মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা

সংকলন ও অনুবাদ

ড. সাঈদ-উর রহমান

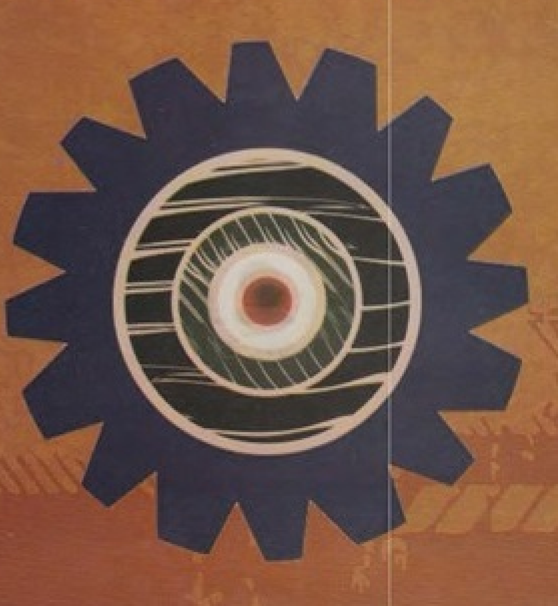

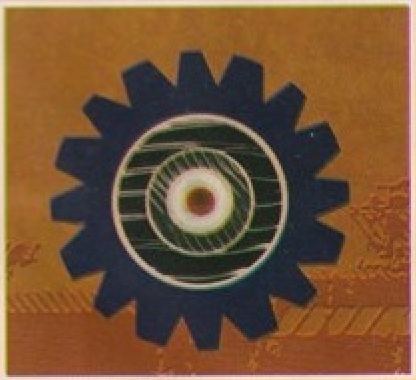

মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের ইতিহাস একশ বছরের কিছু বেশি। আজ অবধি এ-তত্ত্বের বিকাশ সাধন করে চলেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার তাত্ত্বিকরা ও সমালোচকেরা। মার্কস ও এঙ্গেলসের রোপিত বীজটি এভাবে ফুল ও ফলের সম্ভাবনা নিয়ে পরিণত হয়েছে বিরাট মহীরুহে।

মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব অনেক কুসংস্কার দূর করে সাহিত্যের স্বরূপ উদ্ভাসিত করে। সাহিত্য নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেয় এবং জীবন ও সমাজের সমৃদ্ধি-প্রচেষ্টার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে প্রতিভাত হয়।

বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রভাবগত শতাব্দীর প্রথম দিকে পড়তে শুরু করলেও এর সম্যক প্রয়োগ আজও হয়নি। এর বিকাশ চোরাবালিতে আটকে গেছে বারংবার। বর্তমানে যখন সাহিত্যবোধগত নানা বিভ্রান্তিতে আমরা দিশেহারা এবং ক্ষয়িষ্ণু সাংস্কৃতিক তৎপরতায় আচ্ছন্ন, তখন সুস্থ চিন্তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অনেক বেশি। মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের অনুশীলন সেকারণে আজ জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। সে-চর্চার শুভ সূচনা করতে পারে মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা'। তিন মহাদেশের বরেণ্য তাত্ত্বিকদের নির্বাচিত রচনার এই সংকলনটিতে রয়েছে মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব-বিকাশ-বিস্তৃতি, সমৃদ্ধি ও গভীরতার রূপরেখা। বাংলাদেশে এ ধরনের কাজ আর হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

সাবলীল অনুবাদ, মূল্যবান ভূমিকা ও উপকারী নির্ঘণ্ট এ বইয়ের বৈশিষ্ট্য।

প্রচ্ছদ : অনন্ত আকাশ

www.pathagar.com

মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা

www.pathagar.com

মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা

সংকলন ও অনুবাদ
অধ্যাপক সাঈদ-উর রহমান
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জ্ঞান বিতরণী

www.pathagar.com

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩

প্রকাশক
মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম

জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২ বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা ১১০০। ফোন : ৭১৭৩৯৬৯

প্রচ্ছদ
আব্বাছ খান

কম্পোজ
অনিন্দ্য কম্পিউটার, বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
নিউ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি. কে. দাস রোড, ফরাশগঞ্জ,
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মূল্য
৪০০ টাকা U.S.$ 10

Marks o Marksbadider Sahittachinta
By Prof. Sayed-Ur Rahman
Published, 2013 by Shahidul Islam,
Ghan Bitarani , Dhaka 1100 Ph. 7173969
Price : Taka 400.00

ISBN 978-984-901103-3

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

ইকবাল, খোরশেদ, গাউস,
ও প্রয়াত
জহির, রুস্তম ও সেলিম-আল-দীন
— বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সতীর্থদের

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ-কথা ৯

ভূমিকা ১১

কার্ল মার্কস

ফার্ডিনান্ড লাসালের নিকট পত্র ২৫

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

ফার্ডিনান্ড লাসালের নিকট পত্র ২৯

মিন্না কাউটস্কির নিকট পত্র ৩৫

মার্গারেট হারকনেসের কাছে পত্র ৩৭

প্লেখানভ

'শিল্পের-জন্যে-শিল্প' প্রসঙ্গে ৪০

ভ.ই. লেনিন

রুশ বিপ্লবের দর্পণ হিসেবে লিও টলস্টয় ৫৫

ল.ন. টলস্টয় ৬১

লিও ট্রটস্কি

কবিতার আঙ্গিকবাদী গোষ্ঠী ও মার্কসবাদ ৬৬

লুনাচারস্কি

মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনা : কতিপয় প্রস্তাব ৮৩

লু সুন

আমাদের নতুন সাহিত্য সম্পর্কে কিছু চিন্তা ৯৫

ক্রিস্টোফার কডওয়েল

আধুনিক কবিতার বিকাশ ১০১

মাও সে-তুং

সাহিত্য-শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনেনের আলেচনা-
সভায় প্রদত্ত ভাষণ ১১৮

www.pathagar.com

গেওর্গ লুকাচ

অবতরণিকা ১৫০

জর্জ টমসন

কবিতার শিল্পরূপ ১৭১

আরনস্ট ফিশার

শিল্পকলার ভূমিকা ২০১

অঁরি আরভোঁ

দ্বান্দ্বিকতা ২০৯

ওয়ালটার বেনজামিন

যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের যুগে শিল্পকলা ২২১

জেনে এইচ বেল-ভিল্লাডা

শিল্পের-জন্য-শিল্প মতবাদ : বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্ভব, সামাজিক অবস্থা ও কাব্যিক মতাদর্শ ২৪৭

ভবানী সেন

একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী ২৭২

সিডনী ফিনকেলস্টাইন

মানবিকীকরণে শিল্পকলা ২৮৩

পরিশিষ্ট

ক. নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের ঘোষণাপত্র ২৮৮

খ. প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘের সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্র ২৯১

নির্ঘণ্ট ২৯৬

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা : এক

১৯৮৩ সালে কার্ল মার্কসের শততম মৃত্যুবার্ষিকী সামনে রেখে এই অনুবাদের কাজ শুরু করি। পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের একাডেমিক কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বইটি প্রকাশ করার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে আমাকে উৎসাহিত করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজি না হওয়ায় বাংলা একাডেমির কাছে ধরণা দেই। বলা অনাবশ্যক, তারাও রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত, একাডেমিক পাবলিশার্স কর্তৃপক্ষের, বিশেষ করে জনাব হাবিবুর রহমানের আগ্রহে বইটি প্রকাশিত হল। একাডেমিক পাবলিশার্স কর্তৃপক্ষ আমার প্রতি যে আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন, সেটা মনে রাখার মত।

সংকলন করা আসলেই একটি যৌথকর্ম। এ-গ্রন্থ রচনায় সেটা আমার কাছে বেশি মনে হয়েছে। আমার আগ্রহের কথা জানতে পেরে জনাব আহমেদ কামাল অযাচিতভাবে তাঁর কয়েকটি বই আমাকে চিরকালের জন্যে ধার দেন। দু-দুবার বিদেশ থেকে ফিরে আসার সময় সহকর্মী জনাব মনসুর মুসা আমার জন্যে বই নিয়ে আসেন। আমেরিকার প্রবাসী জনাব মতিনউদ্দিন আহমেদ সাহায্য করেন দুটো বই দিয়ে, পশ্চিম জার্মানিতে উচ্চশিক্ষারত বন্ধু শামীম খান পাঠিয়ে দেন সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বই। একজন ফরাসী লেখক সম্পর্কে জানতে চেয়ে সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপিকা ডঃ (মিসেস ফ্রাঁস ভট্টাচার্যের শরণাপন্ন হলে তিনি খুশি হয়ে সাহায্য করেন। জার্মান ভাষার কবিতা তরজমা করে দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের জনাব শরফুদ্দীন আহমেদ। আর আগ্রহভরে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সবসময় খোঁজ নিতেন ও পরামর্শ দিতেন ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ডঃ হুমায়ুন আজাদ ও জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক। অনুবাদে হাত দেই যখন আমি গৃহহীন ছিলাম। গৃহলক্ষ্মী নিরন্তর উৎসাহ না-যোগালে ওই সময়ে কাজ করা আমার পক্ষে দুরূহ হত।

আমি এই সুযোগে সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বাংলা বিভাগ — সাঈদ-উর-রহমান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — ১লা বৈশাখ, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ

প্রসঙ্গ-কথা : দুই

সাতাশ বছর পর বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হচ্ছে। এতে কিছু নতুনত্ব আনা হয়েছে। চারটি নতুন প্রবন্ধ ও দুটি দলিল সংযোজন করেছি। ওয়ালটার বেনজামিনের প্রবন্ধটি আমার অনুবাদ নয়। ইউনিভারসিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর ইংরেজীর সহকারী অধ্যাপক জনাব জাকির হোসেন মজুমদার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা

www.pathagar.com

বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদের আজমের অনূদিত রচনাটি তাদের অনুমতি নিয়ে সংকলিত হয়েছে। ভবানী সেনের লেখাটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, বাংলা ভাষায় রচিত ॥ পরিশিষ্টে দেয়া হয়েছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল—সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্পকলা সম্পর্কে কম্যুনিস্টদের মনোভাব এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

গত সাতাশ বছরে দেশে ও বিদেশে অনেক অনেক ওলট-পালট ঘটেছে। তবু বইটি পাঠকদের কাছে সমাদর পাবে বলে মনে করি। জ্ঞান বিতরনীর স্বত্ত্বাধিকারী প্রকাশক সহিদুল ইসলাম ও আমার ছাত্র সোহেল রানার কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আরও কৃতজ্ঞ জিনিয়া ফারজানা, মোঃ মনির হোসেন ও শিশির ভট্টাচার্য্যের কাছে।

সাঈদ-উর রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — ১লা বৈশাখ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

লেখকের অন্যান্য বই

চারু মজুমদার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
ওদুদ-চর্চা (সংকলন ও সম্পাদনা)
সাহিত্য-সংস্কৃতির উদার প্রান্তরে

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন
পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা
সামন্তযুগে বাঙালী-সংস্কৃতি : কয়েকটি প্রসঙ্গ

একই মায়ের পুত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য : ১৯৭২-১৯৯৭
আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা

এ কেমন বাংলাদেশ
শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ
অনিশ্চিত গন্তব্যে বাংলাদেশ

আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ভাষণ ও বিবৃতি
৭ নভেম্বর : ইতিহাসের মোড়
কালে-কালান্তরে

১৯৭২-১৯৭৫ : কয়েকটি দলিল
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জাতীয় স্বার্থ

www.pathagar.com

ভূমিকা

কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগের সবচেয়ে খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বিপ্লব সংঘটনে ও সমাজ পরিবর্তনের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে। ওই ক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্য আমাদের এত আবিষ্ট করে রেখেছে যে, জীবনের অন্যান্য কৃতী সাধারণভাবে চোখের অগোচরে পড়ে আছে। তেমনি একটি দিক হলো সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি তাঁদের অপরিমেয় কৌতূহল। পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী করার সংগ্রামে যাঁরা আমৃত্যু নিয়োজিত ছিলেন, তাঁরা যে, মানুষ ও সমাজের অন্তরঙ্গ পরিচয়ে বিশিষ্ট সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি আকৃষ্ট হবেন, সেটাই স্বাভাবিক। বাস্তবেও ঘটেছিল তাই। উভয়ে ছিলেন সব ধরনের সাহিত্যের সমঝদার পাঠক। বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনার কালে তাঁরা সুযোগ করে নিতেন সাম্প্রতিক ও চিরায়ত সাহিত্যকর্ম আস্বাদনের। ইসকাইলাস ও শেক্সপীয়র ছিল মার্কসের নিত্যসঙ্গী, হাইনে ও গ্যেটের কাব্য ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ, প্রিয় কবিদের তালিকায় ছিল দান্তে ও রবার্ট বার্নস। তিনি ছিলেন উপন্যাসের পোকা, বিশেষ করে আঠার শতকের ইউরোপীয় উপন্যাসের। ইউরোপের সকল ভাষা তিনি জানতেন, পঞ্চাশ বছর বয়সে আয়ত্ত করেছিলেন রুশ ভাষা। তাঁর রচনারীতি বিশিষ্টতা লাভ করেছে সমকালের ও পুরাকালের অসংখ্য লেখকের রচনা থেকে উদ্ধৃতিতে ও ইঙ্গিতে। তিনি নিজেও লিখেছিলেন একটি উপন্যাস, একটি কাব্যনাট্য ও কয়েকশ কবিতা।

এঙ্গেলসের ভাষাজ্ঞান ছিল আরো বেশি। প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিনের বাইরে তিনি শিখেছিলেন উপভাষাসহ ইউরোপের সমুদয় ভাষা। মার্কসের মতো তিনিও ছিলেন দেশী-বিদেশী সাহিত্যের পাঠক— বিশেষ করে তাঁর আগ্রহ ছিল জার্মান সাহিত্যের প্রতি। উপভাষা শেখার অদম্য অনুরাগবশত তিনি একবার ইতালীর মিলান অঞ্চলের উপভাষায় লেখা একটি উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রয় করেন। প্রথম জীবনে তাঁর অন্যতম আকাঙ্ক্ষা ছিল কবি হবার।

সাহিত্য পাঠের আকাঙ্ক্ষা লেনিনেরও ছিল অনুরূপ। সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত জীবনে তিনি বার বার পড়তেন পুশকিন, লেরমন্তভ ও নেকরাসোভের রচনা। ক্রেমলিনে তাঁর যে অফিসঘর ছিল, তাতে দুটো বুক-কেস ঠাসা ভর্তি ছিল রুশ সাহিত্যিকদের বইপত্রে। টলস্টয়, লেরমন্তভ, গোগোল, তুর্গেনিভ, উসপেনস্কি, নেস্তর, সল্টিকভ, চেখভ ও গোর্কীসহ বিপ্লবী গণতন্ত্রী প্রাবন্ধিকদের রচনাও সেখানে স্থান পেয়েছিল।

সেকালের অপরাপর বিপ্লবীদের জীবনের ছবিও প্রায় অনুরূপ।

www.pathagar.com

দুই

এঁরা কেউই সাহিত্য ও শিল্পকলার তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেননি। দু'বার মার্কস পরিকল্পনা করেছিলেন বিস্তারিত কিছু লেখার : ১৮৪১-৪২ সালে ব্রুনা বাউয়ের (১৮০৯-৮২) সঙ্গে মিলিতভাবে উদযোগ নিয়েছিলেন ধর্ম ও শিল্পকলা সম্পর্কে হেগেলের ধারণার মূল্যায়নের, ১৮৫৭ সালে 'নিউ আমেরিকান সাইক্লোপেডিয়া'র সম্পাদকদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন 'নন্দনতত্ত্ব'বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে। বলাবাহুল্য, কোনটাই বাস্তবায়িত হয়নি।

তবে, প্রথমেই উল্লেখ করেছি, তাঁর রচনায় সাহিত্য ও শিল্পকলার মৌলিক দিক নিয়ে প্রচুর মতামত ছড়িয়ে আছে। এঙ্গেলসের রচনায়ও তেমন নিদর্শন পাওয়া যায়। এমনিতে, বিবিধ সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে অভিমত জানিয়ে তারা লেখকদের কাছে চিঠি লিখতেন। সবগুলো একত্রে করলে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের অভাব অনেকাংশে মিটে যায়। সে-ধরনের সংকলন বেশ কটি প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে নন্দনতত্ত্বের প্রকৃতি, শিল্পকলার সঙ্গে শ্রমের সম্পর্ক, শিল্পকর্মের শ্রেণীউৎস ও আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন, সমাজ ও শিল্পকলার অসম বিকাশ, বাস্তবতার সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের সম্পর্ক, ধনতন্ত্রের যুগে শিল্পসৃষ্টি ও বস্তুগত উপাদান, সাহিত্যের উদ্দেশ্য-প্রবণতা, সাহিত্যে আধার ও আধেয়র সম্পর্ক প্রভৃতি প্রশ্নে তাদের মতামত পুনর্গঠিত করা যেতে পারে। মার্কস-এঙ্গেলসের টুকরো-টুকরো মন্তব্য অবলম্বন করে মার্কসবাদীরা গভীরতর অনুসন্ধান করেছেন। এভাবে পৃথিবীর দেশে-দেশে মার্কসীয় সাহিত্যচিন্তার বিস্তার ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। ওইসব বিভিন্নমুখী আলোচনার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে অনেক, অনেকক্ষেত্রে ঐকমতও সৃষ্টি হয়েছে।

মার্কসীয় নন্দনশাস্ত্র ও সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে এভাবে।

তিন

শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা অন্তর্নিহিত রয়েছে মনুষ্যস্বভাবের বিশিষ্টতার মধ্যে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও যৌনাকাঙ্ক্ষার মতো জৈবিক চাহিদা মানুষের আছে। দুইই, সেগুলো সংগ্রহ করে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে। পশুপাখিরা পরিতৃপ্তি খোঁজে অবিকৃত বা অসংস্কৃত দ্রব্যের মধ্যে, মানুষ নেয় নিজের মনোমত রূপ দিয়ে। সে খাদ্য গ্রহণ করে মুখরোচক রান্নার পর, পোশাক বানায় নিত্যনতুন পদ্ধতিতে, যৌনাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির জন্যে এগোয় প্রেমের পথে। মানুষও পরিশ্রম করে, তবে তার শ্রম সৃষ্টিক্ষম, নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্‌বেল। বলা যায়, জীবজগতের অংশ মনুষ্য প্রজাতির মানুষ হয়ে ওঠার নেপথ্যে কাজ করেছে তার শ্রমের অন্তর্গূঢ় সৃষ্টিশীল ক্ষমতা। এই ক্ষমতার প্রেরণায় সে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চায়, বড়

www.pathagar.com

কিছু করার স্বপ্ন দেখে। আরো বড় কথা, জড়জগতকে নিজের মতো মানবীয় ও শোভন করার, বা প্রকৃতি-জগতকে নিজের আধিপত্যে আনার আকাঙ্ক্ষা মনুষ্যস্বভাবে অন্তর্গত। মানুষের হাতে পাখি কথা কয়, সমুদ্র ক্রন্দন করে, চাঁদ শিশুর মামা হয়। সেজন্যে শিল্প সৃষ্টির উৎস হচ্ছে মানবস্বভাবের দ্বৈত প্রেরণা তথা শ্রমের সৃষ্টিক্ষম বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশের মানবিকীকরণের আকাঙ্ক্ষা। জন্মের ইতিহাস থেকেই বোঝা যায় সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে মানবিকতার মধ্যে—সেটা সৃষ্টি হয় মানুষের দ্বারা ও মানুষের জন্যে এবং বেঁচে থাকে মানুষের মধ্যে ও মাধ্যমে।

তারপর মানুষ সমাজ গড়ে। প্রথম যুগের সমাজ ছিল সদস্যদের সমঅধিকারের, সমবন্টনের ও সমসুযোগভোগের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত। কালপরিক্রমায় সমাজের পরিধি বাড়লে সম্পর্ক জটিল রূপ নেয়। সমবন্টনের সুযোগ নষ্ট হয়ে অধিকাংশের ওপর অল্পের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করার পর এই সমাজে প্রতিটি শিশুই আটকে পড়ে শোষণের সহস্রজালে। জীবনের পথে সে যতই এগোয়, বন্ধন ততই তীব্রতা পায়। বিরূপ বিশ্বের প্রভাবে তার ব্যক্তিত্ব হয় খণ্ডিত, প্রতিভা থাকে অবিকাশিত, মানবীয় সৌরভ প্রকাশের পথ না-পেয়ে গুমরে-গুমরে কাঁদে। সে-অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার সাধনায় কার্ল মার্কস ও তাঁর অনুসারীরা আবিষ্কার করেছেন কম্যুনিস্ট সমাজের পথ। কম্যুনিস্ট সমাজে, এমনকি প্রাক্-কম্যুনিস্ট সমাজতান্ত্রিক সমাজেও শোষণের নাগপাশ লোপ পেয়ে মানুষ যথার্থ স্বাধীনতায় উপনীত হবে, মানব বিকাশের পথ হবে দ্বিধাহীন নির্দ্বন্দ্ব। পৃথিবীর অনেক প্রাচীন ধর্মেও ভগবানের কৃপায় শেষপর্যন্ত মর্তে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হবার ভবিষ্যত বাণী আছে। সেটা সম্ভব হবে ভগবানের কৃপায়, কিন্তু কম্যুনিস্টরা তা করতে চায় সংঘবদ্ধ মানুষের বাহুবলের দ্বারা। সে-প্রয়াসে তথা প্রচলিত সমাজের সংকট উত্তরণের প্রতিদিনের সংগ্রামে বিপ্লবীদের নিত্যসঙ্গী হবে সাহিত্য ও শিল্পকলা। কারণ, সৎসাহিত্য মানুষকে জানায় তার অন্তহীন সম্ভাবনার কথা তার কাছে বার্তা পৌছে দেয় বৃহৎ জীবনের। দিনানুদৈনিকের গ্লানি, দুর্দশা ও প্রবলের উৎপীড়ন যে-চিরস্থায়ী নয়, উদার আনন্দময় জগতরচনা-যে মানুষের দ্বারা সম্ভব, সে সুসমাচার পাওয়া যায় মহৎ সাহিত্যে। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন ব্যতীত অন্য বিপ্লবীরাও সে কারণে দ্বারস্থ হতেন সাহিত্য জগতের। গৃহযুদ্ধের ঝড়ো দিনগুলোতে এক রণাঙ্গন থেকে অন্য রণাঙ্গনে যাওয়ার অবসরে তাঁর বিখ্যাত ট্রেনের কামরায় ট্রটস্কি পড়তেন সদ্য প্রকাশিত সব উপন্যাস; আর বিপ্লবের কালে ইয়েনেনের পার্বত্য অঞ্চলে কমরেডদের নিয়ে মাও সে-তুং নিমগ্ন হতেন সাহিত্যালোচনায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ পুনর্গঠনের কালে স্ট্যালিন স্থাপন করেছিলেন সাহিত্য-শিল্পকলার জন্যে আলাদা মন্ত্রণালয়, আলাদা সংগঠন। সাহিত্যের ওপর খবরদারী বলে যতই প্রচারণা চালানো হোক না কেন, কিংবা বাড়াবাড়ি যে হয়েছিল সেটা অস্বীকার

www.pathagar.com

না-করেও বলা যায় যে, সমাজতন্ত্রীরা শিল্প-সাহিত্যকে সমাজ জীবনের জন্যে কত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, এ-থেকে বোঝা যায়। এমনকি, শোষণমুক্ত নবীন পৃথিবী যখন বিকশিত হবে, তখনও বই হবে মানুষের নিত্যসঙ্গী। সেসময় নাগরিকেরা সকালে যাবে মাছ শিকারে, দুপুরে যাবে কর্মস্থলে, কর্মক্লান্ত বিকেলে সপরিবারে গোল হয়ে বসে পড়বে প্লেটোর বই— মার্কস ভবিষ্যতের ছবি এঁকেছিলেন এভাবে।

মার্কসবাদীদের কাছে সাহিত্যরচনা তাই, উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ নয়। 'শিল্পের জন্যে-শিল্প' তত্ত্বকে তাঁরা বর্জন করেন। তাঁরা মনে করেন সাহিত্যের ইতিহাসে তেমন ধারণার উদ্ভব ঘটা বিচিত্র নয়; সেটা জন্ম নেয় তখন, যখন সাহিত্যসেবী বা শিল্পীরা সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে নৈরাশ্যজনকভাবে সঙ্গতি হারিয়ে ফেলেন। অপরপক্ষে, মার্কসের অনুসারীরা শিল্পীর কাছে আশা করেন দৃঢ় ভূমিকা। অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তি বিধায় তিনি মানুষের দুঃখে বিচলিত হবেন। তিনি মানুষের দুঃখমোচনের সংগ্রামে এগিয়ে যাবেন। সমাজের দ্বান্দ্বিকতা আগ্রহের সঙ্গে নিরীক্ষণ করে তিনি অবস্থান নেবেন সমাজের বৃহৎ অংশের অনুকূলে। যে-শ্রমজীবী জনতা যুগ-যুগ ধরে সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে, অথচ সমাজে যোগ্য আসন পায়নি, তাদের দুঃখ একজন সাহিত্যিকের মনে করুণা জাগাবে। তাঁর লেখায় তারা কথা কয়ে উঠবে। তিনি নিবেদিত হবেন শ্রমজীবী মানুষের জন্যে সুন্দর পৃথিবী গড়ার কাজে। হয়তো তাকে সবসময় সরাসরি কথা বলতে হবে না, কিন্তু সমাজের নিরন্তর দ্বন্দ্বে তিনি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষে ইতিহাসের পক্ষে থাকবেন । সমাজ-বিকাশে এমন সময় আসে যখন শিল্পীকে সৈনিক হতে হয়। সে-অবস্থা রাশিয়ায় এসেছিল, চীনে এসেছিল, আমাদের দেশে এসেছিল ১৯৭১ সালে। সে ক্রান্তিলগ্নে সাহিত্যিককে মানুষের সমতলে নামতেই হবে। এটাই লেনিনের বিখ্যাত পার্টিজানশিপ তত্ত্ব।

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নির্ধারণ করা মার্কসীয় সমালোচনা-শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সমস্যাটি বহুমাত্রিক : শিল্পকর্মের উপকরণ আহরিত হয় সমাজ থেকে; ভাষা সামাজিক মানুষের সৃষ্টি– ব্যক্তি চৈতন্যও নির্মিত হয় সমাজচেতনার ভিত্তিতে, ব্যক্তি বা সমাজের চেতনা গড়ে ওঠায় সাহিত্যের প্রভাব ব্যাপক : অনুভূতি সমৃদ্ধ হয় সংগীত, চিত্রকলা, কবিতা ও নাট্যকর্ম প্রভৃতির সংস্পর্শে এবং সাহিত্যে ও শিল্পকলায় নতুন ধারা ও আঙ্গিকের উদ্ভব ঘটে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে। সমাজ বিন্যস্ত দু'ভাগে– কাঠামো ও ওপরকাঠামো। উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন-সম্পর্কে দুয়ের সমবায়ে গঠিত হয় কাঠামোর স্তর। উৎপাদনের উপকরণ বলতে বোঝায় উৎপাদিকা যন্ত্র, শ্রমজীবী মানুষ ও কাঁচামাল আর উৎপাদিকা যন্ত্রের মালিকানা, উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টনের পদ্ধতি ও সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর স্থান ও সম্পর্ক সেসবের যৌগিক ফলই উৎপাদন-সম্পর্ক। কাঠামো নির্মাণ করে ওপরকাঠামোকে। রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, সংস্কৃতি প্রভৃতি অন্তর্গত ওপরকাঠামোর। সাহিত্যের সঙ্গে সবগুলোর সম্পর্ক আছে, যেমন

www.pathagar.com

আছে কাঠামোর সঙ্গে। কাঠামো বদলালে ওপরকাঠামো বদলায়, তার সাথে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় সাহিত্যের আধার ও আধেয়-এ। সামন্ত-সমাজের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে আছে রোমান্সমূলক কাব্য– প্রাচীনতর সমাজে শতাব্দীর সাধনায় রূপ লাভ করেছে রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড, ওডেসি। সামন্তসমাজ ধনতান্ত্রিক সমাজে বিবর্তিত হওয়ার সাথে নিয়ে আসে গদ্য, গীতি কবিতা ও উপন্যাস। তবে এটা ঠিক, এই পরিবর্তন বা সম্পর্ক একেবারে যান্ত্রিক বা সরলরৈখিক নয়। সে কারণে পুরোনো কালের সাহিত্য পরবর্তীকালেও পাঠকের কাছে আনন্দ নিয়ে হাজির হয়। রোমান্স, মহাকাব্য, কালিদাসের ও সফোক্লিসের নাটক একালের পাঠকেরাও আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করে। এর ব্যাখ্যা এভাবে করা যেতে পারে : সাহিত্য সরাসরি কাঠামো থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে না। রোমান্স বা মহাকাব্যের, এমনকি শেক্সপিয়রের ও গ্রিক নাটকের অন্যতম অবলম্বন পুরাণ, মিথ, কিংবদন্তী ও লোকশ্রুতি– যেগুলোর উদ্ভব হয় সমাজকাঠামো থেকে। দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস থেকে আসে সাহিত্যের একটা প্রধান অংশ। এ ধরনের মধ্যবর্তী মাধ্যম থাকায় কাঠামোর সঙ্গে তুলনায় সাহিত্য এক প্রকার স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হয়। ফলে কাঠামো ও সাহিত্যের বিকাশ অনেক সময় সমান্তরাল হয় না। বাংলা সাহিতের বেলায় এটা আমরা লক্ষ্য করি। আধুনিক বুর্জোয়া যুগের দিকে বাঙালি সমাজ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখনও হেম-নবীন-কায়কোবাদ প্রমুখ পুরোনো ধাঁচের মহাকাব্যের আঙ্গিক নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য থেকে এধরনের নজির টেনে কার্ল মার্কস হাজির করছেন তাঁর অসম বিকাশের তত্ত্ব।

ধনতন্ত্রের সঙ্গে শিল্পসাহিত্যের বিরোধিতার কথা মার্কস বলেছিলেন। সত্যি বটে, পৃথিবীর কয়েকজন সেরা শিল্পীর জন্ম বুর্জোয়া যুগে, কিন্তু সাধারণভাবে, ধনতন্ত্রের প্রকৃতি ও শিল্পের প্রকৃতি পরস্পরের বিরোধী। ধনতন্ত্রের মূলকথা মুনাফা-সঞ্চয়। রাজা মিডাসের স্পর্শে যেমনিভাবে সব কিছু সোনায় পরিণত হতো, তেমনিভাবে ধনতন্ত্রের ছোঁয়ায় সমস্ত পদার্থ বাজারজাতযোগ্য পণ্যে পরিণত হয়। বাজারে যে-দ্রব্যের যত কদর, ধনতন্ত্রীর নিকট সে জিনিস তত মূল্যবান। শেষপর্যন্ত মানবীয় সম্পর্কও হেরে যায় অর্থের কাছে। অথচ আমরা দেখেছি, জড়জগত ও জীবজগতকে মানবিকীকরণের আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল ছিল শিল্পকলার উদ্ভবে। শিল্পের প্রেরণা চারপাশের জগতে মানবীয়তার প্রসার ঘটানো– ধনতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে পণ্যে রূপান্তরিত করা। সেজন্যে পুঁজিবাদ শিল্পের বিকাশকে বাধা দেয়, শিল্পির জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

ধনতন্ত্রে মুনাফা-সঞ্চয় কিন্তু সবার জন্যে নয়, সেটা ব্যক্তিগত সঞ্চয় মাত্র। পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র ব্যক্তিকে কাজে লাগাতে চায়। সাহিত্যের একটি বড় শাখা কবিতার মূল দেখা যায় আদিম মানুষের সংঘবদ্ধভাবে প্রকৃতিকে বশীভূত করার ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার মধ্যে। সেক্ষেত্রে, কবিতার প্রেরণা ও ধনতন্ত্রের প্রেরণা মূলগতভাবেই একে-অপরের বিরোধী। বুর্জোয়া সমাজে কবিতার অবক্ষয়কে এভাবে বোঝা যায়। অথবা, কবিতার প্রাণহীনতার

www.pathagar.com

তথা অর্থহীন আঙ্গিক-সর্বস্বতায় বিবর্তন এই সমাজের ক্ষতিকর প্রভাবের দ্যোতনা দেয়। যাই হোক, তবু সমাজে কবিতা, শিল্প, সাহিত্য টিকে আছে; এবং সেটা সম্ভব হয়েছে তার আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসনের বৈশিষ্ট্যে ও অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বলে।

বাস্তববাদিতা সাহিত্য সৃষ্টির একটি বড় আশ্রয় : বিশেষ করে মহৎ সাহিত্যের একটা লক্ষণ হিসেবে একে বিবেচনা করা যায়। চোখে-দেখা মানুষের সংগ্রাম-সাফল্য, দুঃখ-বেদনা সাহিত্যে রূপায়িত হোক, মার্কসবাদীরা সেটা কামনা করেন। বাস্তব জীবনকে ছেড়ে কল্পজগতে ডুব দেওয়া গৌরবের ব্যাপার নয়। তবে সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা সর্ম্পকে তাদের বিশিষ্ট ধারণা রয়েছে। মার্কসবাদী সাহিত্যালোচনায় বাস্তববাদিতা বলতে বস্তুজগতের বা সমাজ পরিবেশের খুঁটিনাটি বর্ণনা বোঝায় না– তাহলে সেটা ফটোগ্রাফিতে পর্যবসিত হয়। বস্তুভারাক্রান্ত রচনা সমাজবিজ্ঞানীর কাছে আদরণীয় হলেও সমালোচকের কাছে তেমন উৎকৃষ্ট নয়। আবার বস্তুজগতে দাঁড়িয়ে কল্পজগতে হাজির হওয়াও কাম্য নয়, তাহলে শিল্পির ভাববাদে পৌঁছে যাবার ভয় থাকে। বাস্তববাদিতা বলতে মার্কসবাদীরা এঙ্গেলসের বক্তব্যকে মান্য করেন। তিনি মনে করতেন, বাস্তববাদিতা হয় বাস্তবের বিশ্বস্ত উপস্থাপনার বাইরে গড়পরতা পরিবেশে প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের বিশ্বস্ত উপস্থাপনা। এই বক্তব্যকে পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করেন গেওর্গ লুকাচ। মোটামুটিভাবে, মার্কসবাদীদের বিবেচনায় এ–বিষয়টির তিনটি দিক আছে : বস্তুজগতের বিশ্বস্ত উপস্থাপনা; জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে রচিত মানবিক বাস্তব জগতের প্রতিফলন এবং সে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানব প্রকৃতির যে নতুন সত্য উদ্ভাসিত হয়–তার পরিচর্যা। এই তিন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে রচিত সাহিত্য যথার্থ বাস্তববাদী রচনা। লেখকের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি যদি কৃত্রিম না–হয়, তবে তাঁর রচনা অনিবার্যভাবে সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে মূর্ত করে ও ইতিহাসের সরণিকে আলোক-উজ্জ্বল করে। মহৎ শিল্পি যখন ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর ব্যক্তি অভিমান, অহং চেতনা, এমনকি শ্রেণীচেতনা লোপ পায়, সমাজ বিবর্তনের অনিবার্য গতিকে লোচন করে তিনি তাকে রূপদান করেন। সমাজের স্বরূপ, তাঁর ভেতরের দ্বন্দ্ব, জীবনবাদীমানুষের আবেগ-উৎকণ্ঠা তাঁর লেখায় সমৃদ্ধি এনে দেয়। তখন প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর লেখক প্রগতিশীলতাকে জয়যুক্ত করেন, স্বীয় শ্রেণীর পতনের আলেখ্য রচনা করেন নির্মোহভাবে। ফরাসি ঔপন্যাসিক বালজাক এ শ্রেণীর একজন বাস্তববাদী শিল্পি ছিলেন। তার সম্পর্কে আবেগাপ্লুত ভাষায় উল্লেখ করেছেন এঙ্গেলস, কুমারী হারকনেসের কাছে লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে। বাংলা সাহিত্যে তারাশংকরের মধ্যে সে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি ছিলেন সামন্ত শ্রেণীর সদস্য, কিন্তু তার প্রতিভা সর্বাধিক স্ফূর্তি পেয়েছে সামন্তদের ক্রমিক বিলয় ও ধনতন্ত্রীদের অনিবার্য উত্থান অংকনে। অবশ্য, যেখানে তিনি গান্ধীবাদী আদর্শকে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছেন, সেখানে তিনি খণ্ডিত ও নিষ্প্রভ।

কনটেন্ট ও ফর্ম, বিষয় ও আঙ্গিক, বা আধার ও আধেয়র সমবায়ে রচিত হয় একটি

www.pathagar.com

শিল্পকর্ম। বিষয় আসে প্রথমে এবং তার প্রয়োজনে সৃষ্টি হয় উপযুক্ত আঙ্গিক। তত্ত্বগতভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব হলেও, মূলত দুইই অবিভাজ্য। সার্থক শিল্প সৃষ্টিতে দুটো মিলে একটি অবিচ্ছেদ্য এককে পরিণতি লাভ করে। মার্কসবাদীরা আধারের ওপর যথোচিত গুরুত্ব দেন, তবে সেটা ভাব বা বিষয়ের প্রয়োজনে। আঙ্গিক-সর্বস্ব রচনাকে তাঁরা শুধু বর্জনীয় মনে করেন না, বরং মনে করেন 'সর্বশেষ বিচারে একটি শিল্পকর্মের মূল্য নির্ধারিত হয় বিষয়বস্তুর গুরুত্বের কারণে।' লুনাচারাস্কিও বলেছেন–প্রতিটি অত্যুৎকৃষ্ট রচনার আঙ্গিক সর্বতোভাবে আধেয় দ্বারা নির্ধারিত হয়।' তাঁর ধারণা এই যে, 'বুর্জোয়া অবক্ষয়ের আদর্শ প্রতিনিধি আঙ্গিকবাদীরা'। ট্রটস্কিরও অভিমত অনুরূপ—'শিল্পকলায় ভাববাদের নিষ্ফল প্রয়োগের প্রতিনিধি আঙ্গিকবাদী গোষ্ঠী।'

আমরা আগে দেখেছি যে, সমাজে নতুন শ্রেণীবিন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় সাহিত্যে নতুন আঙ্গিক জন্ম নেয়। বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের সঙ্গে নিয়ে আসে গদ্য ও উপন্যাসের সম্ভাবনা–তাদের পূর্বসূরী সামন্তরা স্বস্তি বোধ করত পদ্যে ও রোমান্সে। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বী বনেদী শ্রেণীর সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি নিয়ে অসংখ্য প্রহসন রচনা করেছে। ইংরেজদের সঙ্গে নতুন শ্রেণীটির মধুর সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার কালে আমরা পেয়েছি দেশপ্রেমমূলক কাব্য, নাটক ও উপন্যাস। পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ও পরে বাঙালি মুসলমানদের একাংশ উপযোগী হয়েছিল পুরানো পুঁজির জগতে প্রত্যাবর্তনে। এভাবে বলা যায়, নতুন আধেয় তার প্রয়োজনে তৈরি করে নেয় নতুন আধার।

বর্তমান কালে রাজনীতির প্রভাব ও এলাকা ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। সমাজের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত শিল্পীর পক্ষে আর রাজনীতি-নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হচ্ছে না। বলা যায়, সমাজের পরস্পরবিরোধী শ্রেণীগুলো যত বেশি বৈরীভাবাপন্ন হবে, রাজনীতি তত বেশি স্পর্শ করবে সবার জীবনকে। ফলে, রাজনৈতিক বিষয়, চেতনা ও বক্তব্য উত্তরোত্তর বেশি আসবে সাহিত্য জগতে। সেসময় লেখকের আঙ্গিক প্রভাবিত হবে, নতুন আধারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। তবে, সৌন্দর্য সৃষ্টিকে সব সময়ে মনে রাখতে হবে। রাজনীতির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আঙ্গিকের প্রতি অবহেলা সাহিত্য সৃষ্টিকে ব্যাহত করবে। এক্ষেত্রে মাও সে-তুং-এর বক্তব্য স্মরণীয়—'আমাদের দাবি হচ্ছে রাজনীতি ও শিল্পকলার একতা, বিষয় ও আঙ্গিকের একতা, বিপ্লবী রাজনৈতিক বক্তব্য ও শিল্প রূপের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ খুঁতহীনতার একত্ব। রাজনৈতিকভাবে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, শিল্পগুণহীন রচনার কোন শক্তি নেই।'

আধার বিশ্লেষণ করা সাহিত্য সমালোচনার বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আধার নির্মিত হয় তিনটি উপাদানের জটিল দ্বান্দ্বিক সংমিশ্রণে— সাহিত্য-আঙ্গিকের বিবর্তনের আপেক্ষিক

www.pathagar.com

স্বায়ত্তশাসন, আধিপত্যশীল ভাবাদর্শগত কাঠামো এবং লেখক ও পাঠকের একগুচ্ছ পারস্পরিক সম্পর্ক। এই ত্রয়ী উপাদানকে মনে রেখে সমালোচককে আঙ্গিক বিশ্লেষণে এগুতে হবে।

সর্বশেষে আমরা মুখোমুখি হই ওই জটিল সমস্যার— সাহিত্যপাঠের ও সাহিত্য রচনার তাৎপর্য কী? প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ বই পড়ে, গান শোনে, ছবি দেখে। সবই কি শুধু সময় কাটানোর জন্য বা অবসর বিনোদনের খাতিরে? মার্কসবাদীদের উত্তর নেতিবাচক। তাঁরা এই ঘটনার মধ্যে মনুষ্য স্বভাবের এক প্রধান বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করেন। তাঁরা মনে করেন যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে নিজের সীমাবদ্ধ খণ্ডিত জীবনকে ছাড়িয়ে বিপুল বিশ্বে প্রসারিত করার, বৃহৎ মানব সমুদ্রে অবগাহন করার। তার ব্যাকুল কামনা প্রাণে প্রাণ যোগ করার, আমিত্বকে অতিক্রম করার। তার আনন্দ সৃষ্টিশীলতায়– যে সৃষ্টির লক্ষ্য জগৎ ও সমাজকে সুন্দর করা ও মানবীয়তার প্রসার ঘটানো। সাহিত্য পাঠ ও সাহিত্যরচনা মানুষের এই আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করে। সাহিত্যের তাৎপর্য তাই, জৈবিকতা থেকে মানবিকতায় উত্তরণ ও মানব প্রজাতির আত্মজাগরণ।

চার

বিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত মার্কস ও এঙ্গেলসের সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত চিন্তার সঙ্গে অনেকের পরিচয় ছিল না। সে বিষয়ে তাঁদের যে মৌলিক ভাবনা আছে তা ও অধিকাংশের অজ্ঞাত ছিল। ইউরোপের সর্ববৃহৎ বামপন্থী সংগঠন জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির (১৮৭৩) দুই প্রধান তাত্ত্বিক কার্ল কাউটস্কি, (১৮৫৪–১৯৩৮) ও এডুয়ার্ড বার্নেস্টাইন (১৮৫০-১৯৩২) মনে করতেন যে, শিল্পকলার ওপর অর্থনীতির প্রভাবের ব্যাখ্যার মধ্যে নন্দনতত্ত্বে মার্কসবাদের অবদান নিহিত। অপব্যাখ্যার কারণে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বও সাহিত্য-তত্ত্ব নিয়ে কারো উৎসাহ জাগ্রত হয়নি এবং ধারণা জন্মেছিল যে, সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁদের অভিমত একান্তভাবে তাঁদের ব্যক্তিগত, যার কোন গভীর তাৎপর্য নেই।

অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয় উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে। কয়েকজন তাত্ত্বিক মার্কসীয় চিন্তার সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা অনুধাবন করে এর বিকাশে যত্নবান হলেন। এঁদের প্রধান ছিলেন ফ্রান্সের পোল লাফার্গ (মার্কসের কন্যাজামাতা (১৮৪২-১৯১১), জার্মানির ফ্রানজ মেহরিং (১৮৪৬-১৯১৯) ও রাশিয়ার প্লেখানভ (১৮৫৬-১৯১৮)। তাঁদের ব্যাখ্যায় অপূর্ণতা যে ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু মার্কসীয় নন্দনশাস্ত্র সম্পর্কে গুরুতর আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করেন তাঁরা। লাফার্গের আগ্রহ ছিল শিল্পকলার সঙ্গে সমাজের ও শ্রেণীস্বার্থের সম্পর্ক নির্ধারণ করায়। মেহরিং একান্ত বিরোধী ছিলেন সামাজিক চেতনাবিচ্যুত বিশুদ্ধ শিল্পের ধারণায়। শিল্পকলার সাথে শ্রেণীচেতনার সম্বন্ধকে

www.pathagar.com

বিশেষভাবে স্পষ্ট করায় তাঁর আগ্রহ ছিল। সাহিত্য ও শিল্পকে সামাজিক বিষয় হিসেবে তিনি বিবেচনা করতেন, কিন্তু একই সঙ্গে শিল্পকলার আঙ্গিকবাদী গোষ্ঠীর চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এই দুই বিপরিতমুখী চিন্তাকে অতিক্রম করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় প্লেখানভের চিন্তায়। সমাজ জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে তিনি শিল্পকর্মকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর ধারণা– সাহিত্য ও শিল্পকলা সমাজ বিকাশের সঙ্গে বিকশিত হয়, শ্রেণী সংগ্রাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ও ভাবাদর্শের রূপে তার প্রতিফলন ঘটায়।

১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে লেনিন একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' শিরোনামে। সাহিত্যের এক ধরনের উদ্দেশ্যমুখিতা রয়েছে— এঙ্গেলসের সে কথার সূত্র ধরে তিনি সাহিত্যের শ্রেণী চরিত্র ও এর সামাজিক-আদর্শিক ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেন। মার্কসবাদের অভ্যুদয়ের পর সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন নির্দিষ্ট গতি লাভ করায় সমাজ পরিবর্তনকামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও পার্টির আদর্শের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে ওঠে এবং পার্টির আদর্শের সঙ্গে একাত্ম হয়েই শিল্পী তার ভূমিকা ভালভাবে পালন করতে পারেন। লেনিনের বক্তব্য পরবর্তীকালে রাশিয়ায় জোরালো হয় ও সে-পথে পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করে। তিনি সেটা লিখেছিলেন পার্টি সংক্রান্ত লেখার জন্য, মৌলিক বা সৃজনশীল সাহিত্যের জন্য নয়। লেখাটি সম্পর্কে সবাই জানতেন, এর পটভূমিও সবার জানা ছিল, কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কিত উত্তপ্ত বির্তকের দিনগুলিতেও কেউ এর উল্লেখ করেননি। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর সাহিত্য বিষয়ে তার চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করার জন্য ক্রুপস্কায়া (লেনিনের স্ত্রী), লুনাচারস্কি, পলোনস্কি, পোলিয়ানস্কি প্রমুখ যে সভা করেছিলেন সেখানেও সেটি উল্লেখিত হয়নি। স্ট্যালিনের কালে সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব আন্দ্রে ঝদানভের চেষ্টায় সেটা মূলনীতি হয়ে ওঠে।

১৯১৭ সালের বিপ্লব সফল হলে সারা পৃথিবীর নজর রাশিয়ার দিকে নিবদ্ধ হয়, নতুন রাষ্ট্রে সাহিত্য কী রূপ পরিগ্রহ করে সেটা জানার জন্য সবাই কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। পরবর্তী পনের বছর সরকারি হস্তক্ষেপের বাইরে থেকে সেটা মোটামুটি স্বাধীন ভাবে বিকশিত হয়, প্রাণবন্ত তর্ক-বিতর্কে ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিকাশে মুখর থাকে। প্রলেতকাল্ট, ফিউচারিস্ট, ফরমালিস্ট, সেরাপিও ব্রাদারহুড প্রভৃতি সংগঠন সাহিত্যের ঐতিহ্য, প্রকৃতি ও সামাজিক ভূমিকা নিয়ে গভীর আলোচনায় মত্ত হয়। লেনিন, লুনাচারস্কি, ট্রটস্কি, বুখারিন ও ভরোনস্কি সাহিত্য-শিল্পের স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী ছিলেন বিধায় তাদের আমলে গোড়ামি, একদেশদর্শিতা ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ মাথা তুলতে পারেনি।

চতুর্থ দশকে অবস্থা বিপরীতমুখী হয়। ১৯৩২ সালে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলিকে পুনর্গঠন করার জন্য ডিক্রি জারি করা হয়। এর দ্বারা সকল বেসরকারি সংগঠন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। নতুন সংগঠন তৈরি করা হয় এবং এর লক্ষ্য হয় প্রলেতারিয়

www.pathagar.com

সাহিত্য সৃষ্টি রচনা করা নয়, বরং সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য সরকারের সঙ্গে কাজ করা ; লেখকের লক্ষ্য হবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার রূপায়ণ করার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথ প্রশস্ত করা।

১৯৪১ সালে রাশিয়া বিশ্বযুদ্ধে সামিল হয়। সাহিত্য-শিল্পীদের দায়িত্ব হয় তাদের কাজে স্বদেশপ্রেমিক সাহসীবীর নায়ক সৃষ্টি করা যা পাঠ করে পাঠক উদ্দীপ্ত হবে, লড়াকু সেনারা চাঙ্গা হবে। যুদ্ধে রাশিয়ার সাফল্য ছিল অসাধারণ ; শিল্পীরা আশা করেছিলেন যে যুদ্ধকালের উদারতা যুদ্ধোত্তর কালেও অব্যাহত থাকবে। সে আশা ফলবতী হয়নি। সরকার পুরোপুরি একনায়ক হয়ে বসে। সরকারি নীতির সামান্য বিচ্যুতিও উপেক্ষা করা হয়নি। ইজভেসতিয়ায় প্রকাশিত একটি লেখার জন্য কবি জোশেনকুকে সাহিত্যের আবর্জনা বলে অভিহিত করা হয় ; কবি আখমতোভার লেখা নৈরাশ্য ও বিষাদে ভরপুর বলে সিদ্ধান্ত হয়। কিছুদিন পরে তাদেরকে রাইটার্স ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কার করা হয়।

১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যু হলে অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়। পরবর্তী কালের সাহিত্যে রক্ষণশীলতার পাশাপাশি উদারনৈতিক-কম্যুনিস্ট ভাবধারা জায়গা করে নিতে থাকে। ইতিমধ্যে সাহিত্য সমালোচনার জন্য অতীব প্রয়োজনীয় একটি প্রকল্পে হাত দিয়েছিলেন গবেষকেরা। তারা শুরু করেছিলেন প্রসিদ্ধ লেখকদের সম্পূর্ণ রচনা সম্পাদনা ও প্রকাশ করা। লিও টলস্টয়ের রচনাবলী ৯৬ খন্ডে প্রকাশিত হয়; অনুরূপভাবে তুর্গেনিভের লেখা ২৮ খন্ডে, চেখভ ২০ খন্ডে এবং বেলিনস্কি ১৩ বালামে মুদ্রিত হয়। সর্বপ্রকার তথ্য সংবলিত রচনা সমগ্র গভীরতর আলোচনা ও সমালোচনার সুযোগ অবারিত করে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সাহিত্য জগতে বজায় থাকলেও সেটাই একমাত্র নীতি থাকেনি। ফরমালিস্ট রীতি আবার মাথা তুলে ; কিন্তু আগের মত আর নিন্দিত হয়নি। ভিভি কুজিনভ 'উপন্যাসের ইতিহাস (১৯৬৩) রচনা করলেন মূল রক্ষণশীলতার সঙ্গে উচ্চতর সাহিত্য-কৌশল সমন্বিত করে। ১৯৫৩ সালেই এক তরুণ লিখলেন যে কোন লেখা নিয়ে আলোচনার সময় লেখকের রাজনৈতিক মতের চেয়ে সততা ও ঐকান্তিকতাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ক্রমশ এই মত জোরদার হতে থাকে রুশ সাহিত্যে।

আমেরিকান সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রভাব বিস্তৃত হয় বিশ শতকের তৃতীয় দশকের ভয়াবহ মন্দার প্রতিক্রিয়ায়। সমালোচনাক্ষেত্রে এচিন্তাকে নিয়ে এলেন মাইকেল গোল্ড (১৮৯৪-১৯৬৭), এডমন্ড উইলসন (১৮৯৫-১৯৭২), কেনেথ বার্ক (১৮৯৭-) ভিকতর ফ্রান্সিস কালভারটন (১৯০০-৪০), নিউটন আরভিন (১৯০০-৭৩), গ্রানভিল হিকস (১৯০১-) ও মাথথিয়েসেন (১৯০২-৫০) প্রমুখ লেখক। হিকস-এর 'দি গ্রেট ট্রাডিশন' প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। নিজের কালের মর্মকথাকে অনুধাবন করে লেখক সেটা পাঠকের মনে সঞ্চারিত করবেন এবং অনিবার্য প্রলেতারীয় বিপ্লবের জন্যে তার মন তৈরি

www.pathagar.com

করবেন– এই প্রত্যয়ের আলোকে গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী আমেরিকান সাহিত্যকে তিনি ব্যাখ্যা করেন। বইটি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করে। চারজন বিখ্যাত আমেরিকান লেখকের জীবনী রচনায় ও সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণে আরভিন গ্রহণ করেন এই পদ্ধতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটো রচনা হল হুইটম্যান (১৯৩৮) ও হারমান মেলভিল (১৯৫০)। উইলসনের বিখ্যাত সমালোচনা গ্রন্থ 'একসেল ক্যাসল' প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। এতে তিনি ফরাসি প্রতীকীবাদী লেখকদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। রুশ বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা ছিল। বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যথার্থ মানবীয় সংস্কৃতির পত্তন হবে বলে তিনি মনে করতেন – তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে ঐ লক্ষ্য অর্জনে সাহিত্য ও শিল্পকলা বিপ্লবের সহায়ক হবে।

সবচেয়ে প্রবীণ সাহিত্যশিল্পী গোল্ড ছিলেন সর্বহারা বিপ্লবের জন্যে একেবারে নিবেদিতপ্রাণ। হিকস-এর সহযোগিতায় ১৯৩৫ সালে তিনি সংকলন ও সম্পাদনা করেন 'প্রলেতারিয়ন লিটারেচার ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস'। তিনি পত্রিকাও বের করেন শ্রমিকদের লেখা ছাপার জন্যে ; নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-দুর্দশার আলেখ্য রচনাই হবে সাহিত্যের একমাত্র কাজ– এ মতে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি অভিহিত হতেন আমেরিকান প্রলেতারিয়েত সাহিত্যের 'ডিন' হিসেবে।

ম্যাথথিয়েসেনের 'আমেরিকান রেনেসাঁস' ও 'দি রেসপনসিবিলিটিস অব দি আর্টিস্ট' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৪১ ও ১৯৫২ সালে। রচনাশৈলির সাবলীলতা ও তীক্ষ্ণতা তাঁর লেখার বিশেষ গুণ; তিনি অনায়াসে বিষয়ের মর্মে প্রবেশ করেন। লেখক ও সমালোচকের জন্যে সবচেয়ে ভাল অবস্থা তখন, যখন সমাজের সঙ্গে ব্যবধান সৃষ্টিকারী প্রতিবন্ধকতা একের-পর-এক ভাঙতে-ভাঙতে তারা অগ্রসর হন। অপরদিকে কালভারটন মনে করেন যে, শিল্পকলার বিকাশের স্বার্থে লেখক শিল্পীদের ন্যূনতম মাপকাঠিতে বিশ্বাসী হতে হবে– সে মাপকাঠি হবে সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা সমাজতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সমন্বয়। 'দি নিউয়ার স্পিরিট' (১৯২৫), 'আমেরিকান লিটারেচার এট দি ক্রস রোড্স' (১৯৩১) ও 'দি লিবারেশান অব আমেরিকান লিটারেচার' (১৯৩১) প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর ধারণা বিধৃত আছে।

সবচেয়ে জটিল তাত্ত্বিক হলেন বার্ক। তিনি সাহিত্যকে মনে করেন, 'প্রতীকী কর্ম' বলে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা-উদ্দেশ্যের চারপাশে সৃষ্ট চিন্তা ও প্রকাশের কাঠামো বিশ্লেষণ তাঁর মূল লক্ষ্য। মানুষের সমস্ত জ্ঞানকে একটি বিশ্লেষণী কাঠামোর মধ্যে সূত্রাবদ্ধ করতে তিনি আগ্রহী। 'দি ফিলজফি অব লিটারারি ফর্ম' (১৯৪১), 'এ গ্রামার অব মোটিভস' (১৯৪৫) এবং 'ল্যাংগুয়েজ এজ সিম্বলিক একশন' (১৯৬৬) তাঁর বহুল আলোচিত গ্রন্থ।

হাল আমলে এক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ফ্রেডরিক জ্যামসন।

www.pathagar.com

তাঁর 'মার্কসিজম অ্যান্ড ফরম' (১৯৭১) ভাল বই। মার্কসীয় সমালোচনা নিম্নরূপ এলাকায় আলোকপাত করতে পারে বলে তিনি মনে করেন : মানব অস্তিত্বের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় শিল্পকলার উদ্ভব ও সুস্থ সমাজে শিল্পকলার ভূমিকা, সমাজতান্ত্রিক সমাজে বা সমাজতন্ত্র বিনির্মাণে নিয়োজিত সমাজে শিল্পকলার স্থান; অতীত বা বর্তমানের বিশেষ রচনা বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন।

ইউরোপের ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানিতে মার্কসীয় সাহিত্য চিন্তার বিকাশ ঘটেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। তিরিশের দশকে অডেন, স্পেন্ডার ও ম্যাকনিসের মতো শিল্পীরা মার্কসবাদকে নিয়ে এলেন ইংরেজি সাহিত্যে– সেটা এগিয়ে নেন কডওয়েল। মার্কস ও প্লেখানভের চিন্তাকে নৃতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে 'ইলিউশান ও রিয়ালিটি'-(১৯৩৭) গ্রন্থে কডওয়েল নতুন ব্যাখ্যা হাজির করেন। তাঁর মতে আদিম জনগোষ্ঠীর যৌথ উৎসব থেকে সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছে। উৎসবের যৌথ শ্রম থেকে যৌথ কবিতার জন্ম হয়েছে এবং পরবর্তীকালে শ্রম বিভাজনের প্রক্রিয়ায় কবি স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে পরিণত হন। কবিতা তবু দূর অতীতের স্মৃতিবাহী হয়ে স্বপ্নজগতের দিকে পাঠককে প্রবর্তনা দেয় ও তাকে নিয়ে যায় ঐ জগতের দিকে। কডওয়েলের পরে এ ধারাকে এগিয়ে নেন জর্জ টমসন ও এলিক ওয়েস্ট। তাঁরা সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করেন সমাজের উৎপাদিকা শক্তির সংহত আধাররূপে যা সুপ্ত শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে পাঠককে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। 'ইসকাইলাস অ্যান্ড এথেন্স' (১৯৪১) ও 'ক্রাইসিস অ্যান্ড ক্রিটিসিজম' তাদের দুটো নামকরা সমালোচনা-পুস্তক। বর্তমান কালের দুজন শক্তিশালী সমালোচক হলেন রেমন্ড উইলিয়ামস (১৯২১–) ও টেরি এগলিটন (১৯৪৩–)। প্রথমজন মূলত সংস্কৃতি চিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত– তাঁর গুরুত্বূর্ণ বই 'দি লং রেভোলিউশান' (১৯৬১) ও 'কালচার অ্যান্ড সোসাইটি ১৭৮০-১৯৫০' (১৯৬৩)।

ফ্রান্সে মার্কসীয় চিন্তার বিকাশ সাধন করেন আলথুসার (১৯১৮–) ও তাঁর অনুসারীরা। আলথুসারের বইয়ের নাম 'লেনিন এ্যান্ড ফিলজফি অ্যান্ড আদার এসেস' (১৯৭৭)। তাঁর চিন্তার সার-সংক্ষেপ এভাবে করা যেতে পারে : জগত বিভক্ত অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ভাবাদর্শ ও শিল্পকলায়। শেষের তিনটির রয়েছে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার। ভাবাদর্শ হলো বাস্তব জগতকে উপলব্ধি করার জন্যে গৃহীত কাল্পনিক পদ্ধতি। শিল্পকলা জন্ম নেয় ভাবাদর্শ থেকে এবং অবগাহন করে তার মধ্যে, তবু এক ধরনের দূরত্ব বজায় রেখে পাঠককে সেদিকে ইঙ্গিতে টানে। এভাবে ভাবাদর্শের অন্তর্গত থেকেও স্বায়ত্তশাসনের বৈশিষ্ট্যে সাংগঠনিক দূরত্বে দাঁড়িয়ে ভাবাদর্শকে দেখতে, বুঝতে ও অনুভবে আনতে সেটা পাঠককে সাহায্য করে। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের জগত মূলত একই তবে পদ্ধতি ভিন্ন। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিকে উপলব্ধির জগতে নিয়ে আসে সাহিত্য আর বিজ্ঞান সেটা হাজির করে ধারণাত্মক জ্ঞানের আকারে। সাহিত্য আমাদের সাহায্য করে সমাজের ভাবাদর্শকে বুঝতে

www.pathagar.com

ও কালক্রমে সেটাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক পিয়ের ম্যাশায়রে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত 'সাহিত্য-উৎপাদনের তত্ত্ব' গ্রন্থে আলথুসারের চিন্তাকে সম্প্রসারিত করেছেন। বইয়ের নামকরণ থেকে দেখা যায় তিনি সাহিত্যকে স্রষ্টা না-ভেবে উৎপাদক হিসেবে দেখতে চান। এভাবে শিল্পী ধারণার সঙ্গে রহস্যের যে জাল ছিল তা দূর করে তিনি একটি বস্তুবাদী চিন্তা হাজির করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, কোন উপন্যাস বা শৈল্পিক রচনা সেটুকুই বলে যা সে বলে না।

ফরাসি সাহিত্যে মার্কসীয় সাহিত্য চিন্তা নিয়ে যারা অনুধ্যান করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন মার্লো পঁতে (১৯০৮–৬১), জ্যঁা পল সার্ত্রে (১৯০৫–৮০), ও অঁরি আরভোঁ।

জার্মানিতে মার্কসীয় দর্শনের চর্চা হয়েছে প্রধানত সোশ্যাল ডেমোক্রেট পার্টি ও কম্যুনিস্ট পার্টির আওতায়। তার বাইরে উল্লেখযোগ্য দুজন তাত্ত্বিক ছিলেন ওয়াল্টার বেনজামিন (১৮৯২–১৯৮০) ও থিওডোর এডরনো (১৯০৩–৬৯)। বোদলেয়ার ও জার্মান ট্রাজিক নাটক সম্পর্কে বেনজামিনের গবেষণা আধুনিক যুগের অমানবিক পরিবেশের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নতুনতর আলো দান করে কিন্তু শিল্পী ও লেখককে উৎপাদক হিসেবে বিবেচনা করে তিনি যেতত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন, তা-ই তাঁকে বহুল আলোচিত ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। 'যান্ত্রিক উৎপাদনের যুগে শিল্পকলা' (১৯৩৩) এবং 'উৎপাদকরূপে লেখক' (১৯৩৪) প্রবন্ধদ্বয়ে তিনি বলেছেন যে, শিল্পী যখন নিজেকে উৎপাদকের পর্যায়ে নিয়ে আসেন, তখনই তিনি সর্বহারার শুভাকাঙ্ক্ষী বা আদর্শিক গুরু না ভেবে নিজেকে মনে করেন উৎপাদকরূপে। আধুনিককালে পুস্তক প্রকাশ, ছবি আঁকা, সিনেমা তৈরি একান্তভাবে যন্ত্রের ওপর তথা বুর্জোয়া ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সে ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেলে নতুন উৎপাদন-সম্পর্কে স্থাপিত হবে, শিল্পী-পাঠক নতুন সমতলে উপনীত হবেন। নতুন উৎপাদন সম্পর্ক নিয়ে যাবে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার সম্ভাবনার দিকে। এভাবে দেখা যায়, বেনজামিন শিল্পকর্মের আধেয় তথা বক্তব্যের চেয়ে গুরুত্ব বেশি দিচ্ছেন পাঠকের হাতে পৌঁছে দেবার পদ্ধতির ওপর। মার্কসীয় সমালোচকরা এতদিন অনুসন্ধান করেছেন উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে বিশেষ শিল্পসাহিত্যের সম্পর্ক– এবারে বেনজামিন জানতে চান বিশেষ কালের উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে শিল্পকর্মের অবস্থান। তাঁর অকাল মৃত্যু এতত্ত্বের পূর্ণতার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছে।

সমাজতান্ত্রিক এডরনো সাহিত্য ও সংগীত নিয়েও আলোচনা করেছেন। মূলত লুকাচের তিনি অনুসারী। উৎপাদনের সমাজসম্পর্ক কিভাবে বস্তুর গুণ হিসেবে দেখা যায় সেটাই মূলত তার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। বিভিন্ন শিল্পরূপের সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে তিনি অনুসন্ধান করেছেন। সাহিত্যকে সমাজদর্পণ হিসেবে বিবেচনা করাকে গুরুতর মনে করেন না। তাঁর মতে কোন রচনার প্রতীকী তাৎপর্য বের কররার চেষ্টায় গলদঘর্ম হবার

www.pathagar.com

চেয়ে কি লিখিত হয়েছে সেটা বোঝার জন্যে তিনবার পাঠ করা ভাল।

হাঙ্গেরির গেওর্গ লুকাচ মার্কসীয় নন্দন শাস্ত্রের সবচেয়ে প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। তাঁকে বলা হয় নন্দনতত্ত্বের কাল মার্কস। 'উপন্যাসের তত্ত্ব' (১৯২০), 'ইতিহাস ও শ্রেণীচেতনা' (১৯২৩), 'ইউরোপীয় বাস্তববাদিতা নিয়ে অধ্যয়ন' (১৯৫০), 'ঐতিহাসিক-উপন্যাস' (১৯৬২) এবং 'সাম্প্রতিক বাস্তববাদিতার তাৎপর্য' (১৯৬৩) তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ। অল্প পরিসরে তাঁর চিন্তার পরিচয় দেওয়া বা বিবর্তন রেখা অঙ্কন করা অসাধ্য কর্ম। তবে পরিণত বয়সে তিনি যা ভেবেছেন সে সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে। তাঁর চিন্তা মোটামুটি এরূপ : শিল্পসৃষ্টি ধারণ করে মানব সমাজের আত্মসচেতনতা বা আত্মজাগরণকে। কোনো সাহিত্যকর্ম এই আদর্শ অবস্থা অর্জন করলে সেটা যুগের অন্তরাত্মার বাণীবহ হয়ে ওঠে। ধর্ম, বিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্র থেকে সাহিত্য পৃথক। একান্তভাবে মানস জগতের হওয়ায় ধর্ম থেকে সেটা পৃথক সাহিত্যে বিধৃত জীবনস্বপ্নকে উপলব্ধিতে আনা যায় বলে তা নীতিশাস্ত্র থেকেও দূরে অবস্থান করে। তবে মানসজগত থেকে নৈতিকতার জগতে উপচেপড়া এই প্রতিমার মধ্যে যুগপৎ রয়েছে মোক্ষণের ক্ষমতা ও জ্ঞান দানের সম্ভাবনা– এবং একারণে নৈর্ব্যক্তিক ধ্যান বা ব্যবহারিক জীবনে দুই থেকে সমান দূরত্বে অবস্থান করে বৃহত্তর অস্তিত্বের জন্যে সেটা মানুষকে উপযোগী করে তোলে।

লুকাচের নান্দনিক চিন্তার মধ্যে চারটি ভাবনা অর্ন্তগূঢ় রয়েছে : সামগ্রিকতাবোধ, আধারের ওপর আধেয়র গুরুত্ব, প্রতিফলন প্রক্রিয়ায় অনুকৃতির উপস্থিতি এবং মানুষের পূর্ণতার ধারণা। শিল্প-সাহিত্যের চর্চার মধ্যে তিনি জীবন সাধনার ব্যঞ্জনা অনুভব করতেন। নান্দনিক চেতনা বিরাজ করে ব্যক্তিসত্তা ও সার্বজনীন সত্তার মধ্যে যোগসূত্ররূপে– যে সার্বজনীনতা সমতুল্য সামগ্রিকতার।

লুকাচের প্রধান অনুসারী হলেন রুমানিয়ার লুসিয়েন গোল্ডমান (১৯১৩–)। তাঁর অধিকাংশ বই ফরাসি ভাষায় লেখা। প্রধান কয়েকটি হলো 'গুপ্ত ভগবান' (১৯৫৬) ও 'উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব' (১৯৬৪)। তাঁর আগ্রহ হলো সাহিত্যিক কাহিনীর কাঠামো পরীক্ষা করা ও লেখকের সামাজিক শ্রেণীর চিন্তা বা বিশ্ববীক্ষা কি পরিমাণে লেখায় বিধৃত আছে তা অনুসন্ধান করা। তিনি মনে করেন, কোন লেখার মধ্যে লেখকের সামাজিক শ্রেণীর বিশ্ববীক্ষা যত বেশি সুবিন্যস্তভাবে বিধৃত আছে, সে-লেখা তত বেশি সার্থক। তাঁর মতে, সাহিত্যকর্ম যতটা-না ব্যক্তিবিশেষের জীবনদৃষ্টিকে ধারন করে, তার চেয়ে বেশি করে ঐ-শ্রেণী বা দলের আদর্শ বা মূল্যবোধ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে। মহৎ শিল্পীরা ঐ-কাজটি সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বশীলভাবে করতে পারেন বলে তারা যুগের বাণীবহ।

গোল্ডমানের সমালোচনা পদ্ধতির নাম বুৎপত্তিগত কাঠামোবাদ। সাহিত্যের কাহিনী, বিশ্ববীক্ষা ও ইতিহাস–এই উপাদান ত্রয়ের পারস্পরিক কাঠামো নির্ধারণ করা তাঁর প্রধান

www.pathagar.com

চেষ্টার বিষয়। তিনি দেখতে চান একটি সমাজগ্রুপের ঐতিহাসিক অবস্থান তার বিশ্বদৃষ্টির মাধ্যমে কিভাবে সাহিত্যকর্মের কাঠামোতে স্থানান্তরিত হয়। এটা দেখার জন্য দরকার সমালোচনায় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ– যাতে করে ত্রয়ী উপাদানের পারস্পরিক প্রভাব নির্দেশ করা যায়।

একালের আরো একজন বিশিষ্ট নন্দনতত্ত্ববিদ হলেন স্পেনের এলডফো সানচেজ ভাজকুয়েজ (১৯১৫-)। মার্কসের মূল ধারণায় দাঁড়িয়ে পরিবর্তনশীল পটভূমিতে বিভিন্ন শিল্প আঙ্গিককে মূল্যায়ন করতে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর মূল কৌতূহল হলো বাস্তবের সঙ্গে মানুষের নান্দনিক সম্পর্কের, বিশেষ করে শিল্পকলার প্রকৃতি বিচার করা। মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃতি জগতে মানবীয়তার বিস্তার ঘটানো ও ক্রমিক আত্মজাগরণ এবং শিল্পকলা তার প্রধান সহায়– এটাই তাঁর চিন্তার মর্মমূলে ক্রিয়াশীল। 'শিল্পকলা ও সমাজ' (১৯৬৫), 'নন্দনতত্ত্ব ও মার্কসবাদ' (১৯৭০) বই দুটোতে তাঁর চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে মার্কসীয় ভাবনার প্রবেশ ঘটে রুশ বিপ্লবের পর-পরই। তৃতীয় দশকের গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধে বিপ্লবের কথা, সাধারণ মানুষের ছবি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা প্রভৃতি স্থান পায়। ম্যাক্সিম গোর্কির রচনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, মুজফ্ফর আহমদ (১৮৮৯–১৯৭৩) ও কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬) 'নবযুগ' পত্রিকায় সাধারণ মানুষের জীবনভিত্তিক রচনা নিয়ে এলেন।

তিরিশের দশকের শুরুতে ড. ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১) শিল্পসাহিত্যের বিচারে মার্কসবাদের প্রয়োগ শুরু করেন। তাঁর প্রবন্ধাবলী সংকলিত হয়েছে 'সাহিত্যে প্রগতি' (১৯৪৫) নামক গ্রন্থে। সেকালে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও (১৮৯৪-১৯৬১) ছিলেন যথেষ্ট সক্রিয়। আরো কজন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী সম্মিলিত হয়েছিলেন 'পরিচয়' (১৯৩১) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে।

'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৬ সালে। পরবছর বেরোয় 'প্রগতি' নামক সংকলন। এতে ছিল চারটি প্রবন্ধ : ধূর্জটিপ্রসাদের 'প্রগতি', ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'সাহিত্যে প্রগতি', বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯৮–১৯৭৪) 'প্রগতি সাহিত্যের রূপ' এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর (মৃত্যু ১৯৪৫) 'সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা'। ১৯৩৯-৪০ সালে প্রকাশিত হয় বিনয় ঘোষের (১৯১৭–৮০) 'শিল্প-সংস্কৃতি ও সমাজ' এবং 'নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা'। তাছাড়া ১৯৩৯ সালে মাসিক 'অগ্রণী' ও ১৯৪১ সালে সাপ্তাহিক 'অরণি' প্রকাশিত হয়ে এই ধারাকে পুষ্ট করে।

এভাবে বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রয়োগের প্রথম পর্যায়ের অবসান ঘটে। এই পর্যায়ের লেখকেরা কম্যুনিস্ট পার্টির আওতায় থেকে মার্কসবাদের চর্চা করতেন। ফলে তাঁদের মধ্যে সৃষ্টিশীলতার নিদর্শন কম। তারা মূলত নির্ভর করতেন 'সাহিত্য সমাজের

www.pathagar.com

দর্পণ' শীর্ষক ধারণাটির ওপর। যাই হোক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, এঁরাই দৃঢ় করলেন সাহিত্যের সমাজমুখী ধারাকে এবং প্রতিক্রিয়াশীলতাকে পরাভূত করার সংগ্রামকে। সেকালে কম্যুনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠে, নাট্যান্দোলন জোরদার হয়। সেপথেও মার্কসবাদী চিন্তা দ্রুত জনপ্রিয় হয়।

১৯৪৮ সালে বেরোয় কম্যুনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা 'মার্কসবাদী'। ১৯৫০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এর আটটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাতে ছিল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পাঁচটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলো ছিল বিতর্কমূলক— বিষয় ছিল বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যবিচার, প্রগতিশীল ধারা নির্ণয় সম্পর্কে। বিতর্কের সমাপ্তি টানেন কম্যুনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য ও পত্রিকা সম্পাদক ভবানী সেন (১৯০৯–৭২)। 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে তিনি রামমোহন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ধারাকে অস্বীকার করে প্রগতির ধারা বলে স্বীকার করলেন সিপাহী বিপ্লব ও নীলবিদ্রোহ প্রভাবিত সাহিত্যের ধারাকে। রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে তার মূল্যায়ন ছিল এরূপ : 'রবীন্দ্র-দর্শনই ভারতীয় শাসকশ্রেণীর দর্শন। রবীন্দ্রদর্শনকে আক্রমণ করতে হবে শাসকশ্রেণীকে পরাস্ত করার জন্য। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে মার্কসবাদের বিরোধ এত প্রচণ্ড যে, প্রগতির শিবিরে তার স্থান হতে পারে না।'

এধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবার কারণ ছিল রাশিয়ার স্ট্যালিন ও ঝদানভের ভ্রান্ত সংস্কৃতিনীতির যান্ত্রিক অনুসরণ। যান্ত্রিক অনুসরণের ফল ভাল হয় না, ফলে প্রতিভাবান বুদ্ধিজীবীরাও মার্কসীয় তত্ত্বকে সৃষ্টিশীলভাবে প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে এটাই ভবানী সেনের চূড়ান্ত মত নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। এই সংকলনে গৃহীত 'একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী' প্রবন্ধে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। সৃষ্টিশীল রচনায় সাম্যবাদী চিন্তার ভাল প্রভাব পড়েছে। মানিক-সুভাষ-সুকান্ত ধারাটির উদ্ভব হয় সে-কালে। অনেক ভাল ভাল নাটক রচিত হয়েছে গণনাট্য সংঘের তত্ত্বাবধানে। সাহিত্যরীতির কৌলিন্য ঘুচে গিয়ে গণমুখিতার ছোঁয়া লেগেছে। নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন মানুষের ছবি, সাম্যজ্যবাদ-বিরোধিতার ধারণা সাহিত্যে এসেছে। সমাজ-পরিবর্তনে সাহিত্যের ভূমিকা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে এবং সাহিত্যকে সমাজের পটভূমিতে রেখে মূল্যায়ন করার রীতি জনপ্রিয় হয়।

www.pathagar.com

ফার্ডিনান্ড লাসালের নিকট পত্র

[কার্ল মার্কস (১৮১৮-৮৩) জার্মানির এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও ক্রমশ বিপ্লবী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন এবং আমৃত্যু ব্যাপৃত থাকেন পৃথিবীকে বদলানোর কাজে। তার দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, শ্রেণী সংগ্রাম, বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ প্রভৃতি তত্ত্ব মানুষের চিন্তাজগতকে আমূল পালটে দিয়েছে। বিপ্লবী মার্কসের পরিচয় সাহিত্যরসিক মার্কসের জীবনকে ঢেকে ফেলেছে। বিপ্লবী জীবনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি কবিতা লিখতেন, মূল গ্রিক নাটক পড়তেন, শেক্সপীয়র আওড়াতেন ও ফরাসী সাহিত্যের রসাস্বাদন করতেন। নিজেদের লেখা সম্পর্কে মতামত চেয়ে লেখকেরা চিঠি লিখতেন তাঁর কাছে। ধর্মীয় শিল্পকলা, রোমান্টিসিজম ও ফরাসি উপন্যাস সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বই লেখার ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু সেসব অপূর্ণ রয়েছে। তবু সাহিত্যের বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে নানা প্রসঙ্গে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন, তার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে নতুন সমালোচনাশাস্ত্র। তাঁর নামানুসারে তাকে বলা হয় মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনা। নিম্নের চিঠিটি সংকলিত হয়েছে ১৯৭৬ সালে মস্কোস্থ প্রগ্রেস পাবলিশার্স কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত Marx Engels : On Literature and Art নামক গ্রন্থ থেকে]

(লন্ডন, এপ্রিল ১৯, ১৮৫৯)

এবারে আসছি ফ্রানজ ফন সিকিনজেন* প্রসঙ্গে। সর্বপ্রথমে আমাকে প্রশংসা করতেই হবে গঠনশৈলী ও নাট্যিক কার্যাবলীর এবং অন্য কোন আধুনিক জার্মান নাটক সম্পর্কে এত বেশি বলা যাবে না। দ্বিতীয়ত, রচনাটিকে বিশুদ্ধ সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখার ব্যাপারটি বাদ রেখেও বলা যায়, প্রথম পাঠে এটা আমাকে বিপুলভাবে উত্তেজিত করেছে এবং সেজন্য, যে-সব পাঠক তাদের অনুভূতি দ্বারা অধিকতর শাসিত তাদের মনে এই প্রভাব হবে উচ্চতর মাত্রায়। এবং এটা দ্বিতীয় দিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।

এবার রচনাটির অন্য দিকের কথা : প্রথম কথাটি সম্পূর্ণভাবে আঙ্গিক সম্পর্কে- যেহেতু তুমি এটা রচনা করেছ পদ্যে, সেজন্য তুমি একটু বেশি শিল্প নৈপুণ্যের সঙ্গে আয়ামবিক রীতিকে প্রসাধিত করতে পারতে। কিন্তু এই অবহেলায় 'পেশাদার কবিরা' যতই আহত হোন না কেন, সামগ্রিকভাবে আমি এটাকে একটা অগ্রগতি বলে বিবেচনা করি, যেহেতু আমাদের এপিগোনাস (epigonous) কবিদের শাবকদল আঙ্গিকের

---

* লাসালে বিরচিত একটি নাটক

www.pathagar.com

মসৃণতার বাইরে কিছুই রাখেননি। দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবিত দ্বন্দ্বটি সামান্য ট্রাজিক নয়, বরং সত্যিকার অর্থেই একটি ট্র্যাজিক দ্বন্দ্ব, যা ১৮৪৮-৪৯-এ বিপ্লবী পার্টির ধ্বংস ডেকে এনেছিল এবং সেটা যুক্তিসঙ্গতভাবেই। সুতরাং আধুনিক ট্র্যাজেডির কেন্দ্রীয় ঘটনা হিসেবে এটাকে ব্যবহার করার চিন্তাকে আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানাই। কিন্তু অতঃপর আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, এই দ্বন্দ্বকে উপস্থাপিত করার জন্য যে থিমটি তুমি নিয়েছ, তা উপযোগী ছিল কিনা। বালথসার হয়তো সত্যিই কল্পনা করতে পারে যে, যদি সিকিনজেন নাইট সুলভ কলহের নেপথ্যে তার বিদ্রোহকে গোপন না-করে রাজকীয় শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করত এবং রাজপুত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করত সে তাহলে বিজয়ী হতে পারত। কিন্তু আমরা কি এই মোহকে মেনে নিতে পারি? সিকিনজেন (তার সঙ্গে কম-বেশি হুটেনও রয়েছে) তার ধূর্ততার কারণে পতিত হয়নি। সে পরাজিত হয়েছে এজন্য যে একজন নাইট ও বিলুপ্তপ্রায় শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে প্রচলিত ব্যবস্থার, বা বলা চলে তার নতুন কাঠামোর বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেছিল। সিকিনজেনকে তার বিশিষ্ট মানসিক প্রবণতা এবং বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ, স্বাভাবিক ক্ষমতা প্রভৃতি থেকে বিচ্যুত কর—এবং তাহলে যে বাকি থাকে, সে হলো গট্জ ফন বার্লিশিনজেন। উপযুক্ত কাঠামোর মধ্য দিয়ে শেষোক্ত দুর্দশাগ্রস্ত ব্যাক্তির মধ্যে মূর্ত হয়েছে সম্রাট ও রাজপুত্রদের সঙ্গে নাইটদের ট্র্যাজিক বিরোধিতাটি এবং সেজেন্যেই গ্যেটে সঠিকভাবে তাঁকে নায়ক তৈরি করেছিলেন।* যে ভাবে সিকিনজেন–(এবং কিয়ৎপরিমাণে হুটেন পর্যন্ত, যদিও তাঁর বেলায়, এমন কি কোন শ্রেণীর সকল আদর্শবাদীর বেলায়ও এই বক্তব্যসমূহ যথেষ্ট পরিমাণে পরিমার্জনা করা উচিত)–রাজপুত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে (সম্রাটের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে শুধু এজন্যে যে, নাইটদের সম্রাট পরিণত হয়েছে রাজপুত্রদের সম্রাটে) তা ইতিহাস সমর্থিত হলেও আসলে সে একজন ডনকুইকসোট। নাইট সুলভ ঝগড়ার ছদ্মাবরণে বিদ্রোহ আরম্ভ করা আসলে নাইট সুলভ ফ্যাশানে শুরু করার অতিরিক্ত কিছু বোঝায় না। যদি সে সেটা অন্যভাবে শুরু করত তাহলে তাকে সরাসরি এবং প্রথম থেকেই আবেদন জানাতে হতো শহরাঞ্চলে ও কৃষকদের কাছে অর্থাৎ মূলত ঐ শ্রেণীর কাছে, যাদের উত্থান ও নাইটদের পতন সমার্থক ছিল।

অতএব, গটজ ফন বার্লিশিনজেনে উপস্থাপিত সংঘর্ষের পর্যায়ে তুমি যদি সংঘর্ষকে নামিয়ে আনতে না-চাইতে, এবং সেটা তোমার পরিকল্পনা ছিল না তাহলে সিকিনজেন ও হুটেনকে মাথা নত করতে হতো কারণ তারা নিজেদেরকে ভেবেছে বিপ্লবী বলে, (গট্জ

---

* গ্যেটের নাটক গটজ ফন বার্লিশিনজেনের প্রতি মার্কস এখানে ইঙ্গিত করেছেন।

www.pathagar.com

সম্পর্কে সেটা বলা যাবে না) এবং ১৮৩০ এর পোলিশ শিক্ষিত অভিজাতদের মতই ঠিক অনুরূপ ভাবে একদিকে নিজেদের আধুনিক ভাবধারার ধারক মনে করেছে যদিও অপরদিকে তারা প্রকৃতপক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর। বিপ্লবের অভিজাত প্রতিনিধিরা–একতা ও স্বাধীনতার বুলির আড়ালে যারা স্বপ্ন দেখত পুরোনো সাম্রাজ্য ও ভাবজীবনের রীতি-নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠির–সেজন্যে লেখকের সমস্ত উৎসাহের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত হয়নি, যেমন হয়েছে তোমার নাটকে, বরং বিশেষ করে সক্রিয় পটভূমি হিসেবে থাকা উচিত ছিল কৃষক-প্রতিনিধি ও শহরে বিপ্লবীদের অংশগুলো। তাহলেই তোমার পক্ষে সর্বাধুনিক চিন্তাসমূহকে সবচেয়ে অকপট ভঙ্গীতে ও অনেক ব্যাপকাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হতো, কিন্তু এখানে তদস্থলে 'ধর্মীয়' স্বাধীনতার প্রসঙ্গ বাদ দিলে বুর্জোয়া ঐক্য (সিভিল ইউনিটি) বস্তুতপক্ষে প্রধান চিন্তা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে, তুমি তোমার ভাবনাসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অধিক শেক্সপীয়রীয় রীতিতে প্রকাশ করতে বাধ্য হতে; কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হিসেবে আমি নির্দেশ করি তোমার শিলারের পদ্ধতি অনুসরণ করাকে অর্থাৎ চরিত্রসমূহকে সমকালীন চেতনার মুখপাত্রে পরিণত করাকে। লুথার-নাইটদের বিরোধকে প্লেবিয়ান-মুনচের বিরোধের উর্ধ্বে স্থাপন করে তুমি কি নিজে তোমার ফ্রানজ ফন সিকিনজেনের ন্যায় কিয়ৎপরিমাণে কূটনৈতিক ভ্রান্তিতে পতিত হওনি?

তদুপরি, চরিত্রগুলোর চরিত্রে কিছুটা ন্যূনতা আছে। পঞ্চম চার্লস, বালথসার ও রিচার্ড অব ট্রিয়েরকে আমি এই বিবেচনা-বহির্ভূত রেখেছি। ষোল শতকের বাইরে বর্ণাঢ্য চরিত্রের কাল আর কখনও কি ছিল? হুটেনকে আমি মনে করি মাত্রাতিরিক্তভাবে শুধু 'অনুপ্রেরণার' প্রতিনিধি এবং সেজন্যে বিরক্তিকর। একইসঙ্গে, সে কি শয়তানী বুদ্ধির একটি বিশুদ্ধ উদাহরণ নয়? এবং, সুতরাং তার প্রতি কি তুমি অবিচার করো নাই?

এমনকি তোমার সিকিনজেন, যার চরিত্রও ঘটনাক্রমে অত্যন্ত বিমূর্তভাবে অঙ্কিত হয়েছে, নিজস্ব সমস্ত হিসেব-নিকেশের বাইরে যে সংঘর্ষের শিকার, তার ব্যাপকতা বোঝা যায় এভাবে : একদিকে, নাইটদের কাছে শহরের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের কথা প্রচারের; অপরদিকে, শহরের মধ্যে 'জোর যার মুল্লুক তার' বিচার প্রয়োগ করতে গিয়ে তার উল্লাসের কথা বিবেচনা করলে।

আলোচনা বিস্তৃত করতে গেলে বলতে হয়, এখানে-ওখানে পাত্রপাত্রীরা নিজেদের নিয়ে স্বগত-সংলাপের যে-বাহুল্য ঘটিয়েছে, সেটা অবশ্যই নিন্দার্হ– বোধ হয় শিলারের প্রতি তোমার পক্ষপাতিত্ব থেকে সেটা ঘটেছে, যেমন ১২১ পৃষ্ঠায়। হুটেন যখন তার জীবনকাহিনী ম্যারিকে শোনায়, ওই সময় ম্যারির পক্ষে The whole gamut of

www.pathagar.com

feelings থেকে And it is heavier than the weight of years পর্যন্ত বলা সবচেয়ে স্বাভাবিক হতো। It is said থেকে শুরু করে grown old পর্যন্ত অব্যবহিত পূর্বের শ্লোকগুলো তারপরে আসতে পারত, কিন্তু The maid becomes a woman in one night এই স্বগতোক্তিটি সম্পূর্ণভাবে অপ্রয়োজনীয় ছিল (যদিও এ থেকে বোঝা যায় যে, কেবল বিমূর্ত প্রেমের বাইরেও ম্যারি বুঝতে পারে); কিন্তু সবচেয়ে কম করেও বলা চলে ম্যারির কি উচিত হয়েছে নিজের 'বয়স' সম্পর্কে স্বগতোক্তি দিয়ে আরম্ভ করা? 'এক' ঘণ্টায় সে যা বর্ণনা করেছে তার সব কিছু বলার পর তার উচিত ছিল তার বয়স সম্পর্কিত বাক্যটিতে নিজের অনুভূতিকে সাধারণভাবে প্রকাশ করা। তদুপরি, পরবর্তী চরণসমূহে I considered it my right (অর্থাৎ সুখ) দেখে আমি খুবই আহত হয়েছিলাম। জগত সম্পর্কে যে সরল বিশ্বাস এতদিন ম্যারি রক্ষা করেছিল সেটাকে অধিকার বিষয়ক মতবাদে রূপান্তরিত করে কেন একটি মিথ্যা ধারণা জাগিয়ে তোলে? সম্ভবত অন্য সময়ে আমি আমার মতামত তোমার কাছে বিস্তারিত করে তুলে ধরব।

সিকিনজেন ও পঞ্চম চার্লসের দৃশ্যটিকে আমি বিশেষভাবে সফল মনে করি, যদিও সংলাপটি উভয় পক্ষে একটু বেশি আত্মরক্ষামূলক হয়ে ওঠেছে; ট্রিয়ের-এর দৃশ্যটিও ভাল। তলোয়ার হাতে হুটেনের বাক্যগুলোও অত্যন্ত চমৎকার।

আপাতত এই যথেষ্ট।

এই নাটক দিয়ে তুমি আমার স্ত্রীর অনুরাগ বিশেষভাবে কেড়ে নিয়েছে। ম্যারি হচ্ছে একমাত্র চরিত্র যাতে সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

সালাম।

তোমারই

কা. মা.

www.pathagar.com

ফার্ডিনান্ড লাসালের নিকট পত্র

[ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (১৮২০-৯৫) জন্মগ্রহণ করেন জার্মানির বার্মেন শহরে। তাঁর পিতা ছিলেন কারখানার মালিক। ১৮৪৪ সালে মার্কসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তাঁদের আজীবন বন্ধুতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়। পৃথিবীর কম্যুনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃত সেনানী হিসেবে দুজনের নাম বর্তমানে সবাই একই সঙ্গে উচ্চারণ করে। আমৃত্যু রাজনৈতিক কর্মে নিয়োজিত থাকলেও মার্কসের মতো এঙ্গেলসও ছিলেন সমকালীন ও প্রাচীন সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। হেগেলের দ্বান্দ্বিক দর্শন ও তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছিল তাঁর সাহিত্যচিন্তা। কিছু বিচ্ছিন্ন মন্তব্য, বইয়ের সমালোচনায় তাঁর সাহিত্যচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে অনূদিত তিনটি চিঠিতে সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক তাঁর মূল সূত্রগুলো বিধৃত আছে। এই চিঠিগুলো সংকলিত হয়েছে পূর্বোক্ত Marx Engels : On Literature and Art থেকে।]

(ম্যানচেস্টার, মে ১৮, ১৮৫৯)

প্রিয় লাসালে,

সিকিনজেন সম্পর্কে আমার অভিমত ব্যক্ত করার কথা থাকলেও আমি যে দীর্ঘকাল ধরে তোমাকে লিখিনি সেটা তোমার কাছে আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে। কিন্তু এটাই ঐ বিশেষ কাজ যা আমাকে এতদিন লিখতে নিবৃত্ত রেখেছে। আজকের দিনে সৎ সাহিত্যকর্মের সর্বব্যাপী অভাবের যুগে এ ধরনের লেখা পাঠ করার সৌভাগ্য আমার প্রায় হয়ে ওঠে না এবং অনেক বছর ধরে সামগ্রিকভাবে বিচার করার জন্যে ও উপসংহারে সুদৃঢ় অভিমত প্রদানের উদ্দেশ্য আমি কোন বই পড়িনি। আজে-বাজে রচনা পরিশ্রমেরযোগ্য নয়; এমনকি থ্যাকারের উপন্যাসগুলোর মতো যে সামান্যসংখ্যক উৎকৃষ্ট ইংরেজি নভেল আমি সময়ে-অসময়ে পাঠ করে থাকি, তর্কাতীত সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও সেগুলো এমন করে আমাকে আবিষ্ট করতে পারেনি। অবশ্য দীর্ঘদিনের নিষ্ক্রিয়তার ফলে আমার বিচারবুদ্ধি অত্যন্ত ভোঁতা হয়ে পড়েছে এবং একটি অভিমত প্রদানের জন্যে নিজেকে তৈরি করতে আমার অনেকটা সময় লেগেছে। কিন্তু এ ধরনের রাবিশের চেয়ে ভিন্নভাবে তোমার সিকিনজেনকে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে এবং সেজন্যে আমি সময় নিয়েছি। প্রথম ও দ্বিতীয়বার পাঠে তোমার বইটি, যা বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার গুণে সব অর্থেই একটি জার্মান জাতীয় নাটকের মর্যদাসম্পন্ন, আমাকে এমনভাবে উত্তেজিত করেছে যে, আমাকে কিছুকালের জন্য বইটি সরিয়ে রাখতে হলো, বিশেষত এ কারণে, স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে সৎ সাহিত্যের অভাবের যুগে

www.pathagar.com

আমার রুচি এতই নিম্নগামী যে, অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ রচনার প্রভাবও প্রথম পাঠে আমার মনে পড়ে যায়। সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য, পুরোপুরি বিচারশক্তি সম্পন্ন হবার জন্য আমি সিকিনজেন কিছুকালের জন্য দূরে সরিয়ে রাখলাম, অর্থাৎ কয়েকজন পরিচিতকে ধার দিলাম (এখানে কয়েকজন জার্মান আছেন যারা অল্পবিস্তর সাহিত্যবোধের অধিকারী।) Habent sua fata libelli (পুস্তিকা পরহস্তং গতা গতা) বই পত্র ধার দিলে প্রায়শ সেগুলো ফেরত পাওয়া যায় না– আমাকে সেজন্য জবরদস্তি করে সেটি উদ্ধার করতে হয়। তোমাকে বলতে পারি যে, তৃতীয় ও চতুর্থবার পাঠের সময়ও আমার মনের ওপর ছাপ অপরিবর্তিত ছিল এবং তোমার সিকিনজেনের সমালোচনার ঊর্ধ্বে ওঠার ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আমার মতামত দিচ্ছি।

জার্মানির বর্তমান সরকারি কবিদের কেউই এ ধরনের একটা নাটক লিখতে সক্ষম হবে না, এ কথা বললে তোমার গুণের যে বড় রকমের স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, তা আমি জানি। তবু এটা একটা সত্য ঘটনা এবং আমাদের সাহিত্য সম্পর্কে এমন একটা সত্য ঘটনা, যা ভোলা যায় না। আঙ্গিক সম্পর্কে বলা যায় যে, প্লটের চমৎকার বিকাশ ও কাহিনীর তীব্র নাটকীয়তা আমাকে প্রথমে অত্যন্ত আনন্দদায়ক বিস্ময় দিয়েছে। স্বীকার্য, ছন্দ নির্মাণের ক্ষেত্রে তুমি কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছ– সেটা অবশ্য মঞ্চায়নের চেয়ে পাঠ করার সময় বেশি মনে পড়ে। নাটকটির মঞ্চ-রূপান্তরটি আমি পড়তে চাই– এটা বর্তমান আঙ্গিকে মঞ্চস্থ করা যে সম্ভব নয় সেটা নিশ্চিত। এখানে একজন তরুণ জার্মান কবি (কার্ল সিবেল) ছিলেন। তিনি মফস্বলবাসী এবং আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। মঞ্চ-রূপান্তর সম্পর্কে করবার মতো তাঁর অনেক কিছু আছে। একজন সংরক্ষিত প্রাশিয়ান গার্ড হিসেবে তাঁর বার্লিনে যাবার কথা এবং সে ক্ষেত্রে তোমাকে পৌঁছে দেবার জন্য দু-এক ছত্র লিখে তাঁর হাতে দেবার সুযোগ আমি গ্রহণও করতে পারি। তোমার নাটক সম্পর্কে তাঁর বেশ উঁচু ধারণা রয়েছে কিন্তু স্বগতোক্তির কারণে সেটা যে মঞ্চায়নের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী তাও তিনি বলেন। স্বগতোক্তির কালে একজন অভিনেতা মঞ্চ অধিকার করে থাকে এবং পাছে সংখ্যাতিরিক্ত হয়ে পড়ে, সে আশংকায় ঐ-সময়ে দু-তিনজন অভিনেতাকে তাদের ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ পুনরায় নিষ্পন্ন করতে হয়। শেষ দুটো অংশ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সংক্ষিপ্ত প্রাণবন্ত সংলাপ রচনা করতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না এবং সামান্য কয়টি দৃশ্য বাদ দিলে (যে কোন নাটকের বেলায় এটা সত্য) প্রথম তিনটি অংকেও সেটা করা সম্ভব– মঞ্চ রূপান্তরের সময় তুমি যে এগুলো বিবেচনা করবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। এর ফলে ভাবগত আধেয় অবশ্য নিশ্চিতভাবে বদলাবে, কিন্তু সেটা অনিবার্য। চিন্তার গভীরতা ও সচেতন ইতিহাসগত আধেয়-এর (জার্মান নাটকে দেখা যায় বলে তোমার ধারণা অযথার্থ নয়) শেক্সপীয়রীয়

প্রাণোচ্ছলতা ও পরিচর্যার সঙ্গে সমন্বয় হয়তো একমাত্র ভবিষ্যতে সম্ভব হতে পারে, তবে বোধ হয় জার্মানদের দ্বারা নয়। যাই হোক এর মধ্যেই আমি নাটকের ভবিষ্যত সন্ধান করি। তোমার সিকিনজেন পুরোপুরি সঠিক পথে আছে; প্রধান পাত্র-পাত্রীরা নির্দিষ্ট শ্রেণী ও প্রবণতার এবং সেজন্যে সেকালের নির্দিষ্ট ভাবনারও প্রতিনিধিত্বকারী। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত লালসার মধ্যে নয় বরং ইতিহাসের যে স্রোত তাদেরকে সম্মুখে নিয়ে যায়, তার মধ্যে তারা তাদের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করে। এ লক্ষ্যে যে-সম্মুখবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা হচ্ছে নাট্যিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ঐসব উদ্দেশ্যকে অধিকতর বীর্যবন্ত ও সক্রিয়ভাবে, বলতে কি উপাদান হিসেবে সামনে নিয়ে আসা এবং অপরদিকে বিতর্কসমূহকে (এক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে আমি আনন্দের স্মরণ করছি তোমার পুরোনো বাগ্মিতার যা তুমি জনসভায় এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের জন্য অনুষ্ঠিত সাময়িক অধিবেশনে প্রদর্শন করতে) অধিক থেকে অধিকতর ভাবে অনাবশ্যক করে তোলা। এই আদর্শকে তুমি তোমার লক্ষ্য হিসেবে স্বীকার কর বলে মনে হচ্ছে, যেহেতু তুমি মঞ্চ নাটক ও সাহিত্যিক নাটকের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো; আমার মনে হয় সিকিনজেন-এর মঞ্চনাটকে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এই তাৎপর্য ধরা পড়বে। অবশ্য এই রূপান্তরে কিছুটা অসুবিধা দেখা দিবে (যেহেতু নিখুঁত রূপ নির্মিত প্রকৃতই সহজসাধ্য নয়)। নাটকের পাত্র পাত্রীদের চরিত্র সৃষ্টি এর সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রচলিত মন্দ-ব্যক্তিত্ব রূপায়ণ, যার অর্থ শুধু তুচ্ছ বিজ্ঞতা প্রদর্শন এবং যা প্রকৃতপক্ষে এপিগোনীয় সাহিত্যের অবক্ষয় নিদর্শন, তার বিরুদ্ধে বলার সর্বপ্রকার অধিকার তোমার আছে। আমার বিবেচনায়, একজন ব্যক্তিবিশেষ কি করে তা নয়, বরং কিভাবে করে তার ভিত্তিতে চরিত্রায়ন হতে পারে; এবং এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি না যে, ব্যক্তি চরিত্রগুলো আর একটু বেশি করে স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত ও পরস্পর পার্থক্যবিশিষ্ট হলে নাটকের ভাবধারা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। প্রাচীন লেখকদের চরিত্রাঙ্কন পদ্ধতি বর্তমানে আর যথেষ্ট নয় এবং আমি এখানে মনে করি নাটকের বিকাশে শেক্সপীয়রের গুরুত্ব আর একটু গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করলে বিশেষ ক্ষতি হতো না। কিন্তু এসব হচ্ছে পার্শ্ববিবেচনা; আমি এর উল্লেখ করছি এ জন্য যে তা থেকে তুমি বুঝতে পারবে তোমার নাটকের আঙ্গিকের দিকেও আমি নজর রেখেছি।

ইতিহাসগত আধেয় সম্পর্কে আলোচনায় দেখা যায়, সেকালের যে আন্দোলনটি তোমার কাছে সর্বাধিক কৌতূহলোদ্দীপক ছিল তার দুটো দিক অর্থাৎ অভিজাতদের জাতীয় আন্দোলন, সিকিনজেন যার প্রতিনিধিত্ব করে এবং মানবতাবাদী তাত্ত্বিক ধারা, যেটা ধর্মতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবাদের মধ্য দিয়ে ক্রমপ্রসারিত হয়ে রিফরমেশনে পৌছেছে, তোমার হাতে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে যথার্থ সম্পর্কিত হয়েও দেখা দিয়েছে। আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লেগেছে সিকিনজেন ও সম্রাট এবং

www.pathagar.com

পোপের প্রতিনিধি ও ট্রেভসের আর্কবিশপ– এদের মধ্যকার দৃশ্যাবলী। (এখানে সদবংশজাত, রাজনীতি ও তত্ত্ব বিষয়ে দূরদর্শী, সৌন্দর্যতত্ত্ব ও ক্লাসিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত একজনের সঙ্গে সংকীর্ণমনা জার্মান যাজকীয় রাজকুমারের বৈপরীত্য প্রদর্শন করতে গিয়ে তুমি ব্যক্তিগত প্রতিকৃতির নিপুণ আলেখ্য নির্মাণে সমর্থ হয়েছে– বলা অনাবশ্যক যে, এই প্রতিকৃতি দুই চরিত্রের প্রতিনিধিত্বশীল প্রকৃতি থেকে প্রত্যক্ষভাবে উদগত)। সিকিনজেন-কার্ল দৃশ্যের রেখাচিত্রটিও খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। হুটেনের আত্মজীবনীকে– যার বিষয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বলে যথার্থই নির্দেশ করেছে– তুমি নিশ্চয়ই বিকল্প না পেয়ে নাটকীয় ঘটনায় রূপান্তরিত করেছ। আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে পঞ্চম অংকে বালথসার ও ফ্রানজের কথোপকথন যেখানে প্রথমজন বোঝাচ্ছে ঐ যথার্থ বিপ্লবী পন্থা সম্পর্কে যা তার প্রভুর অনুসরণ করা উচিত ছিল। ঠিক এখানেই সত্যিকারের ট্র্যাজিক নিজেকে প্রকাশ করেছে এবং আমার মনে হয়েছে যে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আরো গুরুত্বসহকারে একে তৃতীয় অংকে আনা উচিত ছিল– সেখানে কয়েকটি সুবিধামতো জায়গাও ছিল। কিন্তু আবার আমি তুচ্ছ প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি।

সেকালের শহরাঞ্চলের অবস্থান ও রাজকুমারদের অবস্থা বেশ পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কয়েকটি জায়গায় দেখানো হয়েছে। তাতে তৎকালিন আন্দোলনের সরকারি দিকটি ভালভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু আমার ধারণা, বেসরকারি দিকটি, অর্থাৎ প্লেবিয়ান ও কৃষকদের ভূমিকা ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাদের সহগামীদের অবদান তোমার রচনায় যথোপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি। কৃষকদের আন্দোলনও অভিজাতদের আন্দোলনের মতই ছিল জাতীয় ও রাজপুত্রদেরবিরোধী এবং যে বিপুল পরিসরের সংগ্রামের মধ্যে সেটা হারিয়ে গিয়েছিল, তা সিকিনজেনকে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলে অভিজাতেরা যে-ত্বরিতগতিকে নিজেদের ঐতিহাসিক ভূমিকায় অর্থাৎ উর্দিপরা ভৃত্যের দায়িত্বে অবতীর্ণ হয়েছিল, তার সঙ্গে অতি চমৎকার বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করে। নাটকটির তাৎপর্য সম্পর্কে তোমার অভিমত গ্রহণ করলেও তুমি মানবে যে, সেটা অনেক বেশি বিমূর্ত এবং আমার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তব নয়; –এবং আমি মনে করি যে কৃষক আন্দোলন অধিকতর নিবিড় দৃষ্টি দাবি করায়। যদিও ফ্রিৎজ জো-র সঙ্গে কৃষকদের দৃশ্যটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং ওখানে অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে আন্দোলকের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থাপিত হয়েছে, তবু কৃষকদের বিক্ষোভ, যেটা অভিজাতদের আন্দোলনের তুলনায় ইতিমধ্যে উর্মিমুখর স্রোতের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, যা যথেষ্ট শক্তিশালীরূপে রূপায়িত হয়নি। নাটকে আমার ভাষ্যানুযায়ী, যেটা আদর্শের খাতিরে বাস্তবকে পরিহার করে না, বা, শেক্সপীয়রের পরিবর্তে শিলারকে তুলে ধরেন, সেকালের বিস্ময়করভাবে বিচিত্র প্লেবিয়ান সমাজের পরিধিকে এই নাটক ধারণ করলে, অভিজাতদের অগ্রবর্তী জাতীয় আন্দোলনের অমূল্য প্রেক্ষাপট নির্মাণের সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

নতুন উপাদান নতুন করে পাওয়া যেত এবং তাহলে আন্দোলনটিও যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত হতো। সামন্তবন্ধন ভেঙে পড়ার ঐকালে কি বিচিত্র টাইপের চরিত্র প্রকাশিত হয়েছিল তা বোঝা যাবে ভ্রাম্যমাণ ভিক্ষুক রাজা, বেকার Lansquenets ও সব রকমের দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের দিকে তাকালে– এরকমের ঐতিহাসিক নাটকে এ ধরনের ফলস্টাফীয় পটভূমি এমনকি শেক্সপিয়রের চাইতেও অধিকতর আবেদন নিয়ে হাজির হতো। এটা বাদ দিলেও, আমার কাছে মনে হয়েছে যে, কৃষক-আন্দোলনকে পেছনে ঠেলে দিয়ে অভিজাতদের জাতীয় আন্দোলনের একটি দিককে ভুলভাবে উপস্থাপিত করতে, আমি বিশ্বাস করি, তুমি প্ররোচিত হয়েছ এবং একই সঙ্গে, সিকিনজেনের ভাগ্যের আসল ট্র্যাজিক উপাদানকে হাতছাড়া হতে দিয়েছ। আমি যা দেখতে পেয়েছি তা হলো সম্রাটের সরাসরি অধীন অভিজাতদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী ছিল না। কৃষকদের নির্যাতন করে প্রাপ্ত আয়ের ওপর তাদের নির্ভরশীলতার কারণে এটা অসম্ভব ছিল। অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হতো শহর এলাকার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন। কিন্তু এ ধরনের কিছু হয়নি বা খুব সীমিত আকারে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু শহরাঞ্চলের ও কৃষকদের সঙ্গে, বিশেষ করে শেষোক্তদের সাথে, মিত্রতার দ্বারাই শুধু অভিজাতদের পক্ষে জাতীয় বিপ্লব সাধন সম্ভবপর ছিল। আমার বিবেচনায় ঠিক এখানেই ঘটনার মূল ট্র্যাজেডী নিহিত আছে– যেহেতু কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার মতো মূল শর্তটি পূরণ অসম্ভব ছিল, যেহেতু তার ফলে অভিজাতদের নীতি সংকীর্ণ হতে হয়েছিল, যেহেতু ঠিক যেমুহূর্তে তারা জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণে উদ্যত হল, তখনই জাতির মূল শক্তি কৃষকেরা ঐ-নেতৃত্বের বিরোধিতা করল ফলে স্বভাবতই আন্দোলন ধ্বংস হয়ে পড়ল। সিকিনজেনের সত্যিই কৃষকদের সঙ্গে কিছুটা সংযোগ ছিল তোমার এ ধরণা কত দূর ইতিহাস সমর্থিত সেটা যাচাই করতে আমি অসমর্থ এবং তাতে কিছু আসে যায় না। প্রসঙ্গক্রমে, আমি যত দূর স্মরণ করতে পারি, যখনই হুটেন তার রচনায় কৃষকদের সামনে বক্তৃতা করছে, সে অভিজাতদের সম্পর্কিত এই কঠিন প্রশ্নটি অত্যন্ত আলতোভাবে স্পর্শ করছে এবং কৃষকদের বিক্ষোভকে পাদ্রীদের দিকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছে। সিকিনজেন ও হুটেনকে কৃষকদের মুক্তিদাতা হিসেবে রূপায়িত করার তোমার অধিকারকে আমি বিন্দুমাত্র প্রশ্ন করছি না। কিন্তু এটা সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে এই ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বের বিপরীতে স্থাপন করে যে, এই দুজনের অবস্থান ছিল অভিজাত ও কৃষকদের মাঝখানে, আর অভিজাতরা ছিল নিশ্চিতভাবে ঐ ইচ্ছার বিরোধী।

এখানে রয়েছে, আমি সাহসের সঙ্গে বলছি, ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় স্বতঃসিদ্ধের সঙ্গে সেটাকে বাস্তবে রূপ দেবার বাস্তব অসম্ভাব্যতার ট্র্যাজিক দ্বন্দ্ব। এই দিকটি বিস্মৃত হওয়ার জন্যই তুমি ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বকে ক্ষুদ্র পরিসরে নামিয়ে এনেছ—অর্থাৎ যে

www.pathagar.com

সিকিনজেনের একই সঙ্গে সম্রাট ও সাম্রাজ্যের মোকাবেলা করার কথা, সে শুধু একজন রাজপুত্রের সম্মুখীন হয়েছে (যদিও তোমার স্বতঃস্ফূর্ত সঠিক অনুভূতি এখানেও তোমাকে কৃষকদের উপস্থাপিত করতে বাধ্য করেছে।) এবং অভিজাতদের উদাসীনতা ও কাপুরুষতার দ্বারা তুমি তাকে সোজাসুজি শেষ করে দিয়েছ। কিন্তু এর প্রেরণা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী হতো যদি তুমি পূর্বেই অধিকতর জোরেসোরে উপস্থাপিত করতে গর্জনমুখর কৃষক-আন্দোলনকে এবং অভিজাতদের মেজাজকে, যেটা আবার পূর্বের বুন্দশ ও আরমে কনরাড-এর কৃষক চক্রান্তের প্রতিক্রিয়ায় নিঃসন্দেহে অধিকমাত্রায় রক্ষণশীল হয়ে পড়েছিল। কৃষক ও প্লেবিয়ান আন্দোলনকে নাটকে অন্তর্ভুক্ত করার এটা অবশ্য একটিমাত্র পন্থা। এটাকে অনুরূপভাবে বা আরো ভালভাবে সম্পন্ন করার জন্য অন্তত দশটি বিবিধ পথ কল্পনা করা যেতে পারে।

তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, নান্দনিক ও ঐতিহাসিক উভয় দিক থেকে আমি তোমার রচনাকর্মের ওপর অনেক উচ্চ, বলতে পার, সর্বোচ্চ দাবি করছি এবং আমাকে যে এটা করতেই হচ্ছে, এখানে-ওখানে দু-একটি আপত্তি উত্থাপন সত্ত্বেও, সেটাই আমার স্বীকৃতির সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অনেক বছর পরে আমাদের মধ্যে, পার্টির নিজের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনের খাতিরে সমালোচনাকে যত দূর সম্ভব খোলাখোলা করা হচ্ছে; সাধারণভাবে অবশ্য, আমি ও আমরা সবাই সর্বদা খুশি হই যখন প্রমাণ পাই যে, আমাদের পার্টি যেখানেই হাত দেয়, সব সময় যোগ্যতরভাবে সেটা সমাধা করে। এবং এখানেও তুমি সেভাবে করতে পেরেছ।

www.pathagar.com

মিন্না কাউটস্কির নিকট পত্র

(লন্ডন, নভেম্বর, ২৬, ১৮৮৫)

এখন আমি Die Alten und die Neuen (পুরাতনেরা ও নবীনেরা)* পড়ে শেষ করেছি এবং এর জন্য তোমাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। লবণ খনির শ্রমিকদের জীবন যেমন নিপুণ কলমে অঙ্কিত হয়েছে, তেমনভাবে নির্মিত হয়েছে স্টেফানের কৃষকদের আলেখ্য। ভিয়েনার সমাজ জীবনের বর্ণনা অধিকাংশ জায়গায় বেশ মনোহর। বলতে কি, ভিয়েনাই জার্মানির একমাত্র নগর যার নিজস্ব সমাজ রয়েছে; বার্লিনের আছে শুধু 'কয়েকটি গোষ্ঠী' এবং অনির্দিষ্ট আরো কয়টি গোষ্ঠী -এ কারণে বিদ্বৎজন, সরকারি কর্মচারী ও অভিনেতাদের জীবন অবলম্বনে সেখানে শুধু উপন্যাস রচিত হয়। তোমার রচনায় কোথাও কোথাও প্লট অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেছে কিনা সেটা বিচার করার সুযোগ তোমার বেশি আছে। অনেক জিনিস, যা আমাদের মনে এ ধারণার জন্ম দিতে পারে, হয় ভিয়েনার বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রকৃতি এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় ও পূর্ব ইউরোপীয় উপাদানের সঙ্গে এর মিশ্রণের ফলে সেখানকার জীবন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হবে। উভয় এলাকায় মানুষেরা প্রখর ব্যক্তিত্ব নিয়ে গড়ে ওঠে এবং তোমার রচনায় অনুরূপ ঘটনা হরহামেশা দেখা যায়। প্রতিটি লোকই এক একটি টাইপ এবং একই সঙ্গে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিও বটে– 'এই একজন' যেমন করে বলতেন প্রবীণ হেগেল এবং যেটা হওয়া উচিতও বটে। যাক, পক্ষপাতহীনভাবে দেখতে গেলে দোষক্রটি কিছু নির্দেশ করতে হয়– যেমন আরনল্ডের বেলায়। সত্যিকার অর্থেই সে একজন উল্লেখ্যযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং শেষপর্যন্ত যখন ভূমিধ্বসে তার জীবনান্ত ঘটে, তখন এ ধরনের কবিজনোচিত বিচারে এই বলে সান্ত্বনা পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর জন্য সে খুব বেশি ভাল ছিল। এটা কিন্তু সব সময় খারাপ যখন লেখার নায়ক লেখকের পূজ্য হয়ে ওঠে; এটাই সেই ক্রটি আমার মনে হয়েছে কিয়ৎপরিমাণ যার শিকার তুমি হয়েছ। এলশা-র মধ্যে তবু কিছুটা ব্যক্তিত্ব আছে, যদিও সে-ও আদর্শায়িত, কিন্তু আরনল্ডের ব্যক্তিত্ব নীতিকথায় খুব বেশি পরিমাণে হারিয়ে গেছে।

এই সীমাবদ্ধতার উৎস রয়েছে উপন্যাসের মধ্যেই। স্পষ্টতই, বইটির মধ্য দিয়ে একটি প্রকাশ্য ভূমিকা নেবার ইচ্ছা তুমি অনুভব করেছ, সমস্ত পৃথিবীর সামনে তোমার বিশ্বাসকে পরীক্ষা করার জন্যে। এটা বর্তমানে সমাপ্ত হয়েছে; একটা পর্যায় তুমি পুরোপুরি অতিক্রম করেছ। সেজন্য এই প্রকারে এর পুনরুক্তির আর প্রয়োজন নেই। আমি

* মিন্না কাউটস্কির উপন্যাস

www.pathagar.com

কোনক্রমেই উদ্দেশ্যবাদী কবিতার বিরোধী নই। ট্র্যাজেডির জনক ইস্কাইলাস ও কমেডির জনক অ্যারিস্টোফেনিস উভয়ে যথেষ্ট পরিমাণ উদ্দেশ্যবাদী ছিলেন, দান্তে ও সার্ভেন্তিস কোন অংশেই কম ছিলেন না এবং শিলারের Kabale und liebe সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল এটাই বলে যায় যে, রাজনৈতিক সমস্যাভিত্তিক জার্মান নাটকের সেটা প্রথম উদাহরণ। আধুনিক রাশিয়ান ও নরওয়েজীয়ান, যারা চমৎকার সব উপন্যাস লেখেন, তারা সবাই উদ্দেশ্য নিয়ে কলম ধরেন। আমি অবশ্য মনে করি যে একেবারে সরাসরি বর্ণিত না-হয়ে পরিস্থিতি ও কার্যকলাপ নিজেই উদ্দেশ্যকে মূর্ত করে তুলবে এবং লেখকের বর্ণিত সামাজিক দ্বন্দ্ব ভবিষ্যত ইতিহাসে যে-ভাবে মীমাংসিত হবে, সেটা বড় থালায় রেখে পাঠকের সামনে তুলে ধরার কোন দরকার নেই। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে যে, আমাদের অবস্থায় অধিকাংশ উপন্যাসই বুর্জোয়া বৃত্ত থেকে (যে-বৃত্ত প্রত্যক্ষভাবে আমাদের নয়) পাঠকদের উদ্দেশ্য করে লেখা। সুতরাং আমার অভিমত হচ্ছে যে, সমস্যার সমাধান সরাসরি হাজির-না করেও, কিংবা কখনো কখনো প্রকাশ্য পক্ষাবলম্বনে বিরত থেকেও, সমাজতান্ত্রিক সমস্যামূলক উপন্যাস তার পবিত্র দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে যদি প্রকৃত অবস্থা বিশ্বস্তভাবে অঙ্কনের মাধ্যমে সে এ বিষয়ক প্রভুত্ববিস্তারকারী প্রচলিত বিভ্রমসমূহ দূর করে, বুর্জোয়া জগতের আশাবাদে ফাটল ধরায় এবং ফলত, প্রচলিত সব কিছুর চিরস্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। এ উপন্যাসে, অস্ট্রিয়ান চাষী ও ভিয়েনা 'সমাজ' এ-দুই সম্পর্কে তোমার পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান। প্রশংসনীয় টাটকা উপস্থাপনার প্রচুর উপকরণ রয়েছে এবং স্তেফান-এর মধ্যে দেখিয়েছ যে, চমৎকার শ্লেষের সঙ্গে তুমি ব্যবহার করতে পার— এটা সৃষ্ট চরিত্রের ওপর স্রষ্টার আধিপত্যের প্রমাণ দেয়।

কিন্তু এখানে আমাকে থামতে হবে, নতুবা বিরক্ত করতে করতে আমি তোমাকে অশ্রুসজল করে ফেলব। এখানে সব কিছু আগের মতো আছে। কার্ল * ও তার স্ত্রী আভলিং -এর নৈশ ক্লাবে শরীরতত্ত্ব পড়ছে, কাজও করছে পরিশ্রমের সঙ্গে; অনুরূপভাবে আমিও কাজে ডুবে আছি; লেনচেন, পাম্প ও তার স্বামী আজকের সন্ধ্যায় একটি উত্তেজক নাটক দেখার জন্য থিয়েটারে যাচ্ছে; এবং পুরানো ইউরোপ পুনরায় নিজেকে গতিশীল করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। বোধ করি, বেশি সময়ও লাগবে না। আমি শুধু আশা করছি যেন 'পুঁজি'র তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত করার সময় আমি পাই—তারপরে সেটা শুরু করতে পারে।

সহৃদয় বন্ধুত্ব ও আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ

তোমারই
ফ. এঙ্গেলস

---

* কার্ল কাউটস্কি

www.pathagar.com

মার্গারেট হারকনেসের কাছে পত্র (খসড়া কপি)

(লন্ডন, এপ্রিলের শুরু, ১৮৮৮)

প্রিয় কুমারী হারকনেস

মেসার্স ভিজেটেলীর মাধ্যমে আপনার রচিত (উপন্যাস) সিটি গার্ল (শহরের মেয়ে) পাঠানোর জন্য আপনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। সর্বাধিক আনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে সেটা আমি পাঠ করেছি। সত্যিই, আপনার উপন্যাসের আনুবাদক আমার বন্ধু আইখ হফ যেমন বলেছেন, এটা ein kleines kunstwerk (একটি ক্ষুদ্র শিল্পকর্ম); একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, যা আপনাকে প্রীত করবে যে, এর ফলে তাঁর অনুবাদ আবশ্যই আক্ষরিক হতে হবে, কেননা যে-কোন বিচ্যুতি বা রদবদলের চেষ্টা মূল রচনার গৌরবের অংশবিশেষের শুধু হানি করবে।

আপনার গল্পের বস্তুগত সত্যের অতিরিক্ত যা আমাকে আকৃষ্ট করে তা হচ্ছে এতে আপনি প্রকৃত শিল্পীর সাহস প্রদর্শন করেছেন। উন্নাসিক সম্মান বোধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপনি যেভাবে উদ্ধারকারী সেনাদলকে এখানে দেখিয়েছেন যার মাধ্যমে আপনার কাহিনীর ভিত্তিতে সম্মানিত লোকেরা প্রথমবারের মত জানতে পারবে কেন সাধারণ জনসাধারণের ওপর তাদের (সেনাদলের) এতো প্রভাব ছিল; অবশ্য তা থেকে নয়, বরং একজন মধ্যবিত্ত মানুষ কর্তৃক একজন শ্রমজীবী মেয়েকে পটানোর অতি পুরানো কাহিনীকে আপনি যেই সরল সাদামাটা পদ্ধতিতে সমগ্র গ্রন্থের কেন্দ্রবিন্দু করেছেন প্রধানত সেটা থেকে আপনার শিল্পীসুলভ সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন মাঝারি গোছের লেখক কৃত্রিম জটিলতা ও বর্ণবহুলতার স্তূপের মধ্যে প্লটটির সুলভ বৈশিষ্ট্যকে গোপন করতে বাধ্য হতেন এবং তবু, ধরা পড়ে যাওয়ার ভাগ্যকে এড়াতে পারতেন না। একটি পুরানো গল্পকে বলার সাহস আছে বলে আপনি অনুভব করেছেন, যেহেতু শুধু যথাযথভাবে বর্ণনা করেই আপনি সেটাকে নতুন রূপ দিতে পারবেন।

আপনার মিঃ আর্থার গ্রান্ট একটি অত্যুৎকৃষ্ট সৃষ্টি।

যদি সমালোচনা করার মতো আমার কিছু থাকে, তবে তা হতে পারে যে, সম্ভবত সব কিছুর পরেও, কাহিনীটি যথেষ্ট বাস্তবসম্মত নয়। বাস্তববাদিতা, আমার মতে খুঁটিনাটি বর্ণনার সত্যতার বাইরেও গড়পরতা পরিবেশে প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের বিশ্বস্ত উপস্থাপনাকে বোঝায়। (Realism to my mind implies besides truth of

www.pathagar.com

detail the truthful reprodution of typical characters under typical circumstances) এখন, যতটুকু পর্যন্ত অঙ্কিত হয়েছে তাতে আপনার পাত্র-পাত্রীরা প্রতিনিধিত্বমূলক, কিন্তু যে পরিস্থিতি তাদের ঘিরে আছে এবং কাজ করিয়ে নিচ্ছে সেটা সম্পর্কে সম্ভবত এ কথা বলা যাবে না। 'শহরের মেয়ে' বইটিতে শ্রমজীবী শ্রেণীকে নিষ্ক্রিয় জনতা হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে– তারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে অসমর্থ এবং এমনকি, নিজেদের সাহায্য করার আগ্রহ তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। এই অসাড় দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে তাদের টেনে বের করার সকল প্রয়াস বাইরে থেকে, ওপর থেকে আসে। এখন, ১৮০০ বা ১৮১০ এর দিকের, অর্থাৎ সাঁৎ সাইমো এবং রবার্ট ওয়েন-এর কালের একটি সত্য বর্ণনা এটা হতে পারে কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে জঙ্গী সর্বহারাদের প্রায় সকল সংগ্রামে অংশগ্রহণের সম্মান যার রয়েছে, তেমন একজন ব্যক্তির কাছে ১৮৮৭ সালে সেটা তেমন মনে হতে পারে না। চারপাশের অত্যাচারী মাধ্যমসমূহের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী প্রতিক্রিয়া– মনুষ্যজীব হিসেবে নিজেদের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের কখনো প্রচণ্ড, কখনো সচেতন বা অর্ধ চেতন প্রয়াস– ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে আছে এবং সেজন্যে নিশ্চিতভাবে বাস্তববাদিতার রাজ্যে স্থান দাবি করে।

আমি কোনক্রমেই আপনার দোষ ধরছি না খোলাখুলি সমাজতান্ত্রিক উপন্যাস রচনা না করায়– রচয়িতার সামাজিক ও রাজনৈতিক মতামতকে গৌরবমণ্ডিত করার জন্য আমরা জার্মানরা যেটাকে সমস্যামূলক উপন্যাস' (Tendenzroman) বলি। আমি যা বোঝাতে চাই, তা কোনমতেই এটা নয়। রচয়িতার মতামত যত বেশি গুপ্ত থাকে শিল্প সৃষ্টির জন্য তত বেশি মঙ্গলজনক হয়। যে বাস্তববাদিতার প্রতি আমি ইঙ্গিত করেছি সেটা লেখকের মতামত বহির্ভূত হয়েও প্রকাশিত হতে পারে। একটা উদারহণ এখানে উল্লেখ করেছি : বালজাক, যাকে আমি অতীত, বর্তমান ও অনাগত কালের সকল জোলার চেয়ে অনেক উঁচু দরের বাস্ত বাদী শিল্পী বলে বিবেচনা করি, তিনি লা কমেডি হিউমেইন (La Comedie humaine)-এর মধ্যে অভিজাতদের সমাজে (যে-অভিজাতরা ১৮১৫ সালের পর নিজেদের পুনর্গঠিত করেছিল এবং যতটুকু পেরেছিল 'বনেদী ফরাসি রুচিশীলতার' আদর্শ পুনঃস্থাপিত করেছিল)– ১৮১৬ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত উদীয়মান বুর্জোয়াদের ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশের চিত্র তুলে ধরে ফরাসি 'সমাজ' এর বিশেষত প্যারিসীয় জগতের, এর পরম বিস্ময়ের ইতিহাস রচনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর এই আদর্শ সমাজের অবশিষ্টাংশ কি ভাবে অমার্জিত ভুঁইফোড় অর্থশালীদের অনুপ্রবেশের মুখে ধ্বসে পড়ল বা কলুষিত হলো; কিভাবে ঐ অভিজাত মহিলা– বিয়ের মাধ্যমে সমাজে হস্তান্তরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে যিনি দাম্পত্যবিশ্বাসহীনতার দ্বারা নিজেকে জাহির করতেন মাত্র–বুর্জোয়া রীতির কাছে ধরা দিলেন এবং নগদ অর্থ বা

www.pathagar.com

কাশ্মিরী শালের জন্য স্বামীকে গুঁতোতে লাগলেন; এবং এই কেন্দ্রীয় চিত্রের চারপাশে তিনি ফরাসি সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নির্মাণ করেছেন, যা থেকে এমনকি অর্থনৈতিক বিবরণের বেলায়ও (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিপ্লব পরবর্তীকালের প্রকৃত ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুনঃনির্ধারণের কথা, সকল পেশাদার ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদের প্রদত্ত তথ্য সমষ্টির চেয়ে ঐ কাল সম্পর্কে আমি বেশি জেনেছি। ভাল কথা, বালজাক ছিলেন 'উত্তরাধিকার সূত্রে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র সিংহাসনের অধিকারী' মতে বিশ্বাসী ব্যক্তি– সম্ভ্রান্ত সমাজের অনিবার্য অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করে তিনি তাঁর মহৎ রচনাবলীর মধ্যে অনবরত বিলাপ করছেন; তাঁর সমস্ত সহানুভূতি ঐ শ্রেণীর জন্য যার মৃত্যু ঘণ্টাধ্বনি তিনি শুনতে পেয়েছেন। এত কিছু সত্ত্বেও, তাঁর ব্যঙ্গ ও শ্লেষ এর চেয়ে তীব্র ও তিক্ত কখনো হয় না, যখন তিনি তাঁর সর্বাধিক সহানুভূতির পাত্র অভিজাত নরনারীকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসেন। এবং একমাত্র তাদের সর্ম্পকেই তিনি অকপট শ্রদ্ধা নিয়ে কথা বলেন, যারা তাঁর তিক্ততম রাজনৈতিক শত্রু ক্লোরেত সাঁৎ ম্যারির ঐ-রিপাবলিকান বীরেরা, যারা বাস্তবিকই ঐ-সময়ে (১৮৩০-৩৬) বৃহত্তর গণমানবের প্রতিনিধি ছিল। বালজাক, এই যে তাঁর নিজস্ব শ্রেণী সহানুভূতি ও রাজনৈতিক মতাদর্শের বিপক্ষে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনি যে তাঁর প্রিয় অভিজাতদের পতনের প্রয়োজনীয়তা লোচন করেছিলেন, এবং তারা যে এর চেয়ে ভাল কোন ভাগ্য আশা করতে পারে না সেটা বর্ণনা করেছেন; এবং তিনি যে প্রকৃত মানুষদের প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভবিষ্যতে যেখানে আপাততভাবে হলেও শুধুই তাদের পাওয়া যাবে-সেটাই আমি বাস্তবাদিতার মহত্তম বিজয়ের অন্যতম নিদর্শন বলে বিবেচনা করি এবং সেটাই প্রবীণ বালজাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

আপনার পক্ষে আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, লন্ডনের পূর্ব প্রান্তের মতো সভ্য পৃথিবীর কোথাও শ্রমিকেরা এত কম সক্রিয় প্রতিবাদী, ভাগ্যের কাছে প্রতিরোধহীনভাবে আত্মসমর্পিত ও অধিকতর হতবুদ্ধি নয়। এবং আমিই বা কেমন করে জানব যে, শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয় দিক ভিত্তি করে ভবিষ্যতে একটি উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করে, বর্তমানে অন্তত একবার তাদের নিষ্ক্রিয় দিক নিয়ে বই লিখে সন্তুষ্ট হবার উপযুক্ত কারণ আপনার নেই?

www.pathagar.com

'শিল্পের-জন্যে-শিল্প' প্রসঙ্গে

প্লেখানভ (১৭৫৬–১৯১৮) রাশিয়ার বিখ্যাত বিপ্লবী ও মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিত। প্রথম দিকে সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সংগঠনের সংঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরবর্তীকালে তিনি মার্কসবাদে নিবিষ্টচিত্ত হন। তাঁর বিভিন্ন রচনা মার্কসবাদের প্রচারে ও বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝতে ব্যর্থ হলেও লেনিন তাঁর অবদানকে কখনো খাটো করে দেখেননি। মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যাখ্যাতা হিসেবে তিনি পরিচিত। শিল্পের উৎপত্তি, সামাজিক জীবনের বিশেষ প্রতিফলক রূপে শিল্পকলার ব্যাখ্যা, শিল্পের মর্মবস্তু বাস্তবতার মধ্যে নিহিত—এ ধরনের মার্কসবাদী চিন্তাকে তিনি প্রসারিত করেন। উৎপাদনের পদ্ধতি ও উৎপাদনের সম্পর্ক মানুষের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষের জীবনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে তাঁর মনের জগত এবং মনের জগত নির্মাণ করে শিল্পের ভুবন– এভাবে তিনি শিল্প সৃষ্টির রহস্য ভেদ করতে চেষ্টা করেছেন। মস্কো থেকে প্রকাশিত Art and Social Life গ্রন্থের ১৯৭৭ সালের তৃতীয় সংস্করণ থেকে বর্তমান অংশটি গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু সরকারি 'অনুপ্রেরণায়' রচিত সাহিত্যের কথা বাদ দেয়া যাক। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সময়ে ফরাসি লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন যারা প্রগতিশীল বিবেচনা ছাড়া আর সব কারণে 'শিল্পের-জন্য-শিল্প' তত্ত্বকে বর্জন করেছিলেন। আলেকজান্ডার ডুমাস ফিস শিল্পের-জন্যে-শিল্প তত্ত্বকে অর্থহীন বলে খোলাখুলি ঘোষণা করেছিলেন। নির্দিষ্ট সামাজিক লক্ষ্যকে এগিয়ে নেবার কাজে নিয়োজিত ছিল তাঁর নাটক'ল্য ফিস নেতুগ্যল' (স্বাভাবিক সন্তান) ও 'ল্য পের প্রডিগ' (অমিতব্যয়ী পিতা)। লেখার মাধ্যমে 'বুনিয়াদী সমাজকে' ধরে রাখা প্রয়োজনীয় বলে তিনি বিবেচনা করেছিলেন– যেসমাজ, তাঁর ধারণায়, সব দিকে ধসে যাচ্ছিল।*

সদ্য লোকান্তরিত আলফ্রেড দ্য মুসসের সাহিত্যকর্মকে ১৮৫৭ সালে মূল্যায়ন করতে গিয়ে ল্যামারতিন দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে, সেগুলো ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক বা দেশাত্মবোধক কোন বিশ্বাসকে ধারণ করেনি; ছন্দ ও মিলের মোহে অর্থকে বিস্মৃত হওয়ার জন্য তিনি সেকালের কবিদেরও তিরস্কার করেছিলেন। সর্বশেষে, আঙ্গিকের প্রতি আসক্তিকে নিন্দা রচিত ম্যাক্সিম দুকাঁপ নামক একজন অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের কবিতার উদ্ধৃতি দেয়া যায় :

La forme est belle, soit! quand I'id'ee est au fond
Qu'est-ce donc qu'un beau front, quin'a pas de cervelle?

---

* ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়নের দ্বিতীয় সাম্যাজ্য (১৮৫২-১৮৭০)।

www.pathagar.com

(আঙ্গিক সুন্দর, সত্য, যদি তার পেছনে ভাব থাকে! কপাল যদি সুন্দর হয় তবে তা দিয়ে কি করবে, যদি পেছনে কোন মগজ না-থাকে ?)

চিত্রকলায় রোমান্টিক গোষ্ঠীর প্রধানকেও তিনি আক্রমণ করেছিলেন এই বলে, 'যেমন কিছু লেখক শিল্পের-জন্য-শিল্প রচনা করেছেন, মিস্টার দেলাকোয়া তেমনি রঙের-জন্য-রঙ-এর তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন ; তাঁর মতে, সুনির্বাচিত রঙের সংমিশ্রণের জন্যে ইতিহাসও মানব সমাজের সৃষ্টি।' এই একই লেখকের মতে, শিল্পের-জন্য-শিল্পতত্ত্বে বিশ্বাসী গোষ্ঠী নিশ্চিতভাবে তাদের জীবনকালের অতিরিক্ত সময় জীবিত রয়েছে।

ল্যামারতিন ও ম্যাক্সিম দুকাঁপকে আলেকজাণ্ডার ডুমাস ফিসের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক চরিত্রের বলে সন্দেহ করার কিছু নেই। শিল্পের-জন্য-শিল্প তত্ত্বকে তাঁরা বর্জন করেছিলেন বুর্জোয়া পদ্ধতিকে নতুন সমাজপদ্ধতি দ্বারা বদলে দিতে চেয়েছিলেন বলে নয় বরং প্রলেতারিয়েতদের মুক্তি সংগ্রামের ফলে মারাত্মকভাবে নড়বড়ে হয়ে পড়া বুর্জোয়া সম্পর্কগুলোকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন বলে। এদিক দিয়ে এঁরা ছিলেন রোমান্টিকদের এবং বিশেষ করে পারনাশিয়ান্স ও প্রথম যুগের বাস্তববাদীদের তুলনায় ব্যতিক্রমী—শুধু এই দিকে, যা তাদের বুর্জোয়া জীবনের প্রতি অনেক বেশি আপোষমুখী করে তুলেছিল; এঁরা ছিলেন রক্ষণশীল আশাবাদী এবং ওঁরা ছিলেন নৈরাশ্যবাদী।

এই সবগুলো থেকে এটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে যে শিল্পকলা সম্পর্কে উপযোগবাদী দৃষ্টি মনের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যেমন অবস্থান করতে পারে, তেমনি পারে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেও। এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি। কোন বিশেষ সামাজিক কাঠামো বা সামাজিক আদর্শের প্রতি জীবন্ত ও সক্রিয় উৎসাহ। যে কোনটির বেলায় হতে পারে; এবং যদি কোনও কারণে এই উৎসাহ নির্বাপিত হয় তাহলে সে-দৃষ্টিভঙ্গির বিলুপ্তি ঘটে।

আমরা পরীক্ষা করতে চেষ্টা করব এ দুটি বিপরীত মনোভাবের মধ্যে কোনটি শিল্পকলার অগ্রগতির জন্য অধিকতর উপযোগী।

সমাজজীবন ও সমাজচিন্তা বিষয়ক অপরাপর প্রশ্নের মত এ প্রশ্নের একটি নিঃশর্ত উত্তরের সুযোগ নেই। স্থান ও কালের পরিস্থিতির ওপর সব কিছু নির্ভর করে। প্রথম নিকোলাস ও তার সেবাদাসদের কথা স্মরণ করুন। তারা পুশকিন, ওসট্রোভস্কি ও অন্য সমকালীন শিল্পীদের রক্ষীবাহিনীর বোধের মানদণ্ডে নীতিকথার পুরোহিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল। এক মুহূর্তের জন্যে ধরা যাক যে তারা তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় সাফল্য লাভ করেছিল। তাহলে কি অবস্থা হত? এর উত্তর সহজে দেখা যায়। তাদের প্রভাবের কাছে পরাভূত শিল্পী প্রতিভারা দরবারী শিল্পী হয়ে অবক্ষয়ের সর্বাধিক স্পষ্ট লক্ষণগুলোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতেন এবং তাদের সত্যবাদিতা, শক্তিমত্তা ও আকর্ষণীয়তা অনেক

www.pathagar.com

পরিমাণে হ্রাস পেত।

পুশকিনের 'স্লেনডারারস অব রাশিয়া'কে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাকর্মের মধ্যে গণ্য করা যায় না। বাদশাহ নামদার যাকে 'উপকারী শিক্ষা' বলে নিজের ঔদার্যে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সেই 'শৌলডারিং এনাদারাস ট্রাবলস'ও তাদৃশ বিস্ময়কর কোন রচনা নয়। তবু এই নাটকটির মাধ্যমে বেকেনর্ডফ, সিরিনস্কি-স্কিমাটোভ এবং তাদের মত শিল্পকলার উপযোগিতার তত্ত্বে বিশ্বাসী লেখকরা যে আদর্শকে বাস্তবায়িত করায় চেষ্টায় ছিলেন, সে-দিকে ওসট্রেভস্কি দু-এক পা ফেলেছিলেন।

চলুন আমরা আরো ধরে নেই যে, থিয়োফিল গতিয়ে, থিয়োডর দ্য বঁভিল, লকোঁতে দ্য লিজ্‌ল বোদলেয়ার, গকুঁত ভ্রাতৃদ্বয়, ফ্লবের– অর্থাৎ রোমান্টিক, পারনাশিয়ান্স ও প্রথম যুগের বাস্তববাদীরা বুর্জোয়া পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন এবং তাদের কাব্যলক্ষ্মীকে অভিজাতদের সেবায় উৎসর্গ করেছেন– যে অভিজাতরা, দ্য বঁভিলের ভাষায়, পাঁচ ফ্রাঁ মূল্যের জিনিসকে স্থান দিতেন সব কিছুর উর্ধ্বে। তাহলে ব্যাপারটি কি দাঁড়াত ?

এর জবাবও সহজে দেখা যায়। রোমান্টিকরা, পারনাশিয়ান্সরা ও প্রথম যুগের বাস্তববাদীরা অনেক অধঃপাতে যেতেন। তাদের রচনা অনেক শক্তিশালী, অনেক কম সত্য প্রকাশক ও অনেক কম আকর্ষণীয় হত।

শিল্পোৎকর্ষের বিচারে কোনটা উচ্চতর মানের– ফ্লবেরের মাদাম বোভারী না, অগিয়েরের জঁদ দ্য মঁশিয়ে পোয়রিয়ে ? স্পষ্টত, প্রশ্নটি বাহুল্যমাত্র। এবং এই পার্থক্য শুধু প্রতিভাগত দিক দিয়ে নয়। বুর্জোয়া সমন্বয় ও মানিয়ে চলার আদর্শের দেবরূপের পরিণতি হল অগিয়েরের নাটকীয় অশ্লীলতা এবং তার জন্যে অনিবার্য ছিল স্বতন্ত্র সৃষ্টি পদ্ধতির; অপরদিকে ফ্লবের, গঁকুত ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্য বাস্তববাদীদের মত যারা সমন্বয় ও মানিয়ে চলার প্রতি ঘৃণায় পিঠ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের পদ্ধতি ছিল আলাদা। সর্বশেষে, নিশ্চয় একটি কারণ আছে কেন অনেক বেশি প্রতিভাবানরা একটি সাহিত্য ধারার বদলে অন্যটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

এ থেকে কি প্রমাণিত হয় ?

এটা এমন একটি দিক প্রমাণ করে যা থিয়োফিল গতিয়ের মতো রোমান্টিকরা কখনো মেনে নিতে পারেন না, অর্থাৎ সর্বশেষ বিচারে একটি শিল্পকর্মের মূল্য নির্ধারিত হয় বিষয়বস্তুর গুরুত্বের কারণে। কবিতা কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করে না, গোতিয়ের শুধু-যে এটা বিশ্বাস করতেন তা নয়, তাঁর এমনও ধারণা ছিল যে, কবিতা কোন বক্তব্য প্রকাশেরও চেষ্টা করে না এবং কবিতার সৌন্দর্য নির্ধারিত হয় ছন্দ ও সংগীতের দ্বারা। কিন্তু এটা একটা মারাত্মক ধরনের ভ্রান্তি। বিপরীত পক্ষে, কাব্যিক ও শৈল্পিক সৃষ্টি

www.pathagar.com

সাধারণত সবসময় কোন-না-কোন বাণীর বাহক, কারণ এগুলো সর্বদা কিছু প্রকাশ করে। অবশ্য কিছু 'বলার' জন্যে এদের নিজস্ব পদ্ধতি আছে। শিল্পী ভাব প্রকাশ করেন চিত্রকল্পের সাহায্যে, প্রচারকের চিন্তা প্রদর্শিত হয় যৌক্তিক সিদ্ধান্তের সহায়তায়। এবং যদি একজন শিল্পী চিত্রকল্পের পরিবর্তে যৌক্তিক সিদ্ধান্তের আশ্রয় নেন অথবা নির্দিষ্ট থীমকে প্রদর্শনের জন্যে চিত্রকল্পের আবিষ্কার করেন, তাহলে প্রবন্ধ ও রচনা না-লিখে নভেল, নাটক বা গল্প রচনা করলেও তিনি শিল্পী নন একজন প্রচারক। এর সবগুলোই সত্য। কিন্তু এর থেকে এটা বোঝায় না যে, শিল্পকর্মে ভাবের কোন গুরুত্ব নেই। আমি আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলতে চাই যে, শৈল্পিক রচনা বলে এমন কিছু নেই, যা ভাববিহীন। এমনকি যেসব রচনার রচয়িতারা আঙ্গিকে সব মনোযোগ ঢেলে দেন এবং বিষয়বস্তু নিয়ে মাথা ঘামান না, সেগুলোও কোন-না-কোন প্রকারে ভাব প্রকাশ করে। নিজের কবিতার ভাববস্তু সম্পর্কে যার কোন ভাবনা ছিল না সেই গোতিয়ে আমরা জানি, ঘোষণা করেছিলেন যে, রাফেলের একটি বিশুদ্ধ সৃষ্টি বা একজন সুন্দর নগ্ন নারী দেখার আনন্দে ফরাসী নাগরিক হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক অধিকার ত্যাগ করতে তিনি প্রস্তুত আছেন। এর একটি অপরটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; আঙ্গিকের প্রতি কবির ঐকান্তিক আগ্রহ তার রাজনৈতিক ও সামাজিক উদাসীনতার ফল। যে সব লেখক শুধু আঙ্গিকের প্রতি সব মনোযোগ নিবদ্ধ করেন, তাঁদের লেখায় সমাজ পরিবেশ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট এবং আমি যেমন ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি একটি নৈরাশ্যজনক নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশিত হয়। এদের সবার মধ্যে একটি সাধারণ ভাব নিহিত আছে যা প্রত্যেকের প্রতিটি লেখায় নিজ নিজ পদ্ধতিতে আলাদা আলাদাভাবে রূপায়িত করেন। কিন্তু, যেমন এমন কোন শিল্পকর্ম নেই যা সম্পূর্ণরূপে ভাববিহীন, তেমনি সব ভাবও আবার শিল্পকর্মের মধ্যে প্রকাশ করা যায় না। রাস্কিন এটা চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, একজন কুমারী তার বিগত প্রেমের গান গাইতে পারে, কিন্তু একজন কৃপণ তার হারানো টাকার গান কখনো গাইতে পারে না। এবং তিনি যথার্থই বলেছেন যে, কোন শিল্পকর্মের মান নির্ধারিত হয় তাতে প্রকাশিত আবেগের মহিমা দ্বারা। "যে অনুভূতি আপনার মনকে প্রবলভাবে অধিকার করে আছে সে সম্পর্কে নিজেকে প্রশ্ন করুন। একজন ওস্তাদ কি গানটি মহৎভাবে আপ্লুত হয়ে যথার্থ রাগ সহযোগে শিল্পসম্মতভাবে গাইতে পারবেন? তাহলে এই অনুভূতি যথার্থ। 'এটা কি কোন অবস্থায়ই গাওয়া যাবে না অথবা গাইলে হাসির উদ্রেক করবে?' তাহলে এটা নীচুস্তরের।" এটা যথার্থ এবং এর অন্যথা হতে পারে না। শিল্পকলা হলো বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগের মাধ্যম। শিল্পকর্মে প্রকাশিত আবেগ যত উচ্চমার্গের হয়, অন্যান্য শর্ত এক থাকলে, তত বেশি কার্যকরভাবে রচনাটি ঐ-উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। কৃপণ কেন তার হারানো টাকার গান গাইতে

www.pathagar.com

পারে না? এ সহজ উত্তর এই যে, যদি সে তার ক্ষতির গান গায়, সে গান কাউকে বিচলিত করবে না, অর্থাৎ সেটা তার সঙ্গে অন্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগের উপায় হিসেবে কার্যকর হতে পারে না।

রণসঙ্গীত সম্পর্কে কী বলা যায়, আমাকে প্রশ্ন করা হতে পারে : যুদ্ধ বিগ্রহও কি মানুষে-মানুষে বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগের মাধ্যম রূপে কাজ করতে পারে ? আমার জবাব হল এই, রণসঙ্গীত শত্রুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশে ব্যবহৃত হলেও সেটা একই সঙ্গে সৈনিকদের ঐকান্তিক সাহস, জাতি ও দেশের জন্যে প্রাণোৎসর্গ করার উন্মুখতা প্রভৃতিকে উদ্বোধিত করে। যতক্ষণ এই উন্মুখতাকে প্রকাশ করা হয়, সেটা সীমিত পরিসরের (গোষ্ঠী, গোত্র ও জাতি) মানুষের মধ্যে যোগাযোগের উপায় হিসেবে কাজ করতে পারে– এটা আবার নির্ধারিত হয় মানবসমাজের বা আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, মানবসমাজের ঐ অংশের সাংস্কৃতিক বিকাশের মান দ্বারা।

শিল্পের উপযোগবাদের প্রচারকদের প্রতি যার প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল, সেই তুর্গেনিভ একদা বলেছিলেন যে, ১৭৮৯ সালের নীতিসমূহের চেয়ে মিলোর ভেনাস অধিকতর সন্দেহাতীত। তিনি যথার্থ কথা বলেছেন। কিন্তু এতে কি বোঝা যায় ? নিশ্চয়ই তুর্গেনিভ যা বলতে চেয়েছেন সেটা নয়।

পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যাদের কাছে ১৭৮৯ সালের নীতিমালা শুধু-যে 'সংশয়াচ্ছন্ন' তা নয়, এমনকি একেবারে অজ্ঞাত। ইউরোপের কোন স্কুলে শিক্ষালাভ করেনি এমন একজন হটেন্‌টট্‌কে জিজ্ঞেস করুন সে এই নীতিমালা সম্পর্কে কি ভাবে, তাহলে শুনবেন যে, এর নামও সে কোনদিন শুনেনি। কিন্তু শুধু ১৭৮৯ সালের নীতিমালা নয়, মিলোর ভেনাসও তার কাছে সমভাবে অপরিচিত। এবং 'ঘটনাক্রমে যদি সে সেটা কখনো দেখে, ঐ ভেনাস সম্পর্কে তারও নিশ্চিতভাবে' সংশয় থাকবে। নারী সৌন্দর্য বিষয়ে তার নিজস্ব আদর্শ রয়েছে। হটেন্‌টট্‌ ভেনাস নামের প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্পপ্রতিমায় সে-আদর্শ প্রায়ই নজরে পড়ে। শ্বেত জাতির শুধু একাংশের কাছে মিলোর ভেনাস 'সন্দেহাতীতভাবে' আকর্ষণীয়। এই একাংশের কাছে ১৭৮৯ সালের নীতিমালার* চেয়ে সত্যিই সেটা অধিক নিশ্চিত। কিন্তু কেন ? শুধু এ কারণে যে, সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বুর্জোয়া ব্যবস্থা যখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছিল— শ্বেতজাতির বিকাশের ঐ

---

* ফরাসি গণপরিষদের ১৭৮৯ সালের আগস্ট মাসের বৈঠকে গৃহীত Declaration of the Rights of Man of the Cittizen-এর নীতিমালা। মানুষের স্বাভাবিক ও অলংঘনীয় অধিকার হিসেবে সেখানে বলা হয়েছে স্বাধীনতার, সম্পত্তির, নিরাপত্তার ও নির্যাতনের প্রতিরোধের কথা।

www.pathagar.com

পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্কগুলো এই নীতিমালায় প্রকাশিত হয়েছে। অপরপক্ষে মিলোর ভেনাস হল নারীমূর্তির এমন একটি আদর্শ যা শ্বেতজাতির বিকাশের বহু পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বহু কিন্তু সব নয়।

নারীর বাহ্যিকরূপ সম্পর্কে খ্রিস্টানদের নিজস্ব আদর্শ আছে। বাইজেনীয় প্রতিমায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। সবাই জানেন যে, এসব প্রতিমার পূজারীরা মিলো ও অন্য ভেনাসদের সম্পর্কে অত্যন্ত 'সংশয়াচ্ছন্ন' ছিলেন। তাঁরা এগুলোকে নারী শয়তান বলে অভিহিত করতেন এবং যেখানেই পেয়েছেন, সেখানেই ধ্বংস করেছেন। তারপর এক সময় এসেছে যখন নারী শয়তানের প্রতিমা পুনরায় শ্বেতজাতির লোকদের কাছে রমণীয় হয়ে উঠল। এ স্তরে উপনীত হওয়ার পথ প্রস্তুত হয়েছে পশ্চিম ইউরোপের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভের আকাঙ্ক্ষা নগরসমূহের মুক্তি আন্দোলনের দ্বারা—যে আন্দোলনটি সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ১৭৮৯ সালের নীতিমালায়। সুতরাং তুর্গেনিভকে ছাড়াও আমরা বলতে পারি যে, ইউরোপের জনগণ ১৭৮৯ সালের নীতিমালা ঘোষণা করার জন্যে যত বেশি পরিপক্ক হয়ে ওঠেছিল, মিলোর ভেনাস তত বেশি 'নিশ্চিত' হয়ে ওঠেছিল নতুন ইউরোপের কাছে। এটা কোন আত্মবিরোধী বক্তব্য নয়, বরং খোলামেলা ঐতিহাসিক সত্য। সৌন্দর্যবোধের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে রেনেসাঁ যুগের শিল্পকলার ইতিহাসগত তাৎপর্য হলো যে, মানবীয় বাহ্যিকরূপ সম্পর্কে খ্রিষ্টীয় যাজকীয় আদর্শ ক্রমশঃ নেপথ্যে চলে গেল এবং শহরগুলোর মুক্ত হবার আন্দেলনের ফলে উদ্ভুত ও প্রত্নমূর্তি নারী শয়তানগুলোর স্মৃতির ভিত্তিতে প্রসারিত ইহজাগতিক আদর্শ সামনে এসে গেল। এমনকি, সাহিত্যিক জীবনের শেষদিকে যিনি যথার্থই বিশ্বাস করতেন যে, 'বিশুদ্ধ, বিমূর্ত, নিঃশর্ত, বা দার্শনিকদের ভাষায় অনপেক্ষ শিল্পের কখনো কোথাও অস্তিত্ব ছিল না, সেই বেলিনস্কি স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন যে, 'ষোল শতকের ইতালীয় গোষ্ঠীর চিত্রশিল্পগুলো শিল্পের অনপেক্ষ আদর্শের কিছুটা কাছাকাছি গিয়েছিল' যেহেতু সেগুলো এমন যুগের সৃষ্টি ছিল যখন 'শিল্পকলা ছিল শুধুমাত্র সমাজের সর্বাধিক শিক্ষিত অংশের প্রধান আগ্রহের বিষয়।' * উদাহরণ হিসেবে তিনি নির্দেশ করেছেন "রাফেলের 'ম্যাডোনা' তথা ষোল শতকের ইতালীয় চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনটিকে" অর্থাৎ ড্রেসডেন গ্যালারিতে রক্ষিত তথাকথিত সিস্টিয়ান ম্যাডোনার কথা। কিন্তু খ্রিস্টীয়-যাজকীয় আদর্শের ইহজাগতিক আদর্শের দীর্ঘ সংগ্রামের পরিণতি হল ষোল শতকের ইতালীয় গোষ্ঠী। এবং ষোল শতাব্দের সমাজের উচ্চশিক্ষিত সমাজের শিল্পকলা সম্পর্কে আগ্রহ যতই ঐকান্তিক হোক না কেন, এটা অনস্বীকার্য, খ্রিষ্টীয় যাজকীয় আদর্শের ওপর ইহজাগতিক আদর্শের বিজয়ের অন্যতম

---

* বেলিনস্কি রচিত A view of Russian literature (১৮৪৭)-গ্রন্থে মতামত রয়েছে।

www.pathagar.com

প্রতিনিধিস্থানীয় শৈল্পিক প্রকাশ হচ্ছে রাফেলের ম্যাডোনাগুলো। শিক্ষক পেরুজিনুর প্রভাবে থাকাকালে অঙ্কিত ঐ চিত্রকর্মগুলো সম্পর্কেও এ কথা অতিশয়োক্তি না করে বলা যায় এবং চিত্রসমূহের মুখাবয়বে বাহ্যত ফুটে উঠেছে বিশুদ্ধ ধর্মীয় আবেগ। কিন্তু ঐ ধর্মীয় বহিরাবরণের পশ্চাতে এমন প্রাণময়তা এবং বিশুদ্ধ ইহজাগতিকতা ও জীবনের প্রতি স্বাস্থ্যকর আনন্দ রয়েছে যে, বাইজেন্টীয় ওস্তাদদের অঙ্কিত কুমারী মেরীর পবিত্র চিত্রগুলোর সঙ্গে এদের কোন বিষয়ে ঐক্য লক্ষ্য করা যায় না।

চিমাবু ও দুচ্চিও দি বোওনিনসগানা থেকে শুরু করে পূর্ববর্তী শিল্পস্রষ্টাদের সৃষ্টির চেয়ে ষোল শতকের ইতালীয় শিল্পীদের কীর্তিসমূহ আর 'অনপেক্ষ শিল্পের' উদাহরণ ছিল না। সত্যি বলতে কি, এ ধরনের শিল্পকলার অস্তিত্ব কখনো কোথাও ছিল না এবং তুর্গেনিভ মিলোর ভেনাসকে এ ধরনের শিল্প সৃষ্টি বলে উল্লেখ করে থাকলে, এর কারণ হবে যে, সব ভাববাদীর মতো মানুষের নান্দনিক বিকাশের প্রকৃত ধারা সম্পর্কে তাঁর একটা ভুল ধারণা ছিল।

যে কোন কালে, যে কোন সমাজে বা সমাজান্তর্গত শ্রেণীতে বিরাজিত আদর্শ সৌন্দর্যের ধারণা আংশিকভাবে মানুষ বিকাশের জৈবিক অবস্থার মধ্যে (যেটা আবার ঘটনাক্রমে, জাতিগত বৈশিষ্ট্যে জন্ম দেয়) এবং আংশিকভাবে ঐ নির্দিষ্ট সমাজ বা শ্রেণীর উদ্ভব ও অস্তিত্বের ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্যে নিহিত। সুতরাং সবসময় এর একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ বিষয়বস্তু রয়েছে যা অনপেক্ষ নয়, নয় শর্তহীন, বরং সম্পূর্ণ বিশিষ্টতাসম্পন্ন। সে জন্যে যিনি 'বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের' উপাসক, তিনি তার নান্দনিক রুচির নির্ধারক জৈবিক ও ঐতিহাসিক সামাজিক কারণ থেকে স্বাধীন হয়ে যান না; শুধুমাত্র কম বা বেশি সচেতনভাবে তিনি সেসব শর্তের প্রতি চোখ বুজে থাকেন। ঘটনাক্রমে, এই ব্যাপারটি ঘটেছিল থিয়োফিল গোতিয়ের মতো রোমান্টিকদের বেলায়। আমি আগেই বলেছি যে কবিতা-শরীরের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক ঔদাসীন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ।

এই উদাসীনতা তাঁর কবিতার গুণকে এ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে যে, সেটা বুর্জোয়া অশ্লীলতা, বুর্জোয়া সমন্বয় ও আপোষকামিতার কাছে পরাভূত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু ঐ গুণ থেকে এতদূর বঞ্চিত করেছে যে, সেটা গোতিয়ের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংকীর্ণ করেছে এবং তাঁর কালের প্রগতিশীল ভাবকে আত্মস্থ করায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। চলুন আমরা পুনরায় প্রত্যাবর্তন করি আমাদের পূর্বপরিচিত মাদমাজোয়েল দ্য মওপিঁর ভূমিকায়, যেখানে তিনি অত্যন্ত ইঁচড়েপাকা ধৃষ্টতা নিয়ে শিল্পে উপযোগবাদে বিশ্বাসীদের আক্রমণ করেছেন। ভূমিকায় গোতিয়ে বলছেন :

'হে খোদা, কি বোকামি এটা, মানুষের আত্ম-পূর্ণতা লাভের তথাকথিত ক্ষমতার

www.pathagar.com

কথা, যা শুনতে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। কেউ ভাবতে পারে যে, মনুষ্যযন্ত্রের উন্নতিসাধন সম্ভব এবং একটা চাকাকে পুনর্বিন্যস্ত করে বা দু'দিকে সমান শক্তির সমাবেশ করে আমরা এর কার্যপ্রণালী অধিকতর কার্যকরী করে তুলতে পারব।'

এটা যে সেটা নয়, তা প্রমাণ করার জন্য গোতিয়ে বাসোমপিয়ের এর মার্শালের* কথা উল্লেখ করেছেন যিনি একটা বুট জুতা পূর্ণ মদের দ্বারা তার বন্দুকের স্বাস্থ্য পান করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, মার্শালের মদ্যপানের রীতি নিখুঁত করা যেমন কষ্টকর হবে তেমনি হবে আজকের দিনের কোন মানুষের পক্ষে ক্রোটোনোর মিলোকে খাওয়া-দাওয়ায় অতিক্রম করা, যিনি এক বৈঠকে একটি আস্ত গরুর উদরস্থ করেছিলেন। এই মন্তব্যসমুদয়, যা আবার নিজেদের ভেতরে সম্পূর্ণ সঠিক, অবিচল রোমান্টিকদের দ্বারা অনুসৃত শিল্পের-জন্য-শিল্প তত্ত্বের ভঙ্গিটির বৈশিষ্ট্যকে জলজ্যান্তভাবে তুলে ধরে।

কে তিনি, জিজ্ঞাসা করা যায়, 'মানুষ আত্ম-পূর্ণতায় সক্ষম' প্রচার করে গোতিয়ের কান ঝালাপালা করে দিয়েছিলেন? সমাজতন্ত্রীরা, আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে সাঁৎ-সাইমনিস্টরা, যারা মাদমাজোয়েল দ্য মউপিঁর প্রকাশের কিছু পূর্বে ফরাসী দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। এঁরা হলেন সাঁৎ-সাইমনিস্টরা, যাদের বিরুদ্ধে তিনি মদ্যপানে বাসোমপিয়ের-এর মার্শালকে এবং মাংস ভক্ষণে ক্রোটোনের মিলোকে অতিক্রম করার অসুবিধে নিয়ে মন্তব্য ছুড়ে মেরেছিলেন— মন্তব্যগুলি নিজেদের ভেতরে খুবই সঠিক। কিন্তু নিজেদের ভেতরে খুব সঠিক হলেও যখন সাঁৎ-সাইমনিস্টদের বিরুদ্ধে বলা হয় তখন পুরোপুরি অনুপযোগী হয়। মানুষের আত্মপূর্ণতার যে কথা তাঁরা বলেছিলেন তার সঙ্গে জঠরের ক্ষমতা বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক নেই। সাঁৎ-সাইমনিস্টদের মনে ছিল জনসংখ্যার সর্বাধিক অংশের তথা শ্রমজীবী উৎপাদক শ্রেণীর স্বার্থে সমাজ সংগঠনের উন্নতি সাধন করার চিন্তা । এই লক্ষ্যকে বোকামি বলা এবং মদ্য-মাংস ব্যবহারে মানুষের ক্ষমতাবৃদ্ধির সহায়ক হবে কিনা জানতে চাওয়া প্রকাশ করে দেয় বুর্জোয়া সংকীর্ণ মানসিকতাকেই, যা তরুণ রোমান্টিকদের মনে মাংসের মধ্যে কাঁটার মতো ছিল। এর কারণ কি? কেমন করে বুর্জোয়া সংকীর্ণ মানসিকতা এমন একজন লেখকের ভাবনায় ঢুকে পড়তে পারে যিনি তাঁর সমগ্র অস্তিত্বের অর্থ দেখতে পেয়েছেন এর সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধরত অবস্থায়।

প্রশ্নটির উত্তর ইতিমধ্যে আমি বেশ কবার দিয়েছি, যদিও প্রাসঙ্গিকভাবে এবং জার্মানরা যেমন বলে, অন্য প্রসঙ্গে। রোমান্টিকদের মনোভাবকে দাউদ ও তার বন্ধুদের সঙ্গে তুলনা করে আমি এর জবাব দিয়েছি। আমি বলেছি যে, যদিও বুর্জোয়া রুচি ও রীতির বিরুদ্ধে রোমান্টিকরা বিদ্রোহ করেছিল তবু বুর্জোয়া সমাজ পদ্ধতির সম্পর্কে তাদের

---

* খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একজন নামকরা গ্রিক মল্লবীর।

www.pathagar.com

কোন অভিযোগ ছিল না। এই দিকটি আমাদের এখন আরো বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

কয়েকজন রোমান্টিক– উদাহরণস্বরূপ জর্জ স্যাণ্ড-এর কথা বলা যায়, পিয়ের ল্যারোর সঙ্গে তাঁর (মহিলা) অন্তরঙ্গতার কালে– সমাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন ব্যতিক্রম। সাধারণ অবস্থাটা ছিল এই যে, বুর্জোয়া স্থূলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও রোমান্টিকদের সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির (যে সমাজসংস্কারের দাবি করে) প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা ছিল। সমাজ-পদ্ধতির কোনও রূপ পরিবর্তন না-করে রোমান্টিকরা সামাজিক আচার-আচরণে পরিবর্তন কামনা করেছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। অনিবার্যভাবে, 'বুর্জোয়া'র বিরুদ্ধে রোমান্টিকদের বিদ্রোহের ব্যবহারিক মূল্য ততই কম ছিল, যেমন ছিল ফিলিস্টাইনদের প্রতি গটিনজেন বা জেনা ফসেসের ঘৃণার মূল্য। ব্যবহারিক দিক থেকে দেখতে গেলে 'বুর্জোয়া'দের বিরুদ্ধে রোমান্টিকদের বিদ্রোহ ছিল একেবারে নিষ্ফল। কিন্তু এর ব্যবহারিক নিষ্ফলতার সাহিত্যিক পরিণতির গুরুত্ব কম ছিল না। এটা রোমান্টিক নায়কদের এমন কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক নায়ক চরিত্রকে কোন শিল্পকর্মের গুণ বলে বিবেচনা করা যায় না এবং সেজন্য আমাদের এবারে অবশ্যই পূর্বেকার ভালো মন্তব্যের সঙ্গে একটি খারাপ মন্তব্য যোগ করতে হবে : 'বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে রোমান্টিকদের বিদ্রোহ থেকে তাদের শৈল্পিক রচনাসমূহ প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হলেও তাদের ক্ষতিও কম হয়নি কেননা এই বিদ্রোহের কোন ব্যবহারিক তাৎপর্য ছিল না।

প্রাথমিক যুগের ফরাসী বাস্তববাদীরা রোমান্টিক রচনার প্রধান দোষ অর্থাৎ লেখার নায়ক চরিত্রের কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতা, দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ফ্লবেরের উপন্যাসে রোমান্টিক কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই (সম্ভবত সালাবোঁ এবং লে কোঁতে এর বাইরে থাকবে)। প্রাথমিক যুগের বাস্তববাদীরা 'বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অব্যাহত রেখেছিলেন তবে তা ভিন্ন উপায়ে। তারা বুর্জোয়া স্থূলতার বিপরীতে এমন কোন নায়ক দাঁড় করায়নি বাস্তবে যার প্রতিরূপ পাওয়া যায়নি; বরং বলা চলে স্থূল চরিত্রের অধিকারীদের তারা বিশ্বস্ত শৈল্পিক উপস্থাপনার বিষয় করার চেষ্টা করেছিলেন। একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী প্রকৃতিকে বর্ণনা করার সময় যে ধরনের মনোভাব গ্রহণ করেন সামাজিক পরিবেশ বর্ণনায় সে ধরনের বস্তুনির্ভর মনোভাব গ্রহণ করা তার দায়িত্ব বলে ফ্লবের বিবেচনা করতেন। তিনি বলেছিলেন "একটি মাস্টোডোন (হস্তীজাতীয় অধুনালুপ্ত প্রাণী) বা কুমীরকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়, একজন মানুষকেও সেভাবে দেখতে হবে।" 'একটির শিং এবং অপরের চোয়াল আছে বলে কেন বিব্রত হতে হবে? তারা যেরূপ ঠিক সেরূপ প্রদর্শন করো, তার একটি জীবন্ত মডেল বানাও এবং স্পিরিট বোতল স্থাপন করে।

www.pathagar.com

কিন্তু তাদের নৈতিক দিক সম্পর্কে কোন রায় দিও না। এবং তোমারা নিজেরাই বা কি, হে ক্ষুদে ব্যাঙ সকল।' আর বস্তুনির্ভর হওয়ার ব্যাপারে ফ্লবের যে-পরিমাণে সাফল্য লাভ করেছিলেন, সে পরিমাণে তার রচনা অঙ্কিত চরিত্রগুলো 'দলিলের' মর্যাদা অর্জন করেছে– সমাজ-মনস্তত্ত্ব সম্পর্ক যারা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করতে চান, তাদের পক্ষে সেগুলো নিয়ে গবেষণা করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। বস্তুনির্ভরতা ছিল তার পদ্ধতির শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য; কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে বস্তুনির্ভর হলেও সমকালীন সামাজিক গতিশীলতার মূল্যায়নে গভীরভাবে মননির্ভর হতে ফ্লবের কখনো ক্লান্তি বোধ করেননি। থিয়োফিল গোতিয়ের মত, তাঁর লেখায়ও পাওয়া যায় বুর্জোয়ার প্রতি তীব্র ঘৃণার পাশাপাশি তাদের সবার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা, যারা কোন-না-কোনভাবে বুর্জোয়া সমাজ-সম্পর্কের বিরুদ্ধাচরণ করে। সত্যি বলতে কি, তাঁর বেলায় ঘৃণাটা তীব্রতর ছিল। সর্বজনীন ভোটাধিকারের প্রতি তিনি ছিলেন আগাগোড়া বিরোধী। তিনি এটাকে মনে করতেন 'মানবমনের প্রতি অপমান' বলে। জর্জ স্যাণ্ডের কাছে তিনি লিখেছিলেন–'সর্বজনীন ভোটাধিকারের আওতায় সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় মন, শিক্ষা, জাতি এবং এমনকি অর্থকেও, শেষেরটি অনেক মূল্যবান সংখার চেয়ে।' অন্য একটা চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে, দৈবানুগ্রহের অধিকারের চেয়ে সর্বজনীন ভোটাধিকার অধিকতর মূঢ়তার কার্য। সমাজতান্ত্রিক সমাজকে তিনি ভাবতেন 'একটি বিরাটকৃতির দৈত্য' রূপে যা সমস্ত ব্যক্তিগত কার্যকলাপ, সমস্ত ব্যক্তিত্ব, সমস্ত চিন্তাকে গ্রাস করবে, যা সবদিকে প্রসারিত হবে এবং সব কিছু করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর সমর্থনহীনতার মধ্য দিয়ে 'বুর্জোয়া'দের এই ঘৃণাকারী, পুরোপুরি এক হয়ে গেছেন বুর্জোয়াশ্রেণীর সবচেয়ে সংকীর্ণমনা মতাদর্শীর সঙ্গে। শিল্পের-জন্য-শিল্পতত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁর সকল সমসাময়িকদের মধ্যে এই গুণটি লক্ষ্য করা যাবে। তিনি-যে জনগণকে বিপ্লবী সালাম জানিয়েছিলেন সেটা দীর্ঘদিন আগে বিস্মৃত হয়ে এডগার পো-র জীবনভিত্তিক একটি প্রবন্ধে বোদলেয়ার লিখেছেন : 'যে-জাতির মধ্যে কোন অভিজাত শ্রেণী নেই, তাদের মধ্যে সৌন্দর্যকে পূজা করার চিন্তা শুধু হ্রাসপ্রাপ্ত, ক্ষয়িত ও অদৃশ্য হতে পারে।' একই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন যে, গুরুত্বপূর্ণ লোক আছে মাত্র তিনজন : পাদ্রী, সৈনিক ও কবি।' এই মনোভাব রক্ষণশীলতারও কিছু বেশি; এটা স্পষ্টত মনের একটি প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থা। ঠিক অনুরূপ প্রতিক্রিয়াশীল হলেন বারবে দ্য গেভিল। লরেন্ত পিশার কবিতা সম্পর্কে তিনি তাঁর 'লে পয়েটেজ' পুস্তকে বলেছেন যে, তিনি একজন আরও বড় কবি হতে পারতেন 'যদি তিনি তার চিন্তার দুটো অসম্মানজনক দিক নাস্তিক্যবাদ ও গণতন্ত্রকে পদদলিত করার ইচ্ছা করতেন।

'থিয়োফিল গতিয়ে মাদমাজোয়েল দ্য মউপি-র ভূমিকা লেখার পর পুলের নীচ দিয়ে অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। মানুষের আত্মপূর্ণতা-লাভের কথা বলে বলে যারা তাঁর কান

www.pathagar.com

ঝালাপালা করে দিয়েছিল বলে বলা হয় সেই সাঁৎ-সাইমনিস্টারা উচ্চৈঃস্বরে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রীর মতো তাঁরা ছিলেন শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রগতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং সেকারণে শ্রেণীসংগ্রামে কম দৃঢ় বিরোধী তাঁরা ছিলেন না; তদুপরি, ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রীরা প্রধানত ধনীদের কাছে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন না যে, প্রলেতারিয়েতরা নিজেরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। কিন্তু ১৮৪৮ সালের ঘটনা দেখিয়ে দিল যে, তাদের স্বাধীন ভূমিকা অত্যন্ত দুর্জয় হয়ে উঠতে পারে। ১৮৪৮ সালের পর প্রশ্ন ছিল আর এটা নয় যে, বিত্তশালীরা বিত্তহীনদের ভাগ্য পরিবর্তনে রাজী হবে কিনা, বরং এ-দুয়ের দ্বন্দ্বে প্রাধান্য লাভ করবে কে? আধুনিক সমাজে শ্রেণীগুলোর ভেতরের সম্পর্ক খুব বেশি সরল হয়ে পড়ছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাবাদর্শীরা বুঝতে পেরেছে যে, বর্তমানে প্রশ্ন হচ্ছে তারা শ্রমজীবী মানুষকে অর্থনৈতিক পরাধীনতায় বেঁধে রাখতে আর সক্ষম হবে কিনা? বিত্তশালীদের-জন্য-শিল্প তত্ত্বের প্রবক্তাদের মনেও এই উপলব্ধি অনুপ্রবেশ করেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদানের জন্যে এদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমানদের অন্যতম আরনস্ট রেনান তার 'রিফরমে আঁতেলেকতুয়াল এ মোরাল' গ্রন্থে এমন একটি শক্তিশালী সরকারের দাবি করছেন 'যে আমাদের শ্রমের অংশটুকু সম্পন্ন করার জন্যে ভাল গ্রামবাসীদের বাধ্য করবে এবং তখন আমরা মানসিক অনুধ্যানে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখব।'

বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রলেতারিয়েতদের মধ্যেকার লড়াইয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্তমানে বুর্জোয়া মতাদর্শীরা অনেক বেশি ওয়াকিফহাল– এই সত্য তাদের 'মানসিক অনুধ্যানের' প্রকৃতির ওপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। খ্রিস্টানদের ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ এটা বলা হয়েছে চমৎকারভাবে– 'নিশ্চয়ই (অপরের ওপর) নির্যাতন একজন জ্ঞানী লোককে পাগল বানিয়ে দেয়।' তাদের শ্রেণী ও প্রলেতারিয়েতদের মধ্যের লড়াইয়ের মূল কথা আবিষ্কার করার পর বুর্জোয়া মতাদর্শীরা সামাজিক প্রপঞ্চসমূহকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার ধীশক্তি ক্রমান্বয়ে হারিয়ে ফেলে। এবং সেটা তাদের বৈজ্ঞানিক রচনার, ভাল মন্দ যাই হোক, অন্তর্নিহিত মূল্য বহুলাংশে খর্ব করে। পূর্বে বুর্জোয়া রাজনৈতিক-অর্থনীতি ডেভিড রিকার্ডোর মতো বিরাট বিজ্ঞানীর-জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু বর্তমানে এর প্রবক্তাদের যুক্তি যোজনা করে ফ্রেডারিক বাস্তিএট এর মতো বাচাল বামনেরা। দর্শন ক্রমবর্ধমানভাবে আক্রান্ত হচ্ছিল ভাববাদী প্রতিক্রিয়া দ্বারা যার মূল নির্যাস ছিল আধুনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে প্রাচীন ধর্মীয় পুরাণকাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য পাতানোর মতো রক্ষণশীল আগ্রহ, অথবা আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে গীর্জার সঙ্গে গবেষণাগারের সন্ধি স্থাপন করা। শিল্পকলাও এই সাধারণ ভাগ্যকে এড়াতে পারেনি। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখবো

www.pathagar.com

বর্তমানের ভাববাদী প্রতিক্রিয়া প্রভাবে কতিপয় আধুনিক চিত্রশিল্পী কি নির্ভেজাল পাগলামিতে মেতেছেন। আপাতত আমি বলছি নিচের কথাগুলো।

প্রথম যুগের বাস্তববাদীদের রক্ষণশীল এবং অংশত এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতা তাদের পারিপার্শ্বিকতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করতে ও উঁচু মানসম্পন্ন শিল্পসৃষ্টিতে নিবৃত্ত করেনি। কিন্তু সন্দেহ নেই যে, সেটা তাদের দৃষ্টিসীমাকে প্রভূত পরিমাণে সংকীর্ণ করে এনেছিল। তাদের কালের মহৎ মুক্তি আন্দোলনের প্রতি শত্রুতায় পিঠ ফিরিয়ে, তারা তাদের পর্যবেক্ষণাধীন 'মাস্টোডোন' ও 'কুমমীর' থেকে, সমৃদ্ধতম অন্তর্জীবনের অধিকারী সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক প্রজাতিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। পর্যবেক্ষণাধীন পরিবেশের প্রতি তাদের বস্তুনির্ভর মনোভাব প্রকৃতপক্ষে সহানুভূতিহীনতার দিকে ইঙ্গিত দেয়। এবং স্বাভাবিকভাবে, তাদের রক্ষণশীলতার কারণে, যে-একটি এলাকা শুধু তাদের অভিনিবেশের কাছে সুগম ছিল, অর্থাৎ গতানুতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্বের 'নোংরা ক্লেদ'জাত 'ক্ষুদ্রচিন্তা' ও 'তুচ্ছ আবেগ'– সেগুলোর প্রতি তারা সহানুভূতিশীল হতে পারেনি। কিন্তু তাদের পর্যবেক্ষিত বা কল্পিত বস্তুর প্রতি এই সহানুভূতিহীনতা অতিদ্রুত উৎসাহকে কমিয়ে ফেলতে বাধ্য ছিল এবং হয়েছেও তাই। প্রকৃতিবাদ, যার ভিত্তি তাদের চমৎকার রচনাবলী দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল, গিগগিরই 'একটি কানা গলিতে, একটি রুদ্ধগুহায়' উপনীত হলো– বলেছেন হৌসম্যান। তিনি আরও বলেছেন এটা সব কিছুকে, এমনকি সিফিলিসকেও, তার উপজীব্য করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু আধুনিক কালের শ্রমজীবীদের আন্দোলন এর আওতার বাইরে ছিল। আমি অবশ্য ভুলিনি যে, জোলা 'জারমিনাল' রচনা করেছিলেন। এই নভেলের দুর্বল দিকগুলো বিবেচনার বাইরে রেখেও, অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, যদিও, তাঁর কথানুসারে জোলা নিজে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছিলেন, তাঁর তথাকথিত পরীক্ষামূলক পদ্ধতি বৃহৎ সামাজিক আন্দোলনকে বৈজ্ঞনিক পর্যালোচনা ও বর্ণনা করার জন্যে অনুপযুক্ত ছিল। এই পদ্ধতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল বস্তুবাদের ঐ ভূমিকার সঙ্গে, যাকে মার্কস বলেছেন প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক এবং যেটা বুঝতে অক্ষম যে, সামাজিক মানুষের মনের ক্রিয়া, প্রবণতা, রুচি ও অভ্যাসকে শরীরবিজ্ঞান বা রোগ নিরূপণ করার বিদ্যা দ্বারা যথাযোগ্যভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না, কেননা সেগুলো নির্ধারিত হয় সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা। এই পদ্ধতির প্রতি বিশ্বস্ত শিল্পীরা 'মাস্টাডোন' ও কুমীর'কে পর্যালোচনা ও চিত্রিত করতে পারেন আলাদা আলাদাভাবে কিন্তু একটি বিরাট এককের সদস্য হিসেবে নয়। এটা হৌসম্যান বুঝেছিলেন যখন তিনি বলেন যে, প্রকৃতিবাদ এক অন্ধগলিতে অবতরণ করেছে এবং মদ ব্যবসায়ীর প্রথম সুযোগের ও মুদি দোকানী মহিলার প্রথম সুযোগের মহব্বতের সম্পর্ক পুনরায় বর্ণনা করা ছাড়া তাদের আর কিছু করার নেই। ঐ বিষয়ক গল্প শুধু তখনই আনন্দদায়ক হতে

www.pathagar.com

পারে যদি সেগুলো সামাজিক সম্পর্কের কোন দিকের ওপর আলো ফেলে– যেমন দেখা যায় রুশ বাস্তববাদী উপন্যাসে। কিন্তু ফরাসি বাস্তববাদীদের লেখায় সামাজিক কৌতূহলের অভাব ছিল। ফল দাঁড়াল এই যে, শেষ পর্যন্ত 'প্রথম সুযোগের মদ ব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রথম সুযোগের মুদি দোকানী মহিলার মহব্বতের কিসসা নিরানন্দময়, বিরক্তিকর, এমনকি প্রতিবাদী হয়ে উঠল। 'হৌসম্যান নিজেও, তাঁর প্রথম রচনা 'লে স্যর ভাটার্ড' উপন্যাসে আবির্ভূত হয়েছেন বিশুদ্ধ প্রকৃতিবাদীরূপে। কিন্তু 'সাতটি মানবীয় পাপ' (তাঁর নিজের ভাষায়)কে চিত্রিত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে তিনি প্রকৃতিবাদ পরিত্যাগ করলেন এবং জার্মান প্রবাদে যেমন বলা হয় শিশুকে গোসলের জলের সঙ্গে নিক্ষেপ করলেন। 'আ রবুর' (A Rebours) গ্রন্থে– একটি অদ্ভুত উপন্যাস; কোন কোন জায়গায় চূড়ান্তরকম ক্লান্তিকর, কিন্তু ক্রটিগুলোর জন্যেই শিক্ষাপ্রদ– তিনি চিত্রিত করলেন, অথবা, পুরোনো কালের ভাষায় যদি বলা হয় সৃজন করলেন তাহলে আরো ভাল হয়, দে জেস সঁতে (Des Esseintes)-এর ব্যক্তিকে এক ধরনের অতিমানবকে (ক্ষয়িষ্ণু অভিজাততন্ত্রের একজন সদস্য), যার সমগ্র জীবনধারা পদ্ধতির লক্ষ্য ছিল 'মদ ব্যবসায়ী' ও মুদি দোকানী মহিলার সম্পূর্ণ অস্বীকৃতিকে উপস্থাপিত করা। এ ধরনের টাইপ চরিত্রে উদ্ভাবন পুনরায় 'ল্য কঁতে দ্য লিজ্ল' এর ঐ-ধারণাকে স্বীকার করে নিল যে, যেখানে কোন বাস্তব জীবন নেই, কবিতার কাজ হচ্ছে সেখানে একটি আদর্শ জীবন উপহার দেওয়া। কিন্তু দে জেসসঁতের আদর্শ জীবন এত মানবীয়তা বর্জিত ছিল যে, সে-সৃষ্টি অন্ধগলি থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ দেখাতে পারেনি সুতরাং হৌসম্যান নিজেকে নিয়ে গেলেন মরমীবাদে, যা পরিস্থিতির হাত থেকে 'বাস্তব' মুক্তির অভাবে 'আদর্শ' মুক্তি হিসেবে কাজ করল। নির্দিষ্ট পরিবেশে এটা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা কি পেলাম?

শিল্পী যখন একজন মরমীতে পরিণত হন, তিনি ভাব-আধেয়কে বিস্মৃত হন না, তিনি সেটাকে এক বিচিত্র চরিত্র দান করেন। মরমীবাদ নিজে একটি ভাব, কিন্তু এমন একটি ভাব যা কুয়াশার মত অস্পষ্ট ও অঙ্গবিহীন এবং যেটা যুক্তির প্রাণান্তকর শত্রু। কিছু বলতে ও এমনকি কিছু প্রমাণ করতে একজন মরমী খুব আগ্রহী। কিন্তু তিনি সে জিনিসের কথা বলেন যা 'এ-জগতের নয়' এবং তিনি তার প্রমাণের ভিত্তি স্থাপন করেন সাধারণ জ্ঞানের অস্বীকৃতির ওপর। হৌসমানের প্রসঙ্গটি আবার দেখায় যে, ভাব-আধেয় ব্যতীত কোন শিল্পসৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু শিল্পী যদি তার রচনার কালের প্রধান সামাজিক প্রবণতার প্রতি অন্ধ হয়ে যান, তখন তার রচনার ভাব-আধেয় অন্তর্নিহিত মূল্য গভীরভাবে ক্ষীতগ্রস্ত হয়। অনিবার্যভাবে রচনার পরিণতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সাহিত্য ও শিল্পকলার ইহিতাসে ব্যাপারটি এত গুরুতর যে, একে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খনুরূপে বিশ্লেষণ করতে হবে। কিন্তু তা করার আগে,

www.pathagar.com

অনুসন্ধানের ফলে যেসব সিদ্ধান্তের দিকে আমরা এগিয়ে গেছি সেগুলোর সার সংকলন করা দরকার।

যেখানেই শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদের সমাজিক পরিবেশের সঙ্গে নৈরাশ্যজনকভাবে সঙ্গতি হারিয়ে ফেলেন, সেখানে শিল্পের-জন্য-শিল্প তত্ত্বটির উদ্ভব ঘটে ও শেকড় বিস্তৃত হয়। এই সঙ্গতিহীনতা শিল্প সৃষ্টিতে অনুকূলভাবে প্রতিফলিত হয় এই পর্যন্ত যে, সেটা পরিবেশের উর্ধ্বে উঠতে শিল্পীকে সাহায্য করে। প্রথম নিকোলাসের আমলে ব্যাপারটি তাই ঘটেছিল পুশকিনের বেলায়। ফরাসীদেশে অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছিল রোমান্টিক, পারনাশিয়ান্স ও প্রথম যুগের বাস্তববাদীদের ক্ষেত্রেও। উদাহরণের সংখ্যা বাড়িয়ে এটা দেখানো সম্ভব যে, যেখানেই এ ধরনের সঙ্গতিহীনার সৃষ্টি হয়েছে সেখানেই অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সামাজিক পরিবেশের স্থূলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও যে সমাজিক সম্পর্কের মধ্যে এর মূল নিহিত তার প্রতি রোমান্টিক, পারনাশিয়ান্স ও প্রথম যুগের বাস্তববাদীদের কোন আপত্তি ছিল না। অপরদিকে 'বুর্জোয়ার' ওপর অভিশাপ বর্ষণ করলেও বুর্জোয়া পদ্ধতিকে তারা সযতনে রক্ষা করেছে–প্রথমদিকে প্রবৃত্তিবশত, তারপরে সম্পূর্ণ সচেতনতায় এবং বুর্জোয়া পদ্ধতি থেকে মুক্তির আন্দোলন আধুনিক ইউরোপে যত বেশি জোরদার হয়েছে এই পদ্ধতির প্রতি শিল্পের-জন্য-শিল্প তত্ত্বে বিশ্বাসী ফরাসি শিল্পীরা সম্পৃক্ত হয়েছে তত বেশি সচেতনভাবে লাভ। এবং এই পদ্ধতির প্রতি তাদের সম্পৃক্তি যত বেশি সচেতনতা লাভ করেছে, তত কম সক্ষম হয়েছে তারা রচনার ভাব-আধেয়ের প্রতি উদাসীন থাকতে। কিন্তু সমাজ-জীবনের আগাগোড়া পুনর্গঠনের লক্ষ্যে প্রবাহিত নতুন ধারার প্রতি অজ্ঞতার জন্যে তাদের মতামত ছিল ভ্রান্ত, সংকীর্ণ ও একপেশে এবং লেখায় বিধৃত ভাবসমৃদ্ধি থেকে বিচ্যুত। এর স্বাভাবিক ফল ছিল যে, ফরাসি বাস্তবতা নৈরাশ্যজনক ফাঁপড়ে আটকে গেল এবং যে লেখকরা এককালে বাস্তববাদী (প্রকৃতিবাদী) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু ঝোঁকের ও মরমী প্রবণতার জন্ম নিল।

এই সিদ্ধান্তকে বিস্তারিত প্রমাণের জন্যে পরবর্তী-প্রবন্ধে পেশ করা হবে। এখন এখানেই শেষ। কিন্তু তা করার আগে পুশকিন সম্পর্কে আমি শুধু একটি কি দুটো কথা বলব।

যখন কবি 'ইতর জনকে' নিন্দা করেন, আমরা তাঁর লেখায় অনেক রোষের পরিচয় পাই, কিন্তু কোন অশ্লীলতার নয়– এ-সম্পর্কে পিসারেভ যাই বলুন না কেন। কবি নিন্দা করছেন অভিজাত জনতাকে– ঠিক অভিজাত জনতাকেই এবং প্রাকৃত জনতাকে নয়, যারা ঐ সময়ে সম্পূর্ণ রূপে রুশ সাহিত্যের দৃষ্টিসীমার বাহিরে ছিল;– তার নিন্দার কারণ তারা অ্যাপোলো দেবীর মূর্তি স্থাপনের উচ্চবেদীর চেয়ে উঁচুতে রান্নার বাসন-কোসন স্থাপন করত। এটা শুধু বোঝায় যে, ওদের সংকীর্ণ ব্যবহারিক মনোবৃত্তি কবির কাছে অসহ্য

www.pathagar.com

ছিল। এর বেশি কিছু নয়। জনগণকে শিক্ষা দিতে তাঁর দৃঢ় অস্বীকৃতি শুধু প্রমাণ করে যে, তাঁর মতে জনগণ উদ্ধারের বাইরে পুরোপুরি চলে গেছে। এই অভিমতে কিন্তু প্রতি-ক্রিয়াশীল মনোভাবের সামান্যতম আভাস নেই এখানেই গোতিয়ের মতো শিল্পের জন্য—শিল্প-তত্ত্বে বিশ্বাসীদের চেয়ে পুশকিনের স্থান অনেক উঁচুতে। সাঁৎ-সাইমনিস্টদের পুশকিন নিন্দা করেননি। সম্ভবত তিনি তাদের কথা শুনেনইনি। তিনি ছিলেন একজন সৎ ও মহাপ্রাণ ব্যাক্তি। কিন্তু তার সৎ ও উদার মন বাল্যকাল থেকে কতগুলো শ্রেণী সংস্কার আত্মস্থ করেছিল। একশ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর শোষণকে বন্ধ করা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে অবাস্তব এবং এমনকি হাস্যকর কল্পচিন্তা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল। যদি এর বিলোপের জন্য কোন বাস্তবমুখী পরিকল্পনার কথা শুনতেন এবং বিশেষ করে সাঁৎ সাইমনবাদীদের পরিকল্পনা ফরাসী দেশে যে রকম সোরগোল তুলেছিল, সে রকমের কিছু রাশিয়াতে ঘটত, তাহলে সম্ভবত তীব্র বিতর্কমূলক লেখা ও অম্ল মধুর সুভাসনের মাধ্যমে তিনি সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতেন। 'থট্স অন দ্য রোড' প্রবন্ধে প্রকাশিত পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকদের তুলনায় রাশিয়ার কৃষক ভূমিদাসদের সচ্ছল অবস্থান সম্পর্কে তাঁর কতিপয় মতামতের ভিত্তিতে কেউ কেউ ভাবতে চাইলেন যে, বিচক্ষণতার অধিকারী পুশকিন হয়তো এই ক্ষেত্রে অনেক কম বিচক্ষণ গোতিয়ের প্রায় সমান নির্বুদ্ধিতা নিয়ে যুক্তিজাল বিস্তার করতেন । এই সম্ভাব্য দুর্বলতা থেকে রাশিয়ার অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

এটা একটা পুরোনো কিন্তু চির নবীন কাহিনী। যখন কোন শ্রেণী অর্থনৈতিক মানদণ্ডে তার অধঃস্তন শ্রেণীকে শোষণ করে বাঁচে এবং সমাজে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে, তার সম্মুখবর্তী পদক্ষেপ তখন পশ্চাদবর্তী পদক্ষেপ হয়ে যায়। এখানেই ঐ-ঘটনার ব্যাখ্যা নিহিত আছে, যা প্রথম দৃষ্টিতে অবোধ্য এবং এমনকি অবিশ্বাস্য মনে হয়, যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর কোন দেশের শাসকশ্রেণীর ভাবাদর্শ প্রাগ্রসর দেশের শাসক শ্রেণীর ভাবাদর্শের চেয়ে অনেক উন্নতমানের হয়।

রাশিয়াও, বর্তমানে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ঐ-স্তরে পৌছে গেছে যেখানে শিল্পের-জন্য-শিল্প তত্ত্বে বিশ্বাসীরা শ্রেণীর ওপর শ্রেণীর শোষণভিত্তিক সমাজ বিন্যাসের সচেতন সর্মথক হয়ে উঠেছে। সেজন্যে, আমাদের দেশেও বর্তমানে 'শিল্পের চরম স্বায়ত্তশাসনের' সমর্থনে এক ঝুড়ি সমাজ-প্রতিক্রিয়াশীল বাজে কথা উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু পুশকিনের কালে তখনো তেমন অবস্থা আসেনি। এবং সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য।

www.pathagar.com

ভ. ই. লেনিন

রুশ বিপ্লবের দর্পণ হিসেবে লিওঁ টলস্টয়

[ভ্লদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) একালের মহত্তম মানুষদের একজন। সারাজীবন বিপ্লবী কর্মে ও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে পুনর্গঠিত করায় নিয়োজিত থেকেও তিনি অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। মার্কসবাদী চিন্তার উত্তরোত্তর বিকাশ সাধন ও বাস্তবে প্রয়োগ তাঁর অবিনশ্বর কীর্তি। নিরুদ্বিগ্ন মনে সাহিত্যচর্চা করা লেনিনের জীবনে ঘটেনি। অবসর সময়ে তাঁর নেশা ছিল সাহিত্য পাঠে। সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত জীবনে তাঁর প্রিয় পাঠ্য ছিল পুশকিন, লেরমন্তফ ও নেকরাসোভের বই। টলস্টয়ের রচনা তিনি বারবার পড়তেন, গোর্কি ছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু । টলস্টয় সম্পর্কে রচিত লেখাগুলো থেকে লেনিনের সাহিত্যচিন্তার পরিচয় লাভ করা যায়। সাধারণভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন উদ্দেশ্যমুখী সাহিত্য। জীবনবিচ্ছিন্ন, মানব সমাজের কল্যাণে উদাসীন, বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-বর্জিত ও বাগাড়ম্বরের সাহিত্য তাঁর অপছন্দ ছিল। তাঁর রচনা-সংগ্রহের ১৬ নং খণ্ড থেকে টলস্টয়-বিষয়ক এই প্রবন্ধগুলো অনূদিত হয়েছে।]

একজন মহান শিল্পীর নামকে বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করা, যে-শিল্পী স্পষ্টত সেটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং স্পষ্টত তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন, প্রথম দৃষ্টিতে আশ্চর্যজনক ও কৃত্রিম হতে পারে । সত্যিই, কেমন করে একজন সেটাকে দর্পণ বলতে পারে যখন সেটা বস্তুকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে না? কিন্তু আমাদের বিপ্লব একটি অত্যধিক জটিল ব্যাপার। যে সব লোক সরাসরি তা নির্মাণ করেছে ও তাতে অংশ নিয়েছে, তাদের মধ্যে অসংখ্য সামাজিক উপকরণ রয়েছে; অনেকে স্পষ্টত আসন্ন ঘটনাকে বুঝতে অসমর্থ হয়েছে এবং নিজেদেরকে বিচ্ছিন্নও করেছে প্রকৃত ঐতিহাসিক কর্তব্য থেকে এবং যার সঙ্গে ঘটনার গতি তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষে হাজির করেছে। যে শিল্পীকে আমরা আলোচনা করছি যদি তিনি তা যথার্থই দক্ষ হোন, তবে তিনি নিশ্চিতভাবেই তাঁর রচনায় বিপ্লবের অন্ততপক্ষে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রতিফলিত করেছেন।

অনুমোদিত রাশিয়ান সংবাদপত্র, যার পৃষ্ঠাসমূহ টলস্টয়ের আশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধ, চিঠি ও মন্তব্যে বোঝাই, রুশ বিপ্লবের চরিত্র ও তার চালিকা শক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর রচনাকে বিশ্লেষণ করায় সর্বাধিক কম মাত্রায় উৎসাহী। এই সংবাদপত্রের সবটা কপটতার কারণে বমনেচ্ছায় পরিপূর্ণ। সে-কপটতার দুটো রকমফের রয়েছে : সরকারি ও উদারনৈতিক। প্রথমোক্তরা হলো ভাড়াটে লেখকদের স্থূল কপটতার উদাহরণ। তারা গতকল্য পর্যন্ত নির্দেশিত ছিল শিকারি কুকুরের মত লিওঁ টলস্টয়ের

www.pathagar.com

পশ্চাৎদাবন করার জন্য এবং আজকে হুকুম পেয়েছে তাঁকে দেশপ্রেমিক রূপে উপস্থাপিত করতে ; জন্মজয়ন্তী পালনে। প্রচলিত রীতি যে পালিত হচ্ছে সেটা ইউরোপকে দেখাতে। এই ভাড়াটে সাহিত্যিকরা তাদের গোপন কাজের জন্য যে পয়সা পেয়েছে সেটা সবার জানা এবং তারা কাউকে প্রতারিত করতে পারে না। অনেক বেশি পরিশীলিত ও সে কারণে অনেক বেশি বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক হচ্ছে উদারনৈতিকদের কপটতা। Rech-এর cadet Balalaikhins-এর কথা শুনলে সবাই ভাবে যে টলস্টয়ের জন্য তাদের সহানুভূতি সবচেয়ে পরিপূর্ণ ঐকান্তিক। প্রকৃতপক্ষে 'মহান ভগবান-অনুসন্ধিৎসু সম্পর্কে তাদের পরিকল্পিত অলংকারবহুল উক্তির ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ বাক্যাংশ আগাগোড়াই মিথ্যাভাষণ, কেননা রুশ উদারনৈতিকরা টলস্টয়ের ভগবানে ঈমান রাখে না কিংবা বর্তমান সমাজবিন্যাস সম্পর্কে তাঁর সমালোচনার প্রতি সহানুভূতি দেখায় না। একটি জনপ্রিয় নামের সঙ্গে তারা যুক্ত থাকে রাজনৈতিক পুঁজি বৃদ্ধির আশায়, জাতীয়ভিত্তিক বিরোধী দলের নেতার ভূমিকা পালনের আকাঙ্ক্ষায়; ঘর্ঘর বাক্যাংশের বজ্র নিয়ে তারা চেষ্টা করে : টলস্টয়বাদের মধ্যে কি কি প্রকট দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং আমাদের বিপ্লবের কোন ত্রুটি ও দুর্বলতা সে প্রকাশ করে এই প্রশ্নের সরাসরি স্পষ্ট উত্তরের দাবিকে ডুবিয়ে দিতে।

টলস্টয়ের রচনায়, মতামতে, তত্ত্বে ও গোষ্ঠীতে দ্বন্দসমূহ সত্যিই সুপ্রকট। একদিকে রয়েছেন আমদের একজন মহান শিল্পী ও প্রতিভা যিনি রুশ জীবনের শুধু অতুলনীয় রেখাচিত্রই অঙ্কন করেননি, বরং বিশ্বসাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অবদান রেখেছেন; অন্যদিকে আমরা পাচ্ছি যিশুখ্রিস্ট দ্বারা আচ্ছন্ন একজন পাগল ভূস্বামীকে। একদিকে আমাদের রয়েছে সামাজিক মিথ্যাচার ও কপটতার বিরুদ্ধে তাঁর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শক্তিশালী, প্রত্যক্ষ ও আন্তরিক প্রতিবাদ; এবং অপরদিকে আছেন টলস্টয়বাদী অর্থাৎ রাশিয়ান বুদ্ধিজীবী নামক বেতো ঘোড়ার ন্যায় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত একজন ভণ্ড যিনি প্রকাশ্যভাবে তার বুক চাপড়ান ও বলেন : আমি একজন ভয়ংকর দুষ্টু পাপী, কিন্তু আমি নৈতিক আত্মপূর্ণতা লাভের সাধনায় নিয়োজিত; আমি আর মাংস ভক্ষণ করি না, আমি এখন চাউলের পুডিং আহার করি।' একপক্ষে আমরা শুনি ধনতান্ত্রিক শোষণের নির্মম সমালোচনা— সরকারি নৃশংসতা, প্রহসন মূলক বিচারব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রকাশ্য নিন্দাজ্ঞাপন; এবং সম্পদ বৃদ্ধি ও সভ্যতার সাফল্যের সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের দারিদ্র্য, অধঃপতন, দুর্দশা বৃদ্ধির মধ্যেকার গভীর দ্বন্দ্বের পূর্ণ উন্মোচন; অন্যপক্ষে আমরা পাই হিংসা দিয়ে পাপকে প্রতিরোধ না-করার উন্মাদ প্রচারণা। একদিকে আমরা পাচ্ছি সর্বাধিক পরিমিত বাস্তবতা, সর্বপ্রকার মুখোশের ছিন্নভিন্ন করে ফেলা; অন্য দিকে রয়েছে পৃথিবীর সর্বাধিক জঘন্য জিনিসের একটি অর্থাৎ ধর্ম এবং সরকারি-কর্মচারী যাজকদের স্থলে নতুন যাজক সৃষ্টির চেষ্টা। ঐ নতুন পাদ্রীরা নৈতিক বিশ্বাস নিয়ে অর্থাৎ সবচেয়ে পরিশীলিতভাবে এবং সেজন্যে

www.pathagar.com

বিশেষভাবে ঘৃণ্য যাজক বৃত্তির পরিচর্যা করবে। সত্যিই–

তুমি দুর্দশাগ্রস্ত, তুমি প্রাচুর্য
তুমি শক্তিধর, তুমি শক্তিহীন
মাতঃ রাশিয়া।

এই বৈপরীত্যের জন্য যে সম্ভবত টলস্টয় শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে এর ভূমিকাকে বুঝতে পারেননি বা রুশ বিপ্লবকে অনুধাবন করতে পারেননি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাঁর মতামত ও তত্ত্বের স্ববিরোধিতা দৈবঘটনা নয়; সেগুলো উনিশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশের রুশ জীবনের পরস্পরবিরোধী অবস্থাকেই প্রকাশ করে মাত্র। মাত্র সাম্প্রতিককালের ভূমি দাসত্ব থেকে মুক্ত পিতৃতান্ত্রিক গ্রামীণজীবনকে দেওয়া হয়েছিল আক্ষরিক অর্থেই লোভাতুর পুঁজি এবং খাজনা সংগ্রাহক দ্বারা লুণ্ঠিত ও দলিত হবার জন্য। কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক জীবনের শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে প্রাচীন ভিত্তিসমূহ অসাধারণ দ্রুততার সঙ্গে ছিন্নভিন্ন ও দূরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। এবং সেজন্য, টলস্টয়ের মতামতের স্ববিরোধিতাকে অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে বর্তমান কালের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রের দৃষ্টি থেকে নয় (এ ধরনের মূল্যায়ন অবশ্য প্রয়োজনীয় কিন্তু যথেষ্ট নয়), বরং অগ্রসরমান ধনতন্ত্র, জনগণের ধ্বংস ও জমি থেকে তাদের উৎখাত এসবের বিরুদ্ধে পিতৃতান্ত্রিক রুশ জীবনোদ্ভূত প্রতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। হাস্যকর প্রতিভাত হন টলস্টয় নবী হিসেবে যিনি মানব সমাজের উদ্ধারের জন্য নতুন ব্যবস্থাপত্র আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেজন্য চরম দুর্দশাগ্রস্ত হলেন বিদেশী ও রুশ টলস্টয়বাদীরা, যারা তাঁর তত্ত্বের ঠিক দুর্বলতম অংশকে একটি মতবাদে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। রাশিয়াতে বুর্জোয়া বিপ্লব আসন্ন হওয়ার কালে লক্ষ লক্ষ রুশ-কৃষকের মানসিকতায় মূর্ত ভাব ও আবেগের প্রকাশক হিসেবেই টলস্টয় মহৎ। সমগ্র ভাবে নিলে, তিনি এজন্যে মৌলিক যে তাঁর মতামতের যোগফল কৃষক বুর্জোয়া-বিপ্লব হিসেবে আমাদের বিপ্লবের ঠিক নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। এই দৃষ্টিতে দেখলে টলস্টয়ের মতামতের পরস্পরবিরোধী দিক আসলে দর্পণ ঐসব পরস্পরবিরোধী অবস্থারই, যার আওতায় আমাদের বিপ্লবের মধ্যে কৃষক সম্প্রদায়কে তার ইতিহাস নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। একদিকে শতাব্দীর সামন্ত অত্যাচার এবং সংস্কারোত্তর কয়েক যুগের ক্রমবর্ধিষ্ণু ধ্বংস প্রক্রিয়া, ঘৃণা ক্রোধ ও বেপরোয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞার পাহাড় সৃষ্টি করেছিল। সরকারী গীর্জা, ভূস্বামী ও ভূস্বামীদের সরকারকে সম্পূর্ণভাবে ঝেটিয়ে দেওয়ার সর্বপ্রকার পুরানো ভূমিমালিকানা ও ভূমি রায়তীর প্রকৃতিকে ধ্বংস করার, ভূমি পরিচ্ছন্ন করার, পুলিশি রাষ্ট্রকে মুক্ত ও সমান মর্যাদার ক্ষুদ্র চাষীর সম্প্রদায় হিসেবে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা—

www.pathagar.com

এর সব কিছু আমাদের বিপ্লবে কৃষক সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে অবিচ্ছিন্ন লাল সূত্রের মতো এগিয়ে গেছে; এবং নিঃসন্দেহে বিমূর্ত খ্রিস্টিয় নৈরাজ্য' রূপে কখনো কখনো মূল্যায়িত তাঁর মতামতের প্রণালীর চেয়ে ঐসব কৃষক–প্রচেষ্টার সঙ্গে টলস্টয়ের রচনার আদর্শগত আধেয় অনেক বেশি মিলে যায়।

অন্যদিকে নতুন ধরনের সামাজিক মেলামেশা কায়েম করার প্রয়াস চালানোর সময় (নিম্নরূপ) প্রশ্নাবলী সম্পর্কে কৃষকদের মনে সাদাসিধা পিতৃতান্ত্রিক ধর্মীয়বোধ কাজ করেছে : সংক্রামক রূপ এ সামাজিক মেলামেশার ধরন, নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাদের আসন্ন সংগ্রামের কালে নেতা নির্বাচন, কৃষক বিপ্লবের স্বার্থের প্রতি বুর্জোয়ার ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব, ভূস্বামীত্ব বন্ধ করার জন্য কেন জারের রাজত্বকে গায়ের জোরে উৎখাত করার প্রয়োজনীয়তা। সমগ্র অতীত কৃষকদের শিখিয়েছে ভূস্বামীদের ও সরকারের কর্মচারীদের ঘৃণা করতে কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর কোথায় পাওয়া যাবে সে বিষয়ে শিক্ষা দেয়নি কিংবা দিতে পারেনি। আমাদের বিপ্লবে কৃষকদের এক ক্ষুদ্র অংশ এক সময় সত্যিই লড়াই করে ছিল, এ লক্ষ্যে কিয়ৎপরিমাণে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল; এবং একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ দুশমনকে খতম করার জন্য জারের সেবকদের ও ভূস্বামীদের রক্ষাকর্তাদের ধ্বংস করার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়েছিল। কৃষক সম্প্রদায়ের বড় অংশ কান্না করেছিল ও প্রার্থনা করেছিল, নীতিকথা বলেছিল ও স্বপ্ন দেখেছিল ও দরখাস্ত পাঠিয়েছিল ও মধ্যস্থতাকারী উকিল প্রেরণ করেছিল– চলেছে ঠিক সে পথের রেখা ধরে যে পথে চলেছে লেভ নিকোলায়েস টলস্টয়ের চিন্তাধারা। এবং এ ধরনের ব্যাপারে যেমন সবসময় ঘটে, রাজনীতি থেকে দূরে থাকার, রাজনীতি পরিত্যাগ করার, রাজনীতির প্রতি আগ্রহের ও উপলব্ধির টলস্টয় সুলভ রীতির ফল ছিল যে শুধু সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ শ্রেণী সচেতন বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতদের অনুসরণ করেছিল কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শিকার হলো নীতিহীন, দাস মনোভাবের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের–যারা ক্যাডেট-এর নামে ট্রুডোভিকির সঙ্গে সভা করে ধাবিত হলো স্টোলাইপিনের গর্ভরুমে এবং প্রার্থনা করল, দরকষাকষিতে গেল, সমঝোতায় পৌছল বা সমঝোতায় পৌছতে প্রতিজ্ঞা করল– যতক্ষণ পর্যন্ত না মিলিটারিরা গামবুটের লাথি মেরে তাদের বাইরে ফেলে দিল। টলস্টয়ের চিন্তাধারা দর্পণ কৃষক বিদ্রোহের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার, প্রতিফলন পিতৃতান্ত্রিক গ্রামীণ জীবনের ঢিলেঢালা ভাবের ও 'মিতব্যয়ী মুঝিকদের' হাড্ডিসর্বস্ব কাপুরুষতার।

১৯০৫-০৬ সালে সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের বিপ্লবে যারা যুদ্ধ করে ছিল, সামাজিক সংগঠনের দিক দিয়ে তারা অংশত কৃষক ও অংশত প্রলেতারিয়েত। প্রলেতারিয়েতরা ছিলেন সংখ্যায় কম; সেজন্য সেনাবাহিনীর আন্দোলনে, এমনকি মোটামুটিভাবেও জাতীয়ভিত্তিক সংহতি ও পার্টিচেতনা প্রকাশ

www.pathagar.com

পায়নি–যেমন দেখা গিয়েছিল প্রলেতারিয়েতদের বেলায়, যারা যেন হাতের একটি ইশারায় স্যোশাল ডেমোক্রেটিক হয়ে গেল। অন্যদিকে, এই অভিমতের চেয়ে বেশি ভুল আর হতে পারে না যে, কোন অফিসার নেতৃত্বে না–থাকায় সেনাবাহিনীর ভেতরের বিদ্রোহ বিফল হয়েছিল। অন্য পক্ষে পিপলস উইল পার্টির (peoples will party) পর থেকে বিপ্লবের বিপুল অগ্রগতির বিষয় এ থেকে জানা যায় যে, 'অশিক্ষিত বর্বররা' স্বাধীনভাবে তাদের উর্ধ্বতনদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল এবং ঠিক এ স্বাধীনতাই উদারনৈতিক ভূস্বামী ও উদারনৈতিক অফিসারদের এত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। সাধারণ সৈনিকেরা কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতি জানিয়েছিল; জমির উল্লেখে তাদের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। একাধিক উদাহরণ ছিল যে, সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্বে সর্বস্তরের সেনাবাহিনীর হাতে চলে গিয়েছিল, কিন্তু সে কর্তৃত্বকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে প্রায়শ প্রয়োগ করা হযনি; ঐ-লোকেরা দোদুল্যমানতায় ভুগছিল; কয়েক দিন পর, কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টা পর, কতিপয় ঘৃণ্য উর্ধ্বতন অফিসারকে হত্যা করে তারা অবশিষ্ট বন্দি অফিসারদের মুক্তি দেয়, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপস মীমাংসার আলোচনা শুরু করে এবং তারপরে কেউ ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখোমুখি হয়, অন্যেরা বার্চ লাঠির কাছে পিঠ খুলে দেয় এবং তারপরে পুনরায় জোয়াল কাঁধে নেয়— ঠিক সে পথের রেখা বরাবর যে পথে গেছে লেভ নিকোলায়েস টলস্টয়ের চিন্তাধারা।

টলস্টয় তাঁর লেখায় প্রতিফলিত করেছেন উত্তেজনাপূর্ণ ঘৃণা, উন্নততর ভাগ্যের জন্য পরিপক্ব প্রচেষ্টা, অতীত থেকে মুক্ত করার আগ্রহ এবং একই সঙ্গে অপরিপক্ব স্বপ্ন, রাজনৈতিক অজ্ঞতা এবং বিপ্লবে ঢিলেমি; ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজনীয় উত্থানের ও সংগ্রামের জন্য তাদের অগ্রগতির এবং তাদের টলস্টয় সুলভ অশুভের অপ্রতিরোধের, যা প্রথম বিপ্লবী প্রয়াসের বিফলতার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুতর কারণ ছিল।

এটা বলা হয় যে, পরাভূত সেনাবাহিনী শেখে ভাল। অবশ্য, বিপ্লবী শ্রেণীগুলোকে সেনাদলের সঙ্গে তুলনা করা যায় অত্যন্ত সীমিত অর্থে। ধনতন্ত্রের বিকাশের পরিবর্তন ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ঘটছে এবং পরিস্থিতিকে তীব্রতর করে তুলেছে। সেটা সামন্ত ভূস্বামীদের ও তাদের সরকারের প্রতি লক্ষ লক্ষ কৃষককে ঘৃণার মাধ্যমে একত্র করে বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জন্য জাগ্রত করেছিল। বিনিময়ের উদ্ভব, বাজারের আধিপত্য ও অর্থের দাপট ক্রমবর্ধমান হারে প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিকতা ও পিতৃতান্ত্রিক টলস্টয়-সুলভ ভাবাদর্শকে বহিষ্কৃত করেছে। কিন্তু বিপ্লবের প্রথম বছরগুলো ও জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রথম বিফলতা থেকে একটি লাভ হয়েছে যার সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।— তা হলো জনসাধারণের পূর্বতন কোমলতা ও ঢিলেমীর ওপর যে প্রাণঘাতী আঘাত এসেছে সেটা। বিভাজন রেখা

www.pathagar.com

অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে। শ্রেণীসমূহ ও পার্টিসমূহ তাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করেছে। স্টোলাইপিনের শিক্ষার উপর্যুপরী আঘাত এবং বিপ্লবী স্যোশাল ডেমোক্রেটদের বিচ্যুতিবিহীন অটল উত্তেজনা অনিবার্যভাবে সামনের কাতারে নিয়ে আসবে সমাজতন্ত্রিক প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে শুধু নয়, কৃষক সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক অংশের মধ্যেও, অধিক থেকে অধিকতর হারে ইস্পাতদৃঢ় যোদ্ধাদের, যারা টলস্টয়বাদের ঐতিহাসিক পাপের মধ্যে ডুবে যেতে কম থেকে কম সক্ষম হবে।

সেপ্টেম্বর ১৯০৮

www.pathagar.com

ল. ন. টলস্টয়

লিও টলস্টয় মৃত্যুবরণ করেছেন। শিল্পীরূপে তাঁর বিশ্বজনীন গুরুত্ব, চিন্তাবিদ ও প্রচারকরূপে তাঁর জগতজোড়া খ্যাতি, যার-যার পদ্ধতিতে বিপ্লবের সর্বজনীন গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে।

ভূমিতে দাসপ্রথার আধিপত্যের যুগে একজন মহৎ শিল্পীরূপে ল. ন. টলস্টয়ের আবির্ভাব। অর্ধশতাধিক বছরের শিল্পীজীবনে রচিত অনেকগুলো শিল্পকর্মের মধ্যে তিনি ধারণ করেছেন প্রধানত পুরোনো, প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়াকে—ভূস্বামী ও কৃষকের যে গ্রামীণ রাশিয়া ১৮৬১ সালের পরেও আধাদাসত্ব প্রথার কবলিত ছিল। রুশ ইতিহাসের ঐ কালকে চিত্রিত করতে বসে বেশ কয়টি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা টলস্টয় তুলে ধরলেন এবং শৈল্পিক প্রতিভার এমন উচ্চগ্রামে উঠতে সক্ষম হলেন যে, বিশ্বসাহিত্যের মহত্তম রচনাবলীর মধ্যে তাঁর সৃষ্টি স্থান করে নিল। টলস্টয়ের চমৎকার রূপায়ণের দৌলতে দাস মালিকদের বুটের তলায় নিষ্পেষিত দেশগুলোর একটির বিপ্লব-প্রস্তুতি যুগ সমগ্রভাবে মানব সভ্যতার শৈল্পিক বিকাশের দিকে একটি সম্মুখবর্তী পদক্ষেপ হয়ে গেল।

শিল্পী টলস্টয়, এমনকি রাশিয়াতেও, অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের কাছে মাত্র পরিচিত। যদি তার মহৎ রচনাবলীকে সত্যিকার অর্থ সর্বমানবের সম্পত্তি করতে হয়, তবে অবশ্যই ঐ সমাজপদ্ধতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে- যে সমাজবিধি লক্ষ কোটি মানুষকে অজ্ঞানতা, অন্ধকার, ঘৃণ্য পেশা ও দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। অর্থাৎ একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে।

টলস্টয় শুধু-যে শিল্পকর্ম রচনা করেছেন এমন নয়, ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের জোয়াল ছুড়ে ফেলে দেবার পর নিজেদের জন্য জীবনের মানবিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলে গণমানবেরা যে-সৃষ্টিগুলোকে সব সময় প্রশংসা করবে ও পাঠ করবে, তিনি তাদের অবস্থা অঙ্কন করে ও তাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও ক্রোধের অনুভূতিকে প্রকাশ করে, বৃহৎ জনতার মেজাজকে উল্লেখযোগ্য শক্তির সঙ্গে তুলে ধরতেও সাফল্য লাভ করেছেন। প্রাথমিকভাবে ১৮৬১-১৯০৪ যুগে অধিবাসী টলস্টয় যুগপৎ শিল্পী ও চিন্তাবিদ-প্রচারক রূপে তাঁর রচনায় প্রথম রুশ বিপ্লবের বিশেষ ঐতিহাসিক বিশেষত্বকে সমগ্রভাবে, তার শক্তি ও দুর্বলতাসহ বিস্ময়কর মোটা তুলিতে দেদীপ্যমান করেছেন

আমাদের বিপ্লবের অন্যতম প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, পৃথিবীজোড়া ধনতন্ত্রের অত্যন্ত প্রাগ্রসর বিকাশের যুগে এবং রাশিয়াতেও তার তুলনামূলক বিকাশের কালে, সেটা

www.pathagar.com

ছিল কৃষক-বুর্জোয়া বিপ্লব। এটা বুর্জোয়া ছিল এ কারণে যে, এর তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল জারের স্বৈরতন্ত্র ও জারতন্ত্রকে উৎখাত করা এবং ভূস্বামী প্রথার উচ্ছেদ করা, কিন্তু বুর্জোয়া আধিপত্যকে উৎপাটন করা নয়। বিশেষ করে শেষের লক্ষ্য সম্পর্কে কৃষকরা সচেতন ছিলেন না; এ লক্ষ্য এবং সংগ্রামের নিকটবর্তী ও অধিকতর তাৎক্ষণিক লক্ষ্যগুলোর পার্থক্য সম্পর্কেও তাঁদের চেতনা অবিকশিত ছিল। এটা ছিল কৃষক-বুর্জোয়া বিপ্লব কেননা বাস্তব পরিস্থিতির চাহিদা ছিল কৃষক জীবনের মূল শর্তসমূহকে বদলানো, ভূমি মালিকানার মধ্যযুগীয় পুরানো প্রথাকে ভেঙে ফেলা, ধনতন্ত্রের জন্য 'ভূমি প্রস্তুত করা'র সমস্যাকে সামনে নিয়ে আসা; দ্বন্দ্বভূমিতে অল্পবিস্তর স্বাধীন ঐতিহাসিক ভূমিকাসহ কৃষক জনগণের উপস্থিতির জন্যও দায়ী করা যায় বাস্তব পরিস্থিতিকে।

টলস্টয়ের লেখায় বিশেষভাবে বিধৃত আছে কৃষক-জনতার আন্দোলনের সবলতা ও দুর্বলতা, শক্তি ও সীমাবদ্ধতা। রাষ্ট্র ও পুলিশের সঙ্গে আঁতাতবদ্ধ সরকারী গীর্জার বিরুদ্ধে তার উত্তপ্ত, আবেগদীপ্ত ও প্রায়শ নির্মম তীক্ষ্ণ রোষের মধ্যে ভাষা পেয়েছে আদিম গণতান্ত্রিক কৃষক-জনতার আবেগ-অনুভূতি—যে-জনতার মনে শতাব্দীর-পর শতাব্দীর ভূস্বামীত্ব, সরকারি নিপীড়ন ও দস্যুতা; এবং গীর্জার খ্রিস্টানত্ব, প্রবঞ্চনা ও ছলচাতুরী পর্বত-প্রমাণ ক্রোধ ও ঘৃণা স্তূপাকার করেছে। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথা সম্পর্কে তাঁর অনমনীয় বিরোধিতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ঐ ঐতিহাসিক কালের কৃষক-জনতার মনস্তত্ত্ব যেকালে পুরোনো মধ্যযুগীয় ভূমি মলিকানার দুই কাঠামো– জমিদারী ও সরকারী 'বণ্টন' নিশ্চিতভাবে দেশের অধিকতর উন্নতির পথে অসহ্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যখন এই পুরোনো ভূমি মালিকানার নির্মমভাবে ও সংক্ষিপ্ততম উপায়ে ধ্বংস করা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে গভীরতম আবেগ ও তীব্রতম রাগ নিয়ে তাঁর বিরামহীন অভিযোগ থেকে জানা যায় শহরের কোথাও থেকে বা আরও দূরবর্তী এলাকা থেকে নতুন অদৃশ্য অবোধ্য শত্রুর আগমনে সন্ত্রস্ত পিতৃতান্ত্রিক কৃষকের অনুভূতিকে– গ্রাম্যজীবনের স্তম্ভসমূহের ধ্বংসের পশ্চাতে-পশ্চাতে যে নিয়ে আসে আদিম সঞ্চয়ের যুগ-এর সকল অভিশাপ– অভূতপূর্ব ধ্বংস, দারিদ্র্য, অনাহার, বর্বরতা, গণিকাবৃত্তি, সিফিলিস; সেটা আরও শতগুণে বর্ধিত হয়েছে লুণ্ঠনের সর্বাধিক অভিনব পদ্ধতির রাশিয়াতে রোপনে ও সর্বময় ক্ষমতাধর মঁশিয়ে কুঁপো কর্তৃক তার বিস্তারের মাধ্যমে।

কিন্তু এই প্রবল প্রতিবাদী, আবেগপ্রবণ অভিযোগকারী ও মহৎ সমালোচক একই সঙ্গে তাঁর রচনায় প্রকাশ করেছেন রাশিয়ার আসন্ন সংকট অনুধাবনে ও তা থেকে মুক্তিলাভের পন্থানির্দেশে তার অক্ষমতাকে– এটা পিতৃতান্ত্রিক হাবাগোবা কৃষকের বৈশিষ্ট্য, ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত একজন লেখকের নয়। সামন্ত পুলিশ, রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম রাজনীতি-অস্বীকারে পর্যবসিত হয়েছে এবং তাঁকে নিয়ে গেছে 'অন্যায়কে প্রতিরোধ' করার তত্ত্বে ও জনতার ১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতায়। সরকারি গীর্জাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নির্যাতিত জনগণের কাছে এক নতুন পরিশোধিত ধর্ম অর্থাৎ এক মার্জিত সূক্ষ্ম বিষ তুলে ধরা। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধিতা তাঁকে প্রকৃত শত্রু অর্থাৎ ভূস্বামীত্ব ও তার রাজনৈতিক কাঠামো রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত না করে এক স্বপ্নালু, এলোমেলো ও নিবীর্য বিলাপের জগতে টেনে নিয়ে গেছে। ধনতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের ওপর সেটা যে-দুর্বিপাক চাপিয়ে দেয়, তার উন্মোচনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েত কর্তৃক পরিচালিত বিশ্বব্যাপী মুক্তির লড়াইয়ের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য।

টলস্টয়ের এই অসঙ্গতি শুধু তার ব্যক্তিগত চিন্তার অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি নয়, বরং চরম জটিল ও পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতি, সামাজিক প্রভাব এবং ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার দ্বারা সংস্কার-পরবর্তী কিন্তু বিপ্লব-পূর্ব সমাজের বিভিন্ন অংশ ও শ্রেণীর মানসিকতারই প্রতিফলন।

এবং এই জন্যেই, টলস্টয়ের যথার্থ মূল্যায়ন করা যেতে পারে একমাত্র ঐ শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে– যে শ্রেণী ঐ সামাজিক জটিলতার জট খোলার কালে বা বিপ্লবের সময়ে, তার রাজনৈতিক ভূমিকা ও সংগ্রাম দ্বারা প্রমাণ করেছে যে, জনগণের স্বাধীনতার ও জনতার শোষণ মুক্তির লড়াইয়ে সেনাপতি হওয়া তার জন্য পূর্বনির্ধারিত হয়ে আছে– যে শ্রেণী গণতন্ত্রের প্রতি তার নিঃস্বার্থ অনুরাগের এবং বুর্জোয়া (কৃষকসহ) গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। এ ধরনের মূল্যায়ন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক প্রলেতারিয়েতদের দৃষ্টিকোণ থেকেই শুধু সম্ভব।

লক্ষ্য করুন, সরকারী সংবাদপত্রে টলস্টয়ের মূল্যায়নকে। তারা 'মহৎ সাহিত্যিকের' প্রতি তাদের সম্মান দেখানোর নামে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে এবং একই সময়ে 'পবিত্র' যাজক সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিবেশনের কার্যাবলীর যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে। পবিত্র ফাদারদের সম্পর্কে বলা যায় যে, তারা বিশেষভাবে একটি নোংরা অন্যায় সম্পন্ন করেছে; মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য মৃত্যুপথযাত্রী টলস্টয়ের কাছে পাঠিয়েছে পাদ্রীদের এবং দেখাতে চেয়েছে যে, তিনি 'তওবা' করেছিলেন। পবিত্র যাজকদের বিশেষ অধিবেশনে তাঁকে খ্রিস্টান সংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। জারের 'কৃষ্ণশত'দের গুণ্ডামি ও ইহুদী-বিরোধী কর্মসূচীর সমর্থক কোজাক কর্মচারী, খ্রিস্টের রক্ষীবাহিনী ও বিষাক্ত ইনকুইজিটরদের (রোমান ক্যাথলিকদের বিরোধী পক্ষের লোকদের খুঁজে বের করায় নিয়োজিত লোক : অনুবাদক) কার্যাবলীর হিসাব মেলাবার সময় যখন আসবে, তখন

www.pathagar.com

জনগণ তাদের এসব নষ্টামীর কথা মনে রাখবে।

উদারনৈতিক সংবাদপত্রসমূহে টলস্টয়ের মূল্যায়ন লক্ষ্য করুন। 'সভ্য সমাজের কণ্ঠস্বর', 'পৃথিবীর সম্মিলিত উত্তর', 'সত্য ও মহত্ত্বের ধারণা' এ ধরনের ফাঁপা সরকারি-উদারনৈতিক, বহুলব্যবহৃত কেতাবী বুলি ব্যবহারের মধ্যে তারা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে– যার জন্য টলস্টয় বুর্জোয়া বিজ্ঞানকে এমন তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন এবং যথার্থই করেছেন। রাষ্ট্র, গীর্জা, ধনতন্ত্র ও ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রভৃতি বিষয়ে টলস্টয়ের মতামত সম্পর্কে তারা তাদের অভিমত খোলাখুলি ও সোজাসুজি প্রকাশ করতে পারে না– সরকারি বিধিনিষেধ তাদের বাধা দিচ্ছে তেমন নয়, বরং, সরকারি নিয়মকানুন একটি বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে তাদের উদ্ধার করেছে। আসল কথা হলো, টলস্টয়ের সমালোচনার প্রতিটি উক্তি বুর্জোয়া উদারনীতির মুখে এক একটি থাপ্পড়ের মতো– কারণ যে রকম খোলাখুলি ভাবে, নির্ভিকতা ও নির্মমতার সঙ্গে তিনি আমাদের কালের সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক ও বিরক্তিকর সমস্যাকে তুলে ধরেছেন সেটা আমাদের উদারনৈতিক (এবং উদারতিক নারোদনিক) সাংবাদিকদের গতানুগতিক বাক্যাংশ, কথার তুচ্ছ মারপ্যাঁচ এবং পাশ কাটানো 'সভ্য' মিথ্যাবাদিতার যথার্থ প্রত্যুত্তর। উদারনৈতিকরা সবাই টলস্টয়ের দলে, তারা সবাই খ্রিস্টসভার বিপক্ষে এবং একই সঙ্গে তারা ভেখিস্টদের (রুশ বুর্জোয়া মতাদর্শে বিশ্বাসীদের সংগঠন : অনুবাদক) পক্ষভুক্ত– যাদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করা সম্ভব কিন্তু একই পার্টিতে কাজ করা প্রয়োজনীয়। এবং তবু, ভোলইনিয়ার পাদ্রী এন্থনী ভেখিস্টদের চুম্বন দিয়ে স্বাগত জানায়।

উদারনীতিকরা সামনে নিয়ে আসে যে টলস্টয় এক 'মহৎ বিবেক।' এটা কি একটা ফাঁপা উক্তি নয়, যা 'নভয়া ভ্রেমিয়া ' এবং তার মতো সব সংবাদপত্র রঙ-বেরঙেয়ের কায়দায় হাজার বার উচ্চারণ করছে। এটা কি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তিনি যেসব সুনির্দিষ্ট সমস্যা তুলে ধরেছেন সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া নয়? এটা কি মননের বদলে সংস্কারানুগত্যকে, তার অস্তিত্বের ভবিষ্যত অভিসারী অংশের পরিবর্তে অতীতচারী অংশকে, তার শ্রেণী আধিপত্যের প্রবল বিরোধিতার স্থলে রাজনীতি-বর্জন ও নৈতিক আত্মপূর্ণতার প্রচারকে সামনে নিয়ে আসা নয়?

টলস্টয় আজ মৃত; এবং প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়ার যে দুর্বলতা ও অক্ষমতা এই মহৎ শিল্পীর দর্শনে ও রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে সেটা এখন অতীতের সামগ্রী। কিন্তু যে ঐতিহ্য তিনি রেখে গেছেন, তার মধ্যে রয়েছে সেটা, যা অতীতের সামগ্রীতে পর্যবসিত হয়নি বরং ভবিষ্যতে সম্পদে পরিণত হয়েছে। এই উত্তরাধিকার রাশিয়ার সর্বহারারা গ্রহণ করেছে এবং তার ওপর কাজ করে চলেছে। রাষ্ট্র, গীর্জা ও ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানা সম্পর্কে টলস্টয়ের সমালোচনাকে রাশিয়ার সর্বহারারা শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের কাছে

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা করবে তাদের আত্মপূর্ণতার ও সাধুসন্তের জীবনাভিমুখী করার জন্য নয়, বরং জারের রাজতন্ত্র ও ভূস্বামীতন্ত্রকে আঘাত করার জন্য, উত্তেজিত করার জন্য– যে ব্যবস্থা ১৯০৫ সালে কিয়ৎ-পরিমাণে বিধ্বস্ত হয়েছে এবং যেটাকে অবশ্যই ধূলিসাৎ করতে হবে। টলস্টয়ের ধনতন্ত্র-সমালোচনাকে রাশিয়ার সর্বহারারা জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করবে এই জন্য নয় যে, জনগণ ধন্যবাদ ও অর্থের প্রভুত্বের ওপর অভিশাপ বর্ষণে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে, বরং যাতে তারা জীবন ও সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে ধনতন্ত্রভিত্তিক প্রকৌশলগত ও সামাজিক জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারে, এবং যাতে তারা লক্ষ লক্ষ সমাজতন্ত্রের সৈনিকেরা একটি ঐক্যবদ্ধ সেনাদলে পরিণত হবার শিক্ষা পায়– যারা ধনতন্ত্রকে উৎখাত করবে এবং এমন নতুন সমাজের পত্তন করবে যেখানে দারিদ্র্য তাদের ললাট লিখন হবে না এবং যেখানে মানুষের ওপর মানুষের শোষণ আর থাকবে না।

নভেম্বর ১৯১০

www.pathagar.com

কবিতার আঙ্গিকবাদী গোষ্ঠী ও মার্কসবাদ

[লিওঁ ট্রটস্কির মূল নাম লেভ দাভিদোভিচ ব্রনস্টেন। ১৮৭৯ সালে ইউক্রেনের এক খামার মালিকের ঘরে তাঁর জন্ম হয়। রাজনৈতিক অপরাধে ১৮৯৯ সালে চার বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। এসময়ে মার্কসবাদে দীক্ষা নেন এবং সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে যান ১৯০২ সালে। কালক্রমে লেনিনের সঙ্গে যুক্ত হন ও ১৯১৭ সালের বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেন। বিপ্লবের পর বিদেশমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য হল লালফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসেবে প্রথম মহাযুদ্ধে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে রক্ষা করা। লেনিনের মৃত্যুর পর ক্ষমতার লড়াইয়ে স্ট্যালিনের কাছে হেরে গিয়ে ১৯২৯ সালে স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯৪০ সালে স্ট্যালিনের গুপ্তচরেরা মেক্সিকোতে তাঁকে হত্যা করে। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ট্রটস্কি ছিলেন সর্ববিধ সাহিত্যের ভক্ত। মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের মূল কাঠামোকে মেনে নিয়ে শিল্পকলার স্বায়ত্তশাসনের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত Literature and Revolution গ্রন্থে তাঁর পরিণত চিন্তার পরিচয় রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধটি গৃহীত হয়েছে Leon Trosky : On Literature and Art নামক গ্রন্থ (১৯৭৭) থেকে।]

বিপ্লব-পূর্ব ভাবাদর্শগুলোর ক্ষীণ প্রতিধ্বনিসমূহকে হিসেবের বাইরে রেখে বর্তমান বছরগুলোতে শুধুমাত্র যে তত্ত্বটি সোভিয়েত রাশিয়ায় মার্কসবাদের বিরোধিতা করছে সেটা হলো শিল্পকলার আঙ্গিকবাদের তত্ত্ব। মজার ব্যাপার এই যে, রুশ আঙ্গিকবাদ নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রেখেছে রুশ ভবিষ্যতবাদের সঙ্গে, কিন্তু শেষেরটি রাজনৈতিকভাবে কম্যুনিজমের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও আঙ্গিকবাদ সর্বশক্তি নিয়ে তত্ত্বগতভাবে বিরোধিতা করছে মার্কসবাদের।

ভিকটর শক্‌লোভস্কি হচ্ছেন ভবিষ্যতবাদের তাত্ত্বিক এবং একই সঙ্গে তিনি আঙ্গিকবাদী গোষ্ঠীর প্রধান। তাঁর তত্ত্বানুসারে, শিল্পকলা, সবসময় স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশুদ্ধ আঙ্গিকের কাজ; এবং প্রথমবারের মতো ভবিষ্যতবাদ সেটা স্বীকার করছে। সেজন্য ভবিষ্যৎবাদ হচ্ছে ইতিহাসে প্রথম সচেতন শিল্প এবং আঙ্গিকবাদীরা হচ্ছে শিল্পকলার ইতিহাসে প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক গোষ্ঠী। শ্‌কলোভস্কির চেষ্টায় (এবং এটা একটা তাৎপর্যবিহীন গৌরব নয়!) শিল্পকলার তত্ত্ব এবং আংশিকভাবে শিল্পকলা নিজেও শেষপর্যন্ত আলকেমির পর্যায় থেকে রসায়ন শাস্ত্রের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। শিল্পকলার প্রথম রসায়নবিদ এই আঙ্গিকবাদী গোষ্ঠী তাদের আগমনী বার্তায় ঐ ভবিষ্যতবাদী 'আপসকামীদের' মুখে কয়েকটি বন্ধুসুলভ চড় দিয়েছে, যারা বিপ্লবের সঙ্গে সেতুবন্ধন চায়

www.pathagar.com

এবং ইতিহাসের বস্তুনির্ভর ধারণায় এই সেতুবন্ধন খোঁজে। এ ধরনের সেতুবন্ধন অপ্রয়োজনীয়; ভবিষ্যতবাদ নিজেই নিজের জন্য পুরোপুরি যথেষ্ট।

দুটো কারণ আছে যেজন্যে এই গোষ্ঠীর সামনে একটু থামা দরকার। একটা হলো এর নিজের কারণে। ভাসা-ভাসা ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র সত্ত্বেও আঙ্গিকবাদী শিল্পতত্ত্বের গবেষণাকর্মের কিছু অংশ উপকারে আসে। দ্বিতীয় কারণটি হলো ভবিষ্যতবাদ নিজে; নবীন শিল্পকলার একচেটিয়া উপস্থাপনে ভবিষ্যতবাদীদের দাবি যতই ভিত্তিহীন হোক না-কেন, ভবিষ্যৎ কালের শিল্পকলা নির্মাণের প্রক্রিয়া থেকে ভবিষ্যতবাদকে কেউ ঠেলে ফেলে দিতে পারে না।

আঙ্গিকবাদী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়?

শকলোভস্কি, ঝিরমুনস্কি, জ্যাকোবসন ও অন্যদের দ্বারা বর্তমানে উপস্থাপিত এর চারিত্র্য অত্যন্ত উদ্ধত ও অপরিণত। আঙ্গিককে কবিতার নির্যাস বলে ঘোষণা করে এই গোষ্ঠীরা নিজেদের কাজকে কমিয়ে এনেছে কবিতার পঙ্‌ক্তি গঠনের ও ব্যবহৃত শব্দের বুৎপত্তির বিশ্লেষণে (আসলে বর্ণনাগত ও আধা পরিসংখ্যানগত), স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জন ধ্বনির পৌনঃপুনিকতার এবং বাক্যাংশ ও গুণবাচক নামের গণনায়। এই ব্যাখ্যা, যেটাকে আঙ্গিকবাদীরা কবিতার বা কাব্যের নির্যাস বলে বিবেচনা করে, নিঃসন্দেহে দরকারী ও উপকারী কিন্তু এর আংশিকতাকে, জোড়াতালি দেওয়াকে, অনুষঙ্গী ও প্রস্তুতিমূলক চারিত্র্যকেও অবশ্য বুঝতে হবে। কাব্যের প্রকৌশল ও প্রকরণের রীতিনীতি সম্পর্কে এটা একটা আবশ্যকীয় উপাদান হতে পারে। বাচনিক চাবিগুচ্ছকে সমৃদ্ধ করার জন্য কবি বা লেখকের যেমন সমার্থবোধক শব্দের তালিকা নির্মাণ করা ও সেটাকে বাড়িয়ে তোলা প্রয়োজন, তেমনি উপকারী ও বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে শুধু অভ্যন্তরীণ অর্থানুযায়ী নয়, বরং শ্রবণ সুভগতার দিক থেকেও শব্দকে বিবেচনা করা, কারণ ধ্বনিবিশিষ্টতার কারণেই একটি শব্দ মানুষ থেকে মানুষে বিস্তৃত হয়। বৈধ পরিধির মধ্যে সীমিত থাকলে আঙ্গিকবাদের পদ্ধতি আঙ্গিকের শৈল্পিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্য (এর অর্থনীতি, গতি, বৈপরীত্য ও অত্যুক্তি অলংকারের ব্যবহার প্রভৃতি) ব্যাখ্যায় সহায়ক হতে পারে। সেটা, পরবর্তী পর্যায়ে, জগতকে অনুভব করতে শিল্পীর সামনে একটি পথ—অনেক পথের একটি—খুলে দিতে পারে এবং একজন শিল্পীর বা সমগ্র শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের সম্পর্ক আবিষ্কারে সাহায্য করতে পারে। অদ্যাবধি বিকাশমান কোন সাম্প্রতিক ও জীবন্ত গোষ্ঠী সম্পর্কে যখন আমরা আলোচনা করি, তখন আমাদের বর্তমান ক্রান্তিলগ্নে শ্রেণীমূল ও সমাজব্যাখ্যা দ্বারা সেটার বিশ্লেষণের একটি তাৎক্ষণিক গুরুত্ব রয়েছে, যাতে করে শুধু পাঠকরা নন, বরং গোষ্ঠী নিজেও দিশা খুঁজে পেতে পারে অর্থাৎ নিজেকে জানতে, শুদ্ধ করতে ও পরিচালিত করতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু আঙ্গিকবাদীরা তাদের পদ্ধতিকে সমাজবিজ্ঞানে পরিসংখ্যানের বা জীব বিজ্ঞানে অনুবীক্ষণের মতো শুধু অনুষঙ্গী, সেবামূলক বা প্রকৌশলীগত গুরুত্ব দিয়ে সন্তুষ্ট নয়। না, তাদের দাবি আরো ব্যাপক। তাদের মতে আক্ষরিক মিল চূড়ান্তভাবে ও পুরোপুরিভাবে শব্দের সঙ্গে শেষ হয়, যেমন চিত্রণমূলক শিল্প শেষ হয় রঙের সাথে। একটি কবিতা ধ্বনির সমাহার, একটি চিত্র রঙবিন্দুর যোজনা এবং শিল্পের কানুন হলো ধ্বনি সমাহারের ও রঙ যোজনার নিয়ম মাত্র। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ও পরিসংখ্যানের সহযোগে অক্ষর দিয়ে নিষ্পন্ন কাজের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমাদের কাছে যে তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয় সেটা আঙ্গিকবাদীদের কাছে আলকেমীর তুল্য।

'শিল্পকলা সর্বদা জীবনমুক্ত ছিল; এর রঙে শহরদুর্গের ওপর আন্দোলিত পতাকার রঙ কখনো প্রতিফলিত হয়নি।' (শক্লোভস্কি); 'কবিতার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে ধ্বনিপুঞ্জের তথা প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে সমন্বয়।' (রজ্যাকোবসন : সাম্প্রতিক রুশ কবিতা); 'নতুন আঙ্গিকের সঙ্গে আসে নতুন বিষয়। সুতরাং আঙ্গিক নির্ধারণ করে বক্তব্য।' (ক্রুশেনিখ); 'কবিতার অর্থ শব্দকে আঙ্গিক প্রদান করা– শব্দ নিজে নিজেই মূল্যবান' (জ্যাকোবসন), বা, খেলবনিকোভ যেমন বলেছেন, 'শব্দ নিজেই যেন কিছু একটা।'

সত্যি বটে, লোকোমোটিভ, প্রপেলার, বিদ্যুৎ ও রেডিও প্রভৃতিকে শব্দের মধ্যে প্রকাশ করার উপায় নির্ধারণের জন্যে ইতালির ভবিষ্যতবাদীরা তাঁদের নিজেদের কালে চেষ্টা করেছেন। অন্য অর্থে জীবনের নতুন বিষয়বস্তুর জন্যে তাঁরা চেয়েছেন নতুন আঙ্গিক। কিন্তু দেখা গেল যে, 'কাব্যভাষার ক্ষেত্রে নয়, সেটা ছিল তথ্যপরিবেশনের ক্ষেত্রে সংস্কার বিশেষ' (জ্যাকোবসন)। রুশ ভবিষ্যতবাদের বেলায় সেটা সম্পূর্ণ আলাদা; 'ধ্বনিপুঞ্জের সমন্বয়'কে সেটা চরম অবস্থায় নিয়ে আসে। রুশ ভবিষ্যতদবাদে, আঙ্গিক নির্ধারণ করে আধেয়কে।

সত্যি বটে, জ্যাকোবসন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'একটি অভিনব কাব্যপদ্ধতি নাগরিকতার (শহুরে সংস্কৃতি) মধ্যে নিজের প্রয়োগ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে; 'মায়াকোভস্কি ও খেলবনিকোভ-এর নাগরিক কবিতার এই হলো পটভূমি, অন্যভাবে বলতে গেলে : কবির চোখ ও কানকে বিদ্ধ করেছে ও পুনর্শিক্ষিত করেছে যে-নগর সংস্কৃতি সেটা, নতুন চিত্রকল্প, নতুন গুণবাচক নাম, নতুন ছন্দ নিয়ে তাকে অনুপ্রাণিত করেনি, বরং স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে আবির্ভূত এই নতুন আঙ্গিকে বাধ্য করেছে যথোপযুক্ত উপকরণ অনুসন্ধানের এবং তাকে ঠেলে দিয়েছে শহরের অভিমুখে। 'ধ্বনিপুঞ্জের' বিকাশ স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে ওডেসি (odyssey) থেকে এগিয়ে গেছে 'এ ক্লাউড অব ট্রাউজারস' (A cloud of Trousers) এর দিকে; টর্চ, মোমবাতি, বিজলী বাতির এক্ষেত্রে কোন ভূমিকা ছিল না। আঙ্গিকবাদের শিশুসুলভ অপূর্ণতা চোখকে বিদ্ধ

www.pathagar.com

করার জন্যে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ভালভাবে শুধু সূত্রাবদ্ধ করলেই চলে। কিন্তু জ্যাকোবসন আরো বলতে চান; তিনি অগ্রিম উত্তর দেন যে, একই মায়াকোভস্কি এ ধরনের পঙ্ক্তি রচনা করেছেন : Leave the cities, you silly people। এবং আঙ্গিকবাদী গোষ্ঠীর তাত্ত্বিকরা গভীর যুক্তি দেন যে 'এটা কি, যৌক্তিক স্ববিরোধী? কিন্তু কবিতায় প্রকাশিত চিন্তাকে অন্যেরা কবির সঙ্গে বেঁধে দিক। ভাবনা ও চিন্তার জন্যে একজন কবিকে দোষারোপ করা মধ্যযুগের জনসাধারণ কর্তৃক জুডাস-এর চরিত্রের অভিনেতাকে প্রহার করার আচরণের মতই অসংগত।' এবং এ ধরনের অনেক কিছু।

এটা সুস্পষ্ট যে, এই সব রচিত হয়েছিল একজন অত্যন্ত সক্ষম হাই স্কুলের কিশোর দ্বারা। 'আমাদের সাহিত্য-শিক্ষক, যিনি একজন জাঁদরেল পণ্ডিত, তাকে মসীবিদ্ধ করার' অতিশয় স্পষ্ট ও যথেষ্ট স্বতঃতাৎপর্যপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল তার। মসীবিদ্ধ করায় আমাদের সাহসী নতুনতত্ত্ব প্রবর্তকেরা ওস্তাদ, কিন্তু তারা জানে না কিভাবে তত্ত্বগত ও ব্যাকরণগত ভাবে তাদের লেখনীকে ব্যবহার করতে হবে। এটা প্রমাণ করা কষ্টকর নয়।

অবশ্য, নগর তার নিজস্ব আঙ্গিকে খুঁজে পাবার অনেক আগে ভবিষ্যতবাদ নগরের ইঙ্গিত অনুভব করেছিল; ট্রামগাড়ি, বিদ্যুৎ, টেলিগ্রাফ, অটোমোবাইল, প্রপেলার, নৈশ ক্যাবারে (বিশেষ করে শেষেরটি) সাহিত্যে এসে গিয়েছিল। নগরমনস্কতা তথা নগরসংস্কৃতি স্থান করে নিয়েছিল ভবিষ্যতবাদের অবচেতনার অনেক গভীরে; গুণবাচক নাম, ব্যুৎপত্তি, বাক্যগঠন এবং ছন্দ-ভবিষ্যতবাদের উক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী আসলে আর কিছু নয়, চেতনাবিজয়ী নগরের প্রাণকে শৈল্পিক রূপ দেবার প্রয়াস মাত্র। এবং যখন মায়াকোভস্কি চিৎকার করে বলেন : Leave the city, you silly people, তখন সেটা এমন একজন লোকের আর্তচীৎকার যিনি অস্থিমজ্জায় নগরের প্রভাবকে অনুভব করেন– যিনি স্পষ্টভাবে ও পরিষ্কারভাবে নিজেকে নগর নিবাসীরূপে প্রকাশ করেন, বিশেষত যদি তিনি নগরের বাইরে অবস্থান করেন তথা শহর ছেড়ে গ্রীষ্মবাসের অধিবাসী হন। কোন কবিকে তার কবিতায় প্রকাশিত ভাব ও অনুভূতির জন্য দোষারোপ (শব্দটিকে কিছু যেন বাদ পড়ে গেছে) করার প্রশ্ন এটা নয়। অবশ্য তার প্রকাশভঙ্গি তাকে কবি করে তোলে। কিন্তু যাই হোক, একজন কবি যে গোষ্ঠীর ভাষাকে গ্রহণ করেছেন বা যে ভাষা সৃজন করেছেন তার সাহায্যে তিনি তার বাইরের দুনিয়ার দায়িত্ব পালন করেন। এটা এমন কি তখনও সত্য যখন তিনি গীতিময়তা, ব্যক্তিগত ভালবাসা এবং ব্যক্তিগত মৃত্যুর বিষয়ে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন। যদিও কবিতার আঙ্গিকের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যগুলো রচয়িতার মানস গঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তবু সেগুলো অনুকরণ ও গতানুগতিকতার, প্রকাশপদ্ধতির এমনকি অনুভবের হাত ধরাধরি করে চলে। বৃহৎ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায় যে, একটি নতুন শিল্পআঙ্গিক নতুন চাহিদার প্রয়োজনে জন্মলাভ

www.pathagar.com

করে। একান্তভাবে গীতি কবিতায় বিষয়টির পর্যালোচনা এখানে করা যেতে পারে– যৌনক্রিয়ার শারীরবৃত্ত ও প্রেমকবিতার মধ্যে ব্যক্তিগত, জাতিগত এবং সমাজগত উপাদান সমন্বিত মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির একটি জটিল প্রেরণ-প্রক্রিয়া বিদ্যমান। জাতিগত ভিত্তি তথা মানুষের যৌনপ্রবৃত্তির কাঠামো খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। প্রেমের সামাজিক রূপ পরিবর্তিত হয় অধিকতর দ্রুত বেগে। সেগুলো প্রেমের মানসিক ওপরকাঠামোকে প্রভাবিত করে, নতুন আবেগ ও প্রবণতা, নতুন আধ্যাত্মিক চাহিদা, নতুন শব্দসম্ভারের প্রয়োজন সৃষ্টি করে এবং এভাবে কবিতার সামনের নতুন দাবি নিয়ে আবির্ভূত হয়। একজন কবি তার শিল্পের উপকরণ শুধু সামাজিক পরিবেশের মধ্যে লাভ করতে পারেন। তিনি তার নিজস্ব শিল্পবোধের মাধ্যমে জীবনের নবতরঙ্গকে সঞ্চারিত করেন। শহুরে পরিবেশ দ্বারা পরিবর্তিত ও জটিল রূপ পরিগ্রহকারী ভাষা কবিকে নতুন বাচনিক উপকরণ উপহার দেয় এবং নতুন চিন্তা ও নতুন অনুভূতির কাব্যিক রূপ প্রদানের জন্যে নতুন শব্দযোজনার সুযোগ এনে দেয় বা সম্ভাবনা জাগ্রত করে। এই নতুন অনুভূতি অবচেতনের কালো আবরণকে ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। যদি সমাজ-পরিবেশের পরিবর্তনের মানসিকতার কোন পরিবর্তন না- হতো, তবে শিল্পকলায় কোন চাঞ্চল্য আমরা লক্ষ্য করতাম না; পুরুষপরম্পরায় মানুষকে শুধু বাইবেলের কবিতা বা, প্রাচীন গ্রিক কবিতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হতো।

কিন্তু আঙ্গিকবাদের দার্শনিক আমাদের উপর লাফ দিয়ে পড়েন এবং বলেন যে, নতুন আঙ্গিকের প্রশ্ন কাব্যভাষার ব্যাপারে নয়, বরং তথ্য পরিবেশনের বেলায় প্রশ্ন বটে। সেখানে তিনি আমাদের বিদ্ধ করেন। আপনি যদি মনে করেন তাহলে কবিতা সংবাদ পরিবেশন, কেবল একটি বিচিত্র, ওজস্বী রীতিতে।

'বিশুদ্ধ শিল্প' ও 'উদ্দেশ্যমুখী শিল্প' নিয়ে কলহ দেখা দিয়েছিল উদারনৈতিক ও জনতন্ত্রী (populist)দের মধ্যে। এগুলো আমাদের ব্যাপার নয়। বস্তুবাদী দ্বন্দ্ব এর ওপরে; ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিতে দেখলে শিল্পকলা সবসময় ছিল সমাজের ভৃত্য ও ঐতিহাসিকভাবে উপযোগবাদী। অন্ধকার ও অস্পষ্ট ভাবের জন্যে সেটা প্রয়োজনীয় শব্দ-ছন্দ আবিষ্কার করে, চিন্তা ও অনুভূতির কাছাকাছি এনে পারস্পরিক বৈপরীত সৃষ্টি করে, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে অনুভূতিকে পরিশীলিত, অধিকতর নমনীয় ও সংবেদনশীল বানায়; এটা চিন্তার ভাণ্ডারকে আগেভাগেই সমৃদ্ধ করে, তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে নয়; ব্যক্তি সমাজগ্রুপ, শ্রেণী ও জাতিকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে। 'বিশুদ্ধ'তা বা নগ্ন 'মতবাদের' পতাকায় শোভিত হয়ে শিল্প রচিত হলো কিনা সে বিচেনার উধের্ব থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সে এ কাজ করে। আমাদের রুশ সমাজবিকাশের ধারায়, জনগণের সঙ্গে সাযুজ্যলিপ্সু বুদ্ধিজীবী গ্রুপের ব্যানার হিসেবে

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যমুখী শিল্পকলা আবির্ভূত হয়। জারতন্ত্র দ্বারা পদদলিত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশবঞ্চিত অসহায় বুদ্ধিজীবীরা সমাজের নিম্নতর স্তরে সমর্থন কামনা করেছিল এবং 'জনগণের' কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিল যে, তারা শুধু জনগণের কথা চিন্তা করে, শুধু তাদের জন্যে বাঁচে এবং 'ভয়ংকর' ভাবে তাদেরকে ভালভাসে। এবং জনসাধারণের কাছে গমনকারী জনতন্ত্রীরা (populist) যেমন পরিচ্ছন্ন রেশমী পোশাক, চিরুনী ও টুথব্রাশ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল সেভাবে নির্যাতিতদের আশা ও বেদনাকে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত বাকভঙ্গি প্রদানের আশায় বুদ্ধিজীবীরা শিল্পরচনায় আঙ্গিকের 'সূক্ষ্মতা'কে বর্জন করতে তৈরি ছিল। অন্যদিকে উদীয়মান বুর্জোয়াদের ব্যানার ছিল 'শিল্পের শুদ্ধতা'র ধারণা— এরা নিজেদের বুর্জোয়া চরিত্র খোলাখুলি ঘোষণা করতে অক্ষম ছিল কিন্তু একই সঙ্গে চেয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের সেবায় নিয়োজিত রাখতে। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থান এসব প্রবণতার অনেক দূরে- যে-প্রবণতাসমূহ ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় ছিল কিন্তু বর্তমানে ঐতিহাসিকভাবে অবসিত। বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে মার্কসবাদ একই নিশ্চয়তার সঙ্গে বিশুদ্ধ ও উদ্দেশ্যমুখী শিল্পের সামাজিক মূল অনুসন্ধান করে। কবিতায় প্রকাশিত চিন্তা ও অনুভূতির জন্যে সে কবিকে দোষারোপ করে না, বরং অনেক বেশি গুরুতর প্রশ্ন উথাপন করে– সকল বৈচিত্র্যসহ একটি শিল্পকর্ম অনুভূতির কোন স্তরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়? এ সমস্ত চিন্তা- ভাবনার সামাজিক প্রেক্ষাপট কি ? কোন সমাজ ও শ্রেণীর ঐতিহাসিক বিকাশে এদের স্থান কোথায়? এবং তদুপরি, এই নবীন আঙ্গিকের জটাজালের মধ্যে কোন সাহিত্যিক ঐতিহ্য প্রেরণা সঞ্চার করেছে। ইতিহাসের কোন ঢেউয়ের প্রভাবে চিন্তা ও অনুভূতিগত এই নতুন জটিলতা কাব্যিক চেতনার সঙ্গে পৃথককারী বহিরাবরণকে ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছে ? অনুসন্ধানটি জটিল, বিস্তৃত বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে পারে, কিন্তু সমাজিক প্রক্রিয়ায় শিল্প-যে-অনুসঙ্গী ভূমিকা পালন করে, সেটা হবে অনুসন্ধানের মূল প্রত্যয়।

প্রতিটি সামাজিক শ্রেণীর শিল্পকলা সম্পর্কে নিজস্ব নীতি আছে, অর্থাৎ শিল্পের কাছে দাবি উত্থাপনের জন্যে রয়েছে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল পদ্ধতি; উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ম্যাসিনার রয়েছে তুরস্কের সুলতান ও তার দরবারকে রক্ষা করার নীতি এবং চাহিদা ও সরবরাহের স্বয়ংক্রিয় সম্পর্ক, যা পরিপুষ্ট হয় ব্যক্তিকে প্রভাবিত করার জটিল পদ্ধতি দ্বারা। এবং এধরনের আরো অনেক কিছু। যতদিন পর্যন্ত শিল্পকলা তার দরবারী চরিত্র বজায় রেখেছিল ততদিন পর্যন্ত সে তার সমাজ এবং এমনকি ব্যক্তি নির্ভরতার কথা তো গোপন রাখেনি, বরং খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেছে। মূল তত্ত্বে অনেক বিচ্যুতি থাকলেও উদীয়মান বুর্জোয়ার ব্যাপক অধিক জনপ্রিয় ও অনির্দেশ্য চরিত্র সামগ্রিকভাবে 'বিশুদ্ধ শিল্প' তত্ত্বের জন্ম দেয়। আগেই বলা হয়েছে যে, জনতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীর উদ্দেশ্যমুখী সাহিত্যের

www.pathagar.com

মধ্যে এক ধরনের শ্রেণীস্বার্থ কাজ করেছে; জনগণের সমর্থন ব্যতীত বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের শক্তিশালী করতে কিংবা ইতিহাসে নিজেদের ভূমিকা পালনের অধিকার বর্জন করতে সক্ষম হতো না। কিন্তু বিপ্লবী সংগ্রামের স্তরে বুদ্ধিজীবীর শ্রেণী-অহং এর ভেতরটা উলটে গিয়ে বাইরের দিকে প্রসারিত হয় এবং বামপন্থী অংশের মধ্যে সেটা সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের রূপ পরিগ্রহ করে। এ কারণেই বুদ্ধিজীবীরা উদ্দেশ্যমুখী শিল্পভাবনাকে গোপন না রেখে বরং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছে এবং এভাবে অন্য অনেক জিনিসের মতো শিল্পকলাকে বিসর্জন দিয়েছে।

রাজনীতির ভাষায় যখন বলা হয় তখন শিল্পকলার বস্তুবাদী সমাজনির্ভরতা ও সমাজ-উপযোগিতা বলতে আমাদের মার্কসবাদী ধারণায় আদেশ ও অধ্যাদেশ দ্বারা শিল্পকলার ওপর আধিপত্য বিস্তার করার আকাঙ্ক্ষা কখনো বোঝানো হয় না। এটা সত্যি নয় যে, আমরা ঐ শিল্পকে নতুন ও বিপ্লবী মনে করি যা শ্রমিকদের কথাই বলে এবং এটা বলা নিরর্থক যে কারখানার চিমনি বা পুঁজির বিরুদ্ধে অনিবার্য অভ্যুত্থান লিখতে আমরা কবিদের কাছে দাবি উত্থাপন করি। অবশ্য, প্রলেতারিয়েতদের সংগ্রামকে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন না-করে নতুন সাহিত্য পারে না। কিন্তু নতুন সাহিত্যের লাঙ্গল কৃষিজমির নির্দিষ্ট এলাকা চাষের মধ্যে সীমিত নয়। বিপরীত পক্ষে, সমগ্র মাঠকে সব দিক থেকে অবশ্যই এর কর্ষণ করতে হবে। সবচেয়ে ক্ষুদ্র পরিসরের ব্যক্তিগত গীতিকবিতারও নতুন সাহিত্যের মধ্যে টিকে থাকার পূর্ণ অধিকার আছে। তদুপরি, নতুন গীতিকবিতা ব্যতীত নতুন মানুষ সৃষ্টি করা যাবে না। কিন্তু সেটা সৃষ্টি করতে হলে কবির নিজের পক্ষেও জগতকে নতুনভাবে উপলব্ধি করা দরকার। যদি শুধু যিশুখ্রিস্ট বা এককভাবে কবি নিজে নিজের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েন (আখমাতোভা, ট্সভেতেইভা, শ্কপসকাআ এবং অন্যদের রচনায়), তাহলে শুধু প্রমাণিত হয় যে, সময়ের কত পেছনে গীতিকাবিতা রয়ে গেছে এবং নতুন মানুষের জন্যে সামাজিক ও নান্দনিকভাবে সেগুলো কত অসম্পূর্ণ। এমনকি এই পরিভাষাসমূহ যতটা শব্দের অবশেষ ততটা যদি চেতনাগত নাও হয়, তবু সেটা মনস্তাত্ত্বিক জড়তা নির্দেশ করে এবং সেজন্যে নতুন মানুষের চেতনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কবিকে কেউ থিমের সম্পর্কে ব্যবস্থাপত্র দিতে যাচ্ছে না বা দিতে ইচ্ছাও করে না। দয়া করে আপনার চিন্তার সামর্থ্য অনুযায়ী সব বিষয়ে লিখুন। কিন্তু নয়া জগত রচনা করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত বলে যে নতুন শ্রেণীটি যুক্তিসঙ্গতভাবে নিজেকে মনে করে তাকে যে কোন বিষয় সম্পর্কে আপনার কাছে এ কথা বলার সুযোগ দিন যে, সতের শতকের জীবনদর্শনকে সবচেয়ে সুন্দর ভাষায় তরজমা করলেই আপনি নতুন কালের কবি হবেন না। শিল্পকলার আঙ্গিক কিয়ৎপরিমাণে এবং অনেক বড় পরিসরে স্বাধীন, কিন্তু যে-শিল্পী ঐ আঙ্গিক সৃষ্টি করেন এবং যে-দর্শক সেটা উপভোগ করেন, তারা শূন্য মেশিন নন যে,

www.pathagar.com

একজন কেবল আঙ্গিক রচনা করবেন এবং অন্যেরা সেটা উপভোগ করবেন। সুনির্দিষ্ট আকৃতির মনস্তত্ত্ব নিয়ে তারা জীবন্ত মানুষ— পুরোপুরি সুসংহত না হলেও তারা কিছুটা ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই মনস্তত্ত্ব সমাজ পরিস্থিতির ফল। শিল্পের আঙ্গিক সৃষ্টি করা ও অনুভব করা এই মনস্তত্ত্বের অন্যতম দায়িত্ব। আঙ্গিকবাদীরা জ্ঞানী হবার যতই চেষ্টা করুন না কেন, তাদের সমস্ত ধারণা শুধু এর ওপরই নির্ভরশীল যে, সামাজিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যকে তারা অস্বীকার করেন— যে সামাজিক মানুষ সৃষ্টি করে ও সৃষ্ট বস্তুকে উপভোগ করে।

প্রলেতারিয়েতদের শিল্পকলায় নতুন আধ্যাত্মিক চেতনাকে রূপ দিতে হবে, যার কায়া তাদের নিজেদের ভেতরে সবেমাত্র ধারণ শুরু হয়েছে এবং যার শৈল্পিক রূপ দেবার জন্যে শিল্পকলা লেখককে অবশ্যই সাহায্য করে। এটা রাষ্ট্রীয় নির্দেশ নয়, বরং ইতিহাসের দাবি। ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার বস্তুনির্ভরতায় এর শক্তি নিহিত, আপনি এটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন না, বা এর শক্তিকে অস্বীকার করতে পারেন না।

বস্তুনির্ভর হবার জন্যে আঙ্গিকবাদী গোষ্ঠী সচেষ্ট বলে মনে হয়। শুধু রুচি ও মেজাজ নিয়ে তৎপর সাহিত্যিক ও সমালোচক খেয়ালীপনা-সম্পর্কে বিরক্ত হবার কারণ এর আছে এবং সেটা যুক্তিহীন নয়। শ্রেণীবিন্যাস ও মূল্যায়নের জন্যে তারা সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি চায়। কিন্তু সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাসা–ভাসা পদ্ধতির জন্যে তারা নিরন্তর রৈখিক চিত্রবিদ্যা ও মাথার খুলির গঠনের ভিত্তিতে মানসিক শক্তি নির্ণয়ের বিদ্যার কুসংস্কারে নিমজ্জিত হচ্ছে। মনুষ্যচরিত্র নির্ণয় করার জন্যে এই দুই 'গোষ্ঠী'র সম্পূর্ণ বস্তুনির্ভর পরীক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব আছে; যেমন একজনের কলমের চাকচিক্য ও গোলত্ব এবং আর একজনের মাথায় পেছনাংশের স্ফীতির বৈচিত্র্য। কেউ কেউ বলতে পারেন যে, চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কলমের চাকচিক্য এবং মাথার খুলির স্ফীতির কিছুটা সম্পর্কে আছে, কিন্তু এই সম্পর্কে সরাসরি নয় এবং মনুষ্য চরিত্রের পরিচয় এর দ্বারা নিঃশেষ হয় না। আকস্মিক, গৌণ ও অসম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যভিত্তিক আপাতবস্তুনির্ভরতা অনিবার্যভাবে সবচেয়ে খারাপ মননির্ভরতায় নিয়ে যায়। আঙ্গিকবাদী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সেটা নিয়ে যায় শব্দ বিষয়ক কুসংস্কারে। বিশেষণ গণনা করে, পঙ্ক্তির ওজন করে এবং ছন্দ হিসেব করে আঙ্গিকবাদী নিজের-করণীয়-সম্পর্কে-অজ্ঞ একজন মানুষের মূর্তি ধারণ করে নিশ্চুপ হন বা এমন ধরনের অভাবিত সাধারণীকরণ করেন যার মধ্যে আঙ্গিকের কথা থাকে পাঁচ ভাগ আর সবচেয়ে বিচারহীন প্রেরণা থাকে পঁচানব্বই ভাগ।

প্রকৃতপক্ষে, আঙ্গিকবাদীরা শিল্পকলা সম্পর্কে তাদের ধারণাকে যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে নিয়ে যায় না। যদি কেউ কাব্যসৃষ্টির প্রক্রিয়াকে শুধু ধ্বনি বা শব্দের যোজনা হিসেবে গণ্য

www.pathagar.com

করে এবং এর মধ্যে কবিতার সব সমস্যার সমাধান পেতে চায়, তাহলে কাব্যতত্ত্বের (পোয়েটিকস) একমাত্র নিখুঁত সূত্র হবে এরূপ : একটি অভিধানের সাহায্যে নিজেকে অস্ত্র সজ্জিত কর এবং শব্দ নিয়ে বীজগণিতের বিন্যাস ও সমাবেশ (Permutation and combination)-এর পদ্ধতিতে পৃথিবীতে আজ অবধি লিখিত ও অলিখিত সবগুলো কাব্য রচনা করে যাও। 'আঙ্গিকবাদীদের যুক্তি অনুযায়ী, আমরা ইউজিন ওনাজিন* রচনা করত পারি দু'ভাবে : শব্দনির্বাচনকে পূর্ব পরিকল্পিত শৈল্পিক ধারণার বশবর্তী করে (যেমন করেছিলেন পুশকিন), বা, সমস্যাকে বীজগণিতের পন্থায় সমাধান করে। আঙ্গিকবাদীর দৃষ্টিতে দ্বিতীয় পদ্ধতিই অধিকতর সঠিক, কারণ সেটা মেজাজ, প্রেরণা বা অন্যান্য অস্থির বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না, এবং তার সঙ্গে এই সুধিধা আছে যে, ইউজিন ওনাজিন এর পথে এগিয়ে নিয়ে সেটা একজনকে সংখ্যাহীন মহৎ রচনাবলী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। এর জন্যে দরকার শুধু অনন্ত সময়ের, তথা শাশ্বত কালের। কিন্তু একজন কবি বা মানবসমাজ কারোই তাদের আজ্ঞায় অনন্ত সময় নেই, সেজন্যে কাব্যিক শব্দের মূল উৎস হবে আগের মতোই, পূর্ব পরিকল্পিত শৈল্পিক ধারণা–এটাকে বুঝতে হবে ব্যাপকতম অর্থে অর্থাৎ তীক্ষ্ণ চিন্তারূপে এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশিত ব্যক্তিগত বা সামাজিক অনুভূতি হিসেবে এবং একটি অস্পষ্ট মেজাজরূপে। শৈল্পিক রূপ পরিগ্রহের চেষ্টায় এই মননির্ভর ভাব আঙ্গিক দ্বারা উত্তেজিত ও ঝাঁকুনিপ্রাপ্ত হবে এবং কখনো কখনো সম্পূর্ণ অদৃষ্টপূর্ব পথে তাকে ঠেলে দেওয়া হতে পারে। এর সাধারণ অর্থ এই যে, বাচনিক আঙ্গিক পূর্বপরিকল্পিত ভাবের নিষ্ক্রিয় প্রতিফলন নয়, বরং এমন একটি উপকরণ যা ভাবকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে। কিন্তু এ ধরনের সক্রিয় পরস্পরনির্ভরশীল সম্পর্ক—যেখানে আধার আধেয়কে প্রভাবিত করে এবং কখনো কখনো পুরোপুরি বদলে দেয়—সামাজিক ও এমনকি জৈবিক জীবনের সর্বত্র আমাদের পরিচিত। জীববিজ্ঞানে ও সমাজবিজ্ঞানে ডারউইনবাদ বা মার্কসবাদকে বর্জন করে আঙ্গিকবাদ রচনা করার কোন কারণ নেই।

ভিকটর শক্‌লোভস্কি যিনি বাচনিক আঙ্গিকবাদ থেকে সর্বাধিক হৃদয়নির্ভর মূল্যায়নে অবলীলায় সঞ্চরণ করেন, শিল্পকলার ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্বের প্রতি একটি অত্যন্ত আপসহীন মনোভাব গ্রহণ করেছেন। The March of the Horse নামক বার্লিন থেকে প্রকাশিত তিন পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকায় (শক্‌লোভস্কির প্রধান এবং যে কোন বিবেচনায় সন্দেহাতীত গুণ হচ্ছে সংক্ষিপ্তি) শিল্পকলার বস্তুনির্ভর ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তিনি পাঁচটি (চারটি নয়, ছয়টি নয়, বরং ঠিক পাঁচটি) দফায় চরমতম যুক্তি খাঁড়া করেছেন।

---

* রুশ সাহিত্যিক পুশকিনের রচিত একটি কাব্যোপন্যাস।

www.pathagar.com

এগুলোকে বিচার করে দেখতে হবে, কারণ সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক চিন্তার নামে বিচিত্রতম বৈজ্ঞানিক রেফারেন্স সমাহারে তিনটি আনুবীক্ষণিক পৃষ্ঠার মধ্যে কি-ধরনের আবর্জনা আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখলে কোন ক্ষতি হবে না।

'যদি পরিবেশ ও উৎপাদন–সম্পর্ক' শ্‌কলোভস্কি বলেছেন, 'শিল্পকলাকে প্রভাবিত করে, তাহলে কি শিল্পকলার থিম উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে যথাযথ (Corresponding) অঞ্চলের সাথে আবদ্ধ থাকবে না? কিন্তু থিমের কোন বাসভূমি নেই। ভাল কথা, কিন্তু প্রজাপ্রতি-সম্পর্কে কি বলবেন? ডারউইনের মতানুযায়ী, তারাও নির্দিষ্ট সম্পর্কের সঙ্গে যথাক্রমে যুক্ত, তবে তারা স্থান থেকে স্থানান্তরে বিচরণ করে ঠিক ভরহীন সাহিত্যশিল্পীর ন্যায়।

এটা বোঝা সহজ নয়, মার্কসবাদ থিমকে অবস্থার ক্রীতদাস বলে নিন্দা করছে বলে কেন বলা হয়? একই মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন শ্রেণীর একই থিম ব্যবহার করার ঘটনা শুধু এটাই দেখায় যে, মানুষের কল্পনা কত সীমাবদ্ধ এবং কিভাবে মানুষ প্রত্যেক ধরনের সৃষ্টিকর্মে, এমনকি শিল্প রচনায়ও শক্তি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে চেষ্টা করে। প্রতিটি শ্রেণী, অপর শ্রেণীর বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণে কাজে লাগাতে চায়। শক্‌লোভস্কির যুক্তিকে অনায়াসে উৎপাদন-কৌশলের ক্ষেত্রে প্রসারিত করা যায়। প্রাচীনকাল থেকে মাল বহনকারী ওয়াগন একই থিমের ভিত্তিতে প্রস্তুত হয়ে আসছে–যথা অক্ষ, চাকা ও দণ্ড। তবু যাই হোক, রোমক প্যাট্রিসিয়ানের রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নির্মিত হয়েছিল তার রথ, অভ্যন্তরীণ আরাম আয়েশ নিয়ে ক্যাথারিন দি গ্রেটের তেমনি মনোমত হয়েছিল কাউন্ট ওরলভের অশ্বচালিত গাড়ি। রুশ চাষীর ওয়াগন নির্মিত হয়েছে তার গেরস্থালীর প্রয়োজন, তার ছোট্ট অশ্বের শক্তি এবং পল্লীপথের সঙ্গে খাপ খাইয়ে। নিঃসন্দেহে যেটা নতুন প্রকৌশল জ্ঞানের ফসল, সেই মোটর গাড়িও নিশ্চিতভাবে একই থিম তথা দুই অক্ষের ওপর চার চাকার ভিত্তিতে তৈরি। তবু, রাতের বেলায় মোটর যানের চোখ ধাঁধানো আলোতে যখন রাশিয়ার রাস্তায় চাষীর অশ্ব ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়, তখন ওই ঘটনার মধ্যে দুই ভিন্ন সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়।

'যদি পরিবেশ উপন্যাসের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে' শ্‌কলোভস্কি দ্বিতীয় যুক্তি এভাবে দাঁড় করাচ্ছেন, 'তাহলে এক সহস্র ও এক রজনীর গল্পসমূহ কোথায় রচিত হয়েছিল– মিশর, ভারত না পরস্যে– সে প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান গলদঘর্ম হয়ে মরত না।' মানুষের, লেখকও তার অন্তর্ভুক্ত, পরিবেশ তথা তাদের জীবন ও শিক্ষা সাহিত্যে প্রকাশিত হওয়ার অর্থও কিন্তু এই নয় যে, সেগুলোর নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক ও পরিসংখ্যানগত চরিত্র আছে। এটা মোটেই বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, কিছু কিছু নভেল মিশর, ভারত বা পারস্যে রচিত হয়েছে কিনা নির্ধারণ করা কষ্টকর, কেননা উক্ত দেশগুলোর সামাজিক পরিস্থিতিতে অনেক কিছু সাধারণ আছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান ওই সমস্যার সমাধানের জন্যে ভেবে গলদঘর্ম হচ্ছে, এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে, নভেলসমূহে পরিবেশের, যদিও সুষমভাবে নয়, ছাপ পড়েছে। কেউ নিজের সীমানার বাইরে লাফ দিতে পারে না। এমনকি পাগলের প্রলাপের মধ্যেও এমন কিছু নেই যা ঐ-অসুস্থ লোকটি বাইরের পৃথিবী থেকে পূর্বে লাভ করেনি। কিন্তু তাই বলে কেউ যদি ওই প্রলাপগুলোকে বহির্জগতের যথার্থ প্রতিফলন বলে বিবেচনা করে, তবে সেটাও হবে এক ধরনের পাগলামী। শুধু রোগীর অতীত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল মনস্তত্ত্ববিদের পক্ষে ওই প্রলাপোক্তির মধ্যে প্রতিফলিত ও বিকৃতভাবে উপস্থাপিত বাস্তবতার ভগ্নাংশকে বের করা সম্ভব। অবশ্য, শৈল্পিক সৃষ্টি প্রলাপোক্তি নয়, যদিও সেটা শিল্পকলার বিচিত্র নিয়মানুযায়ী বাস্তবতার প্রতিসরণ, পরিবর্তন ও রূপান্তর।

শিল্পকর্ম যতই অদ্ভুত হোক না কেন, ত্রিমাত্রিক পৃথিবী ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সংকীর্ণ জগত থেকে প্রাপ্ত উপাদানের বাইরের কোন কিছু তার আওতার মধ্যে আসে না। এমনকি, শিল্পী যখন বেহেশত ও দোজখ সৃষ্টি করেন, তিনি শুধু তার নিজের জীবনাভিজ্ঞতাকে এমনকি বাড়িওয়ালাকে অপ্রদত্ত ভাড়া, স্বপ্নের পরিবর্তনশীল ছবির জগতে স্থানান্তরিত করেন।

'যদি শ্রেণী ও বর্ণের বিশিষ্টতা শিল্পে রক্ষিত থাকে' তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব যে, অভিজাতদের নিয়ে রচিত মহান রুশ শিল্পীদের গল্পগুলো এবং পাদ্রীদের নিয়ে রচিত রূপকতাগুলো একই প্রকারের হয়?

অন্যভাবে বলা হলেও, এই যুক্তির মূল কথা প্রথম যুক্তির অনুরূপ। অভিজাত ও পাদ্রীদের নিয়ে রূপকথা কেন এক প্রকারের হতে পারবে না এবং সেটা কিভাবে মার্ক্সবাদ বিরোধী হয়? সুপরিচিতি মার্কসবাদীদের ঘোষণাগুলোর মধ্যে ভূস্বামী, পুঁজিপতি, পাদ্রী, সেনাধ্যক্ষ ও অন্য শোষকরা কম বারংবার উল্লিখিত হয় না। ভূস্বামী নিশ্চয়ই পুঁজিপতি থেকে আলাদা, কিন্তু অনেক প্রসঙ্গ আছে যেখানে তাদের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। তাহলে, কেন লোকশিল্প কখনো কখনো জনগণের মাথার ওপরে অবস্থিত ও তাদের লুণ্ঠনকারী শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে অভিজাত ও পাদ্রীদের একসাথে বিবেচনা করতে পারবে না? মুর ও ডেনির কার্টুন ছবিগুলোতে পাদ্রী প্রায়ই ভূস্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাতে মার্ক্সবাদের কোন ক্ষতি হয়নি।

চতুর্থ যুক্তিতে শকলোভস্কি বলছেন; 'যদি নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য শিল্পকলায় প্রতিফলিত হয়, তাহলে সীমান্তের ওপারের লোকজনদের অবলম্বনে রচিত লোককাহিনীর সঙ্গে এপারের

www.pathagar.com

লোককাহিনী পরস্পর বদলযোগ্য হবে না এবং এক এলাকার লোক অপর এলাকা সম্পর্কে বলতে পারবে না।'

আপনারা দেখেতে পাচ্ছেন যে, এখানেও নতুন কিছু বলা হয়নি। মার্কসবাদ কখনো মনে করে না যে, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোর কোন স্বাধীন চরিত্র আছে। অন্যদিকে, লোককাহিনীর উদ্ভব সম্পর্কে সেটা প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সর্বগ্রাসী গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। পশুপালক, কৃষক ও আদিম চাষী সম্প্রদায়ের বিকাশের পর্যায়গুলোর সাদৃশ্য এবং তাদের পারস্পরিক প্রভাব বিস্তারের চারিত্র্য সাদৃশ্যের জন্যে অনুরূপ লোককাহিনী সৃষ্টি না হয়ে পারে না। আমাদের কৌতূহলী করে যে-প্রশ্নটি, সে-দৃষ্টিতে এটা অবান্তর সমস্যা যে, মৌলস্বভাবে সমরূপ জীবনাভিজ্ঞতার প্রতিফলনরূপে এবং কৃষক-কল্পনার সমপ্রকৃতির প্রিজমে প্রতিফলিত হয়ে এই সমজাতীয় থিমগুলো বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বাধীনভাবে উৎপন্ন হয়েছে, না, রূপকথার বীজগুলো অনুকূল বায়ুপ্রবাহে স্থান থেকে স্থানান্তরে নীত হয়ে অনুকূল মাটিতে শিকড় গজিয়েছে। এটা অত্যন্ত সম্ভব যে, প্রকৃত প্রস্তাবে দুটো প্রক্রিয়াই সমন্বিত হয়েছে এখানে।

এবং, সর্বশেষে, একটি আলাদা যুক্তিরূপে শ্‌কলোভস্কি বলেছেন, পঞ্চম কারণে এটা (মার্কসবাদ) সঠিক নয়। এই বলে তিনি নির্দেশ করছেন থিম চুরির বিষয়টির প্রতি যা গ্রিক কমেডি থেকে শুরু করে ওসট্রোভস্কির রচনা পর্যন্ত প্রবাহিত। এখানে, আমাদের সমালোচক, অন্যভাবে হাজির করছেন তার প্রথম যুক্তিকেই। (তাই আমরা দেখছি যে আনুষ্ঠানিক যুক্তিবিদ্যার প্রশ্ন যখন আসছে, তখনও আমাদের আঙ্গিকবাদীদের ব্যাপারগুলো ঠিকমত চলছে না।) হ্যাঁ, লেখার থিম ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, শ্রেণী থেকে শ্রেণীতে, এবং এমনকি লেখক থেকে লেখকে হিজরত করে। এটা শুধু এটাই বোঝায় যে, মনুষ্যকল্পনা অতীতের সম্পদরাজিতে প্রবেশ করে, সেগুলোর শ্রেণীবিন্যাস করে, নেড়েচেড়ে দেখে ওলট-পালট করে এবং এর ওপরে নতুন কিছু নির্মাণ করে। যদি অতীত কালের 'সেকেন্ড হ্যান্ড' সম্ভারের এ ধরনের ব্যবহার না থাকত, তাহলে ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় কোন অগ্রগতিই থাকত না। যদি ওসট্রোভস্কির নাটকের থিম মিশরীয় ও গ্রীকদের মাধ্যমে তাঁর কাছে এসে থাকে, তবে যে-কাগজে তিনি রচনা লিপিবদ্ধ করছেন সেটা মিশরীয় প্যাপিরাস ও গ্রীক পার্চমেন্টের স্তর পার হয়ে তাঁর কাছে এসে পৌছেছে। আরও একটি কাছের তুলনা দেওয়া যাক : তাদের কালের বিশুদ্ধ আঙ্গিকবাদী সোফিস্টদের বিশ্লেষণী পদ্ধতি শকলোভস্কির তাত্ত্বিক চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হলেও এই সত্যের বিন্দুমাত্র হেরফের হয় না যে, শক্‌লোভস্কি নিজে একটি নির্দিষ্ট সমাজ-পরিবেশের ও একটি নির্দিষ্ট কালের অত্যন্ত আজব সৃষ্টি।

শক্‌লোভস্কি কর্তৃক পাঁচটি দফায় মার্কসবাদের নিকেশ করে দেওয়ার ঘটনা

www.pathagar.com

আমাদেরকে ওই সুন্দর অতীত দিনগুলোতে Orthdox Review নামক পত্রিকায় ডারউইনবাদের বিরুদ্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলোকে মনে করিয়ে দেয়। বানর থেকে মানুষের উদ্ভবের কথা যদি ঠিক হতো, তিরিশ বা চল্লিশ বছর আগে লিখেছিলেন ওডেশার বিজ্ঞ যাজক নিকারন, তাহলে আমাদের পিতামহদের মধ্যে লেজের স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যেত, বা, তারা তাদের পিতমহ ও পিতামহীদের মধ্যে সে ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতেন। দ্বিতীয়ত, সবাই জানেন যে, বানর শুধু বানরের জন্ম দিতে পারে। ... পঞ্চমত, ডারউইনবাদ বেঠিক কেননা সেটা আঙ্গিকবাদের বিরোধী– আমাকে মার্জনা করবেন (পাঠক), আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে, সেটা নিখিল গীর্জা সম্মেলনে গৃহীত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যায়। অবশ্য, বিজ্ঞ সাধুর সুবিধা ছিল যে, তিনি খোলাখুলিভাবে অতীত চিন্তার অনুসারী ছিলেন এবং সন্ন্যাসী পলের চিন্তা থেকে যুক্তি আহরণ করতেন; ভবিষ্যতবাদী শক্লোভস্কি যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা বা গণিতের দোহাই দেন, তিনি সেরূপ করতেন না।

এ-বিষয়ে প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই যে, শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তা অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে সৃষ্ট হয়নি, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজনীয়তাও অর্থনীতির সৃষ্টি নয়। অন্য পক্ষে, খাদ্য ও উত্তাপের প্রয়োজনীয়তা অর্থনীতির জন্ম দিয়েছে। এটা অত্যন্ত ঠিক যে, কোন শিল্পকর্মকে গ্রহণ বা বর্জন করার সিদ্ধান্তটি সবসময় মার্কসবাদের নীতিমালার ভিত্তিতে নেওয়া যায় না। শিল্পকর্মকে প্রাথমিকভাবে বিচার করা উচিত তার নিজস্ব নীতিমালা দিয়ে, অর্থাৎ শিল্পকলার নিয়ম দ্বারা। কিন্তু মার্কসবাদই শুধু ব্যাখ্যা করতে পারে কেন এবং কিভাবে ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে শিল্পসাহিত্য একটি বিশেষ ধারা জন্ম লাভ করেছে, অন্যকথায়, তারা ছিল কারা, যারা এ ধরনের কিন্তু অন্য ধরনের নয়, শিল্পরূপের দাবি জানিয়েছিল, এবং কেন করেছিল।

এ-ধরনের চিন্তা হবে বালসুলভ যে, প্রতিটি শ্রেণী তার নিজের মধ্য থেকে সমগ্রভাবে ও সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব শিল্পকলা রচনা করতে পারে এবং বিশেষ করে, সীমাবদ্ধ শিল্পসংঘ বা শিল্পকেন্দ্র, অথবা, Organization for proletarian culture প্রভৃতির সহায়তায় প্রলেতারিয়েতরা নতুন নতুন শিল্পকলা গড়ে তুলতে সক্ষম। সাধারণভাবে বলতে গেলে, মানুষের শিল্পসাধনা নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান। প্রত্যেকটি নবজাগ্রত শ্রেণী তার পূর্ববর্তী শ্রেণীর কাঁধে নিজেকে স্থাপন করে। এই প্রবহমানতা কিন্তু দ্বান্দ্বিক, অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে সেটা নিজেকে আবিষ্কার করে। নতুন শ্রেণীর বিকাশের মাধ্যমে, অর্থনীতি নতুন সাহিত্যিক ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে নতুন শৈল্পিক প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদার প্রেরণা যোগায় এবং ক্ষুদ্র প্রেরণাগুলো জন্ম নেয় সম্পদ ও সংস্কৃতির শক্তিবৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রেণীর অবস্থানগত পরিবর্তনের ফলে।

শিল্পসৃষ্টি সবসময় হলো, শিল্পজগতের বাইরে সৃষ্ট নতুন প্রেরণার ফলে পুরোনো আঙ্গিকের মধ্যে উদ্ভূত জটিল ওলট-পালট। শব্দটির এই বিরাট তাৎপর্যে শিল্পকলা

www.pathagar.com

চাকরানীর মতো। এটা দেহমুক্ত উপাদান নয় যে, নিজের মধ্য থেকে নিজের খাদ্যসংগ্রহ করে, বরং জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত সামাজিক মানুষের কাজ। এবং এটা কি-ধরনের বৈশিষ্ট্য— যদি কেউ প্রতিটি সামজিক কুসংস্কারের মূল অস্বাভাবিকতা বের করে– যে শ্‌কলোভস্কি রুশ ইতিহাসের এমন এক সময়ে সামাজিক পরিবেশবিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ স্বাধীন শিল্পতত্ত্ব নিয়ে হাজির হয়েছেন, যখন নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণী, উপশ্রেণী ও গ্রুপের কাছে শিল্পকলা তার আধ্যাত্মিক পারিপার্শ্বিকতা ও বস্তুনির্ভরতা এত সহজ খোলামেলাভাবে অনাবৃত করে দিয়েছে।

যুক্তিবিদ্যা, আইন বিজ্ঞান বা শিল্পকলা এদের কোনটিতেই একটি উপাদান হিসেবে আঙ্গিকের গুরুত্বকে বস্তুবাদ অস্বীকার করে না। যেমন করে আইন বিজ্ঞানকে তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ যুক্তি ও সঙ্গতি দ্বারা বিচার করা যায় এবং করতে হবে, সেভাবে শিল্পকলাকে আঙ্গিকের বেলায় তার সফলতার দিক থেকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে এবং অবশ্যই করতে হবে– কারণ আঙ্গিক ব্যতীত কোন শিল্প হতে পারে না। যাই হোক, আইন বিষয়ক কোন তত্ত্ব যদি আইনকে তার সামাজিক পরিস্থিতি থেকে স্বধীনরূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে, তাহলে বিসমিল্লায় গলদ থেকে যাবে। এর গতিশীলতার শক্তি নিহিত আছে অর্থনীতিতে অর্থাৎ শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্যে। আইন-কানুন বিভিন্ন ঘটনার বিচ্ছিন্ন বৈচিত্র্যকে নয়, বরং সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে তথা বার-বার ঘুরে-ফিরে আসা স্থায়ী উপাদানকে রূপগতভাবে ও অভ্যন্তরীণভাবে সুষম প্রকাশ দান করে। বর্তমানে, ইতিহাসের এক দুর্লভ মুহূর্তে, পরিষ্কারভাবে দেখেছি কিভাবে নতুন আইন সৃষ্টি করা হচ্ছে। এটা করা হচ্ছে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত দ্বারা নয়, বরং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ও নতুন শাসক শ্রেণীর আর্থিক চাহিদার সঙ্গে সমন্বিত করে।

সাহিত্যের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার শেকড় রয়েছে অতিদূর অতীতে এবং সেটা বাচনিক প্রকরণের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে প্রতিনিধিত্ব করে; সাহিত্যে প্রকাশিত হয় নতুন কালের ও নতুন শ্রেণীর চিন্তা, অনুভূতি, সমাজ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আকাঙ্ক্ষা। এর বাইরে কেউ লাফ দিয়ে যেতে পারে না। এবং সে ধরনের লাফ দেবার দরকার নেই, অন্ততপক্ষে তাদের জন্যে, যারা ইতিমধ্যে বিগত কোন যুগের কিংবা অতিরিক্ত সময় টিকে থাকা কোন শ্রেণীর সেবা করছে না।

আঙ্গিকবাদী বিশ্লেষণী পদ্ধতির প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেটা অপ্রতুল। লোকপ্রিয় প্রবাদের অনুপ্রাস আপনি গণনা করতে পারেন, উপমা-উৎপ্রেক্ষার শ্রেণীবিন্যাস করতে পারেন, হিসেব করতে পারেন, একটি বিবাহগীতির স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা। একভাবে না হয় অন্যভাবে, এর দ্বারা লোকশিল্প সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হবে; কিন্তু আপনি যদি না জানেন চাষীদের ধান্যরোপণ পদ্ধতি এবং তার ওপর নির্ভরশীল

www.pathagar.com

জীবনকে, যদি আপনার কোন ধারণা না থাকে সে জীবনে কান্তের ভূমিকা সম্পর্কে, কৃষকের কাছে গীর্জাপঞ্জিকার তাৎপর্য, তথা কখন চাষী বিয়ে করে বা চাষীবউ বাচ্চা প্রসব করে, সেটা যদি আপনি না-শিখে থাকেন, তবে আপনি শুধু দেখলেন লোকশিল্পের বাইরের খোলসটিকে, তার ভেতরের শাঁস আপনার নাগালের বাইরে রয়ে গেল।

কোলন ক্যাথেড্রালের স্থাপত্যকৌশল দেখানো যায় খিলানের ভিত্তি ও উচ্চতা, উপাসকদের বসার বৃহৎ স্থানের ত্রিমাত্রিকতা, স্তম্ভগুলোর বিস্তৃতি ও অবস্থান নিরূপণ করে। কিন্তু মধ্যযুগীয় শহর কেমন ছিল, গিল্ড বলত কাকে এবং মধ্যযুগের ক্যাথলিক গীর্জা মানে কি, সে-সব না জেনে কোলন ক্যাথেড্রালকে কখনো সম্পূর্ণভাবে বোঝা যাবে না। শিল্পকলাকে জীবনবিচ্ছিন্ন করে দেখা ও স্বয়ংসম্পর্ণ প্রকৌশলীর কাজ বলে ঘোষণা করা সেটাকে প্রাণহরণ করে হত্যা করার শামিল। এ ধরনের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা বুদ্ধিবৃত্তিক অবক্ষয়ের অভ্রান্ত লক্ষণ।

ডারইনবাদ– বিরোধী ধর্মীয় বিতর্কের সঙ্গে পূর্বে যে-সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে, সেটা পাঠকের কাছে বাহ্যিক ও উপাখ্যানিক মনে হবে, কিয়ৎপরিমাণে এটা সত্য হতে পারে; কিন্তু এদের মধ্যে একটি গভীরতর যোগাযোগ আছে। যার সামান্য কিছু লেখাপড়া আছে তেমন একজন মার্কসবাদীর মনে আঙ্গিকবাদী তত্ত্ব অনিবার্যভাবে একটি সুপ্রাচীন পরিচিত দার্শনিক গীতের দু-একটি রাগিণীকে স্মরণে এনে দেবে। ব্যবহারশাস্ত্রবিদ ও নীতিবিদরা (এলোপাতাড়িভাবে মনে পড়ছে জার্মান স্টৈমলার ও আমাদের নিজের আত্মবাদী মিখায়েলোভস্কির নাম) প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে, নৈতিকতা ও আইনকে অর্থনীতি দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না, কারণ বিচার বিভাগ ও নীতিআদর্শের বাইরে অর্থনৈতিক জীবন অচিন্তনীয়। সত্যি বটে, আইন ও নীতি বিষয়ক আঙ্গিকবাদীরা অর্থনীতি থেকে আইন ও নীতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলার মতো অবস্থায় যাননি। তারা কিয়ৎপরিমাণ জটিল ও পরস্পরসম্পর্কিত উপাদানের (Factor) অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। পরস্পরকে প্রভাবিত করার পর এই উপাদাননিচয়ের স্বাধীন অস্তিত্বের মতো গুণরাজি টিকে থাকে। এটা কি ভাবে সম্ভব সেটা অবশ্য কেউ বলতে পারে না। সামাজিক অবস্থার প্রভাব থেকে নান্দনিক উপাদানগুলোর সম্পূর্ণ স্বাধীনসত্তার যে ঘোষণা শ্কলোভস্কি করেছেন, সেটা বিশেষ অত্যুক্তির নিদর্শন। এর মূল অবশ্য নিহিত সামাজিক অবস্থার মধ্যে। নিজেকে বড় মনে করার রোগটি এখানে নন্দনতত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে এবং আমাদের রূঢ় বাস্তবতাকে নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে। এই অদ্ভুততা ছাড়াও আঙ্গিকবাদের গঠন প্রণালীতে, সকল প্রকার ভাবাদর্শের মধ্যে সাধারণ ক্রটিপূর্ণ পদ্ধতিগত ব্যাপারটি রয়েছে।

একজন বস্তুবাদীর কাছে ধর্ম, আইন, নীতি এবং শিল্পকলা একটি ও একই

www.pathagar.com

সমাজবিকাশ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও সেগুলো শিল্পায়িত ভিত্তি থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে, জটিল হয়, নিজস্ব বিশিষ্টতাকে বিস্তারের মাধ্যমে শক্তিশালী ও বিকশিত করে, তবু রাজনীতি, ধর্ম, আইন নীতিশাস্ত্র এবং নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি সামাজিক মানুষের তৎপরতা হিসেবে থেকে যায় এবং সামাজিক সংগঠনের নিয়মাবলী মান্য করে। অন্যপক্ষে ভাববাদীরা ইতিহাসের বিকাশে কোন একীভূত প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে না– যে বিকাশ নিজের মধ্য থেকে যথাযোগ্য সংগঠন ও কার্যাবলী রচনা করে নেয়– বরং কতিপয় স্বাধীন নীতিমালার সংমিশ্রণ বা সংযোজন এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে দেখে; এর মধ্যে রয়েছে ধর্ম, রাজনীতি, বিচারকার্য, নন্দনতত্ত্ব ও নীতিকথার বিষয়াবলী, যেগুলো তাদের উদ্ভব ও ব্যাখ্যার কারণ নিজেদের মধ্যে খুঁজে পায়।

হেগেল তাঁর (দ্বান্দ্বিক) ভাববাদে উল্লেখিত বিষয়াবলীকে (substances) (যেগুলো শাশ্বত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত) একই মূলোদ্ভূত বলে ধরে নিয়ে কয়েকটি পর্যায় ক্রমে বিন্যাস করেছেন। হেগেলের কাছে মূল এককের নাম পরমসত্তা এবং দ্বান্দ্বিক প্রকাশের প্রক্রিয়ায় সেটা নিজেকে কয়েকটি Factor-এ বিভক্ত করে– এতদসত্ত্বেও, ভাববাদের জন্যে নয়, বরং দ্বান্দ্বিক চরিত্রের জন্যে হেগেলীয় পদ্ধতির ঐতিহাসিক বাস্তবতার এমন ধারণা হাজির করে যা দস্তানায় অনুপ্রবিষ্ট হাতের রূপ নিয়ে দেখা দেয়।

কিন্তু আঙ্গিকবাদীরা (এবং তাদের সবচেয়ে বড় প্রতিভা হলেন কান্ট) বিকাশের গতিশীলতার দিকে চোখ না-রেখে ঠিক যে দিনটিতে এবং যে ঘণ্টায় দার্শনিক ওহীলাভ করেছেন সে-সময় দৃষ্ট আকস্মিক অংশবিশেষের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত টানেন। রেখাগুলোর ক্রস করার বিন্দুটিতে তারা বস্তুর জটিলতা ও বহুমাত্রিকতা প্রকাশ করে। (তারা সৃষ্টি প্রবাহের কথা বলে না কারণ তাতে তারা বিশ্বাস করে না।) ঐ জটিলতাকে তারা বিশ্লেষণ ও বিন্যাস করে। তারা উপাদানগুলোর নাম দেয়। সেগুলো তৎক্ষণাৎ পিতৃমাতৃহীনভাবে বস্তুনির্যাসে ও ক্ষুদ্রাকার পরমসত্তায় রূপান্তরিত হয়; এভাবে ব্যঙ্গ, ধর্ম, রাজনীতি, নীতি, আইন, শিল্পকলার সৃষ্টি হয়। এখানে আমরা ভেতর থেকে বাইরের দিকে প্রকাশিত একটি ইতিহাস-গ্লোবের সাক্ষাৎ পাই না, বরং বিভিন্ন আঙ্গুল থেকে ছিঁড়ে আনা এবং চূড়ান্ত বিমূর্ত অবস্থায় শুকিয়ে নেওয়া কিছু চামড়াকে দেখি। ইতিহাসের এই হাত দেখা দেয় বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনি ও মধ্যমা এবং বাকি সব factor-এর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফসলরূপে। এর মধ্যে নন্দনতত্ত্বের factorটি হচ্ছে কনিষ্ঠাঙ্গুলটি, সবচেয়ে ছোট বটে কিন্তু সবচেয়ে কম ভালবাসার পাত্র নয়।

জগতপ্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ সম্পর্ককে না-বুঝে তার বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে অন্ধচিন্তায় উপস্থাপিত করার (চেতনার) বিশেষ রূপান্তরটি জীববিজ্ঞান শাস্ত্রে প্রাণবাদ নামে অভিহিত। এক সমাজ-অতিক্রমী পরম নৈতিকতার বা নন্দন তত্ত্বের, অথবা এক পরাবাস্তব পরম

www.pathagar.com

'প্রাণশক্তির' অভাবমোচনচিন্তাই সৃষ্টিকর্তা। স্বাধীন factorসমূহের বহুত্ব, যেগুলো আবার আদি-অন্তবিহীন, প্রকৃতপক্ষে ছদ্মাবরণে বহুপ্রাণবাদ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কান্টের ভাববাদ ঐতিহাসিকভাবে যেমন খ্রিস্টানধর্মের যুক্তিনির্ভর দর্শনে রূপান্তরকে বোঝায়, তেমনিভাবে ভাববাদের সর্বপ্রকার আঙ্গিকায়ন সমস্ত কারণের মূলকারণরূপী প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন ভগবানের ধারণায় পৌঁছে দেয়। ভাববাদী দর্শনের এক ডজন উপপরমসত্তার সমবায়িক রাজত্বের তুলনায় একজন একক ব্যক্তিসদৃশ সৃষ্টিকর্তার ধারণা ইতিমধ্যে সুশৃঙ্খল বিশ্বের উপাদানে পর্যবসিত। আঙ্গিকবাদীদের মার্কসবাদের প্রত্যাখ্যান এবং ধর্মীয় চিন্তাবিদদের ডারউইনবাদের প্রত্যাখ্যান— এ দুয়ের মধ্যেকার গভীরতর ঐক্য নিহিত আছে ঐ ব্যাখ্যার ভেতরে।

শিল্পকলায় ভাববাদের নিষ্ফল প্রয়োগের প্রতিনিধি আঙ্গিকবাদী গোষ্ঠী। তারা দ্রুত পক্কায়মান ধর্মকেন্দ্রিকতার পরিচয় বহন করে। তারা সাধু জন-এর অনুগামী। তারা বিশ্বাস করে যে, 'সৃষ্টির আদিতে ছিল শব্দ'। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি সৃষ্টিমূলে ছিল কর্ম। তার পেছনে শব্দ এসেছে ধ্বনিবিষয়ক ছায়ার মতো।

www.pathagar.com

মার্কসবাদী সাহিত্য সমালেচনা : কতিপয় প্রস্তাব

[লুনাচারস্কি (১৮৭৫-১৯৩৩) রুশ রাজনীতিবিদ ও জননেতা। বাগ্মী পণ্ডিত ও সমালোচক হিসেবে তিনি প্রচুর খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ও লেনিনের বিশিষ্ট বন্ধু। শিল্পের বিভিন্ন দিক– সাহিত্য, সংগীত, চিত্র, ভাস্কর্য সম্পর্কে তিনি প্রায় পনেরশ' প্রবন্ধের রচয়িতা। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার গণমুখী সাহিত্যচিন্তায় ও বিপ্লব-পরবর্তী নৈরাজ্যের মধ্যে সুস্থ চিন্তার প্রবর্তনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তাঁর আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণ করেন।। ১৯২৮ সালে রচিত বর্তমান প্রবন্ধটিতে মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনাকে সুস্থ ও সুনির্দিষ্ট ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার অকপট প্রয়াস আছে।]

১

আমাদের সাহিত্য তার বিকাশধারার অন্যতম ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করছে। দেশে রচিত হচ্ছে এক নতুন জীবন এবং সাহিত্য ক্রমশ অধিক হারে প্রতিফলিত করছে এর অদ্যাবধি অস্থির ও অনির্দিষ্ট রূপকে; স্পষ্টত, এটা উন্নীত হতে পারে আরো উচ্চমার্গের সমস্যায়– রাজনৈতিক এবং বিশেষ করে পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক প্রভাবে।

যদিও আমাদের দেশ অন্য যে কোন দেশের তুলনায় ব্যক্তিগত শ্রেণীদ্বন্দ্বকে অনেক কম প্রতিনিধিত্ব করে, তবু এটাকে এখনও সম্পূর্ণভাবে শ্রেণীহীন ভাবা অসমম্ভব। কৃষক ও প্রলেতারীয় সাহিত্যের প্রবণতার তারতম্যের অনিবার্যতা সম্পর্কে আলোচনা না-করেও, প্রাক্তন মনোভাব বজায় রেখেছে এমন লোক দেশে যে রয়েছে, সেটা স্পষ্ট করে বলা যায় : ঐ লোকেরা হয় সর্বহারা একনায়কত্বের ধারণার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয়নি, অথবা সর্বহারা কর্তৃক সমাজতন্ত্র নির্মাণের মতো সর্বাপেক্ষা মৌলিক ধারণার সঙ্গে পর্যন্ত নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

নতুন ও পুরাতনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব অব্যাহত রয়েছে। ইউরোপের, অতীতের, পুরানো শাসকশ্রেণীর অবশেষের, নতুন অর্থনৈতিক কর্মচারীর আওতায় কিয়ৎপরিমাণে বিকাশমান নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর– এই সবগুলোর প্রভাব উপলব্ধি করা যাচ্ছে। বিভিন্ন গ্রুপ ও ব্যক্তির ভাবসাবেই যে সেটা বোঝা যাচ্ছে এমন নয়, সর্বপ্রকার মিশ্রণেও সেটা লক্ষণীয়। মনে রাখতে হবে যে, বুর্জোয়া চিন্তার প্রত্যক্ষ ও ইচ্ছাকৃত বৈরী প্রভাবের বাইরেও একটি উপাদান রয়েছে যেটা অধিকতর বিপজ্জনক ও যাকে পরাস্ত করা দুঃসাধ্য– সেটা হলো দৈনন্দিন জীবনে পাতি-বুর্জোয়া স্বভাব। এটা সর্বহারাদের, এমনকি অনেক কমিউনিস্টেরও

www.pathagar.com

প্রতিদিনের চিন্তা-ভাবনার বেশ গভীরে স্থান করে নিয়েছে। এতেই ব্যাখ্যা করা যায় কেন সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার ছাপ-বিশিষ্ট নতুন জীবনপদ্ধতি কায়েমের জন্য, শ্রেণীদ্বন্দ্বের আকারে প্রকাশিত সংগ্রাম, শুধু যে কমছে না তা নয়, বরং পূর্বশক্তি অক্ষুণ্ন রেখে নিত্যনতুন সূক্ষ্মতর ও গভীরতর রূপ পরিগ্রহ করছে। অবশ্য প্রলেতারীয় ও সহগামী সাহিত্যের পাশাপাশি বৈরী উপাদানগুলোকে যে শুধু বোঝাচ্ছি এমন নয়, অজ্ঞাতসারে যে-সব ক্ষতিকর ধারণা– ঔদাসীন্য, নৈরাশ্য, ব্যক্তিসর্বস্বতাবোধ, কুসংস্কার, বিকৃতি— প্রসার লাভ করে সেগুলোকেও।

২

এই পরিস্থিতিতে সাহিত্যকে যে-তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়, তার লালনে মার্কসবাদী সমালোচনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। সাহিত্যের সাথে তাকেও, নতুন মানুষ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় তীব্রতা ও শক্তি নিয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৩

মার্কসবাদী সমালোচনাশাস্ত্র অন্য সকল প্রকার সাহিত্যকর্ম থেকে প্রথমত এই কারণে পৃথক যে, এর প্রকৃতি সমাজতাত্ত্বিক না-হয়ে উপায় নেই– যার ভিত্তি অবশ্যই মার্কস ও লেনিনের বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ব।

সাহিত্যসমালোচক ও সাহিত্যঐতিহাসিকের কর্মপ্রণালীর মধ্যে কখনো কখনো পার্থক্য টানা হয়; পার্থক্য অবশ্য ততটা অতীত-বর্তমানের বিশ্লেষণের ওপর নয় : ইতিহাসবিদ সাহিত্যকর্মের উৎসের বস্তুভিত্তিক ব্যাখ্যা দেন, সমাজকাঠামোতে এর অবস্থান দেখান, সমাজজীবনে সাহিত্যের প্রভাব ব্যাখ্যা করেন, আর, সমালোচকের মূল্যায়নের ভিত্তি সম্পূর্ণতই আঙ্গিক, সামাজিক উপযোগিতা বা রুচির দিক।

৪

একজন মার্কসবাদী সমালোচক কিভাবে এই সমজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্পাদন করেন? মার্কসবাদ সমাজজীবনকে সাংগঠনিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিবেচনা করে– যেখনে বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলো পরস্পরনির্ভরশীল; এবং সেখানে নির্ধারক ভূমিকা পালিত হয় সর্বাধিক স্বাভাবিক ও বস্তুগত অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সর্বোপরি শ্রমের প্রকৃতি দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন যুগের সাধারণ পর্যালোচনা করতে বসে মার্কসবাদী সমালোচককে অবশ্যই ঐ-যুগের সমগ্র সমাজবিকাশের পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য নির্মাণে সচেষ্ট হতে হবে। যখন বিচ্ছিন্ন লেখক বা রচনা আলোচনার বিষয়, তখন মূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার তাদৃশ প্রয়োজন নেই, কেননা প্লেখানভের নিয়ম বলে অভিহিত নিত্যসত্যটি সে ক্ষেত্রে বিশেষ

www.pathagar.com

করে সত্য হয়ে ওঠে। ঐ নিয়মে বলা হচ্ছে যে, সমাজের কাঠামোর সঙ্গে একটি শিল্পকর্ম অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মাত্রায় যুক্ত। সেটা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে সমাজের শ্রেণীকাঠামো এবং শ্রেণীস্বার্থের ফলে সৃষ্ট শ্রেণীমনস্তত্ত্বের মতো মধ্যবর্তী সংযোগের মাধ্যমে। একটি শিল্পকর্ম, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, সর্বদা লেখকের শ্রেণী মনস্তত্ত্বকে প্রতিফলিত করে। হয় এটা, অথবা যেমনটি প্রায়ই ঘটে, এতে প্রতিবিম্বিত হয় মিশ্র উপাদান, যার মাধ্যমে লেখকের ওপর বিভিন্ন শ্রেণীর প্রভাব প্রকাশিত হয় এবং সেটাকে অবশ্যই ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

৫

একটি বিস্তৃত সামাজিক প্রকৃতির বড় গ্রুপের বা শ্রেণীর মনস্তত্ত্বের সঙ্গে প্রতিটি সাহিত্যকর্মের বন্ধন প্রধানত প্রকাশিত হয় এর বিষয়বস্তুর দ্বারা। শব্দ-শিল্প বা চিন্তার সর্বাধিক সন্নিহিত শিল্প— যেভাবেই সাহিত্যকে দেখা যাক না কেন, আঙ্গিকের তুলনায় বিষয়ের অধিক প্রাধান্যের জন্য, অন্য সকল প্রকার শিল্পের সঙ্গে তার পার্থক্য সূচিত হয়। সাহিত্যে এটা বেশি করে দেখা যায় যে, শৈল্পিক বিষয়ই– চিত্রকল্পবিধৃত বা চিত্রকল্পের সাথে যুক্ত চিন্তা ও আবেগপ্রবাহ– সামগ্রিকভাবে ঐ রচনার শিল্পনির্ধারকের ভূমিকা গ্রহণ করে। বিষযবস্তু উন্মুখ হয়ে থাকে নির্দিষ্ট আঙ্গিকে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য। এটা বলা যায় যে, বিষয় উপযোগী সর্বোচ্চ একটি আঙ্গিক সম্ভব। কম আর বেশি, একজন লেখক তাঁর চিন্তা ও অনুভূতির উপযোগী প্রকাশভঙ্গী খুঁজে নিতে পারেন– যে ভঙ্গিতে সর্বাধিক সাবলীলতায় সেগুলো প্রকাশিত হয় এবং যেটা তাঁর কাঙ্ক্ষিত পাঠকমনে সবচেয়ে শক্তিশালী চাপ মুদ্রিত করে দিতে সক্ষম।

সুতরাং একজন মার্কসবাদী সমালোচক তাঁর ব্যাখ্যার লক্ষ্য হিসেবে প্রথমে বেছে নেন রচনায় তথা লেখায় বিধৃত সমাজ-নির্যাসকে। তিনি এই বা ওই সমাজগ্রুপের সঙ্গে এর সংশ্লেষ এবং সমাজজীবনে ঐ কর্মের প্রকাশক্ষমতার প্রভাব নির্ধারণ করেন, তার পরেই তিনি আঙ্গিকের দিকে নজর দেন এবং সর্বোপরি, কিভাবে ঐ আঙ্গিক শিল্পের মূলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে সর্বাধিক প্রকাশকুশলতা ও প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যকে হাসিল করে সেটা প্রদর্শন করেন।

৬

আঙ্গিক বিশ্লেষণ করার বিশেষ দায়িত্বটি বিস্মৃত হওয়া অবশ্য অসম্ভব ব্যাপার এবং মার্কসীয় সমালোচকের কখনো এর থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকা ঠিক হবে না। একটি বিশেষ সাহিত্যকর্মের আঙ্গিক শুধু যে এর আধেয় দ্বারা নির্ধারিত হয় এমন নয়, অন্যান্য অনেক কিছু এতে প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ শ্রেণীর মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাপ্রবাহ ও আলাপ-

www.pathagar.com

সালাপ, জীবনযাপনের 'স্টাইল', সমাজের বস্তুবাদী সংস্কৃতির মানের স্তর, প্রতিবেশীর প্রভাব, অতীতের জড়তা বা নবায়নের প্রয়াস– জীবনের সবদিকে প্রকাশযোগ্য আধেয় সমূহ আঙ্গিককে প্রভাবিত করে, অথবা এর নির্ধারণে অনুসঙ্গীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। প্রায়ই কোন একটি রচনার সঙ্গে নয়, বরং একটি সমগ্র 'স্কুল' বা সমগ্র যুগের সঙ্গে আঙ্গিকের সম্পর্ক থাকে। বিষয়ের জন্য ক্ষতিকর বা প্রতিবন্ধক শক্তিরূপেও এর বিকাশ সম্ভব। কখনো-কখনো বিষয়সংলগ্নতা হারিয়ে একটি বিচ্ছিন্ন ছলনাময় প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়েও সেটা প্রকাশিত হয়। সেটা ঘটে তখনই যখন সাহিত্যকর্ম আধেয়বিহীন হয়ে শ্রেণীপ্রবণতার প্রকাশ হয়, বাস্তবজীবনকে ভয় করে এবং শব্দাড়ম্বর ও উচ্চমার্গীয় বুলি কপচানোর আড়ালে লুকিয়ে জীবন থেকে পালাতে চায় অথবা, অন্যপক্ষে স্ফূর্তিবাজ ও চপল প্রকৃতি ধারণ করে। এই সমস্ত দিক মার্কসীয় সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রতিটি অত্যুৎকৃষ্ট রচনায় (Master piece) আঙ্গিক সর্বতোভাবে আধেয় দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং প্রতিটি সাহিত্যসৃষ্টি অতুৎকৃষ্ট হওয়ার প্রত্যাশী– পাঠকেরা বুঝতে পারবেন যে, এই প্রত্যক্ষসূত্রজাত যে আঙ্গিক, তার উপাদানসমূহ কোনক্রমেই সমাজজীবনবিচ্ছিন্ন নয়। সেগুলোকে পরবর্তী পর্যায়ে সমাজপটভূমি থেকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

৭

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মার্কসীয় সমালোচনার পরিধি সীমাবদ্ধ রেখেছি বিদ্যাবত্তাভিত্তিক কাজের মধ্যে। মার্কসীয় সমালোচক এখানে বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ববিদ হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছেন, যিনি মার্কসীয় বিশ্লেষণকে নির্দিষ্ট করে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাহিত্যে প্রয়োগ করছেন। মার্কসীয় সমালোচনাশাস্ত্রের প্রবর্তক প্লেখনভ জোর দিয়ে বলেছেন যে, এটাই প্রকৃত দায়িত্ব যা একজন মার্কসবাদীকে পালন করতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একজন মার্কসবাদী একজন আলোকদাতা থেকে এ কারণে পৃথক যে, শেষোক্তজন সাহিত্যের বিশেষ লক্ষ্য ও দায়িত্ব নির্দেশ করেন, তিনি যেখানে নির্দিষ্ট আলোকে সাহিত্যকে বিচার করেন, সেখানে মার্কসবাদী ব্যাখ্যা করেন কোন একটি সৃষ্টিকর্মের উদ্ভবের স্বাভাবিক কারণগুলো।

বস্তুবাদী ও বিজ্ঞানভিত্তিক মার্কসীয় সমালোচনা পদ্ধতির প্রেক্ষাপটে পুরানো আত্মকেন্দ্রিক নন্দনতত্ত্ব ও পেটুকের লোভাতুর দৃষ্টির বিরোধিতা করে প্লেখানভ ভবিষ্যতের মার্কসীয় সমালোচনার অনুসরণযোগ্য প্রকৃত পথের পত্তন করেছেন এবং প্রভূত উপকার করেছেন মার্কসবাদের।

www.pathagar.com

এটা অবশ্য কোনক্রমেই চিন্তা করা যাবে না যে শুধু বাহ্যিক উপাত্ত নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ করা প্রলেতারিয়েতদের বৈশিষ্ট্য। মার্কসবাদ শুধু একটি সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব নয়, বরং (সমাজ) সৃষ্টির এক সক্রিয় কর্মপদ্ধতি। তথ্যের বস্তুনির্ভর মূলায়ন ব্যতীত এ ধরনের সৃষ্টি অচিন্তনীয়। চারপাশের ঘটনানিচয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে একজন মার্কসবাদী যদি বস্তুনিষ্ঠভাবে অনুধাবন করতে না- পারেন তবে মার্কসবাদী হিসেবে তার মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু প্রকৃত, সর্বতোমুখী মার্কসবাদীর কাছে আমরা আরো বেশি আশা করি– আমরা আশা করি তিনি তার চারপাশের ওপর নির্দিষ্ট ছাপ রেখে যাবেন।

একজন মার্কসবাদী সমালোচক সাহিত্যিক জ্যোতির্বিদ নন, যিনি বৃহৎ থেকে অতি ক্ষুদ্র সাহিত্যকর্মগুলোর গতির অনিবার্য সূত্রসমূহ ব্যাখ্যা করবেন। তিনি তাঁর চেয়েও বড় : তিনি একজন যোদ্ধা ও স্রষ্টা। এই অর্থে মূল্যায়নের উপকরণগুলোকে সাম্প্রতিক মার্কসীয় সমালোচনার সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মহত্তম বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম বলে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

৮

একটি সাহিত্যকর্ম মূল্যায়ন করার মানদণ্ড কী হওয়া উচিত? এটা দেখা উচিত প্রথমে আধেয়র দিক থেকে। সাধারণভাবে এ ক্ষেত্রে সব কিছু স্পষ্ট। এখানে মূল মানদণ্ড প্রলেতারীয় নীতিতত্ত্বের মতই। প্রলেতারিয়েতের বিকাশে ও বিজয়ে যা সহায়ক তা-ই ভাল– যা ক্ষতিকারক তা-ই খারাপ।

মার্কসবাদী সমালোচককে অবশ্যই সাহিত্যকর্মের মধ্যে বিধৃত মূল সমাজ বোধের চারিত্র্য অনুসন্ধান করতে হবে; তাঁকে অবশ্যই বের করতে হবে এর লক্ষ্যের দিকে, ঐ প্রক্রিয়া কি নিয়মশৃঙ্খলা বিরহিত না অন্য কিছু? এবং মূল সামাজিক ও গতিশীল ভিত্তির ওপর তাঁর মূল্যায়নকে দাঁড় করাতে হবে।

এমনকি, কোন রচনার সমাজ-বিষয় মূল্যায়নের বেলায়ও সব কিছু অত সহজ নয়। মার্কসবাদী সমালোচককে অবশ্যই অত্যন্ত দক্ষ ও চরম অনুভূতিপ্রবণ হতে হবে। এর দ্বারা শুধু মার্কসবাদে প্রশিক্ষণ নয়, বরং বিশেষ প্রতিভাকেও বোঝানো হচ্ছে– যার অভাবে কোন সমালোচনাই হতে পারে না। একটি প্রকৃত মহৎ শিল্পকর্মের অনেক দিক বিচার্য আছে এবং সে ক্ষেত্রে কোন প্রকার থার্মোমিটার বা মাপকাঠি প্রয়োগ খুব বেশি অসুবিধাজনক। এখানে দরকার সমাজ-সচেতনতা, অন্যথায় ভুলভ্রান্তি অনিবার্য। মার্কসবাদী সমালোচকের শুধু সে রচনাগুলোকে শিরোপা দেওয়া উচিত নয়, যেগুলো সাময়িক বিষয়ে নিবেদিত। টগবগে প্রশ্নগুলোর গুরুত্ব অস্বীকার না-করেও বলা যায় যে, প্রথম দর্শনে যেসব বিষয় অত্যন্ত সাধারণ ও দূরবর্তী মনে হয়, ঘনিষ্ঠদর্শনে সমাজজীবনে এদের প্রভাব ধরা পড়ে এবং সে জন্য, এদের গভীরতর তাৎপর্য পুরোপুরি অস্বীকার করা অসম্ভব।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের মতো এখানেও ঠিক একই ব্যাপার। বিজ্ঞান নিজেকে পুরোপুরি ব্যবহারিক কাজে নিয়োজিত করছে ভাবা মস্ত বড় ভুল। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, সর্বাপেক্ষা নৈর্ব্যক্তিক সমস্যাও সমাধান করলে অনেক সময় সর্বাপেক্ষা বেশি ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে।

এবং তবু, যখন কোন লোক বা কবি সাধারণ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে যান– যদি তিনি প্রলেতারিয়েত হন এবং সংস্কৃতির মূল প্রশ্নকে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিতে পুনর্মূল্যায়নে প্রয়াসী হন, তখন সেটার সমালোচনায় একজন সমালোচক সহজেই বিভ্রান্ত হতে পারেন। প্রথমত, এসব ক্ষেত্রে, এখনো আমাদের কোন যথার্থ মাপকাঠি নেই; দ্বিতীয়ত, অনুমান এ ক্ষেত্রে মূল্যবান হতে পারে– সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক অনুমান যদি হয়– যেহেতু সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানে নয়, বরং সেটার তুলে ধরায় ও বিশ্লেষণে আমরা উৎসাহী। কিয়ৎপরিমাণে অবশ্য, এসব কথা পুরোপুরি সাময়িক বিষয়ভিত্তিক সাহিত্য সম্পর্কে প্রযোজ্য। একজন শিল্পী যদি তাঁর লেখায় আমাদের কর্মসূচির (সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি) ধারণাকে, যেগুলো ইতিপূর্বে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়ে গেছে, তুলে ধরেন তবে তিনি একজন নিচুমানের শিল্পী বিবেচিত হবেন। কিন্তু ঐ শিল্পীই মহৎ যিনি অনাবাদী জমি কর্ষণ করেন, যুক্তি ও পরিসংখ্যান যখন পরাস্ত হয় তখন অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্ষমতায় নতুন দিগন্তে উপনীত হন। একজন শিল্পী সঠিক কিনা, তা বিচার করা সহজ কাজ নয়; এখানেও, সম্ভবত, সমালোচক ও পাঠকের মতদ্বৈধের মধ্য থেকে যথার্থ সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। এই সবগুলোই, সমালোচকের কাজকে কম গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় করে তোলেনি।

কোন শিল্পকর্মের সমাজ বিষয়ের মূল্যায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে দ্বিতীয়বারের বিচারটি– যদি প্রথম বিচারে বইটি বিজাতীয় ভাবাপন্ন কিংবা কখনো আমাদের আদর্শবিরোধী বলে দেখা দিয়ে থাকে। শত্রুর মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া, আমাদের থেকে আলাদা অবস্থানের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণকে কাজে লাগানো সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়শ সেগুলো আমাদেরকে ভাবগভীর সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, এবং অন্ততপক্ষে, জীবন-প্রপঞ্চের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারে। মার্কসবাদী সমালোচক, যিনি বলেছেন যে, এই রচনা বা রচয়িতা একেবারে পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীর, তিন হাত নেড়ে ঐ লেখককে একেবারে খারিজ করে দেবেন না। সেটা থেকেও প্রভূত পরিমাণে উপকার নিষ্কাশন করা যেতে পারে। এজন্য, কোন রচনার উৎস এবং পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং আমাদের গঠনমূলক কাজে এর সম্ভাব্য উপযোগিতার দিক থেকে এর দ্বিতীয়বার মূল্যায়ন করা একজন মার্কসবাদী সমালোচকের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব।

এর একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যার আবশ্যকতা আছে। সাহিত্যক্ষেত্রে বিজাতি ও বৈরী মনোভাবের উপাদান, ওপরের অর্থে, যদিও কখনো-কখনো উপকারে আসে, তবু সেগুলো

www.pathagar.com

অবশ্য চরম ক্ষতিকারক এবং বিষাক্ত প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব এবং প্রতিবিপ্লবী প্রচারণার বিপজ্জনক প্রকাশ হয়ে উঠতে পারে। মার্কসবাদী সমালোচনার নয়, বরং মার্কসবাদী সেন্সরশিপের উদ্ভবের কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে ওতেই।

৯

মার্কসবাদী সমালোচকের কাজ সম্ভবত আরো বেশি জটিল হয়ে ওঠে, যখন তিনি আধেয় ছেড়ে আঙ্গিকের মূল্যায়নে মনোনিবেশ করেন।

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং প্লেখানভ এর ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাহলে, এ ক্ষেত্রে মূল্যায়নের সাধারণ মাপকাঠি কি? সর্বাধিক প্রকাশক্ষমতাসহ আঙ্গিককে অবশ্যই আধেয়র সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে এবং যাদের জন্য লিখিত হয়েছে ঐ পাঠকের মনে সম্ভাব্য সর্বাধিক শক্তিশালী ছাপের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

সর্বোপরি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিকগত মাপকাঠি, যেটা প্লেখানভও জোর দিয়ে বলেছিলেন, সেটার কথা এখানে বলা দরকার : অর্থাৎ সাহিত্য হচ্ছে চিত্রশিল্প এবং নগ্নধারণা অথবা প্রচারণার প্রতিটি আক্রমণ ঐ সৃষ্টির জন্য সর্বদা ক্ষতিকর। এটা স্বতঃপ্রকাশিত যে, প্লেখানভের এই মানদণ্ডটি এ সম্পর্কে শেষ কথা নয়। উদাহরণস্বরূপ সল্টিকভ-শসেড্রিন, উসপেনস্কি-ফার্মোনোভ— এদের চমৎকার লেখাগুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে ; যেগুলো স্পষ্টত, এই মানদণ্ডের বিরুদ্ধে যায়; তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, রম্যরচনার সঙ্গে প্রচারমুখী চিন্তার মিশ্রণজাত সঙ্কর সাহিত্যও নিজের গুণেই টিকে থাকতে পারে। তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে এর সম্পর্কে সতর্ক থাকা ভাল, অবশ্য, উৎকৃষ্ট আঙ্গিকের প্রচারধর্মী রচনাও, সাহিত্য শব্দটির বিস্তৃততম অর্থে, প্রচারণা ও সাহিত্যের চমৎকার নিদর্শন, কিন্তু অন্যপক্ষে বিশুদ্ধ প্রচারধর্মী উপাদান বোঝাই শৈল্পিক রম্যরচনা, যুক্তি যতই শাণিত হোক না কেন, পাঠককে নিরুত্তপ্তই রেখে দেবে। এই অর্থে, বিষয়কে শৈল্পিকভাবে উদারস্থ করতে লেখকের অক্ষমতা সম্পর্কে বলার সর্ব অধিকার সমালোচকের রয়েছে– যদি বিষয়টি ঐ রচনায় বাধাবন্ধহীন গতিতে প্রবাহিত উজ্জ্বল গলিত ধাতুর চিত্রকল্পে না-হয়ে বৃহৎ শীতল পিণ্ডের আকারে স্রোত থেকে-খসে-খসে পড়ে।

সমস্ত আঙ্গিকচিন্তার স্বাভাবিক বহির্প্রকাশরূপী দ্বিতীয় বিশেষ মাপকাঠিটি, আগেই বলা হয়েছে, জড়িত আছে আঙ্গিকের মৌলিকতার প্রশ্নে। কিন্তু এই মৌলিকতা কিসের সমন্বয়ে গঠিত? মূলত এই : কোন রচনাকর্মের আঙ্গিকগত কাঠামো এর বিষয় এবং ভাবের হরগৌরী মিলনে একটি অবিভাজ্য এককে পরিণতি লাভ করে। অকৃত্রিম শিল্পকর্মকে অবশ্যই আধেয়র দিক থেকে নতুন হতে হবে। যদি আধেয় নতুন না-হয়, তবে লেখার মূল্য হ্রাস পাবে। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট। একজন শিল্পীকে এমন কিছু বলতে হবে, যা আগে বলা হয়নি। পুনরুৎপাদন শিল্পসৃষ্টি নয় (চিত্রকরেরা এটা সহজে বুঝতে

www.pathagar.com

পারে না), বরং একপ্রকার কৌশল, যদিও কখনো-কখনো বেশ মনোহরী হয়ে ওঠে। এই বিবেচনায় প্রতিটি নতুন সৃষ্টিতে নতুন আধেয় নতুন আঙ্গিক দাবি করে।

এই অকৃত্রিম মৌলিকতাকে আমরা কিসের বিপরীতে স্থাপন করতে পারি? প্রথমত, মনে পড়বে গতানুগতিক আঙ্গিকের কথা, যেগুলো রচনাকর্মে নতুন ভাবধারা অন্তর্ভুক্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পুরাকালে ব্যবহৃত আঙ্গিক একজন লেখককে মুগ্ধ করতে পারে এবং তার বিষয়বস্তু নতুন হলেও, তিনি সেটা পুরানো মদের বোতলে পরিবেশন করতে পারেন। এ ধরনের অপূর্ণতাদৃষ্টিপথে না-পড়ে পারে না। দ্বিতীয়ত, আঙ্গিক এমনিতেই অনুপযুক্ত হতে পারে : অর্থাৎ নতুন, কৌতূহলোদ্দীপক ভাবপ্রকাশের উপযোগী শব্দসম্ভার, বাক্যাংশ, পুরাকাহিনী, অধ্যায়, নভেল, নাটক নির্মাণের মতো ভাষাগত সম্পদ এবং ছন্দ ও কবিতার অন্যান্য উপাদান প্রভৃতির ন্যায় আঙ্গিকগত সম্পদ লেখকের অধিকারে না-ও থাকতে পারে। এর সব কিছু একজন মার্কসবাদী সমালোচক চিহ্নিত করবেন। একজন অকৃত্রিম মার্কসবাদী সমালোচক— এ শ্রেণীর সমালোচকদের আদর্শ উদাহরণ, যদি তিনি হন– অবশ্যই শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, বিশেষ করে তরুণ লেখক অথবা নবিসদের।

সবশেষে, আঙ্গিকের মৌলিকতার সম্পর্কে পূর্বোল্লেখিত বিশেষ নিয়মের বিরুদ্ধে তৃতীয় প্রধান অপরাধ হলো আঙ্গিকের 'সংগঠন'– যেখানে আঙ্গিকগত আবিষ্কার, অলঙ্করণের দ্বারা বিষয়বস্তুর শূন্যতাকে ঢেকে-ঢুকে রাখা হয়। বুর্জোয়া অবক্ষয়ের আদর্শ প্রতিনিধি আঙ্গিকবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত লেখকরা তাদের সৎ ও গুরুতর বিষয়কে বিবিধপ্রকার চাতুর্য দ্বারা সাজাতে ও শোভিত করতে প্রয়াসী বলে দেখা গেছে– তাদের লেখার সর্বনাশ এভাবেই হয়।

একটি রচনাকর্মের সর্বজনীনতা–আঙ্গিকগত এই তৃতীয় মানদণ্ডটিকে বিবেচনা করতে হবে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে। টলস্টয় অত্যন্ত জোরালোভাবে এর কথা বলছেন। আমরা যারা জনগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সাহিত্যসৃষ্টির জন্য অত্যন্ত আগ্রহী, যে-সাহিত্য তাঁদের ও বড় বড় জীবনস্রষ্টাদের সমভাবে আবেগাপ্লুত করবে, তারাও এই সর্বজনীনতায় উৎসাহী। যে-আঙ্গিক মৌনতা ও বিচ্ছিন্নতার ফসল, একটি ক্ষুদ্র নন্দনতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর জন্য নিবেদিত, সে ধরনের সর্বপ্রকার শৈল্পিক রীতি ও চারুতা মার্কসবাদী সমালোচক কর্তৃক পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত। মার্কসবাদী সমালোচনা যে শুধু সক্ষম তা নয়, অতীত ও বর্তমানের এ ধরনের লেখার আন্তরমূল্যও অবশ্য নির্দেশ করতে হবে— একই সঙ্গে, এ ধরনের আঙ্গিকগত পদ্ধতির সহায়তায় নিজেকে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চায় যে শিল্পী, তার মনের গড়নকেও নিন্দা করতে হবে।

কিন্তু পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, সর্বজনীনতার মাপকাঠিটিকে অবশ্য প্রয়োগ করতে

www.pathagar.com

হবে যথেষ্ট সতর্কতা সহকারে। আমাদের প্রেসে ও আমাদের প্রচারবাদী সাহিত্যে, পাঠকদের কাছ থেকে উপযুক্ত বুদ্ধি দাবি করে এমন ধরনের জটিল সাময়িকী ও সংবাদ পত্র থেকে শুরু করে নিতান্ত প্রাথমিক জনপ্রিয় পর্যায়ের জিনিস পর্যন্ত স্থান দিয়েছি; অনুরূপভাবে আমরা আমাদের সব সাহিত্যকর্মকে, অদ্যাবধি অসংস্কৃত কৃষক জনতার, এমনকি শ্রমিকের, সাংস্কৃতিক মানের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারি না। সেটা হবে একটা বড় ধরনের ভুল।

গৌরবোজ্জ্বল ঐ-সাহিত্যশিল্পী যিনি একটি জটিল ও সারগর্ভ সমাজভাবনাকে এমন শক্তিশালী শৈল্পিক সরলতার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারেন যে, লক্ষ লক্ষ পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে সেটা ঘা দেয়। ঐ-সাহিত্যশিল্পীও গৌরবমণ্ডিত যিনি তুলনামূলকভাবে সরল, প্রাথমিক বিষয় নিয়ে ঐ লক্ষ লক্ষ পাঠকের মনোহরণ করতে সক্ষম হন এবং মার্কসবাদী সমালোচকের বিশেষ নজর ও বিজ্ঞ সহায়তার প্রয়োজন এখানেই। কিন্তু, অবশ্য, ঐসব রচনার মূল্য অস্বীকার করা ঠিক হবে না, যেগুলো প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে তাদৃশ্য বোধগম্য নয়— যেগুলো রচিত হয়েছে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর ওপরদিকের স্তর, পার্টির সংস্কৃতিবান সদস্য এবং উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক মান অর্জনকারী পাঠকের কথা স্মরণে রেখে। জীবন অনেক প্রজ্বলন্ত সমস্যা তুলে ধরে জনগণের এই অংশের সম্মুখে– যারা সমাজতন্ত্র বিনির্মাণে প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; এবং সমস্যাসমূহ বৃহৎ জনতার সামনে আসেনি বলে কিংবা সর্বজনীন আঙ্গিকে অদ্যাবধি রূপায়িত হয়নি বলে, সে-গুলোকে শৈল্পিক পরিচয়বিহীন অবস্থায় ফেলে রাখা উচিত নয়। এটা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, আমরা অন্যদিকে অনেক দূর এগিয়েছি, আমাদের লেখকরা মনো যাগ কেন্দ্রীভূত করেছেন সহজতর কাজে– তারা সংস্কৃতিবান পাঠকগোষ্ঠীর জন্য লিখেছেন এমন সময়ে, যখন শ্রমিক ও কৃষকের কল্যাণের জন্য রচিত সাহিত্যকর্মকে, যদি সেটা প্রতিভাদীপ্ত ও সকল সাহিত্য হয়, অবশ্যই বিশেষ করে উঁচু জ্ঞান করতে হবে।

১০

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মার্কসবাদী সমালোচক অনেকাংশে একজন শিক্ষকও বটে। সমালোচনার ফলে যদি কোনরূপ উন্নতি সাধিত না-হয়, তবে সে সমালোচনা অর্থহীন। এবং এই অবশ্যম্ভাবী অগ্রগতি হবে কোন দিকে? প্রথমত, মার্কসবাদী লেখকের প্রতি তার মনোভাবে নিশ্চিতভাবে একজন শিক্ষক হবেন। এ টা খুবই সম্ভব যে, একথা শুনে অনেকে রাগতকণ্ঠে সোচ্চার হবেন; বলা হবে যে, নিজেকে লেখকের চেয়ে বড় মনে করার অধিকার সমালোচককে কেউ দেয়নি, কিংবা এ ধরনের আরো অনেক কথা। যখন প্রশ্নটিকে ঠিকমতো হাজির করা হয়, তখন কিন্তু এ ধরনের আপত্তি পুরোপুরি অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রথমত, যখন বলা হয় মার্কসবাদী সমালোচক লেখকের শিক্ষক হবেন, তখন

www.pathagar.com

এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে, তিনি অবশ্যই হবেন একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মার্কসবাদী, অনিন্দনীয় সাহিত্যবোধের অধিকারী পণ্ডিত। এটা বলা হবে যে, আমাদের মধ্যে সে ধরনের কোন সমালোচক নেই এবং থাকলেও সংখ্যায় খুবই নগণ্য। এ কথাটিতে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা ভুল প্রতিপন্ন হবেন, দ্বিতীয়টিতে তাঁরা সত্যের সন্নিকটে থাকবেন। এ থেকে একটিমাত্র সিদ্ধান্তই টানা সম্ভব : শিক্ষাগ্রহণ করা প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে সদিচ্ছা ও প্রতিভার কোন অভাব ঘটবে না; কিন্তু কষ্ট করে শেখার এখনো অনেক কিছু বাকি আছে। দ্বিতীয়ত, সমালোচক নিজেকে বড় মনে না করে শুধু-যে শিক্ষা দেন, তা অবশ্য নয়, বরং তিনি লেখকের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখেনও। শ্রেষ্ঠ সমালোচক তিনি, যিনি প্রশংসা ও উৎসাহ নিয়ে লেখকের দিকে তাকাতে পারেন, এবং যিনি সর্ব অবস্থায় তাঁর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। মার্কসবাদী সমালোচক দু'ক্ষেত্রে লেখকের শিক্ষক হতে পারেন এবং তাঁকে হতে হবে : প্রথমত, তরুণ সাহিত্যিকদের এবং সাধারণভাবে যে-লেখকরা অনেকবার আঙ্গিকবিষয়ক ভুল করতে পারেন, তাদের লেখার ত্রুটিগুলো নির্দেশ করা। এটা ব্যাপকভাবে ধারণা করা হত যে, আমরা কোন বেলিনস্কি চাই না, কারণ আমাদের লেখকদের আর তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন নেই। বিপ্লবের পূর্বে হয়তো এটা সত্য ছিল, কিন্তু বিপ্লবের পরে এটা নিছক হাস্যকর শোনায়, কারণ এখন জনগণের মধ্য থেকে শতে শতে, হাজারে হাজারে নতুন লেখক বেরিয়ে আসছে। একটি দৃঢ় পথনির্দেশ সমালোচনা, সকল পেশার বেলিনস্কি, সাহিত্যপেশার ভাল জ্ঞান সম্বলিত সচেতন শ্রমিক–এগুলো চূড়ান্তভাবে এখন প্রয়োজনীয়।

মার্কসবাদী সমালোচককে, অন্যদিকে, অবশ্যই সমাজভাবনায় লেখকের শিক্ষক হতে হবে সামাজিক মনোভাবের প্রশ্নে শুধু যে অপ্রলেতারীয় লেখক প্রায়শ শিশুসুলভ আচরণ করেন এবং সমাজজীবনের সূত্র সম্পর্কে আদিম ধারণার জন্য ও যুগের মূলসত্য অনুধাবনে ব্যর্থতার কারণে স্থূলতম ভুল করেন তা নয়, একজন মার্কসবাদী প্রলেতারীয় লেখকের বেলায় সেটা হরহামেশা ঘটে। লেখককে অপমান করার জন্য এটা বলা হচ্ছে না, বরং অংশত-প্রায় তার প্রশংসা করার জন্যই। লেখকেরা স্পর্শকাতর লোক, বাস্তবতার সর্বপ্রকার প্রভাব তাদের তাৎক্ষণিকভবে স্পর্শ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় সাহিত্যসেবীদের বিশেষ কৌতূহল কোনটাই থাকে না; এই কারণে, অবশ্য, কখনো কখনো অসহিষ্ণুভাবে প্রচারবাদী সমালোচকের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণে তারা অস্বীকৃত হন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে, এই পরামর্শ প্রদানের কালে সেটা পণ্ডিতি রীতিতে ব্যাখ্যা করা হয়। তবু, প্রকৃতপক্ষে, নামজাদা লেখক ও সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান সাহিত্যসমালোচকের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলেই সত্যিকার মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এবং সৃষ্টি হতে থাকবে।

www.pathagar.com

১১

লেখককে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেবার চেষ্টার সঙ্গে মার্কসবাদ সমালোচক অবশ্যই পাঠককেও শিক্ষা দেবেন। হ্যাঁ, পাঠককেও অবশ্যই পড়তে শিখতে হবে। আপাতভাবে মিষ্ট মনে হয় তেমন বিষাক্তদ্রব্য সম্পর্কে সতর্ককারী, ভেতরের মুক্তা প্রদর্শন করার জন্য শক্ত খোলস ভঙ্গকারী; সর্বপ্রকার আমিত্ব বোধের চিহ্নিতকারী এবং শৈল্পিক বস্তুর ভিত্তিতে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী– সে ধরনের পথনির্দেশক ভাষ্যকারের প্রয়োজন পড়েছে বর্তমান সময়ে, যখন এত বেশি মূল্যবান কিন্তু এখনো অপরিপক্ক পাঠক আবির্ভূত হয়েছেন। আমাদের অতীত ও বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে এটাই তাঁর সংলগ্নতা এবং এটাই সে প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তিনি সাম্প্রতিক সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হবেন। সুতরাং আমরা পুনর্বার জোর দিচ্ছি, আমাদের কাল একজন মার্কসবাদী সমালোচকের কাছে যে ব্যতিক্রম দাবি করছে সে সম্পর্কে। আমাদের থিসিস দিয়ে কাউকে ভগ্নোদ্যম করা আমাদের ইচ্ছা নয়। একজন মার্কসবাদী সমালোচক বিনম্রভাবে আরম্ভ করতে পারেন, এমনকি তিনি পথ হাতড়ে বেড়াতে পারেন ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে, কিন্তু তাঁকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এক দীর্ঘ খাঁড়া সিঁড়ি অতিক্রম করে তিনি প্রথম ভূমিস্পর্শ করবেন এবং তখন তিনি নিজেকে ভাববেন একজন শিক্ষানবিস রূপে। কিন্তু এটা অসম্ভব, সাধারণ সংস্কৃতি ও প্রতিভাদীপ্ত সাহিত্যের বিপুল উত্থানকে গ্রাহ্য না-করা– এটা বিশ্বাস না-করা আরো অসম্ভব যে, মার্কসবাদভিত্তিক সমালোচনার মান বর্তমানে পুরোপুরি সন্তোষজনক না-হলেও, অতি শীঘ্র উন্নততর পর্যায়ে উপনীত হবে।

১২

অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে আমি আরো দুটো প্রশ্ন স্পর্শ করতে চাই। প্রথমত, মার্কসবাদী সমালোচকদের সম্পর্কে প্রায়শ এমন অভিযোগ আনা হয় যার অর্থ দাঁড়ায় যে, তারা তথ্যপরিবেশন করছেন। একজন লেখক সম্পর্কে বর্তমানে এটা বলা সত্যিই বিপজ্জনক যে, তিনি 'অচেতন' বা এমনকি 'প্রতি-বিপ্লবী' ভাবধারার পোষক। এবং ঐসব-ক্ষেত্রে যখন একজন লেখককে বিদেশী, পাতিবুর্জোয়া অথবা ডানপন্থার সহযাত্রী বিবেচনা করা হয় অথবা যখন আমাদের একজন লেখকের বিরুদ্ধে কোন বিচ্যুতির বা অন্য কিছুর অভিযোগ আনা হয়, তখন পুরো ব্যাপারটি কেমন যেন রহস্যাবৃত মনে হয়।

সমালোচকের কাজ কি আসলে এই, লোকজন প্রশ্ন করে, লেখককে রাজনৈতিকভাবে সন্দেহজনক ও অগভীর বলা বা তার রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি আছে কিনা সেটা নির্দেশ করা? এ ধরনের প্রতিবাদকে আমাদের অবশ্য, কালক্ষেপ না-করে জোরালোভাবে খণ্ডন করতে হবে। যে সমালোচক নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা ইচ্ছাকৃতভাবে কারো কুৎসা রটনার জন্যে এই পদ্ধতির আশ্রয় নেয়, সে একজন দুর্বৃত্ত;

www.pathagar.com

এবং এ ধরনের দুর্বৃত্ততা, আগে বা পরে, সব সময় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সে একজন অমনোযোগী বা অসতর্ক সমালোচক, যে বিষয় সম্পর্কে চিন্তা বা বিচার না করে এরূপ অভিযোগ ছুড়ে মারে। কিন্তু যে ব্যক্তি, তার বস্তুনির্ভর সমাজ ব্যাখ্যার ফলাফল সোচ্চারে ঘোষণা করতে ভীত বলে মার্কসবাদী সমালোচনার মূল নির্যাসকে বিকৃত করে, সেও অবশ্য অসর্তক ও রাজনীতি-উদাসীন বলে ধিকৃত হবে।

এটা নয় যে, মার্কসবাদী সমালোচককে চীৎকার করে বলতে হবে 'নজর রাখ'। রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে আবেদন জানানো সমালোচনা নয়, আমাদের গঠনমূলক কাজের জন্য এটা কোন-না-কোন লেখার বস্তুনির্ভর মূল্যায়ন। তার পরের দায়িত্ব লেখকের— সমালোচনার আলোকে সিদ্ধান্ত টানা বা চিন্তাকে সংশোধন করা। আমরা রয়েছি মতাদর্শগত লড়াইয়ের মাঝখানে। বর্তমান কালের সাহিত্য ও তার মূল্যায়নের প্রশ্নে একজন বিবেকবান ও সৎ কমিউনিস্ট এই লড়াইয়ের প্রকৃতিকে অস্বীকার করতে পারেন না।

১৩

সবশেষে প্রশ্ন দাঁড়ায় তীক্ষ্ণ ও তিক্ত বিতর্ককে কি অনুমতি দেওয়া যায়? সাধারণ অর্থে বলা যায়, তীক্ষ্ণ বিতর্ক উপকারী এই অর্থে যে, সেগুলো পাঠককে কৌতূহলী করে রাখে। বিশেষত যখন দু'পক্ষই ভ্রান্ত, কিন্তু বাকি সবদিকে সমতুল্য, তখন বিতর্কমূলক লেখা পাঠকের মনে রেখাপাত করে বেশি এবং সেটা উপলব্ধ হয় আরো ভালোভাবে। তদুপরি একজন বিপ্লবীরূপে মার্কসবাদী সমালোচকের যোদ্ধৃতেজ নিজের অনুভূতিকে তীক্ষ্ণভাবে উপস্থাপনে তাঁকে এগিয়ে দেয়, কিন্তু একই সঙ্গে এটাও স্মরণযোগ্য যে, নিজের যুক্তির দুর্বলতাকে বিতর্কের ঔজ্জ্বল্য দ্বারা যুক্তিবহুলতার বদলে অসংখ্য বিভিন্নমুখী কটূ বক্তব্য, তুলনা, বিদ্রূপাত্মক উক্তি এবং ধূর্ত প্রশ্ন স্থান পায়, তখন প্রতিক্রিয়া আমোদজনক হতে পারে কিন্তু কখনো গভীর হয় না। সমালোচনা প্রযোজ্য হতে পারে সমালোচনার ক্ষেত্রেও, যেহেতু মার্কসবাদী সমালোচনা একই সঙ্গে বিজ্ঞানভিত্তিক ও শিল্পকর্ম। সমালোচনার ভিত্তি ক্রোধ নয়, বরং সেটা, অনেকক্ষেত্রে সমালোচকের ভ্রান্তির খবর জানিয়ে দেয়।

স্বীকার্য যে, কখনে কখনো হুলফোটানো ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের লাভা সমালোচকের হৃদয় ফেটে নির্গত হয়। অন্য একজন সমালোচক বা পাঠকের কমবেশি ভেদাভেদকারী কান সবসময় প্রথমাবধি স্বাভাবিক ক্রোধ ও নিছক বিদ্বেষের মধ্যে তারতম্য করতে পারে। আমাদের গঠনমূলক প্রয়াসে বিদ্বেষ যতটা সম্ভব কম হওয়া উচিত। এটাকে শ্রেণীবিদ্বেষের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। শ্রেণীবিদ্বেষ আঘাত হানে উদ্দেশ্য সহকারে, কিন্তু ধরিত্রীর ঊর্ধ্বে ভাসমান মেঘমালার ন্যায়, সেটা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে বিরাজ করে। মোটামুটিভাবে, কৌতুককর লীলাতে মত্ত না-হয়ে, যেটা তার পক্ষে খুবই দূষণীয় কাজ হবে, একজন মার্কসবাদী সমালোচক মুখ্যত দরদী ব্যক্তি হবেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ অবশ্যই হবে লেখার ইতিবাচক দিক আবিষ্কারে।

www.pathagar.com

আমাদের নতুন সাহিত্য সম্পর্কে কিছু চিন্তা

[লু সুনের প্রকৃত নাম ঝাও জুওরেন। ১৮৮১ সালে বেজিং প্রদেশর পণ্ডিত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ১৮ বছর বয়সে পিতৃহীন লু-সুন মায়ের শেষ সম্বল ৮ ডলার নিয়ে নানজিং যান নৌ একাডেমিতে ভর্তি হবার জন্যে। ১৯০১ সালে তিনি স্নাতক হন ও সরকারী বৃত্তি নিয়ে জাপানে যান। ওখানে ছিলেন ৮ বছর- এসময়ে তাঁর চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসে এবং সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে নির্যাতিত চীনা সমাজের সেবায় আত্ম নিয়োগ করতে তিনি মনস্থ করেন। ১৯২৭ সালে সান ইয়াৎ সেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন কিন্তু কম্যুনিস্টদের ওপর চিয়াং কাইশেকের অত্যাচারের প্রতিবাদে পদত্যাগ করে সাংহাইয়ে ফিরে আসেন। তারপর থেকে আমৃত্যু বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠন, তরুণদের অনুপ্রেরণা দান, পত্রিকা প্রকাশ ও বিদেশী গণমুখী সাহিত্যের চীনা ভাষায় অনুবাদ প্রভৃতি কর্মে ব্যাপৃত থাকেন। যক্ষারোগে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন ১৯৩৬ সালে। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, স্মৃতিকথা মিলে তাঁর রচনার পরিমাণ বিশ খণ্ডের মতো। চীন জনগণের সংগ্রাম ও সাফল্য, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে তাদের সীমাহীন সমর, চীনা ইতিহাসের বীরত্বপূর্ণ ঐতিহ্য প্রভৃতি তাঁর লেখার বিষয়। শ্রমজীবী মানুষের সাথে সহমর্মিতা ও বিশিষ্ট চৈনিক চরিত্র তাঁর রচনার গুণ। বর্তমান প্রবন্ধটি Selected works of Lu Shun-এর ৩ নং খণ্ডের (১৯৬৪ সালের মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ) অর্ন্তর্গত Some thoughts on our New Literature নামক প্রবন্ধের অনুবাদ]

[১৯২৯ সালের ২২-এ মে তারিখে ইয়েনচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইনিজ লিটারেচার সোসাইটিতে প্রদত্ত ভাষণ।]

আজ এক বছরেরও বেশি সময় হলো, আমি তরুণদের সামনে প্রায়ই বক্তৃতা দিইনি, কেননা বিপ্লবের পর থেকে বক্তৃতা দেবার মতো সুযোগ খুব কম ছিল। আপনি হয় উত্তেজনার স্রষ্টা বা প্রতিক্রিয়াশীল, যার কোনটাই কারো কোন উপকারে আসে না। এবার পিকিংয়ে অত্যাবর্তনের পর অবশ্য কয়েকজন পুরোনো বন্ধু আমাকে এসে কিছু বলতে প্রনুরোধ করায় আমি এখানে এসেছি। কিন্তু যে কারণে হোক, বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে আমি কখনো সিদ্ধান্ত নিইনি- এমনকি কোন বিষয় সম্পর্কে বলব তা-ও নয়।

রাস্তায় আসার সময় বাসে বসে একটি বিষয় ঠিক করতে আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু পথ এত খারাপ ছিল যে, বাসটি রাস্তার এক ফুট ওপরে লাফাতে শুরু করে দিল এবং কোন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব করে তুলল। তখন আমার মনে হলো যে, বাইরে থেকে একটি জিনিস শুধু গ্রহণ করলে কোন কাজে আসে না। আপনার যদি বাস থাকে,

www.pathagar.com

আপনার ভাল সড়কেরও দরকার। প্রতিটি বস্তু তার পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য এবং সেটা সাহিত্যের বেলায়ও প্রযোজ্য– যেটা চীনদেশে নতুন সাহিত্য বা বিপ্লবী সাহিত্য হিসেবে অভিহিত।

যতই দেশপ্রেমিক হই না কেন, সম্ভবত আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের সভ্যতা কিছুটা অনগ্রসর। প্রতিটি নতুন জিনিস বাইরে থেকে আমাদের কাছে এসেছে এবং আমাদের মধ্যে অধিকাংশই নতুন শক্তির দ্বারা বেশ বিমূঢ়। অদ্যাবধি পিকিং এর আওতায় আসেনি কিন্তু উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, সাংহাইয়ের আন্তর্জাতিক বসতিতে আপনি দেখবেন কেন্দ্রে বিদেশীরা রয়েছে এবং তাকে ঘিরে আছে দোভাষী, গোয়েন্দা, পুলিশ, 'বয়' ও অন্যদের এক বেষ্টনি– যারা তাদের বোঝে ও বিদেশের বাড়তি সুবিধাকে জানে। এই বেষ্টনির বাইরে আছে সাধারণ মানুষ।

যখন সাধারণ মানুষেরা বিদেশীদের কাছে আসে, কি হচ্ছে সে-সম্পর্কে তারা বিশদ কিছু জানে না। যদি একজন বিদেশী বলেন 'ইয়েস'; তার দোভাষী জানায় তিনি আমাকে বলেছেন তোমার কান মলে দিতে। যদি বিদেশী বলেন 'নো', এর ভাষান্তর দাঁড়ায় 'ঐ লোকটাকে গুলি করা হোক।' এ ধরনের অসুবিধা এড়ানোর জন্য আপনার দরকার অধিকতর জ্ঞানের, কারণ তখনই আপনি এই বেষ্টনীকে ভেদ করতে পারবেন।

জ্ঞানের রাজ্যেও একই ব্যাপার। আমরা অনেক কম জানি এবং শিখতে সাহায্য করার জন্য আমাদের অনেক কম উপকরণ রয়েছে। লিয়াং শিহ্-সিউর আছে তাঁর ব্যারিট, হুশু সিহ্-মোর আছে তাঁর ঠাকুর, হু শিহ্র রয়েছে তাঁর ডিউই– হ্যাঁ, হুশু সিহ্-মোর ক্যাথেরিন ম্যানসফিডও আছে, কেননা সে তাঁর কবরে গিয়ে কেঁদেছে– এবং ক্রিয়েশান গোষ্ঠীর রয়েছে বিপ্লবী সাহিত্য– যে-সাহিত্য বর্তমানে প্রচলিত। যদিও এর সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে লেখার প্রচলন আছে, অধ্যয়ন কিন্তু তেমন হয় না। আজকের দিন পর্যন্ত কিছু বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো কতিপয় লোকের ব্যক্তিগত। এরা প্রশ্নপত্র তৈরি করেন।

সব সাহিত্য পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে রূপ লাভ করে এবং শিল্পানুরাগী ব্যক্তিরা যদিও দাবি করেতে চান যে, সাহিত্য পৃথিবীর ঘটনারাজির প্রবাহকে প্রভাবিত করতে পারে, আসল সত্য হলো যে, রাজনীতি আসে প্রথমে এবং তদনুসারে শিল্পকলা পরিবর্তিত হয়। আপনি যদি কল্পনা করেন যে, শিল্পকলা আপনার পরিবেশ বদলাতে পারে, তবে আপনার কথা হবে একজন আদর্শবাদীর মতো। ঘটনা প্রায়শই বিদ্বান লোকদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী ঘটে না। এই কারণেই একটি বড় বিপ্লবের পরে তথাকথিত বিপ্লবী লেখকদের সর্বনাশ হয়। শুধু যখন বিপ্লবের ফল পাওয়া শুরু হয় এবং স্বাধীনভাবে নিশ্বাস নিতে মানুষের পুনরায় সময় আসে, তখন বিপ্লবী লেখকদের আবির্ভাব হবে। এর কারণ হলো যে,

www.pathagar.com

ধ্বংসের মুখোমুখী পুরোনো সমাজে প্রায়শই আপনি এমন রচনার দেখা পাবেন যা অনেকটা বিপ্লবী প্রতিভাত হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যথার্থ বিপ্লবী সাহিত্য নয়। উদাহরণস্বরূপ: একজন মানুষ পুরোনো সমাজকে ঘৃণা করতে পারেন, কিন্তু তার যা আছে তা শুধু ঘৃণা– ভবিষ্যতের কোন কল্পনা নয়। সমাজ-সংস্কারের জন্য তিনি উচ্চকণ্ঠ হতে পারেন কিন্তু যদি আপনি প্রশ্ন করেন যে, তিনি কোন ধরনের সমাজের আকাঙ্ক্ষী, উত্তর আসবে এক অবাস্তব ইউটোপিয়ার কথা। অথবা তিনি জীবনযাপনে ক্লান্ত হয়ে উঠতে পারেন এবং ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার জন্য বড় আকারের পরিবর্তনের প্রত্যাশী হতে পারেন, যেমন করে খাদ্য ও মদ্য দ্বারা অতিভোজনের পর কেউ কেউ ক্ষুধা উদ্রেকের জন্য গরম মরিচ আহার করেন। তারপর আছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার প্রচুর অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট লোকেরা যারা জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কিন্তু যারা নতুন সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে রাখে এবং তাদের জন্য উন্নততর মর্যাদা এনে দেবার জন্যে নতুন শক্তির ওপর নির্ভর করে।

চীনে লেখকদের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেছে যে, তারা বিপ্লবের জন্য সামনের দিকে তাকিয়ে থাকেন, কিন্তু একবার বিপ্লব শুরু হলে চুপ মেরে যান। চিং বংশের শেষের দিকের দক্ষিণ ক্লাবের সদস্যদের কার্যকলাপ তার এক উদাহরণ। সাহিত্যের ঐ সংকীর্ণ দলটি বিপ্লবের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে, হানদের দুর্দশার জন্য রোদন করেছে, মাঞ্চুদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে রোষ প্রকাশ করেছে এবং 'হারিয়ে যাওয়া ভাল দিনগুলোর' পুনঃপ্রবর্তনের স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হবার পর তারা চরম নৈঃশব্দে হারিয়ে যায়। আমারে মনে হয় এর কারণ হলো, তাদের স্বপ্ন ছিল বিপ্লবের মাধ্যমে 'প্রাচীন বৈভবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার'– আগেকার দিনের উচ্চ রাজকর্মচারীদের উঁচু হ্যাট ও বড় বেল্ট ফিরিয়ে আনার। ঘটনা যখন ঘটল উল্টোভাবে এবং বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল, তারা তখন সাহিত্যচর্চার প্রেরণা অনুভব করল না। তার চেয়ে বেশি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যাবে রাশিয়ায়। অক্টোবর বিপ্লবের শুরুতে অনেক বিপ্লবী লেখক আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘূর্ণিঝড়কে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং ঝড়ের দ্বারা পরীক্ষিত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কবি ইয়েসেনিন ও ঔপন্যাসিক সপোলি আত্মহত্যা করেন এবং সাম্প্রতিককালে বলা হচ্ছে যে, বিখ্যাত লেখক এরেনবুর্গ অনেকটা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছেন। এর কারণ কি? কারণ হলো এই যে, তাদের ওপর যা আছড়ে পড়ছে তা ঘূর্ণিবাত্যা নয়, তাদেরকে যা পরীক্ষা করছে সেটাও ঝড় নয়, বরং একটি প্রকৃত সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত উত্তম (honest-to-goodness) বিপ্লব। তাদের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, সুতরাং তারা আর বাঁচতে পারেন না।

প্রাচীন কালের বিশ্বাসের মত এটা এতো ভাল নয় যে, আপনার পরলোক গমনের পর

www.pathagar.com

আত্মা স্বর্গে যায় ও ভগবনের পাশে বসে কেক খায়।* কারণ তাদের আদর্শ বাস্তবায়িত হবার পূর্বে তারা মহাপ্রয়াণ করেছেন।

অবশ্য তারা বলেন চীনদেশে ইতিমধ্যে একটি বিপ্লব এসে গিয়েছিল। এটা সত্য হতে পারে রাজনীতির বেলায়, শিল্পকলার ক্ষেত্রে নয়। কেউ বলেন 'পাতি-বুর্জোয়াদের সাহিত্য বর্তমানে মাথা তুলছে।' সত্যি বলতে কি, এ ধরনের কোন সাহিত্য নেই মাথা তোলবার জন্যে। আমি আগে যা বলেছি– বিপ্লবীরা সেটা যত অপছন্দ করেন না কেন– তার ভিত্তিতে বিচার করলে সাহিত্যে কোন পরিবর্তন বা নবজাগরণ আসেনি এবং এটা বিপ্লব বা প্রগতি কোনটাকেই প্রতিফলিত করে না।

ক্রিয়েশান সোসাইটি যে-অধিকতর চরম বিপ্লবী সাহিত্য সম্পর্কে অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতদের সাহিত্যের জন্য ওকালতি করছেন– সেটা শূধু শূন্য কথা। এখানে-ওখানে এবং সর্বত্র নিষিদ্ধ করা ওয়াং তু-চিং-এর কবিতা লিখিত হয়েছিল সাংহাইয়ের আন্তর্জাতিক বসতিতে। সেখান থেকে তিনি বিপ্লবী ক্যান্টনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। ক্রমিক বড় টাইপের লেখা Pong Pong Pong কবির ওপর সয়া সস সম্পর্কিত সাংহাইয়ের সিনেমা পোস্টার ও বিজ্ঞাপনের প্রভাবের কথাই শুধু জানিয়ে দেয়। তিনি ব্লকের টুয়েলভ-এর অনুকরণ করেছেন, কিন্তু ব্লকের জোর ও প্রতিভা তার নেই। বেশ কিছু লোক কুমো জোর 'হ্যান্ড'কে একটি উৎকৃষ্ট রচনা বলে প্রশংসা করেছেন। গল্পটিতে একজন বিপ্লবীর কথা বলা হয়েছে যিনি বিপ্লবের কালে একটি হাত হারিয়েছেন কিন্তু এখনো বাকিটি দিয়ে প্রেয়সীর হাত ধরতে পারেন। ক্ষতিটা নিশ্চিতভাবে খুব উপযোগী। যদি আপনাকে চারটি প্রত্যঙ্গের যে-কোন একটি হারাতে হয়, নিশ্চিতভাবে সবচেয়ে বেশি খরচযোগ্য হবে একটি হাত। একটি পা হারানো হবে অসুবিধাজনক, মাথা তার চেয়েও বেশি। এবং যদি একমাত্র আশংকা থাকে একটি হাত হারানোর, তবে সে-ঘর্ষণের জন্য আপনার তত বেশি সাহসের দরকার হবে না। তবু আমার মনে হচ্ছে একজন বিপ্লবীর তার চেয়ে বেশি ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। হ্যান্ড গল্পটি হচ্ছে একজন গরিব পণ্ডিতের বিচারের বহু বহু পুরাতন গল্পের মতো যা প্রথামাফিক সমাপ্ত হয় প্রাসাদে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় পণ্ডিতের উত্তীর্ণ হওয়ার ও সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চীনের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে এটা অন্যতম ধারণা। সাম্প্রতিক

* জার্মান কবি হাইনের কবিতা Mir traumt: ich bin der liebe Gott (আমি স্বপ্ন দেখলাম আমি স্বয়ং ভগবান)- এর প্রতি ইংগিত আছে এখানে। এটা কবির Die Heimkehr (বাড়ি ফেরা) কাব্যগ্রন্থে রয়েছে।

www.pathagar.com

কালে সাংহাইয়ে প্রকাশিত একটি বিপ্লবী সাহিত্যরচনার প্রচ্ছদে রয়েছে 'সিম্বলস অব মিজারী'র* প্রচ্ছদ থেকে নেয়া ত্রিশূল ও তার মাঝের কাঁটায় বসানো সোভিয়েত পতাকার হাতুড়ি। এখানে একটির ওপর অপরটির চাপিয়ে দেয়া থেকে বোঝা যায় ত্রিশূল অনুপ্রবিষ্ট করানো বা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা কোনটাই আপনি পারেন না। এটা শুধু শিল্পীর নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে– এসব লেখকদের একটা ব্যাজ হিসেবেও এটা ব্যবহৃত হতে পারে।

অবশ্য এক শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া সম্ভব। সবচেয়ে ভাল হয় আপনার মতামত খোলাখুলি বলা, যাতে জনগণ বুঝতে পারে আপনি শত্রুপক্ষের না মিত্রপক্ষের। নাটকীয়ভাবে নিজের নাকের দিকে ইঙ্গিত করে এবং 'আমিই একমাত্র যথার্থ প্রলেতারিয়েত' সে কথা দাবি করে এই সত্য গোপন করতে চেষ্টা করবেন না যে, আপনার মগজের ভেতরে পুরোনো তলানি জমে আছে। জনগণ আজকাল এত বেশি স্পর্শকাতর যে, 'রাশিয়া' শব্দটি তাদের প্রায় ভূত ছাড়িয়ে দেয় এবং শিগগিরই হয়তো ঠোঁট লাল করতে তারা অনুমোদন করবে না। তারা সর্বপ্রকার প্রকাশনা সম্পর্কেই ভীত। এবং বিদেশ থেকে অধিক তত্ত্ব বা বই প্রবর্তন করতে অনিচ্ছুক আমাদের বিপ্লবী লেখকেরা শুধু নাটকীয়ভাবে নিজেদের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে এবং শেষপর্যন্ত তারা আমাদের প্রাক্তন চিং রাজবংশের 'রাজকীয় অনুশাসনের তিরস্কার'-এর ন্যায় কিছু দান করেন– সেগুলো-যে কি, সে সম্পর্কে কারো কোন প্রকার ধারণা নেই।

সম্ভবত আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে 'রাজকীয় অনুশাসনের তিরস্কার' শীর্ষক বক্তব্যটি। এটা রাজকীয় দিনের ঘটনা– যদি কোন রাজকর্মচারী কোন ভুল করতেন, তাকে গেটের বাইরে বা অন্যত্র হাঁটু ভেঙে বসে থাকার নির্দেশ দেওয়া হত এবং বাদশাহ এক খোজাকে পাঠাতেন ড্রেসিং গাউন দেবার জন্যে। যদি আপনি খোজার হাতের তালুতে তৈল মর্দন করতেন সে খুব তাড়াতাড়ি থেমে যেতো। যদি তা না-করতেন, আপনার পূর্বপুরুষ থেকে উত্তর পুরুষ পর্যন্ত সবাকে সে অভিশাপ দিত। এটাকে মনে করা হতো বাদশাহের উক্তি বলে কিন্তু এমন কে ছিল যে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারত যে, সত্যিই তিনি সেগুলো বোঝান কি না? গত বছর একটি জাপানি সাময়িকীতে বলা হলো যে, চীনের কৃষক ও শ্রমিকেরা জার্মানিতে গিয়ে নাটক অধ্যয়ন করতে চেং ফাং-উকে

* হাকসন কুরি আগাওয়া কর্তৃক রচিত সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক বই। লু সুন সেটা জাপানি ভাষা থেকে চীনা ভাষায় তরজমা করেন।

www.pathagar.com

নির্বাচিত করেছে। এবং তিনি যথার্থই সেভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন কিনা সেটা বের করার কোন পথ আমাদের নেই।

এই কারণেই, আমি যেমন সর্বদা বলি, যদি আমরা আমাদের উপলব্ধিকে বাড়াতে চাই, চারপাশের বেষ্টনীকে ভেদ করার জন্য আমাদের বেশি করে বিদেশী বই পড়তে হবে। আপনাদের জন্য এটা বেশি কষ্টকর নয়। যদিও নতুন সাহিত্য সম্পর্কে ইংরেজিতে বা ইংরেজি তরজমায় খুব বেশি বই নেই, অল্প যে কয়টি আছে তা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। বিদেশী তত্ত্ব গ্রন্থ ও সাহিত্য বেশি পাঠ করে আমাদের নতুন চীনা সাহিত্য বিচার করতে বসলে আপনি অনেক বেশি স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে সক্ষম হবেন। তার চেয়েও ভাল, আপনি সে ধরনের কাজকে চীনদেশে প্রবর্তন করতে পারবেন। এলোমেলো লেখাকে বাতিল করার চেয়ে অনুবাদ করা সহজতর নয়, কিন্তু আমাদের নতুন সাহিত্যের বিকাশে এটার আবদান অনেক বেশি ও আমাদের জনগণের জন্যে অধিকতর উপকারী।

www.pathagar.com

ক্রিস্টোফার কডওয়েল

আধুনিক কবিতার বিকাশ

[১৯০৭ সালে ইংল্যান্ডে তাঁর জন্ম হয়। পনের বছর হবার পূর্বেই আর্থিক কারণে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। পরে বিমানচালনা বিদ্যা বিষয়ক একটি প্রকাশনা-সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর অগ্রজের সহযোগিতায় এবং ব্যবসা-সাময়িকী সম্পাদনা করেন। ছোটগল্প, নাটক, কবিতা ও গোয়েন্দা উপন্যাস রচনা করেছেন কয়েকটি- বিমানচালনা-বিদ্যা বিষয়ক পাঠ্যবই লিখেছেন পাঁচটি। ১৯৩৪ সালে মার্কসবাদে আগ্রহী হন ও কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন পরের বছর। ১৯৩৬ সলে স্পেনে যান আন্তর্জাতিক বিগ্রেডের সদস্য হিসেবে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্যে। যুদ্ধে তিনি নিহত হন ১৯৩৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি। তাঁর বহুল পরিচিত গ্রন্থ Illusion and Reality প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পরে; তার অপর একটি নামকরা বই হচ্ছে Studies in a Dying Culture। ব্রিটিশ মার্কসবাদী শিল্পসমালোচকদের মধ্যে তাঁর স্থান সর্বোচ্চে। সাহিত্য ও শিল্পকলার বিরাট এলাকা তিনি প্রথম মার্কসবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করেন ও মানব জীবনে শিল্পকলার স্থান নির্ধারণ করেন। বর্তমান প্রবন্ধটি নেওয়া হয়েছে প্রথম গ্রন্থ থেকে।]

যখন আমরা সাধারণ অর্থে 'আধুনিক' শব্দটি প্রয়োগ করি, তখন আমরা জটিল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের এমন এক সমগ্ররূপকে বোঝাই, যা পনের শতকে ইউরোপে বিকশিত হয়ে, ওখান থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। শেক্সপিয়ার, গ্যালিলিও, মাইকেল এঞ্জেলো, পোপ গ্যেটে এবং ভলতেয়ারের মধ্যে 'আধুনিকতা'র এমন কিছু বর্তমান, যাকে হোমার, থেলস, চসার এবং বিউলফ-এর সঙ্গে আমরা আলাদা করতে পারি এবং তুলনা করতে পারি ভ্যালেরি, সিজানে, জেমস জয়েস, বার্গসঁ এবং আইনস্টাইনের সঙ্গে।

এই জটিলতা একটি অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। জটিল রূপটিও পরিবর্তনশীল; মানব ইতিহাসের কোন কালই এত বিচিত্র ও গতিশীল ছিল না, যেমন দেখা যায় এলিজাবেথীয় যুগ থেকে প্রসারিত আমাদের আজকের যুগটি। কিন্তু এই সময়ে অর্থনীতির ভিত্তিটিও পরিবর্তিত হয়েছে সামন্তযুগ থেকে শিল্পযুগে। ঐ সাংস্কৃতিক জটিলতা হলো উৎপাদনব্যবস্থায় বুর্জোয়া বিপ্লবের ওপর কাঠামো- যে বিপ্লবের প্রকৃতি প্রথম পুরোপুরি ব্যাখ্যা করেছেন মার্কস তাঁর 'দাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থে। আধুনিক কবিতা হলো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কবিতা।

আধুনিক কবিতাকে অনুধাবন করা অসম্ভব যদি-না আমরা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তথা গতিশীলতায় রেখে এর বোঝার চেষ্টা করি। কবিতাকে স্থবির 'শিল্পকর্ম' হিসেবে তথা

www.pathagar.com

অনেকটা হিমায়িত এবং স্তরীভূত বিবেচনা করে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলো নিস্প্রাণ সূত্র শুধু বের করে নিয়ে আসতে পারি। এটা বিশেষভাবে সত্য হয় যখন উর্মিমুখর গতিবিশিষ্ট সমগ্র সমাজের সাংগঠনিক ফসল হিসেবে কবিতা আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু ওই সময়ের বুর্জোয়া কবিতাকে সমগ্রভাবে পর্যালোচনা করা দুরূহকর্ম। বহু জাতি ও অনেক ভাষা বুর্জোয়া আন্দোলনে জাড়িয়ে পড়েছে; তবু কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, এর সৌন্দর্য উপভোগের জন্যে সাহিত্যের অন্য যে কোন অঙ্গের চেয়ে যে-ভাষায় এটা রচিত হয়েছে, সে-সম্পর্কে প্রয়োজন গভীর জ্ঞানের।

কিন্তু যেমনটি ঘটেছে, অর্থনীতিতে বুর্জোয়া বিপ্লবের পথিকৃৎ ছিল ইংল্যান্ড। ইতালিতে এর সূচনা হলেও, সেখানে এর বিকাশ আগে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। আমেরিকা একে অতিক্রম করে যায়, কিন্তু সে কেবল পরবর্তীকালে। শুধু ইংল্যান্ডের বুর্জোয়া বিপ্লবের বৃহত্তর অংশ নিজেকে মেলে ধরে এবং ওখানে থেকে পৃথিবীর বাকি অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

১৭৮৯-১৮৭১ সালের মধ্যে ফরাসি দেশে বুর্জোয়া বিপ্লব অধিকতর গতি, অধিকতর সংহতি এবং অধিকতর অবিশ্রান্ত যৌক্তিকভাবে অনেকগুলো স্তর অতিক্রম করে। কিন্তু ঐ গতিই এর আদর্শগত ওপরকাঠামোকে অধিকতর বিভ্রান্তিকর করে তোলে। সাধারণভাবে বুর্জোয়া সাহিত্যশিল্প সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে হলে ওই স্বল্প সময়ের ফ্রান্স বেশি উপকারী, কিন্তু কবিতা-সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করতে হলে ইংল্যান্ডই অধিকতর প্রশস্ত,–যে-দেশে বিপ্লব নিজেকে প্রকাশ করছে অনেক বেশি সুষমভাবে এবং অনেক বেশি বিস্তারিতভাবে।

পূর্বতর বিকাশের কারণে, অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্রিটিশ বুর্জোয়া অর্থনীতির অবক্ষয় দেখা দেয় একটু পরে। তাই, সাম্রাজ্যবাদের কালে এর কাব্যিক লক্ষণসমূহ ইংল্যান্ডের তুলনায় ফ্রান্স, জার্মানি এবং রাশিয়ায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সুতরাং উপসংহারের ওই কাল ব্যতীত, আধুনিক কবিতা বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধান শুধু একটি দেশ ইংল্যান্ডেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

এটা কোন দৈব ঘটনা নয় যে, সেই একই দেশ ইংল্যান্ড আধুনিক কবিতায় তার পরিমাণগত ও বৈচিত্র্যগত অবদানের কারণেও উল্লেখযোগ্য। তিন শতাব্দীর ধনতন্ত্রের বিকাশে ইংল্যান্ড পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছে এবং একই সময়ে, কবিতার বিকাশেও সে পৃথিবীতে নেতৃত্বের অবস্থানে ছিল— এই দুই ঘটনা কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয়, বরং ইতিহাসের অভিন্ন আন্দোলনের অংশবিশেষ।

ইতিহাসের দিক থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী খুবই বিপ্লবী ভূমিকা পালন করছে।

বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য, সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক পিতৃতান্ত্রিক ও

www.pathagar.com

প্রকৃতি-শোভন সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। যে সব বিচিত্র সামন্তবাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল তার 'স্বভাবসিদ্ধ ঊর্ধ্বতন'দের কাছে, তা এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের অনাবৃত স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকার 'নগদ টাকার' বাঁধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখেনি।

উৎপাদনের উপকরণে অবিরাম বিপ্লবী বদল না-এনে এবং তাতে করে উৎপাদন-সম্পর্ক ও সেই সঙ্গে সমগ্র সমাজ-সম্পর্কে বিপ্লবী বদল না-ঘটিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী বাঁচতে পারে না। অপরদিকে অতীতের শিল্পজীবী সকল শ্রেণীর বেঁচে থাকার প্রথম শর্তই ছিল সাবেকী উৎপাদন-পদ্ধতির অপরিবর্তিত রূপটি বজায় রাখা। আগেকার সকল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্যই হলো উৎপাদনে অবিরাম বিপ্লবী পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং উত্তেজনা। অনড় জমাট সব সম্পর্ক ও তার আনুষঙ্গিক সমস্ত সনাতন শ্রদ্ধাভাজন কুসংস্কার ও মতামতকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়, নবগঠিতগুলো দৃঢ় সম্বদ্ধ হয়ে উঠবার আগেই অচল হয়ে আসে। যা কিছু ভারিক্কী তা-ই যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়, যা পবিত্র তা হয় কলুষিত; শেষ পর্যন্ত মানুষ বাধ্য হয় তার জীবনের আসল অবস্থা এবং অপরের সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে খোলা চোখে দেখতে।'

ধনতান্ত্রিক কবিতা এসব পরিস্থিতিকে প্রতিফলিত করে। এটা পরিস্থিতির প্রসূন। কবিতার জন্ম হয়েছে আদিমগোষ্ঠীর অবিভক্ত বিশিষ্টতা (matrix) থেকে এবং তার ফলে এতে ফুটে উঠেছে পৌরাণিক চারিত্র্য। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শাসক শ্রেণীর শিল্পরূপে এটা নিজেকে ধর্ম থেকে পৃথক করে, কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দের গ্রিসের বিপ্লবী ক্রান্তিলগ্ন ব্যতীত, এই শিল্প এক ধরনের অচঞ্চল অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং প্রতিফলিত করে ঐ শ্রেণীর ধীর উন্নতি ও ধীর অবনতি– যে শ্রেণীর 'অস্তিত্বের প্রধান শর্ত হচ্ছে অপরিবর্তনীয় কাঠামোর মধ্যে নিজস্ব উৎপাদনব্যবস্থা বজায় রাখা।' ওই সময় সামন্ততন্ত্রের স্থির ও স্থবির কাঠামোর গর্ভে একটি শ্রেণী জন্ম নেয়, গথিক ক্যাথেড্রালের মধ্য দিয়ে যার দাপটের কথা প্রথমবারের মতো জানা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এই শ্রেণী শাসক গোষ্ঠীতে উন্নীত হয় কিন্তু এর টিকে থাকার প্রথিমিক বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদনের উপকরণে অনবরত বিপ্লব সাধন করা এবং যার প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তন আসে উৎপাদন-সম্পর্কে এবং সর্বশেষে সমাজের সর্ববিধ সম্পর্কে।

সেজন্যে এই শিল্প মর্মবস্তুতে প্রতিবাদী, কাঠামোবিহীন ও প্রকৃতিধর্মী। শুধু বিপ্লবী গ্রিসের শিল্পই একভাবে বুর্জোয়া শিল্পের প্রকৃতিধর্মিতার পূর্বাভাস সূচনা করে। এটা এ ধরনের শিল্প যা নিরন্তর নিয়মকানুনে পরিবর্তন আনে, যেমন করে বুর্জোয়া অর্থনীতি অনবরত আনয়ন করে নিজের উৎপাদনের উপকরণে পরিবর্তন। এই বিরতিহীন বিপ্লব, প্রাচীন ও শ্রদ্ধেয় সংস্কার ও মতবাদের' এই অনবরত উপড়ে ফেলা, এই 'চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা ও

www.pathagar.com

আন্দোলন' বুর্জোয়া শিল্পকলাকে পূর্ববর্তী সব শিল্প থেকে পৃথক করে। যে বুর্জোয়া শিল্পী এক পুরুষের জন্যও তাঁর কালের নিয়মকানুনে বাঁধা পড়েন, তিনি 'একাডেমিক' হয়ে পড়েন ও তাঁর শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে প্রাণহীন। ইংরেজি কবিতার মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হলো যে, আপাতদৃষ্টিতে সেটা মানুষে-মানুষে বিরাজিত সকল প্রত্যক্ষ নির্যাতনমূলক সম্পর্ক দূর করে এবং তদস্থলে স্থাপন করে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠিত সম্পদের-ওপর-অধিকার তথা দ্রব্যের সঙ্গে মানুষের নির্যাতনমূলক সম্পর্ক। মানুষ আর মানুষের সঙ্গে নির্যাতনের সম্পর্কে আবদ্ধ নয়, যেমন করে সামন্ততন্ত্রে ভূমিদাস থাকে মালিকের সঙ্গে, মালিক থাকে তারও ওপরের প্রভুর সঙ্গে; বরং তারা স্বাধীনভাবে উৎপাদন করে মুক্ত বাজারের জন্য এবং একইভাবে স্বাধীনভাবে মুক্ত বাজার থেকে ক্রয় করে। তারা শুধু তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে নেয় না, সঙ্গে নেয় নিজের ক্ষমতাও। বাজারে নিজের শ্রমশক্তিকে সর্বোচ্চ মূল্য প্রদানকারী ক্রেতার কাছে নির্বিঘ্নে বিক্রয়ের অধিকার তার আছে। একটি অনিয়ন্ত্রিত বাজারে এ ধরনের বাধাবন্ধনহীন প্রবেশাধিকার ধনতান্ত্রিক সমাজের 'স্বাধীনতার' অঙ্গ হিসেবে দেখা দেয়।

অতএব মানুষে-মানুষে নির্যাতনমূলক সম্পর্ক দেখা না-গেলেও মানুষ ও দ্রব্যের (সম্পদ) মধ্যে জবরদস্তিমূলক সম্পর্কে সেটা প্রকাশিত হয় এবং পরিণতি লাভ করে ব্যক্তিবিশেষ ও বাজারের মধ্যেকার সম্পর্কে। বাজারকে মনে হয় সরবরাহ ও চাহিদার প্রাকৃতিক 'নিয়মের' অধীন– প্রকৃতির অংশ, এক টুকরো পরিবেশ। এর নির্যাতনকে মনুষ্যসৃষ্ট নয়, বরং ঝঞ্ঝা বা অগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তিসঞ্জাত বলে ধারণা হয়।

প্রকৃতপক্ষে বাজার আর কিছু নয়, বরং মানুষের মধ্যেকার প্রকৃত সম্পর্কের অন্ধপ্রকাশ। সম্পর্কগুলো হলো নির্যাতনের সম্পর্ক; উৎপাদনের উপকরণের মালিক হয়ে মুক্ত শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করে ধনতন্ত্র যে বিশিষ্ট শোষণ গড়ে তোলে সেটা– ঐ মুক্ত শ্রমিক আসলে তার খালি হাত দুটো ব্যতীত সব সম্পদ থেকেই মুক্ত। কিন্তু যেহেতু এটা এক ধরনের অন্ধ প্রকাশ, সেজন্য, নির্যাতনমূলক ও নৈরাজ্যমূলক এবং কাজ করে প্রাকৃতিক শক্তির প্রচণ্ডতা ও অনিয়ন্ত্রিত পরিণাম ভাবনাহীন হয়ে। পুঁজিপতি ও মজুরের মধ্যেকার নির্যাতনমূলক সম্পর্কটি অবগুণ্ঠিত থাকায় সেগুলো অধিকতর পাশব ও নির্লজ্জ প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়।

সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি হচ্ছে কপট ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের ও ফাঁপা স্বাধীনতার অর্থনীতি। শাসকগোষ্ঠী হিসেবে বুর্জোয়া শ্রেণীর টিকে থাকার শর্ত এবং সেজন্যে সমাজে এর স্বাধীনতার শর্ত হচ্ছে মানুষে-মানুষে প্রত্যক্ষ নির্যাতনমূলক সম্পর্কের

www.pathagar.com

অনুপস্থিতি। এ ধরনের নির্যাতনমূলক সম্পর্কগুলো হচ্ছে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ– সামন্ততন্ত্রে প্রভুর প্রতি ভূমিদাসের বন্ধনের মতো। কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক বিরহিত স্বাধীনতা কোন স্বাধীনতাই হবে না– হবে সমাজের অনিবার্য ধ্বংসের সম্ভাবনাসহ অন্ধ নৈরাজ্যের অবস্থা। সুতরাং মানুষের মধ্যেকার প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অনুপস্থিতির সঙ্গে বুর্জোয়া সমাজে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে উৎপাদনের উপকরণের ওপর চূড়ান্ত মালিকানার অধিকার তথা 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির' অধিকার। এই চরম অধিকার রক্ষা করা হয় নিপীড়ক রাষ্ট্রশক্তির মধ্য দিয়ে, তার আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সহযোগিতায়– যেহেতু মানুষের ওপর কোন প্রকার ব্যক্তিগত মালিকানা নয়, বরং সম্পত্তির অধিকার প্রয়োগ করে, সেজন্যে রাষ্ট্রশক্তিকে মধ্যস্থতাকারী ও স্বাধীনরূপে সমাজের ওপর অত্যুচ্চ শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার বুর্জোয়াকে 'মুক্ত' শ্রমিকের ওপর নিপীড়নের শক্তি যোগায়, রাষ্ট্র ও বুর্জোয়া অর্থনীতি যুগপৎ আচ্ছাদন টেনে দেয় সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্যে নির্যাতনমূলক সমাজে; এতে লভ্য একমাত্র স্বাধীনতা হচ্ছে সমাজে উৎপাদিত দ্রব্যের মনোপলীর দ্বারা প্রকৃতির হাত থেকে বুর্জোয়ার মুক্তি– এবং সামন্ত চরিত্রের সকল প্রত্যক্ষ নির্যাতনমূলক সম্পর্কের উচ্ছেদের মাধ্যমে মানবীয় নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি। বুর্জোয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে বুর্জোয়া সমাজ হচ্ছে মুক্ত সমাজ; এই মুক্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কারণে, সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন বাজারের জন্যে এবং প্রত্যক্ষ সামাজিক সম্পর্কের অনুপস্থিতির দারুন– যার অনুপস্থিতির কারণ ও প্রকাশ হলো মুক্ত বাজার! কিন্তু সমাজের বাকিদের কাছে বুর্জোয়া সমাজ হলো নিপীড়ক এবং নিপীড়নের পদ্ধতি হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মুক্ত বাজার। এটাই হলো বুর্জোয়া সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্ব– ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশের ধারক। সমগ্র আন্দোলনকে বুঝতে হলে এই দ্বন্দ্বকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে।

কবিতার উদ্ভবের ব্যাখ্যায় আমরা দেখেছি যে, আদি কবিতা মূলত যৌথ আবেগ এবং তার জন্ম দলবদ্ধ উৎসবে। শত্রুদর্শনে পশুদলে যে ধরনের আবেগ উত্থিত হতে পারে, সে ধরনের অনিয়ন্ত্রিত, স্বতঃস্ফূর্ত যৌথ আবেগ নয়; অর্থনৈতিক যুথাবদ্ধতার প্রয়োজনে সৃষ্ট সংঘবদ্ধ জবাবের আবেগ।

বুর্জোয়া সংস্কৃতি হলো একটি শ্রেণীর সংস্কৃতি, যার কাছে স্বাধীনতা– অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিসমূহের জাগরণ লাভ করা যায় 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য' দ্বারা। এমন মনে হতে পারে, বুর্জোয়া-সভ্যতা কবিতা-বিরোধী, যেহেতু কবিতা হলো যৌথ প্রয়াসজাত কিন্তু বুর্জোয়ারা হলো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী।

কিন্তু এট হলো বুর্জোয়াকে তার নিজের মানদণ্ডে মূল্যায়ন করা। অবশ্য একজন পুঁজিপতি বা কবিকে যেভাবেই বুঝতে চাই না কেন আমাদের প্রথমে সেটাই করতে

www.pathagar.com

হবে। বুর্জোয়া নিজেকে দেখে স্বাধীনতার জন্যে একাকী যুদ্ধরত বীরনায়করূপে- মুক্তমানুষরূপে জন্ম নিয়ে এক রহস্যময় কারণে যে- সর্বত্র শৃঙ্খলিত, সে ধরনের প্রাকৃতিক মানুষকে আটকে রেখেছে যেসব সামাজিক-সম্পর্ক তার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত একজন ব্যক্তি হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিরবিচ্ছিন্ন প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে তথা ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতায় তাকে নিয়ে যায়। সামন্ত সমাজ-সম্পর্কের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম সমাজে উৎপাদিকা শক্তির বিরাট জাগরণে সাহায্য করে। যে-প্রক্রিয়ায় বুর্জোয়া অর্থনীতি তার কাঠামোগত ভিত্তিতে অব্যাহত বিপ্লব আনয়ন করে বুর্জোয়ার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ সে-বিশেষ পদ্ধতিকে প্রকাশ করে। সেটা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না কাঠামোর পক্ষে ওপরকাঠামোকে ধরে রাখা অসহ্য হয়ে পড়ে এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিতে বিপরীতমুখী বিস্ফোরণ ঘটে।

এবং একইভাবে, বুর্জোয়া কবি নিজেকে দেখেন এমন একজন ব্যক্তিরূপে, যিনি তার হৃদয়স্থিত শক্তির বহির্মুখী সম্প্রসারণ এবং বাহ্যিক কাঠামোর চাপে আড়ষ্ট অন্তরস্থ শক্তির প্রকাশ দ্বারা নিজের সর্বাধিক বিশিষ্ট 'অহং'- এর জাগরণের জন্যে লড়াই করে চলছেন। এটাই বুর্জোয়া-স্বপ্ন, জগতপ্রপঞ্চকে এককভাবে রচনা করার এককমানুষের স্বপ্ন। তিনি ফাউস্ট, হ্যামলেট, রবিনশন ক্রুশো, শয়তান এবং প্রুফক।

সামন্ত সমাজের সীমাবদ্ধতাকে চূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত বুর্জোয়ার ব্যক্তিসর্বস্বতা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রচণ্ড ও নিরন্তর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি আনয়ন করে। অনুরূপভাবে, কবিতার কলাকৌশলেও সেটা প্রচণ্ড ও নিরন্তর অগ্রগতি সম্পন্ন করে।

কিন্তু পুঁজিপতি ও কবি যুগপৎভাবে তমসাচ্ছন্ন চরিত্রে পরিণত হয়- প্রথমে ট্র্যাজিক, তারপরে করুণা উদ্রেককারী ও সর্বশেষে বিষধর। পুঁজিপতি দেখে যে, তার বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তার বিশেষ স্বাধীনতাযুদ্ধ, নৈরাজ্য মন্দা ও বিপ্লবের মতো সর্বপ্রকার অন্ধ নিপীড়ন ডেকে আনে। উৎপাদনে নিয়োজিত মেশিন শেষপর্যন্ত তাকেই সন্ত্রস্ত করে তোলে। নিজের অন্ধতায় বাজার ভয়ংকার নৈসর্গিক শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়।

বাজারের প্রক্রিয়ায়, পুঁজিপতিরা নিরন্তরভাবে একে-অপরকে মজুরি-শ্রমিকে সবলে নিক্ষেপ করে বা অস্থায়ী সুবিধাভোগী 'বেতনভুক'-এর মর্যাদায় নির্বাসনে পাঠায়। গতকালের কারুশিল্পী আজকে কারখানার মজুর। এ বছরের দোকানের মালিক আগামী বছরের চেইন স্টোরের ম্যানেজার। গত সপ্তাহে ছোট ব্যবসায়ের অধিপতি, আজকে বৃহৎ ট্রাস্ট্রের বেতনভোগী কর্মকর্তা; এটাই সেই নাটকীয় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ধনতন্ত্র নিজের মধ্যে বিপ্লবী পরিবর্তন ডেকে আনে। সে একাজ করে ঐ মুক্ত বাজারের মধ্যে দিয়েই, যার ওপর মুক্তির জন্যে সে নিজে নির্ভরশীল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ও স্বাধীনতার এই নিশ্চয়তা ঠিক বিপরীত শক্তির জন্ম দেয়- ট্রাস্টগঠন ও লগ্নিপুঁজির ওপর নির্ভরশীলতা। সুষ্ঠু

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতার এই স্বর্ণোদ্যানে জন্ম নেয় সুষ্ঠুতার ঠিক বিপরীতটি– মূল্যহ্রাস, যুদ্ধ, কার্টেল, একচেটিয়া ব্যবসা, জোরপূর্বক বাজার-দখল এবং উর্ধ্বমুখী ট্রাস্ট। এসব অনিষ্টকর দিক, যা তাকে স্বাধীনতা থেকে সবলে বিচ্যুত করে, বুর্জোয়ার কাছে মনে হয়, আসলেও সত্যি, প্রত্যক্ষ ও নির্যাতনমূলক সামাজিক সম্পর্করূপে। তার স্বপ্নের মুক্ত বাজারের ঠিক পরিপন্থী বিবেচনা করে সেগুলোর বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করে। সুষ্ঠুতর বাজার ও তীব্রতর প্রতিযোগিতার আশায় সে বিদ্রোহ করে, কিন্তু সে বুঝতে পারে না যে, মুক্ত বাজারের কারণে সৃষ্ট হওয়ার দরুন স্বাধীনতার তীব্রতা দাবি করা মানেই প্রকারান্তরে যে-দাসত্বকে সে ঘৃণা করে, তারই তীব্রতাকে দাবি করা। সুতরাং যে-আন্দোলনকে সে ঘৃণা করে, তারই অগ্রগতিকে সে ত্বরান্বিত করে এবং কেবল রক্ষা পেতে পারে বুর্জোয়া দ্বন্দ্ব থেকে আত্মরক্ষা করে। বুর্জোয়ারা সব সময় স্বাধীনতার কথা বলে যেহেতু স্বাধীনতা সব সময় তার হাত থেকে পিছলে-পিছলে পড়ে।

বুর্জোয়া কবিও অনুরূপ চক্র পরিক্রমণ করেন। যে নির্জনতা তাঁর স্বাধীনতার শর্ত, সেটাই তাঁর কাছে অসহনীয় ও নিপীড়ক বলে দেখা দেয়। পৃথিবী ও বিশ্ব সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাকে তিনি ক্রমবর্ধমানহারে অবন্ধুসুলভ ও তাঁর স্বাধীনতার ওপর হামলা বলে দেখেন। তিনি তাঁর আত্মা থেকে সামাজিক সবকিছুকে বহিষ্কার করেন এবং তাঁকে তুচ্ছ, শূন্য ও অরক্ষিত রেখে আত্মার চুপসে যাওয়া প্রত্যক্ষ করেন।

এটা কিভাবে সম্ভব হলো? আমরা শুধু কারণটি বের করতে পারি, যদি আমরা বুর্জোয়াকে তার নিজস্ব মূল্যায়নে না-দেখে অর্থনৈতিক গতিপ্রবাহকে উন্মুক্ত করে দিই । বুর্জোয়ার নিজস্ব মূল্যায়ন এতে প্রতিফলিত হয়। প্রতিটি স্তরে বুর্জোয়া দেখে যে, সামাজিক 'নিয়ন্ত্রণ' তুলে দিতে গেলে সেটা আরো তীব্র হয়ে দেখা দেয়। মুক্ত বাজারের অভিমুখী তার যাত্রা উৎপাদককে প্রতিযোগিতার এমন আবর্তে নিক্ষেপ করে যার একমাত্র ফসল হচ্ছে বিভিন্ন ব্যবসায়ের ক্রমিক সংযুক্তি। বুর্জোয়াদের সম্পত্তি-মালিকানার সরল নিয়মাবলীর স্বার্থে সমস্ত 'জটিলতার' ধ্বংস বুর্জোয়া চুক্তি-আইনের প্রাণান্তকর জটিলতা ডেকে আনে। সামন্ত-শাসন ও সামাজিক নির্যাতনের প্রতি তার বিদ্বেষ জন্ম দেয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর অন্তহীন হস্তক্ষেপ-সংবলিত শক্তিশালী কেন্দ্র বিশিষ্ট বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জন্ম দেয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধী পরিস্থিতির। যেই অর্থনীতিক-ব্যবস্থার লক্ষ্যে মনে করা হতো সর্ববিধ সামাজিক সম্পর্কের মূলোৎপাটন, সে-ই এমন ভয়ঙ্কর জটিল সমাজ গড়ে তোলে যা ছিল অভাবিতপূর্ব। তার স্বাধীনতার গতি হচ্ছে স্বাধীনতার অস্বীকার। সে একজন কাগুজে বিপ্লবী-সমাজে বিপ্লবী পরিবর্তন আনার আশায় এমন জিনিসের দাবি করে, যা তার আকাঙ্ক্ষার উল্টোটা এনে হাজির করে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের মৌলিক নিয়মের মধ্যে এই স্ববিরোধী বিকাশ ঘটে। এটা

www.pathagar.com

একই নিয়মের ফল; এ নিয়ম মূল্যহ্রাসের যুদ্ধ বাধায়, যাতে প্রতিটি পুঁজিপতি অপরকে নির্মূল করতে বাধ্য হয়– সে তার অন্যথা করতে পারে না কারণ সবার চূড়ান্ত ধ্বংস পিছিয়ে দেয়া মানে নিজের নিশ্চিত ধ্বংস এগিয়ে আনা। এই প্রবাহ প্রতিটি শিল্পে স্থির পুঁজির পরিমাণকে ক্রমিক হারে বাড়িয়ে দেয়; এর প্রতিক্রিয়ায় সুদের হার হ্রাস পায় এবং দেখা দেয় পরিচিত ধনতান্ত্রিক সংকট যা থেকে নিস্তার পাওয়া শুধু সম্ভব দেশের সম্পদের এক বৃহৎ অংশের ধ্বংসসাধনে। এই একই দ্বন্দ্ব ধনতন্ত্রে বিস্তৃতি আনে, স্বীয় কাঠামোতে নিরন্তর বিপ্লব সাধন করে এবং পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় সাগ্রহ চাপ সৃষ্টি করে। এটি প্রতিনিয়ত সংযোজন ও ট্রাস্টকরণ করে চলেছে এবং এভাবে স্থির পুঁজির অনুপাত বাড়িয়ে শুধু লভ্যাংশের হারের পতন ত্বরান্বিত করে।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার এই দ্বন্দ্ব– যা এর বিপ্লবী বিকাশে সহায়তা করে, একই সঙ্গে এর বিপ্লবী বিনাশেও এগিয়ে আসে। যখন ধনতন্ত্রের বিকাশমান শক্তি সমগ্র পৃথিবীকে করতলগত করেছে তখন সমৃদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্রগুলো একে-অপরের সঙ্গে গুপ্ত বা খোলাখুলি সমরে আবির্ভূত হয় এবং প্রতিযোগী শক্তির বিকাশমুখী কারণাবলীকে তীব্র করে তোলে। উৎপাদিকা শক্তিসমূহ পীড়ন শুরু করে উৎপাদনের সম্পর্কের ওপর। তখন প্রকাশ পায় 'অতিরিক্ত উৎপাদনের' চূড়ান্ত সংকট। সর্বব্যাপী বেকারত্ব, বিশ্বসংকট, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সাধারণ হ্রাস, যুদ্ধ ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ স্ববিরোধের অনিবার্য ফসল তথা লভ্যাংশের হারের পতন, লক্ষণীয় হয়। এই চূড়ান্ত বিকাশ, যেখানে বুর্জোয়া তার স্বাধীনতার সনদকে দেখতে পায় তাকে প্রয়োজনের দাসে পরিণত করার সীলমোহররূপে– তার রচিত কবিতায়ও প্রতিফলিত হয়– সে কবিতা সাম্রাজ্যবাদের ও ফ্যাসীবাদের।

বুর্জোয়ার উত্থান ও স্বাধীনতার প্রধান শর্ত সর্বপ্রকার প্রত্যক্ষ সামাজিক নির্যাতনের মূল উৎপাটন; কিন্তু এটাই অন্যদিকে শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের দাসত্বের কারণ, কেননা পুঁজির পরোক্ষ নির্যাতন অব্যাহত রাখার এটাই উপায় এবং সে লক্ষ্যে তারা রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিপীড়ক যন্ত্রকে ব্যবহার করে। সুতরাং ধনতান্ত্রিক বিকাশের শেষাংশে বুর্জোয়ারা নিজেদের মুখোমুখি দেখে অপর একটি শ্রেণীকে। নতুন শ্রেণীর স্বাধীনতার উপায় হলো শ্রমিক সংগঠনে সংঘবদ্ধ হওয়া, কেননা এটাই মুক্ত সমাজের কাঠোরতা হ্রাস করে। তারা নিজেদের জন্যে স্বাধীনতার ব্যবস্থা করতে পারে শুধু তার ওপর নির্যাতনমূলক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এই শ্রেণী হলো মজুরী শ্রমিক বা প্রলেতারিয়েতদের শ্রেণী। নিজেদের প্রথমে চার্টিস্ট, তারপরে শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে সংগঠিত করে ও সর্বশেষে সচেতন রাজনৈতিক দল কর্তৃক চালিত হয়ে তারা কারখানা আইন, সামাজিক বীমা ও অনুরূপ কিছু নিপীড়নমূলক নিয়ন্ত্রণ পুঁজিপতিদের ওপর চাপিয়ে দেয়– এগুলো হলো বুর্জোয়া অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

কাঠামোর মধ্যে যতদূর স্বাধীনতা পাওয়া যেতে পারে তার ভিত্তি। কিন্তু একটি শ্রেণীর স্বাধীনতা অপর শ্রেণীর স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়ে ওঠে– এটাই হলো ঐ দ্বন্দ্ব যা বর্তমানে নগ্নভাবে আলোকে এসে যায়।

বুর্জোয়া উৎপাদনব্যবস্থা মজুর শ্রেণীর ওপর নিজেরা সংগঠিত হওয়ার কারণসমূহ চাপিয়ে দেয়। বুর্জোয়া অর্থনীতিশ্রমিক সদস্যদের শহরে ও কারখানায় দলবদ্ধ করে এবং তাদেরকে মিলিতভাবে কাজ করায়। বুর্জোয়া শ্রেণী অস্থায়ীভাবে মানুষের মধ্যেকার প্রতিযোগিতাকে সমাধিস্থ করে। সামন্ত নিয়ন্ত্রণকে উৎপাটিত করার জন্যে যখনই তাদের মিত্রতার প্রয়োজন পড়েছে, তখনই মানুষের ভ্রাতৃত্ব বোধের কাছে সে আবেদন করেছে। এটা মজুর শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়েছে এবং রাজনৈতিক দল গঠনে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

এই নতুন শ্রেণী শাসক শ্রেণী রূপে নিজেদের পুরোপুরি নির্বাহী সংগঠন তথা শ্রমিক শক্তির সোভিয়েত গঠনের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আয়ত্ত করে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা থেকে মুক্ত করে বুর্জোয়া শ্রেণীর ওপর চূড়ান্ত 'স্বাধীনতা' চাপিয়ে দেয়– এবং এভাবে স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণার মিথ্যাচারিতাকে উদঘাটিত করে। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর বিলুপ্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে নিহিত সর্বশেষ নিপীড়ক সম্পর্ক লোপ পায় এবং প্রকৃত স্বাধীনতার পথে মানুষ যাত্রা করে।

সর্বহারা বিপ্লব এমন পরিস্থিতিতে সাধিত হয় যা অনিবার্যভাবে বুর্জোয়াদেরকেও নির্মূল করে ও প্রলেতারিয়েত বানায়।

'সুতরাং আগেকার এক যুগে যেমন অভিজাতদের একটা অংশ বুর্জোয়া শ্রেণীর দিকে চলে গিয়েছিল, ঠিক তেমনই এখন বুর্জোয়াদের একটা ভাগ যোগ দেয় শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে, বিশেষ করে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের কিছু-কিছু, যারা ইতিহাসের সমগ্র গতিকে তত্ত্বের দিক থেকে বুঝতে পারার স্তরে নিজেদের তুলতে পেরেছে। সুতরাং তারা তখন রক্ষা করে তাদের বর্তমান স্বার্থ নয়, ভবিষ্যৎ স্বার্থ; নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে তারা গ্রহণ করে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি।

ধনতন্ত্রের চরম বিকাশের পর্যায়ে, নিজেদের ভবিষ্যৎ স্বার্থ রক্ষার্থে বুর্জোয়া আদর্শ-বাদীদের স্বেচ্ছায় দলত্যাগ ও ইংরেজি কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

সুতরাং আমরা ধনতান্ত্রিক কবিতার মৌলিক প্রবাহ উপলব্ধি করতে পারি না যদি না আমরা বুঝি যে, বুর্জোয়া কবিতার বিকাশকে অত দ্রুতবেগে ও অবিরতভাবে এগিয়ে দেওয়ার ভিত্তি যে-স্ববিরোধ, সেটা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান প্রবাহ সৃষ্টি করে যে-স্ববিরোধ এবং যার ফলে স্থির পুঁজির বৃদ্ধি, লভ্যাংশের হারের পতন ও পৌনঃপুনিক

www.pathagar.com

ধনতান্ত্রিক সংকট সৃষ্টি হয়, তারই আদর্শগত প্রতিরূপ, বাস্তবজীবনে বুর্জোয়ারা যার মুখোমুখি হয়, তা অনিবার্যভাবে তার আদর্শ অভিজ্ঞতাকে পরিবর্তিত করে। শিল্পের সংঘবদ্ধ পৃথিবী রসগ্রহণ করে বাস্তব সমাজের সংঘবদ্ধ পৃথিবী থেকে; এটা রচিত হয় সামাজিক ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত কাঠামো ও আবেগের সংমিশ্রণজাত উপকরণ থেকে।

দুই

প্রয়োজনীয়তার চেতনা নয়, বরং সে সম্পর্কিত অজ্ঞানতাই বুর্জোয়ার কাছে স্বাধীনতা। তিনি সমাজকে দাঁড় করিয়ে দেন সেটার মাথার ওপর। তার কাছে প্রবৃত্তিসমূহ 'মুক্ত' কিন্তু সমাজ সর্বত্র সেগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে। শুধু সামন্ত নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, বরং নিজের তৈরি অবস্থার বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের নিরন্তর বিদ্রোহ– এটাই প্রতিটি পদক্ষেপে নিজের কাঠামোকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে বুর্জোয়াকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়।

বুর্জোয়া এমন একজন লোক যে সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততায় বিশ্বাস করে এবং তদ্দ্বারা স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব বলে মনে করে। সে দেখে না যে, মানুষ ততক্ষণই স্বাধীন যতক্ষণ সে তার কাজের নেপথ্যের প্রেরণা সম্পর্কে সচেতন থাকে– যার বিপরীতে রয়েছে মুখের খিঁচুনির প্রতিবর্তী চরিত্রের অনৈকচ্ছিক কাজ বা পৃষ্ঠদেশে ধাক্কা লাগার মতো আরোপিত নির্যাতনমূলক কাজগুলো। কাজের প্রেরণা সম্পর্কে সচেতন হওয়া মানে কারণ সম্পর্কে তথা প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে চেতনা জাগা। কিন্তু বুর্জোয়ার প্রতিবাদ এর বিরুদ্ধে, যেহেতু অদৃষ্টবাদকে সে স্বাধীনচিন্তার পরিপন্থী বলে জান্যে।

নিজের প্রেরণা-সম্পর্কে সচেতন হওয়ার অর্থ স্বাধীনভাবে চিন্তা করা এবং স্বীয় কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চেতনা জাগা। সচেতন না-হওয়ার অর্থ পশুর মতো বা পিঠে ধাক্কা খাওয়া মানুষের মতো প্রবৃত্তিবশে চালিত হয়ে কাজ করা। অন্তর্মুখীন চিন্তা নয়, বরং সংগ্রামের দ্বারা এ চেতনার অধিকারী হওয়া সম্ভব। সে সংগ্রাম হয় বাস্তবতার সঙ্গে যা-তার নিয়মকানুনকে প্রকাশিত করে রাখে এবং সচেতনভাবে সেগুলোকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি মানুষ শেখায়।

এটা মেনে নিতে বুর্জোয়ার অস্বীকৃতির সমান্তরালে চলছে সমাজের প্রতি তার মানোভাব– সে চিন্তা করে যে, সামন্ততন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের মতো সুস্পষ্ট সামাজিক কর্তব্য থেকে মুক্ত থাকাই আসল মুক্তি। কিন্তু একই সঙ্গে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পরিস্থিতি সহগামী লোকদের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান হারে জটিল সম্পর্ক-পরম্পরায় যুক্ত হতে তার কাছে দাবি জানায় । এগুলো চাহিদা ও সরবরাহের নিয়ম চালিত বস্তুনির্ভর বাজারকেন্দ্রিক সম্পর্ক বলে তার কাছে প্রতিভাত হয়। সুতরাং সে এগুলোর প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে অচেতন এবং

www.pathagar.com

তাকে নিজের মুঠোতে আটকে রেখেছে সমাজের যে-প্রকৃত অদৃষ্টবাদ সে-সম্পর্কেও অজ্ঞ। এর কারণেই সে শৃঙ্খলিত। অন্ধ শক্তির দ্বারা সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; সংকট, যুদ্ধ, মন্দা এবং 'অমিত্র' প্রতিদ্বন্দ্বিতার সে-শিকার। তার কার্যকলাপই এসব জিনিস পয়দা করে যদিও পয়দা না-হলেই সে খুশি।

যতক্ষণ মানুষ বহির্বাস্তবের নিয়মাবলী– বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত নিষ্প্রাণ প্রকৃতির অদৃষ্টবাদ বা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাতে পারে ততক্ষণ সে প্রকৃতি থেকে মুক্ত, যেমনটা দেখা যায় মেশিনের বেলায়। স্বাধীনতা এখানেও প্রয়োজনীয়তার চেতনা। পূর্বেকার শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অস্বীকৃত ওই স্বাধীনতার পর্যায়ে বুর্জোয়ারা উন্নীত হতে পারে। কিন্তু উক্ত স্বাধীনতা একক মানুষের ওপর নয়, বরং সংঘবদ্ধ মানুষের ওপর নির্ভরশীল। মেশিনের জটিলতা যত বেশি হয়, সেটা চালানোর জন্যে মানুষের সংগঠন তত ব্যাপক হয়। সুতরাং সমাজে সংঘবদ্ধ হবার নিয়মাবলী না-জেনে মানুষ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি থেকে মুক্ত হতে পারে না। এবং মেশিনপত্রের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের প্রকৃত স্বাধীন হওয়ার সম্ভাবনা যত বৃদ্ধি পায়, অজ্ঞানতার দাসত্বের কথা তত বেশি রূঢ়ভাবে তার মনে জাগ্রত হয়।

উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে নিজেদের চেতনাকে যুক্ত করে যে-অদৃষ্টবাদ, সেটাকে তথা সমাজ প্রকৃতিকে যে-পরিমাণে মানুষ অনুধাবন করে, সে-পরিমাণে ব্যক্তিগতভাবে তার নিজের ওপর এবং সমাজশক্তি হিসেবে প্রকৃতির ওপর প্রভাবকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু বুর্জোয়া অর্থনীতির শর্তগুলোই দাবি করে যে, মুক্ত বাজার ও পণ্য উৎপাদনের কাঠামো দ্বারা সামাজিক সম্পর্কগুলো অবগুণ্ঠিত থাকবে, যাতে মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক-সমূহ দ্রব্যের মধ্যেকার সম্পর্কের আবরণে প্রকাশিত হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ককে মানুষের নিয়ন্ত্রণ করার তথা অদৃষ্টবাদ-সম্পর্কে সচেতন হওয়ার যে কোন দাবিকে 'স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ' বলে বুর্জোয়ারা মনে করে। স্বাধীনতার ওপর এটা এ অর্থে হস্তক্ষেপ যে, এটা বুর্জোয়া হিসেবে তার পদমর্যাদার ওপর হস্তক্ষেপ এবং সমাজে তার সুবিধাভোগী অবস্থান তথা দ্রব্যকে এবং সেজন্যে সমাজের স্বাধীনতাকে একচেটিয়াভাবে কুক্ষিগত করার অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ।

সুতরাং স্বাধীনতা ও প্রবৃত্তির তুলনায় সামাজিক কার্যকলাপ সম্পর্কিত বুর্জোয়া মায়ার (Illusion) মূল নিহিত আছে বুর্জোয়া অর্থনীতির মূল তথা উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে। যখনই কোন বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের পূর্বনির্ধারিত থাকার ব্যাপারে সচেতন হয়, তখনই সে আর বুর্জোয়া থাকে না, কারণ সচেতনতা শুধু ধ্যান নয়, বরং সক্রিয় প্রক্রিয়ার ফসল। সামাজিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ করার পরীক্ষা থেকে এর জন্ম , যেমন করে প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা থেকে প্রাকৃতিক

www.pathagar.com

অদৃষ্টবাদের জন্য। কিন্তু নিজেদের সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করার আগে সেটা করায় তাদের ক্ষমতা থাকতে হবে– অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি উৎপাদনের উপকরণকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা থাকতে হবে। কিন্তু সেটা করা সম্ভব কিভাবে, যখন উপরকণগুলো একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর অধিকার রয়েছে।

সামন্ত সমাজে বুর্জোয়াদের স্বাধীনতা লাভের শর্ত হচ্ছে সামন্ত শাসনের অনুপস্থিতি। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকদের স্বাধীনতালাভের শর্ত হচ্ছে ধনতান্ত্রিক শাসনের অনুপস্থিতি। সম্পূর্ণ মুক্ত সমাজ তথা শ্রেণীহীন সমাজের জন্যেও এটা একটা শর্ত। শুধু সে ধরনের সমাজে তাদের সংশ্লিষ্ট ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধমে সমস্ত মানুষ সামাজিক অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে তাদের চেতনাকে সক্রিয়ভাবে বিকশিত করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত-না বুর্জোয়া হিসেবে তার অবলুপ্তি ঘটে এবং সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের গতিকে সে অনুধাবন করে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীনতার ঐ-সংজ্ঞাকে সে গ্রহণ করে না।

বুর্জোয়া সমাজে অবক্ষয় শুরু হলে স্বাধীনতার বুর্জোয়া ধারণায় দ্বন্দ্বের প্রকৃতি প্রতিভাত হয় এবং সমগ্রভাবে সমাজের স্বাধীনতার সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাধীনতা ক্রমবর্ধমান হারে বৈরী হয়ে ওঠে। সমাজের স্বাধীনতা সমগ্রভাবে এর অর্থনৈতিক উৎপাদনের মধ্যে নিহিত এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের অর্জিত মানুষের স্বাধীনতা তাকেই প্রতিফলিত করে। এগুলো বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শুধু-যে বুর্জোয়ারা নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করে তা নয়, এগুলোর অংশভাগী সমাজের অপরাপর অংশও একই সঙ্গে তা মনে করে এবং বিপ্লবী পদ্ধতিতে ঐ শর্তাবলীকে চ্যালেঞ্জ করতে প্রস্তুত থাকে না। এই অংশও নিষ্ক্রিয়ভাবে সেগুলোকে মেনে নেয়। এ পরিস্থিতি বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণাকে প্রমাণ করে বলে মনে হয়। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণা যথার্থ। কিন্তু এটা একটা মায়া, একটি ভৌতিক মায়া, যা এই পর্যায়ে নিজেকে বাস্তবে প্রকাশিত করে। সামাজিক সম্পর্ককে অস্বীকার করার মাধ্যমে মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করে কেননা সম্পর্কগুলো ছিল সামন্তজীবনের এবং তার ফাঁক-ফোকড় দিয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশের দরুন তা ইতিমধ্যে সেকেলে হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু কোনো শ্রেণীর ওপর অত্যাচার বজায় রাখতে হলে তার জন্যে এমন কিছুটা অবস্থা নিশ্চিত করতে হয় যাতে সে তার দাসোচিত অস্তিত্বটুকু অন্তত চালিয়ে যেতে পারে। ভূমিদাসত্বের যুগে ভূমিদাস নিজেকে কমিউন-সভ্যের পর্যায়ে তুলেছিল ঠিক যেমন সামন্ত স্বৈরতন্ত্রের পেষণতলেও পেটি বুর্জোয়া পেরেছিল বুর্জোয়ারূপে বিকশিত হতে। আধুনিক শ্রমিক কিন্তু যন্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ওপরে ওঠে না, স্বীয় শ্রেণীর অস্তিত্বের যা শর্ত, তারও নিচে ক্রমশ বেশি করে তাকে নেমে যেতে হয়। মজুর হয়ে পড়ে দুঃস্থ, আর দুঃস্থাবস্থা বেড়ে চলে জনসংখ্যা ও সম্পদবৃদ্ধির চেয়ে দ্রুততর তালে । এই সূত্রেই

www.pathagar.com

পরিষ্কার প্রতিপন্ন হয় যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর আর সমাজের শাসক হয়ে থাকার অধিকার নেই। বুর্জোয়া শ্রেণী শাসন চালাবার উপযুক্ত নয়, কারণ তারা দাসত্বের মধ্যে দাসের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে অক্ষম, তাদের এমন অবস্থায় না-নামিয়ে পারে না যেখানে দাসের দৌলতে খাওয়ার বদলে দাসকেই খাওয়াতে হয়। এই বুর্জোয়ার শাসনে সমাজ আর বেঁচে থাকতে পারে না অর্থাৎ অন্য ভাষায় বলতে গেলে তার অস্তিত্ব আর সমাজের সঙ্গে খাপ খায় না।

এই সময়ে সমাজের বিকাশ বস্তুগতভাবে দ্বান্দ্বিক প্রকৃতিকে অস্বীকার করায় স্বাধীনতার বুর্জোয়া ধারণার মধ্যে সেটা আত্মপ্রকাশ করে। অদৃষ্টবাদের সচেতনতাররূপে স্বাধীনতার ধারণায় সেটা উপনিত হয়। তখন মানুষের স্বাধীনতার শর্ত হিসেবে দেখা দেয় সমাজিক-সম্পর্কের নির্ধারক কারণসমূহের তথা উৎপাদিকা শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও প্রলেতারীয় ক্ষমতার জন্যে। এবং তাকে স্বাধীনতার অস্বীকৃতি রূপে অভিহিত করে বুর্জোয়া এর বিরোধিতা করে– (বুর্জোয়ার কাছে অবশ্যই তাই) সেখানে সমগ্র সমাজের পক্ষে কথা বলতে চেষ্টা করে কিন্তু সামাজের অধিকাংশের বিপ্লবী গতি তাকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

সুতরাং স্বাধীনতা-সম্পর্কে বুর্জোয়া মায়া, যা স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অদৃষ্টবাদ ও সমাজের বিপরীতে হাজির করে, একটি সত্যকে পাশ কাটিয়ে যায়। ঐ সত্য হলো যে, সমাজ হচ্ছে এমন একটি সত্য যাকে, ঐ অস্বাধীন ব্যক্তি তথা মানুষ, সংঘবদ্ধভাবে বাস্তবায়িত করে এবং এ ধরনের সংঘবদ্ধতার শর্ত হচ্ছে স্বাধীনতা লাভেরই শর্ত। স্বয়ং এই মায়া হচ্ছে একটি বিশেষ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ফসল এবং বুর্জোয়া শাসনের ভিত্তি বিশেষ সুবিধারই প্রতিফলন। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা টিকে থাকে সে পর্যন্ত সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করে চলে।

অন্যান্য শ্রেণীবিভক্ত সমাজের রয়েছে নিজস্ব মায়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ক্রীতদাসভিত্তিক সমাজ স্বাধীনতাকে দেখে নির্যাতনমূলক সম্পর্কের অনুপস্থিতিতে নয়, বরং ইচ্ছাশক্তির মতো বিশেষ ধরনের নির্যাতনমূলক সম্পর্কের মধ্যে– যেখানে প্রভু নির্দেশ দেয় এবং ক্রীতদাস অধিকারের মতো অন্ধভাবে সেটা পালন করে। এ সমাজে স্বাধীন হওয়ার অর্থ ইচ্ছা করতে পারার স্বাধীনতা কিন্তু শ্রেণীসমূহের বিকাশ ইচ্ছা জ্ঞাপনকারী চেতনাকে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, যে বাস্তবতার সঙ্গে অন্ধভাবে আজ্ঞাবহ ক্রীতদাসকে সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করতে হবে। তা থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক ক্ষয়িষ্ণুতা হচ্ছে প্রয়োজন-সম্পর্কে মানুষের ক্রমবর্ধমান অসচেতনাজাত অস্বাধীনতারই প্রতিফলন– এই অসচেতনতা চেতনার এবং সেটা জন্ম নেয়, স্বাধীনতার বাহক হিসেবে বিবেচিত শ্রেণীটির ক্রমবর্ধমান নিষ্ক্রিয়তার কারণ। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সংগ্রামের মাধ্যমে চেতনার উন্মেষ ঘটে

www.pathagar.com

এবং যখন সে সংগ্রামের অবসান ঘটে, তখনই অন্ধ আঙ্গিক সর্বস্বতায় তার বিলুপ্তি ঘটে।

স্বাধীনতার যথার্থ তাৎপর্য– অর্থাৎ পরিবেশ ও মানুষ এবং এদের পারস্পরিক সংগ্রামের প্রকাশক সমাজকে নির্ধারণ করার ক্ষমতা-বিষয়ক চেতনা-সম্পর্কে ধ্যানের দ্বারা নয়, যা সচেতনতার উন্মেষ ঘটাতে পারে না, বরং সক্রিয় সংগ্রামের মাধ্যমে সচেতন হওয়ার অর্থ ঐ সচেতনতার বিকাশ রুদ্ধ করে রাখে সমাজের যে অন্ধনির্যাতন ও শোষণ, সে সব সম্পর্ককে লোপ করে দেবার সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া। এসবের বিলোপ সাধন মানেই শ্রেণীর বিলোপ-সাধন এবং যথার্থ অর্থে মুক্ত হবার উপায় মানুষের হাতে তুলে দেওয়া; কিন্তু এটা সম্ভব হতে পারে এজন্যে যে, ধনতন্ত্র তার নিজের কবর খননকারীর জন্ম নিজেই দিয়েছে– যে শ্রেণীর টিকে থাকার শর্তই তাদেরকে শুধু যে বিদ্রোহে ঠেলে দেয় এবং সাফল্যজনক শাসনের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে, এমন নয়, বরং এরও নিশ্চয়তা দেয় যে, এর শাসন কেবল তখনই হতে পারে যখন শ্রেণীর জন্মদাতার সকল অধিকার নিশ্চিহ্ন হয়।

তিন

এই মায়ার ক্রমিক আত্ম-উন্মোচন হলো বুর্জোয়া স্বাধীনতার ইতিহাস। আমরা এটাকে দেখতে পারি ম্যাকবেথের মতো ট্র্যাজিক, ফলস্টাফের মন কমিক, 'হেননি পাঁচ' এর মতো উদ্দীপক অথবা 'টিমন অব এথেন্সের' ভুবনের মতো বিরক্তিকর রূপে– এসব দিক এর বিকাশে প্রতিফলিত হয়– অনুরূপ সমান্তরাল বিকাশ ঘটে অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমিতে।

আমরা কি এটা বলিনি যে ট্র্যাজেডি হচ্ছে সর্বদা প্রয়োজনীয়তার সমস্যা? অডিপাসের কাছে ট্র্যাজেডি হাজির হয় ঠিক ঐ আবরণে যদ্বারা ক্রীতদাস-ভিত্তিক সমাজে স্বাধীনতা অর্জিত হয় বলে মনে হয়– অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির আকারে, সমস্ত মানবীয় ইচ্ছাকে অতিক্রমকারী একটি দৈব, অতিকায় শক্তির আকৃতিতে কল্পিত ভাগ্যরূপে। ম্যাকবেথের কাছে ট্র্যাজেডি প্রতিভাত হয় বুর্জোয়া স্বাধীনতার আবরণে : প্রগলভ ধারায় বহির্গত মানুষের মুক্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো পরিস্থিতির দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং এবারে দেখা দেয় উল্টোভাবে– তিনটি ডাইনী দ্বারা অনুমোদিত ম্যাকবেথের আকাঙ্ক্ষাসমূহ আসল নির্যাসের প্রতিবাদস্বরূপ বিপরীত আকাঙ্ক্ষারূপে পুনরায় হাজির হয়। বীরনাম উড ডানসিনানে আসে এবং স্ত্রীলোক দ্বারা জন্ম নেয়নি এমন একজন লোকের দ্বারা নিহত হয়।

সমস্ত বুর্জোয়া কবিতা হচ্ছে বুর্জোয়া মায়ায় প্রবহমানতার প্রতিফলন– ঠিক যে হারে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে বুর্জোয়া অর্থনীতিতে নিহিত দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়। মানুষ অন্ধভাবে অর্থনীতি দ্বারা ছাঁচে তেরি হয়নি; তাদের কাজের ফল হচ্ছে অর্থনীতি এবং এর গতিশীলতা মানুষের প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে। তাহলে, কবিতা হচ্ছে সংঘবদ্ধ মানুষের প্রকৃতি নির্যাসের প্রকাশ এবং তা থেকে সে নিজের সত্য আহরণ করে।

www.pathagar.com

বুর্জোয়া মায়াকে তখন দেখা যায় খোশ-কল্পনারূপে। এবং আদিম পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে উদ্ভট কল্পনার সম্পর্কের মতোই সত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক। কবিতার জন্মভূমি যৌথ উৎসবের মধ্যে কবিতার কল্পভুবন ফসলের আগমনীর ইঙ্গিত দেয় এবং তার মাধ্যমে প্রকৃত ফসল ফলানোকে সম্ভবপর করে। কিন্তু এই যৌথ কল্পনার মায়া আগামী ফসল তোলার শুধু নীরস কপি নয়; ফসল তোলাকে সম্ভবপর করে তোলার জন্য মানুষকে অন্যদের সঙ্গে এবং ফসল তোলার সঙ্গে, তার প্রবৃত্তিসমূহকে প্রকৃতির সঙ্গে এবং অন্যদের সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে অবশ্যই খাপ খাইয়ে নিতে হবে– এসব সত্যের সঙ্গে জড়িত আবেগপ্রবণ জটিলতারই সেটা প্রতিফলন। যৌথ কবিতা অথবা উৎসব, প্রকৃত ফসল তোলার এলোমেলো ছবি হলেও, ফসল তোলার প্রক্রিয়ার সঙ্গে, জড়িয়ে থাকা সংঘবদ্ধ মানুষের প্রবৃত্তিগত খাপ-খাওয়ানোর সূক্ষ্ম আলেখ্য বিশেষ। এটা মানুষের হৃদয়ের প্রকৃত ছবি।

একইভাবে তার সব বৈচিত্র্য ও জটিলতার মধ্যে, বুর্জোয়া কবিতা পরস্পরের সঙ্গে ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রবৃত্তিগত খাপ-খাওয়ানোকে প্রতিফলিত করে; এই খাপ-খাওয়ানো প্রয়োজনীয় ঐসব সামাজিক সম্পর্কে যা মানুষের স্বাধীনতা এনে দেবে। আমরা দেখেছি যে, স্বাধীনতা হচ্ছে মানুষের আত্মবিকাশে সহায়ক সমাজের অর্থনৈতিক উৎপাদনের কাল্পনিক ও কাব্যিক প্রকাশ। অর্থনৈতিক উৎপাদনের মধ্যে আমরা শুধু সমাজের বাণিজ্যিক ও বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করছি না, চেতনাসহ মানুষের সাংস্কৃতিক ও আবেগিক দ্রব্যাদিও এর মধ্যে রয়েছে। সেজন্য, স্বাধীনতা সম্পর্কিত এই যে বুর্জোয়া মায়া, বুর্জোয়া কবিতা হচ্ছে যার প্রকাশ, যতক্ষণ সে তার অস্তিত্বের দ্বারা স্বাধীনতাকে উৎপন্ন করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার একটি বস্তুগত ভিত্তি থাকে– কোন আনুষ্ঠানিক অর্থে আমি এটা বলছি না, আমি বলতে চাই যে, বস্তুগত ফসল উৎপাদন দ্বারা (যেটা আবার আদিম স্বাধীনতার উপায়) যেমন আদিম কবিতার যথার্থতা বোঝা যায়, তেমনিভাবে উৎপাদিত বস্তুগত দ্রব্য দ্বারা সমাজের গতিশীলতায় সৃজিত বুর্জোয়া কবিতার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এই স্বাধীনতা সমগ্র সমাজের নয়, বরং সমাজের উৎপাদিত দ্রব্যের সিংহভাগ কুক্ষিগত করে যে বুর্জোয়া শ্রেণী, তারই স্বাধীনতা।

কারণ স্বাধীনতা কোন অবস্থা নয়, এটা প্রকৃতির সঙ্গে বিশেষ সংগ্রামের একটি নাম। স্বাধীনতা সবসময় আপেক্ষিক, সংগ্রামের সাফল্যের সঙ্গে। স্বাধীনতার প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতনতা, আধিবিদ্যিক সমস্যা-সম্পর্কে শুধু ধ্যান নয়, বরং সমাজের বিশেষ অবস্থায় মানুষের মতো বাঁচাবার ও আচার আচরণেরই নাম। সচেতনতার প্রতিটি স্তর নির্দিষ্টভাবে অর্জিত হয়; শুধু সামাজিক গতিশীলতার দ্বারা সেটা জীবিত বস্তুর মতো রক্ষিত হয়। সে গতিশীলতার নাম আমরা দিয়েছি শ্রম। স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া মায়ার বিবর্তন– প্রথমে

www.pathagar.com

বিজয়ী সত্যরূপে (ধনতন্ত্রের জন্ম ও ক্রমিক সমৃদ্ধি), তারপরে ক্রমোন্মোচিত মিথ্যারূপে (ধনতন্ত্রের অবক্ষয় ও চূড়ান্ত সংকটকালে) এবং সর্বশেষে, এর বিপরীতমুখী যাত্রায়, সামজিক প্রয়োজনীয়তার জীবনবিজয়ী চেতনারূপে (সর্বহারা-বিপ্লবের কালে)– মানুষ, আবেগ, সম্পদ ও চিন্তার এক অতিকায় গতি; এটা পরিশ্রমী, শিক্ষার্থী, দুঃখভোগী ও আশাবাদী মানুষের সামগ্রীক ইতিহাস। প্রবাহের বিস্তৃতি, শক্তি এবং বস্তুগত জটিলতার জন্যে, বুর্জোয়া কবিতাও উজ্জ্বল, সূক্ষ্ম, জটিল ও বহুমাত্রিক। বুর্জোয়া মায়া, যা বুর্জোয়াদের স্বাধীনতার শর্তও বটে, তাদের কবিতায় বিধৃত হয় যেহেতু বুর্জোয়া শ্রেণীর অপর সদস্যদের মতো, বুর্জোয়া কবিও, তাদের জীবনে, তাদের সকল বিজয়ী আবেগে, এর ট্র্যাজেডিতে, এর বিশ্লেষণের ক্ষমতায় এবং এর আধ্যাত্মিক বিরক্তিতে, সেটাকে ধারণ করে। শ্রেণীহীন কম্যুনিস্ট সমাজে সমগ্রভাবে মানুষের স্বাধীনতার শর্ত, তথা সমাজিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বিধৃত হবে কম্যুনিস্ট কবিতাতেও। আধিদৈবিক সূত্র হিসেবে নয়, বরং মানুষের মতো জীবন্তভাবে, তার মূল নির্যাসেই, একটি বিকাশমান সাম্যবাদী সমাজ, যার মধ্যে কবি ও কবিতার পাঠক বাঁচতে পারে, শুধু তার ধারণ সম্ভব।

চার

মানুষের প্রবৃত্তি নিচয়কে– তার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্যের উৎস 'হৃদয়কে' বুর্জোয়া নিজের স্বাধীনতার উৎস মনে করে। এই ধারণা ভুল, যেহেতু আপোসমানা প্রবৃত্তিগুলো অন্ধ ও অমুক্ত। সমাজ-সম্পর্ক দ্বারা পোষ মেনে সেগুলো আবেগের জন্ম দেয়, এবং এই রূপান্তর, আবেগ যার প্রকাশ ও আয়না হলো উপায়স্বরূপ। এর দ্বারা সমাজের মেশিনকে চালাবার জন্যে মানুষের প্রবৃত্তিগত শক্তি ব্যবহার করা হয় : সমাজের ঘূর্ণায়মান মেশিন প্রকৃতির মুখোমুখি হতে ও তার সঙ্গে লড়াই করতে মানুষকে শক্তি জোগায়– কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত ও প্রবৃত্তিতাড়িত উপায়ে নয়, সংঘবদ্ধ ও খাপ খাইয়ে নেয়া মানুষরূপে। সুতরাং প্রবৃত্তিসমূহ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং মানুষকে স্বাধীনতা এনে দেয়। স্বাধীনতা এবং সমাজের সঙ্গে প্রবৃত্তির সম্পর্ক বিষয়ক উক্ত মায়া ও সত্য বুর্জোয়া কবিতার নেপথ্য কাজ এবং এর গোপন শক্তি ও নিরন্তর প্রাণ-প্রাচুর্যের জন্যে দায়ী। সেজন্য, বুর্জোয়া মায়ার নির্যাস তথা বুর্জোয়া অর্থনীতির পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' বা 'স্বাভাবিক মানুষ' সম্পর্কিত বিশেষ বিশ্বাসকে জেনে আমরা বিস্মিত হতে পারি না যে, বুর্জোয়া কবি এমন একজন নিঃসঙ্গ মানুষ, যিনি আপাতভাবে সমাজ থেকে নিজের ভেতরে চোখ ফিরিয়ে সাম্প্রতিক সমাজের প্রয়োজনীয় সম্পর্ককে অধিকতর শক্ত জোরালোভাবে প্রকাশ করেন। বুর্জোয়া কবিতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এই অর্থে যে, এটা তার কালের যৌথ আবেগকে প্রকাশ করে।

www.pathagar.com

পুরাণ কাহিনীর ধর্মে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে মূলত সকল শিল্পকলার সৃষ্টি হয়েছে এবং কবিতা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে পুরাণ কাহিনী থেকে। আমরা দেখেছি যে, সাহিত্যশিল্প হচ্ছে সমাজের স্বতঃস্ফূর্ততার প্রকাশ এবং এর মূল রয়েছে স্বাধীনতায়। স্বতঃস্ফূর্ততার ভিত্তিমূলে রয়েছে আবার সমাজের বস্তুগত উৎপাদন এবং এ উৎপাদন সংঘবদ্ধ মানুষের কাছে যে আবেগ-সম্পর্ক দাবি করে, স্বতঃস্ফূর্ততা হচ্ছে তার এক ধরনের ছাঁচ বিশেষ। এর কারণ এই যে, শিল্পকলা হচ্ছে স্বাধীনতার প্রকাশ, যা উন্নত শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মায়ার প্রকাশ– অবশ্য সমগ্র সমাজের নয়, বরং শুধু শাসক শ্রেণীর। বুর্জোয়া মায়ার বিকাশের পথে, সাহিত্যশিল্পে কবিতা থেকে গল্পাংশ পৃথক হয়ে পড়ে। তরুণতর, আদিমতর ও আবেগের দিক থেকে অধিকতর প্রত্যক্ষ বলে ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে কবিতা প্রবৃত্তি-জারিত আবেগের সঙ্গে জড়িত; কয়লা থেকে বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গের ন্যায় সমাজ-সম্পর্ক দ্বারা প্রবৃত্তিজাত উত্তরের পরিস্থিতির সঙ্গে তার সংশ্লেষ। এটা বুর্জোয়া মায়ার ঐ-অংশকে প্রকাশ করে যা ব্যক্তিমানুষের হৃদয় ও অনুভূতিকে, স্বাধীনতা, জীবন ও বাস্তবতার উৎস হিসেবে বিবেচনা করে; কারণ সামগ্রিকভাবে সমাজের স্বাধীনতা শেষ বিচারে নির্ভর করে ঐসব প্রবৃত্তির চালনার ওপর, প্রকৃতির সঙ্গে যাদের লড়াইয়ের ফলে সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। ভাষার যৌথ ভুবনকে ব্যবহার করতে হয় বলে সমাজের সমস্ত আবেগায়ীত জীবনকে সে এক দৈত্যাকৃতি 'অহং'-এ (যা সবার জন্যে সাধারণ) কেন্দ্রীভূত করে এবং সব মানুষকে এক শ্বাসরুদ্ধকর অভিজ্ঞতা উপহার দেয়।

গল্প গ্রহণ করে কারুকার্যময় কাপড়ের ঢাকনির বিপরীত দিক; এবং পোষমানা ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে প্রবৃত্তিসমূহ সমাজে যেভাবে প্রকাশিত হয়, সেটাকে প্রকাশ করে। এই অবস্থায় বুর্জোয়া সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হয় মানুষ-সম্পর্কে কৌতূহলরূপে, একটি সাধারণ অভিজ্ঞতার নৈর্ব্যক্তিকতায় নয়, বরং বাস্তব জগতে সঞ্চরমান সামাজিক টাইপের চরিত্ররূপে।....

www.pathagar.com

সাহিত্য-শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনেনের আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ : মে ১৯৪২

[কম্যুনিস্ট চীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও সে-তুং (১৮৯৩-১৯৭৬) হুনান প্রদেশের চাষী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যের জন্য রীতিমতো লেখাপড়া করতে পারেননি। তিনি ১৯১৮ সালে স্নাতক হন। পড়াশোনার প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগের কারণে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সদ্যস্য হন এবং এক সময়ে ছিলেন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক। ১৯২০ সাল থেকে তিনি মার্কসবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন ও বিপ্লবী রাজনীতিতে অংশ নিতে শুরু করেন। ১৯৪৯ সালে চীনা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের চেয়ারম্যান হন।
সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি মাও সে-তুং-এর আগ্রহ বরাবরই ছিল। চীনদেশের অতীত ইতিহাস, চিরায়ত সাহিত্য প্রভৃতির তিনি ছিলেন আবাল্য ভক্ত। কর্মমুখর সংগ্রামী জীবনের ফাঁকে তিনি কবিতা লিখতেন। সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর বেশ কয়টি প্রবন্ধ রয়েছে- সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণটি এখানে অনূদিত হলো। ১৯৪২ সালের ২রা মে থেকে ২৩-এ মে পর্যন্ত মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে শিল্প ও সাহিত্যের সম্পর্ক ও সমস্যা আলোচনা করার জন্যে ইয়েনানে এক মুক্ত আলোচনাচক্রের আয়োজন হয়। বর্তমান প্রবন্ধটি সে-পটভূমিতে রচিত। অপ্রয়োজনীয় বিধায় কয়েকটি টীকা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।]

ভূমিকা মে ২, ১৯৪২

কমরেডগণ! এই আলোচনা সভায় আজকে আপনাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ভাবের আদান-প্রদান এবং সাধারণভাবে সাহিত্য-শিল্পসৃষ্টি ও বিপ্লবী কর্মের মধ্যেকার সম্পর্ক পরীক্ষা করার জন্যে। আমাদের লক্ষ্যে হচ্ছে এর নিশ্চয়তা দেওয়া যে, বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্প উন্নয়নের সঠিক পথ অনুসরণ করে এবং জাতীয় মুক্তি অর্জনের ও জাতীয় শত্রুর উৎখাতের মতো বৈপ্লবিক কাজে উন্নততর সাহায্য প্রদান করে।

চীনা জনগণের মুক্তির জন্যে আমাদের লড়াইয়ে বিভিন্ন ফ্রন্ট রয়েছে যার মধ্যে আছে মসী ও বন্দুকের ফ্রন্ট তথা সাংস্কৃতিক ও সামরিক ফ্রন্ট। শত্রুকে পরাস্ত করার জন্যে আমাদের প্রাথমিকভাবে নিশ্চয়ই নির্ভর করতে হবে বন্দুকধারী সেনাদলের ওপর। কিন্তু এই সেনাদল এককভাবে যথেষ্ট নয়; আমাদের অবশ্যই একটি সাংস্কৃতিক বাহিনী থাকতে হবে, যা আমাদের সবাইকে একতাবদ্ধ করার জন্যে ও শত্রুকে পরাভূত করার জন্যে একান্তভাবে অপরিহার্য। ৪ঠা মে-র আন্দোলনের পর [১] চীনদেশে এ ধরনের একটি

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক বাহিনীর কাঠামো গড়ে উঠেছে এবং চীনের সামন্ত সংস্কৃতির, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সেবাদাস মুৎসুদ্দি সংস্কৃতির আওতা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এনে ও সেগুলোর প্রভাব দুর্বল করে চীনা বিপ্লবকে এগিয়ে দিয়েছে। নতুন সংস্কৃতির বিরোধিতা করার জন্যে চীনা প্রতিক্রিয়াশীলরা বর্তমানে শুধু 'পরিমাণ দিয়ে গুণের মোকাবিলা' করতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রতিক্রিয়াশীলদের অর্থ আছে এবং যদিও তারা ভাল কোনকিছুই তৈরি করতে পারে না, তবুও তারা সব কিছু ব্যবহার করতে পারে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় তৈরি করতে পারে। '৪ঠা মে'র আন্দোলনের পর থেকে সাহিত্য ও শিল্প গড়ে উঠেছে ফ্রন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সফল অংশ হিসেবে। দশ বছরের গৃহযুদ্ধের কালে বিপ্লবী সাহিত্য-শিল্প আন্দোলন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ওই আন্দোলন ও বিপ্লবী যুদ্ধ যৌথভাবে একই সাধারণ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছে, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলরা এদেরকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন করে ফেলায় এই দুটো ভ্রাতৃ-সুলভ বাহিনী একসঙ্গে যুক্ত হয়নি। এটা খুবই ভাল যে, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর, অধিক থেকে অধিকতর বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীরা ইয়েনেন ও আমাদের অন্যান্য জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকায় চলে আসছেন। কিন্তু এর স্বাভাবিক অর্থ এই নয় যে, ঘাঁটি এলাকায় আসার ফলে, তাঁরা এই এলাকার লোকদের সঙ্গে নিজেদেরকে ইতিমধ্যে পুরোপুরিভাবে একাত্ম করে ফেলেছেন। এ দুটোকে অবশ্যই পুরোপুরি একাত্ম করতে হবে যদি বিপ্লবী তৎপরতাকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিতে চাই। আমাদের আজকের আলোচনার লক্ষ্য ঠিক এটা নিশ্চিত করা যে, সাহিত্য ও শিল্প সমগ্র বিপ্লবী যন্ত্রে একটা প্রয়োজনীয় অংগ হিসেবে ভালভাবে মিলে যায়, সেগুলো জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও শিক্ষিত করার জন্যে এবং শত্রুকে আক্রমণ ও ধ্বংস করার জন্যে শক্তিশালী অস্ত্রের মতো কাজ করে এবং সেগুলো এক মন ও এক হৃদয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে জনগণকে সাহায্য করে। এই লক্ষ্য অর্জনে কি কি সমস্যা আছে যা অবশ্যই সমাধান করাতে হবে? আমি মনে করি সেগুলো হলো লেখক ও শিল্পির শ্রেণীভূমিকা, মনোভাব, শ্রোতা, রচনা ও অধ্যয়ন সম্পর্কিত সমস্যা।

শ্রেণীভূমিকার সমস্যা। আমাদের ভূমিকা হলো প্রলেতারিয়েতদের ও জনগণের। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যদের কাছে এর অর্থ হলো পার্টির ভূমিকার অনুগত হওয়া, পার্টির প্রেরণা ও কর্মপদ্ধতিকে মান্য করা। আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মীদের মধ্যে এমন কি কেউ আছেন যিনি এখনো সমস্যা অনুধাবনে ভ্রান্তিতে আছেন কিংবা স্বচ্ছ নন? আমি মনে করি আছেন। আমাদের অনেক কমরেড প্রায়শ সঠিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

মনোভাবের সমস্যা। ব্যক্তি বিশেষের অবস্থান থেকে বিশেষ ঘটনার প্রতি বিশেষ মনোভাবের জন্ম হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজনকে কি উপদেশ দিতে হবে, না, তার স্বরূপ উদঘাটন করতে হবে? এটা মনোভাবের প্রশ্ন। কোন মনোভাব আমাদের কাম্য? আমি

www.pathagar.com

বলব দুটোর কথাই। প্রশ্নটা হলো, কাদের সঙ্গে আপন কাজ করছেন? এখানে তিন শ্রেণীর লোক আছেন : শত্রুপক্ষ, যুক্তফ্রন্টে আমাদের মিত্র এবং আমাদের নিজস্ব লোক; শেষোক্তরা হলো জনগণ ও তাঁদের অগ্রবর্তী বাহিনী। এই তিন শ্রেণীর প্রতি আমাদের গ্রহণ করতে হবে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। শত্রুর ব্যাপারে, অর্থাৎ জাপ সাম্রাজ্যবাদ ও জনগণের অন্য সর্ববিধ শত্রুর ব্যাপারে বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীর কর্তব্য হচ্ছে তাদের নৈতাতা ও নিষ্ঠুরতাকে উন্মোচিত করা এবং একই সঙ্গে তাদের পরাজয়ের অনিবার্যতাকে নির্দেশ করা, যাতে তাদের উৎখাত করতে জাপবিরোধী সেনাদল ও জনগণ এক মনে ও এক প্রাণে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত হয়। যুক্তফ্রন্টে আমাদের বিভিন্ন মিত্র সম্পর্কে আমাদের মনোভাব হবে একই সঙ্গে মিত্রতার ও সমালোচনার এবং মিত্রতা হবে বিভিন্ন প্রকারের, সমালোচনাও হবে বিভিন্ন প্রকারের। জাপানের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধে আমরা সমর্থন দেই এবং যে কোন সাফল্যকে প্রশংসা করি। কিন্তু তারা যদি প্রতিরোধ যুদ্ধে সক্রিয় না-হয়, তবে আমাদের উচিত তাদের সমালোচনা করা। কিন্তু কেউ যদি কম্যুনিস্ট পার্টি ও জনগণের বিরোধিতা করে এবং প্রতিক্রিয়ার পথে চলতে থাকে, আমরা দৃঢ়ভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করব। জনগণকে, তাদের শ্রম ও সংগ্রামকে, তাদের সেনাদল ও পার্টিকে আমাদের নিশ্চয়ই প্রশংসা করতে হবে। জনগণেরও অবশ্য সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে অনেকে পাতিবুর্জোয়া ভাবধারা বজায় রাখে, আর কৃষক ও শহুরে পাতিবুর্জোয়া উভয়ের পশ্চাৎপদ ভাবধারা আছে; এগুলো হলো বোঝা যা সংগ্রামকে বাধাগ্রস্ত করে। যাতে তারা বড় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারে তজ্জন্য আমাদের উচিত ধৈর্য ধরা ও দীর্ঘ সময় ব্যয় করে তাদেরকে শিক্ষিত করা এবং ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা মোকাবেলা করে যাতে তারা পিঠ থেকে বোঝা নামাতে পারে সে-কাজে সাহায্য করা। তারা লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নিজেদের পুনর্গঠিত করেছে এবং করে চলেছে, এবং আমাদের সাহিত্য ও শিল্পের উচিত সে-প্রক্রিয়াকে চিত্রিত করা। যতক্ষণ তারা তাদের ভুলের মধ্যে না-থাকে। আমাদের উচিত তাদের নেতিবাচক দিক নিয়ে কালক্ষেপ না-করা এবং শেষপর্যন্ত, তাদেরকে উপহাস করার মতো ভুল যেন আমরা না-করি, অথবা, আরো খারাপ, তাদের শত্রু না-হয়ে উঠি। একতাবদ্ধ হতে, অগ্রগতি করতে, এক মনে এক প্রাণে সামনে এগিয়ে যেতে, যা-পশ্চাৎপদ সেটা পরিত্যাগ করতে এবং যা-বৈপ্লবিক সেটাকে বিকশিত করতে আমাদের লেখা তাদেরকে সাহায্য করা উচিত এবং বিপরীতটা করা নিশ্চতভাবে ঠিক হবে না।

পাঠক-শ্রোতার সমস্যা অর্থ্যাৎ যে-জনগণের জন্যে আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্ম রচিত হয়েছে। সেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত এলাকায় [২] এবং উত্তর ও মধ্যচীনের জাপানবিরোধী ঘাঁটি এলাকায় সমস্যাটি কুওমিনটাং এলাকার থেকে পৃথক এবং তার চেয়ে বেশি পৃথক প্রতিরোধ যুদ্ধপূর্ব সাংহাই এলাকা থেকে। সাংহাই আমলে, বিপ্লবী

www.pathagar.com

সাহিত্যশিল্পের পাঠক-শ্রোতারা প্রধানত গঠিত ছিল ছাত্র, অফিস-কর্মী ও দোকান-সহকারীদের একাংশ দ্বারা। প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, কুওমিনটাং এলাকার পাঠক-শ্রোতার সংখ্যা কিছুটা ব্যাপক হয়, কিন্তু তবু সেটা প্রধানত একই প্রকার লোকের দ্বারা গঠিত ছিল কারণ সেখানকার সরকার শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের বিপ্লবী সাহিত্যশিল্পের পাঠে বাধা সৃষ্টি করেছিল। আমাদের ঘাঁটি এলাকায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। এখানকার সাহিত্য-শিল্পের পাঠক-শ্রোতারা শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও বিপ্লবী ক্যাডারদের সমবায়ে গঠিত। ঘাঁটি এলাকায় ছাত্ররা আছে সত্য, কিন্তু তাঁরা পুরোনো টাইপের ছাত্রদের চেয়ে আলাদা; তারা হয় প্রাক্তন বা ভবিষ্যৎ ক্যাডার। সেনাদলের যোদ্ধা, কারখানার শ্রমিক এবং গ্রামের কৃষক– একবার সাক্ষর হতে পারলে এসব ক্যাডার বইপত্র ও খবরের কাগজ পড়তে চায় এবং যারা নিরক্ষর তারা চায় নাটক ও অপেরা দেখতে, ছবি ও রেখাচিত্র দর্শন করতে, গান গাইতে ও বাজনা শুনতে; এরাই আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকলার দর্শক-পাঠক-শ্রোতা। ক্যাডারদের এককভাবে দেখুন। তারা সংখ্যায় অল্প সেটা ভাববেন না, কুওমিনটাং এলাকায় প্রকাশিত যে কোন পুস্তকের পাঠকসংখ্যাকে তাঁরা অনেকগুণ ছাড়িয়ে যায়। ওখানে, সাধারণভাবে এক সংস্করণে বইয়ের সংখ্যা হয়, ২,০০০ কপি এবং এমনকি, তিন সংস্করণে শুধু ৬,০০০ পর্যন্ত ওঠে; কিন্তু ঘাঁটি এলাকার ক্যাডারদের কথা বলতে গেলে শুধু ইয়েনেনে ১০,০০০-এর বেশি রয়েছে যারা বই পড়েন। এঁদের অনেকে তদুপরি, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ বিপ্লবী, যারা দেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে এসেছেন এবং বিভিন্ন এলাকায় কাজ করতে যাবেন; সেজন্যে তাদের ভেতরে শিক্ষামূলক কার্য চালানো অত্যন্ত বেশি জরুরি। আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মীদের এদিকে অব্যশ্যই ভাল কাজ করতে হবে।

আমাদের শিল্প-সাহিত্যের পাঠক-দর্শক-শ্রোতারা শ্রমিক-কৃষক সৈনিকদের এবং তাদের ক্যাডারদের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ার সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তাদেরকে ভালভাবে বোঝার ও জানার। তাদেরকে ভালভাবে বোঝার ও জানার জন্যে; পার্টির ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের, গ্রাম ও কারখানার, অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর বিভিন্ন লোক ও ঘটনাকে ভালভাবে বোঝার ও জানার জন্যে প্রচুর পরিমাণে কাজ করতে হবে। শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ে আমাদের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নিজের কাজ আছে, কিন্তু তাদের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে জনগণকে বোঝা ও ভাল করে জানা। আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাছে বিষয়গুলো কিভাবে আসছে? আমি বলব যে, জ্ঞানে ও উপলব্ধিতে তারা কিছুটা পিছিয়ে ছিলেন; তারা এমন একজন বীরের মতো 'যার শক্তি প্রদর্শনের কোন উপযুক্ত জায়গা নেই।' জ্ঞানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা বলতে কী বোঝায়? জনগণকে ভালভাবে না-জানা। যাদের কাছে বলেন কিংবা যাদের সম্পর্কে বলেন, তাদের বিষয়ে

www.pathagar.com

লেখক ও শিল্পীদের পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই; সত্যি বলতে কি, তাঁরা ওদের সম্পর্কে অতি সামান্য জানেন। তারা শ্রমিক অথবা কৃষক অথবা সৈনিকদের ভালভাবে জানেন না, এবং ক্যাডারদেরও ঠিকমতো জানেন না। বোঝার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার মানে কী? ভাষা না-বোঝা, অর্থাৎ জনগণের সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত ভাষার সঙ্গে পরিচয় না-থাকা। যেহেতু অনেক লেখক ও শিল্পী জনগণ থেকে দূরে অবস্থান করেন এবং ফাঁপা জীবন যাপন করেন, সেজন্যে স্বভাবতই তাঁরা জনগণের ভাষার সঙ্গে অপরিচিত। এর ফলে, তাঁদের রচনা-যে কেবল ভাষার দিক থেকে নীরস তাই নয় উপরন্তু তাদের ভাষায় এমন অনেক মনগড়া অনুপযুক্ত শব্দ থাকে যা অর্থহীন এবং যা জনপ্রিয় প্রকাশভঙ্গির পরিপন্থী। অনেক কমরেড 'একটি গণরীতি' সম্পর্কে কথা বলতে পছন্দ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা কী বোঝায়? এর অর্থ এই যে, আমাদের লেখক ও শিল্পীদের চিন্তা ও অনুভূতি শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক জনতার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে, তাদেরকে সচেতনভাবে জনগণের ভাষা আয়ত্ত করতে হবে। আপনি কেমন করে সাহিত্যিক ও শৈল্পিক সৃষ্টির কথা বলতে পারেন, যদি জনগণের ভাষা আপনার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়? 'একজন বীর যার শক্তি প্রদর্শনের কোন জায়গা নেই' বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে, আপনার সংগৃহীত বড় বড় সত্য জনগণ কর্তৃক প্রশংসিত হচ্ছে না। যতই আপনি বীর যোদ্ধার ভাবসাব নিয়ে জনগণের সামনে আসেন এবং 'বীরের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, আপনি এসব জিনিস যত বেশি জনসাধারণের সামনে ফেরি করতে চান, তাদের সেসব গ্রহণের সম্ভাবনা ততই কম। যদি আপনি চান যে, জনগণ আপনাকে উপলব্ধি করুক, আপনি যদি তাদের একজন হতে চান, তাহলে একটা দীর্ঘ এবং এমনকি কষ্টকর অভ্যস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া অবশ্যই আপনাকে অতিক্রম করতে হবে। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই কিভাবে আমার অনুভূতি পরিবর্তিত হলো। আমি জীবন শুরু করি ছাত্ররূপে এবং স্কুলে অর্জন করি ছাত্রদের জীবনধারা, ওই সময় সতীর্থ ছাত্রদের উপস্থিতিতে নিজের সামান্য ব্যাগ বহন করার মতো সামান্য কায়িক শ্রম করাকেও আমি অমর্যাদাকর মনে করতাম– ওই ছাত্ররা তাদের কাঁধে বা হাতে কোন জিনিস বহনেই অপারগ ছিল। ওই সময় আমি ভাবতাম যে, বুদ্ধিজীবীরাই পৃথিবীতে একমাত্র পরিচ্ছন্ন লোক এবং সে তুলনায় শ্রমিক-কৃষকরা নোংরা। বুদ্ধিজীবীদের মতো পোশাক পরিধানে আমি কিছুই মনে করতাম না, কারণ সেগুলো আমার কাছে পরিষ্কার মনে হতো, অপরদিকে শ্রমিক বা কৃষকের পোশাককে অপরিষ্কার বিবেচনা করে সেগুলো পরিধান থেকে আমি বিরত থাকতাম। কিন্তু বিপ্লবী হওয়ার পর এবং শ্রমিক-কৃষকের ও বিপ্লবী বাহিনীর সেনাদের সঙ্গে বাসের পর ক্রমান্বয়ে তাদেরকে আমি ভালভাবে জানতে পারলাম এবং তারাও ক্রমান্বয়ে আমাকে বুঝতে পারল। এটা ওই সময় এবং শুধু ওই সময়ই আমি বুর্জোয়া স্কুলে আমার মনে প্রোথিত বুর্জোয়া ও

www.pathagar.com

পাতিবুর্জোয়া ভাবাদর্শ মৌলিকভাবে পরিবর্তিত করলাম। আমি উপলব্ধি করলাম যে, শ্রমিক-কৃষকদের তুলনায় অপরিবর্তিত বুদ্ধিজীবীরা পরিচ্ছন্ন নয় এবং সর্বশেষ বিচারে, শ্রমিক-কৃষকরাই সর্বাধিক পরিষ্কার লোক এবং যদিও তাদের হাত মাটিমাখা ও গোবরমেশানো তবু বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় তারা অধিকতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অনুভূতির পরিবর্তন, একশ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উত্তরণ বলতে যা বোঝায়, এটা ঠিক তাই। বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে আগত আমাদের লেখক ও শিল্পীরা যদি চান যে, তাদের লেখা জনগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হোক, তাদের অবশ্যই তাদের চিন্তা-অনুভূতিকে পরিবর্তিত ও পুনর্গঠিত করতে হবে। এ ধরনের পরিবর্তন বা পুনর্গঠন ছাড়া, তারা কিছুই ভাল করতে পারবেন না এবং বেমানান হবেন।

শেষ সমস্যা হচ্ছে অধ্যয়ন সম্পর্কিত, যদ্বারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সমাজকে অনুধাবন করা আমি বোঝাচ্ছি। যিনি নিজেকে বিপ্লবী মার্কসবাদী লেখক মনে করেন এবং বিশেষ করে যে-লেখক কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য, তাঁর অবশ্যই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। বর্তমানে, অবশ্য মার্কসবাদের মূল ধারণা সম্পর্কে কিছু কমরেডের উপযুক্ত ধারণার অভাব আছে। যেমন, একটা মৌলিক মার্কসবাদী ধারণা হচ্ছে যে, সত্তা নির্ধারণ করে চেতনাকে; শ্রেণীসংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের বাস্তব অবস্থা নির্ধারণ করে আমাদের চিন্তা ও অনুভূতিকে। কিন্তু কিছু কমরেড এটাকে উল্টো করে ফেলেন এবং মনে করেন যে, সব কিছুর উৎস হওয়া উচিত প্রেম। কিন্তু প্রেম সম্পর্কে বলা যায় যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীনির্ভর প্রেমই সম্ভব; কিন্তু আলোচ্য কমরেডগণ চাচ্ছেন শ্রেণীঅতিক্রমী প্রেম,–বিমূর্ত স্বাধীনতা, বিমূর্ত সত্য ও বিমূর্ত মানব প্রকৃতি প্রভৃতি হলো তাদের অন্বিষ্ট। এতে প্রমাণিত হয়, যে, অত্যন্ত গভীরভাবে তারা বুর্জোয়াদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই প্রভাব থেকে তাদের আগাগোড়া মুক্ত হওয়া এবং বিনীতভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করা উচিত। লেখক ও শিল্পীদের সাহিত্য ও শিল্প অধ্যয়ন করা ঠিক, কিন্তু সকল বিপ্লবী কর্তৃক– লেখক বা শিল্পীরা তার বাইরে নয় অবশ্যই মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিজ্ঞানকে অধ্যয়ন করতে হবে। লেখক ও শিল্পীদের সমাজ-সম্পর্কে পড়াশোনা দরকার, অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যার যার অবস্থা, তাদের চেহারা ও মনস্তত্ত্বকে অনুধাবন করা দরকার। যখন এই সব কিছু আমরা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করাতে পারি, তখনই কেবল সমৃদ্ধ বিষয়বস্তু ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহিত্য ও শিল্প আমরা পেতে পারি।

এসব সমস্যা আজকে আমি তুলে ধরছি শুধু উপক্রমণিকা রূপে; আশা করি আপনারা সকলে এসব প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আপনাদের মতামত প্রকাশ করবেন।

www.pathagar.com

উপসংহার মে ২৩, ১৯৪২

কমরেডগণ, এই মাসে আমাদের আলোচনা সভার তিনটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সত্যের অনুসন্ধানে আমরা প্রাণবন্ত বিতর্ক করেছি। এতে পার্টির সদস্য ও পার্টির সদস্য নয় এমন কয়েক কুড়ি কমরেড অংশ নিয়ে ইস্যুগুলোকে খোলাখুলি তুলে ধরেছেন এবং সেগুলোকে অধিকতর মূর্ত করেছেন। এটা, আমি বিশ্বাস করি, সমগ্র সাহিত্যিক ও শৈল্পিক আন্দোলনকে বিপুলভাবে উপকৃত করবে।

কোন সমস্যার আলোচনায় আমাদের উচিত সংজ্ঞা থেকে নয়, বরং বাস্তব অবস্থা থেকে শুরু করা। আমরা ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করব যদি প্রথমে পাঠ্য বইয়ের সাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞা অনুসন্ধান করি এবং পরবর্তী পর্যায়ে, হাল আমলের সাহিত্যিক ও শৈল্পিক আন্দোলনের নির্ধারক নীতিনির্দেশে এবং বর্তমানে উদ্ভূত, বিভিন্ন মত ও বিতর্কের মূল্যায়নে সেগুলো প্রয়োগ করি। আমরা মার্কসবাদী এবং মার্কসবাদ এই শিক্ষা দেয় যে, সমস্যার বিচার করতে বসে আমাদের আরম্ভ করা উচিত বিমূর্ত সংজ্ঞা থেকে নয়, বরং বাস্তব তথ্য থেকে এবং সেগুলোর বিশ্লেষণ করে পথনির্দেশক নীতি, কর্মপদ্ধতি ও উপায় খুঁজে বের করতে হবে। সাহিত্য ও শিল্পকলা বিষয়ে বর্তমান আলোচনায় আমাদের ঠিক একই কাজ করা দরকার।

বর্তমানের বাস্তব অবস্থা কি? তথ্যগুলো হলো : জাপানের বিরুদ্ধে চীন পাঁচ বছর ধরে প্রতিরোধ যুদ্ধ করে আসছে; বিশ্বব্যাপী ফ্যাসীবিরোধী যুদ্ধ; প্রতিরোধ যুদ্ধে চীনের বৃহৎ ভূস্বামী শ্রেণী ও বড় বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতা এবং জনগণের ওপর তাদের চরম নির্যাতন; ৪ঠা মে-র আন্দোলনের পর সাহিত্য-শিল্পে বিপ্লবী আন্দোলন– গত তেইশ বছর ধরে বিপ্লবে মে-আন্দোলনের প্রভাব ও এর বিবিধ সীমাবদ্ধতা; অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর জাপবিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি এবং লেখক ও শিল্পীদের বিপুল সংখ্যায় এসব বাহিনীর সঙ্গে ও শ্রমিক কৃষকের সাথে একাত্মতা প্রকাশ; ঘাঁটি এলাকার ও কুওমিনটাং এলাকার লেখক ও শিল্পীদের পরিবেশ ও দায়িত্বের তারতম্য; এবং সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে ইয়েনেন ও অন্যান্য জাপবিরোধী ঘাঁটি এলাকার যেসব বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এগুলো হলো বাস্তব ঘটনা ও অনস্বীকার্য সত্য। এর আলোকে সমস্যাগুলোকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

তাহলে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু কোনটি? আমার মতে, জনগণের জন্যে কাজ করার সমস্যা এবং কিভাবে কাজ করা যায়– মূলত তার মধ্যে সেটা নিহিত। যদি-না সমস্যা দুটো সমাধান করা হয় বা যথাযথভাবে সমাধান করা হয়, আমাদের লেখক ও শিল্পীরা তাদের পরিবেশ ও দায়িত্বের প্রতি অনুপোযোগী হবেন এবং ভেতর ও বাইরে থেকে সমস্যামালার মুখোমুখি হবেন। আমার সমাপ্তি মন্তব্যগুলো কেন্দ্রীভূত হবে এই সমস্যাদ্বয়ের ওপর এবং কয়েকটা প্রাসঙ্গিক দিকও আলোচনায় আসবে।

www.pathagar.com

এক

প্রথম সমস্যা হলো : কাদের জন্য সাহিত্য ও শিল্প?

মার্কসবাদীরা, বিশেষ করে লেনিন, এর মীমাংসা করে গেছেন বহু আগে। ১৯০৫ এর দিকেই লেনিন জোরালোভাবে বলেছিলেন যে, আমাদের সাহিত্য ও শিল্পের উচিত 'লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের সেবা করা।' [৩] জাপবিরোধী ঘাঁটি এলাকায় সাহিত্যিক ও শৈল্পিক কার্যে নিয়োজিত কমরেডদের কাছে মনে হতে পারে যে, সমস্যাটি ইতিমধ্যেই মীমাংসিত হয়ে গেছে এবং অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে আসল ব্যাপার সেটা নয়। অনেক কমরেড কোন পরিষ্কার সমাধান পাননি। স্বভাবতই, শিল্পকলা ও সাহিত্যের নির্দেশক মূলনীতি সম্পর্কে তাঁদের আবেগ, রচনা, ক্রিয়াকলাপ এবং অভিমত জনগণের প্রয়োজন ও বাস্তব সংগ্রামের সঙ্গে কম-বেশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অবশ্য, মহান মুক্তি সংগ্রামে, কম্যুনিস্ট পার্টি এবং অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর সহযোগী হিসেবে যুদ্ধরত অসংখ্য সংস্কৃতিসেবী, লেখক, শিল্পী এবং অন্যান্য সাহিত্য-শিল্প কর্মীর মধ্যে কেউ কেউ ভাগ্যান্বেষী থাকতে পারে; তারা আমাদের সঙ্গে আছেন সাময়িকভাবে, কিন্তু বিপুলসংখ্যক কর্মী আছেন যারা কাজ করছেন সাধারণ লক্ষ্যে উদ্দীপনার সঙ্গে। এসব কমরেডের ওপর নির্ভর করে সাহিত্য নাটক সঙ্গীত ও ললিতকলায় আমরা উল্লেখ যোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি। এদের মধ্যে অনেক লেখক ও শিল্পী প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর লেখা শুরু করেছেন, অনেকে যুদ্ধের পূর্বে অনেক বিপ্লবী কাজ করেছেন, অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন এবং তাদের কার্যকলাপ ও রচনা দ্বারা বিপুল জনগণকে প্রভাবিত করেছেন। তাহলে কেন আমরা বলি যে, এমনকি এসব কমরেডের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন যারা সাহিত্য ও শিল্প কাদের জন্যে যে-সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণায় পৌছেন নাই? এটা কি চিন্তা করা যায় যে, এখনো কেউ আছেন, বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্প জনগণের জন্যে নয়, বরং শোষক ও অত্যাচারীর জন্য বলে যারা বিশ্বাস করেন?

প্রকৃতপক্ষে এমন সাহিত্য ও শিল্পকর্ম রয়েছে যেগুলো শোষক ও অত্যাচারীর জন্যে? ভূস্বামী শ্রেণীর জন্যে রচিত শিল্প ও সাহিত্য হলো সামন্ত শিল্প ও সাহিত্য। চীনের সামন্তযুগের সাহিত্য ও শিল্প ছিল এ ধরনের। বর্তমানেও চীনে এই সাহিত্য-শিল্পের যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান। বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্যে রচিত সাহিত্য-শিল্পের নাম বুর্জোয়া সাহিত্য ও শিল্প। লিয়াং শি-ছিউর [৪]র মতো লোক– লু সুন যার সমালোচনা করেছেন– বলছেন যে, সাহিত্য ও শিল্পকলা শ্রেণীকে অতিক্রম করে যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো বুর্জোয়া সাহিত্য-শিল্পকে ওপরে তুলে ধরে এবং প্রলেতারীয় সাহিত্যশিল্পকে বাধা দেয়। তারপরে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে কাজ করে যে সাহিত্য ও শিল্প, যেমন চৌ-জুও রেন, চাং জি-পিং [৫]– সেগুলোকে আমরা বলি দেশদ্রোহীর সাহিত্য ও শিল্প। আমাদের কাছে,

www.pathagar.com

সাহিত্য ও শিল্প হলো জনগণের জন্যে, ওপরের কোন গ্রুপের জন্যে নয়। আমরা বলেছি যে, বর্তমান পর্যায়ে চীনের নব্যসংস্কৃতি হলো প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বাধীন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী জনগণের সংস্কৃতি। আজকের দিনে, যা কিছু প্রকৃতই জনগণের জন্যে, সেগুলোকে অবশ্যই প্রলেতারিয়েতদের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন কোন কিছু সম্ভবত জনগণের জন্যে হতে পারে না। স্বভাবতই, নতুন সংস্কৃতির অংশ নতুন সাহিত্য-শিল্পের ব্যাপারেও সেটা প্রযোজ্য। চীন ও বিদেশের অতীত যুগের সাহিত্য-শিল্পে সমৃদ্ধ ভাণ্ডার ও মহৎ ঐতিহ্যকে আমাদের গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু তখনও লক্ষ্য হবে অবশ্যই জনগণের সেবা করা। অতীতের সাহিত্যিক ও শৈল্পিক রূপকে ব্যবহার করায়ও আমরা আপত্তি করব না, কিন্তু আমাদের হাতে সেসব পুরোনো আঙ্গিকও নতুন বিষয়বস্তুর দ্বারা পুনর্নির্মিত ও স্পন্দিত হয়ে জনগণের সেবার লক্ষ্যে এক ধরনের বিপ্লবী রূপ পরিগ্রহ করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে জনগণ কারা? আমাদের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ, মোট সংখ্যার ৯০ শতাংশেরও বেশি হচ্ছে শ্রমিক, সৈনিক ও পাতিবুর্জোয়া। সে জন্যে আমাদের সাহিত্য ও শিল্প প্রথমত শ্রমিকদের জন্যে, যারা বিপ্লবের পরিচালক। দ্বিতীয়ত, সেগুলোকে কৃষকদের জন্যে, বিপ্লবে আমাদের মিত্রদের মধ্যে যারা সংখ্যায় সর্বাধিক ও সর্বাপেক্ষা দৃঢ়চিত্ত। তৃতীয়ত, সেগুলো সশস্ত্র শ্রমিকদের ও কৃষকদের জন্যে, অর্থাৎ যারা অষ্টম রুট বাহিনী, নতুন চতুর্থ বাহিনী ও জনগণের অন্যান্য অস্ত্রধারী অংশের সদস্য। আমাদের বিপ্লবী যুদ্ধের এরাই প্রধানশক্তি। চতুর্থত, সেগুলো শহরে পাতিবুর্জোয়াদের শ্রমজীবী অংশের এবং পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের জন্যেও– বিপ্লবে যারা আমাদের মিত্র এবং আমাদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতায় সক্ষম। এই চার ধরনের লোক নিয়ে চীনাজাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গঠিত। এরাই জনগণের বৃহত্তম ভাগ।

আমাদের সাহিত্য-শিল্প হওয়া উচিত উল্লিখিত চার শ্রেণীর লোকদের জন্যে। আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে পাতিবুর্জোয়াদের নয়, বরং প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীদৃষ্টিকোণ। আজকের দিনে যে-লেখকরা ব্যক্তিসর্বস্ব পাতিবুর্জোয়ার দৃষ্টিকোণ আঁকড়ে ধরে থাকেন, তারা সত্যিকার অর্থে বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষক সৈনিকের সেবা করতে অপারগ। তদের দৃষ্টি প্রধানত নিবদ্ধ থাকে অল্পসংখ্যক পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের দিকে। এটাই মূল কারণ কেন আমাদের কোন কোন কমরেড 'কাদের জন্যে' সমস্যাকে সঠিকভাবে সমাধান করতে পারেন না। এ কথা বলে আমি তত্ত্বগত প্রসঙ্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছি না। তত্ত্বগতভাবে, অথবা কথায়, আমাদের দলের একজনও শ্রমিক কৃষক-সৈনিকদের চেয়ে জনগণকে পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের চাইতে কমগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন না। আমি এখানে বলছি কাজ ও প্রয়োগের কথা। প্রয়োগে ও কাজে, তারা কি

www.pathagar.com

শ্রমিক-কৃষক সৈনিকদের চেয়ে পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন। আমার ধারণা, তারা তা করেন। অনেক কমরেড নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন, পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীকে নিয়ে গবেষণায় ও তার মূলতত্ত্ব বিশ্লেষণে; শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক জনতার নিকটবর্তী হওয়ার, জনগণের ব্যবহারিক সংগ্রামে অংশ নেওয়ার, জনগণকে চিত্রিত করার ও শিক্ষিত করার প্রয়াসে নিজেদের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করার চেয়ে বুদ্ধিজীবীদের চিত্রিত করায় ও তাদের সীমাবদ্ধতা স্খলনে বা সমর্থনে মনোনিবেশ করেন। পাতিবুর্জোয়া শ্রেণী থেকে আসায় নিজেরা বুদ্ধিজীবী হওয়ায় অনেক কমরেড শুধু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বন্ধু সন্ধান করেন এবং তাদেরকে অধ্যয়ন ও বর্ণনা করায় মনোযোগ দেন। সেগুলো যথার্থ হয় যদি প্রলেতারিয়েতের অবস্থান থেকে অধ্যয়ন ও বর্ণনা হয়। কিন্তু তারা যা করেন সেটা তা নয়, কিংবা পুরোপুরি তা নয়। তারা পাতিবুর্জোয়ার অবস্থান গ্রহণ করেন এবং এমন সব রচনা সৃষ্টি করেন যা পাতিবুর্জোয়ার আত্মপ্রকাশ মাত্র– এটা বেশ কটি সাহিত্যিক ও শৈল্পিক রচনা থেকে দেখা যায়। পাতি বুর্জোয়া পটভূমি থেকে আগত বুদ্ধিজীবীদের প্রতি তারা কখনো আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করে, তাদের দোষত্রুটির প্রতি সহানুভূতি জানায়, এমনকি সেটা প্রশংসা পর্যন্ত গড়ায়। অন্যপক্ষে, এই কমরেডরা খুব কমই শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক জনতার সংস্পর্শে আসে, তাদেরকে বোঝে না কিংবা বোজার চেষ্টা করে না, তাদের মধ্যে তাদের (লেখকদের) অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই; তারা আলেখ্য নির্মাণে পটু নয়, তারা যে-ছবি আঁকে, তাতে কাপড়চোপড় হয় শ্রমজীবীর, কিন্তু মুখটা হয় পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর। কখনো কখনো তারা শ্রমিক-কৃষক সৈনিকদের এবং তাদের মধ্যে থেকে আগত ক্যাডারদের প্রতি অনুরক্ত হয়; কিন্তু এমন সময়ও আসে যখন তারা তাদের পছন্দ করে না এবং কোন কোন দিকে অপছন্দ করে; তারা পছন্দ করে না তাদের অনুভূতি, বা তাদের চালচলন, বা তাদের সৃজ্যমান সাহিত্য ও শিল্পকলাকে (দেয়াল সংবাদপত্র, দেয়ালচিত্র, লোকসঙ্গীত এবং লোককাহিনী প্রভৃতি)। কখনো কখনো তারা এসব জিনিসের অনুরাগী হয় কিন্তু সেটা হয় তখন যখন তারা নতুনত্ব-শিকারী হয়, যখন তাদের নিজের রচনাকে কারুকার্য মণ্ডিত করার জন্যে কোন কিছুর দরকার পড়ে অথবা এমনকি যখন কোন প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। অন্য সময়ে তারা খোলাখুলিভাবে এসব জিনিসকে অবজ্ঞা করে এবং পাতিবুর্জোয়া এমনকি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের জিনিসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়। এই কমরেডদের পা রাখা আছে পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের দিকে; অথবা আরো ভদ্রভাবে বলতে গেলে তাদের গভীরতম হৃদয় এখনো পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের রাজ্য। সেজন্যে তারা এখনো করেনি বা পরিষ্কারভাবে করেনি 'কাদের জন্যে সাহিত্য' সমস্যাটির সমাধান। ইয়েনেনে নবাগতদের বেলায় যে এটা প্রযোজ্য এমন নয়; এমনকি যেসব কমরেড

www.pathagar.com

রণক্ষেত্রে ছিলেন এবং আমাদের ঘাঁটিতে অষ্টম রুট বাহিনীতে বা নতুন চতুর্থ বাহিনীতে কয়েক বছর ধরে কাজ করেছেন তাদের অনেকেও পুরোপুরি এর সমাধান করেননি। এর জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘ সময়ের, এমনকি সম্পূর্ণভাবে সমাধানের জন্যে লাগে আট থেকে দশ বছর। কিন্তু যত দীর্ঘ সময়ই লাগুক সমাধান আমদের করতেই হবে এবং করতে হবে দ্ব্যর্থহীনভাবে এবং আগাগোড়া। আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মীদের অবশ্যই এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং অবস্থান বদলাতে হবে; তাদের ঠিক ভেতরে ও ব্যবহারিক সংগ্রামের গভীরে প্রবেশের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এবং মার্কসবাদ ও সমাজ গবেষণার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অবশ্যই ক্রমান্বয়ে তাদের অবস্থান শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক প্রলেতারিয়েতদের পক্ষে সরিয়ে নিতে হবে। শুধু এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেরই আমরা পেতে পারি এমন একটি সাহিত্য ও শিল্প যা হবে যথার্থই শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের জন্যে সত্যিকার অর্থের প্রলেতারীয় সাহিত্য ও শিল্প।

'কাদের জন্য' এই প্রশ্নটি মৌলিক; এটা একটা নীতির প্রশ্ন। অতীতে কোন কোন কমরেডের মধ্যে সৃষ্ট বিতর্ক ও মতভেদ, বিরোধিতা ও বিভেদ নীতির এই মৌলিক প্রশ্নের ওপর নয়, বরং গৌণ প্রশ্নের সঙ্গে, অথবা এমকি নীতিবর্জিত ইস্যুর সঙ্গে জড়িত ছিল। নীতিগত এই প্রশ্নে, অবশ্য দুটো বিবদমান দলের মধ্যে বলতে গেলে কোন বিভেদ ছিল না এবং তারা প্রায় সম্পূর্ণ মতৈক্য দেখিয়েছে; কিয়ৎপরিমাণে, তারা শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়েছে এবং জনগণ থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আমি বলি 'কিয়ৎপরিমাণে', কারণ সাধারণভাবে বলতে গেলে এই কমরেডরা কুওমিনটাংরা যেভাবে শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায় এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, সেভাবে করে না। তবু প্রবণতাটা কিন্তু রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত-না এই মৌলিক সমস্যার সমাধান করা হয়, অন্য অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হবে না। উদাহরণস্বরূপ মনে করেন সাহিত্য ও শিল্প মহলে সংকীর্ণতাবাদের প্রশ্নটি। এটাও একটা নীতির প্রশ্ন, কিন্তু তারও মূলোৎপাটন করা যায় শুধু এই শ্লোগানসমূহ তুলে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রয়োগ করে : 'কৃষক ও শ্রমিকের জন্যে!' 'অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর জন্যে!' এবং 'জনগণের মধ্যে যাও!' অন্যথায় সংকীর্ণতার সমস্যাকে কখনো সমাধান করা যাবে না। লুসুন একদা বলেছিলেন :

'একটি ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তোলার পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি সাধারণ লক্ষ্য থাকা। আমাদের ফ্রন্ট যে একতাবদ্ধ নয় এই ঘটনা দেখিয়ে দেয় যে, আমরা আমাদের লক্ষ্যসমূহকে একত্র করতে সক্ষম হইনি এবং কিছু কিছু লোক শুধু ক্ষুদ্র দলসমূহের জন্যে কাজ করছে এবং প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্যেই কাজ করে চলছে। শ্রমিক ও কৃষক জনতার সেবার লক্ষ্য যদি আমাদের হয়, তবে আমাদের ফ্রন্ট অবশ্যই সম্মিলিত হবে।' [৬]

www.pathagar.com

ওই সময় সমস্যাটি ছিল সাংহাইয়ে; বর্তমানে এটা চুংকিং-এও আছে। ওই সব জায়গায় এর আগাগোড়া সমাধান সম্পূর্ণভাবে করা যাবে না, কারণ সেখানকার শাসকবর্গ বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের ওপর অত্যাচার করে এবং তাদেরকে শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক জনতার মাঝখানে যাবার স্বাধীনতা দেয় না। আমাদের এখানে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে সক্রিয় হতে আমরা বিপ্লবী লেখক-শিল্পীদের উৎসাহিত করি; জনগণের মাঝখানে যাওয়ার বেলায় এবং একটি যথার্থ বিপ্লবী সাহিত্যশিল্প সৃষ্টিতে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন। সুতরাং, এখানে আমাদের মধ্যে সমস্যাটির সমাধান প্রায় হয়ে এসেছে । কিন্তু সমাধান হয়ে আসা আর সম্পূর্ণ আগাগোড়া সমাধান হয়ে যাওয়া সমার্থক নয়। যেমন আমরা আগে বলেছি, সম্পূর্ণ ও আগাগোড়া সমাধানের লক্ষ্যে আমাদেরকে অবশ্য মার্কসবাদ ও সমাজকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে। মার্কসবাদ বলতে আমরা বোঝাচ্ছি জীবন্ত মার্কসবাদ যা জনগণের জীবনে ও সংগ্রামে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, যা শুধু লেখায় সীমাবদ্ধ থাকে না। লেখায় সীমাবদ্ধ মার্কসবাদ বাস্তব জীবনের মার্কসবাদের রূপান্তরিত হলে, সংকীর্ণতাবাদের দোষ আর থাকবে না। শুধু যে সংকীর্ণতাবাদের সমস্যার সমাধান হবে এমন নয়, অন্য অনেক সমস্যাও তার সাথে কেটে যাবে।

দুই

'কাদের সেবা করব' এই সমস্যার নিরসনের পর আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নের মুখোমুখি হই– কিভাবে সেবা করব? আমাদের কয়েকজন কমরেডের ভাষায় বলতে গেলে : আমরা কি মান-উন্নয়নের কাজে মনোনিবেশ করব, না, জনপ্রিয় করার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করব?

অতীতকালে কিছু কমরেড কিয়ৎপরিমাণে বা এমনকি গুরুতরভাবে, জনপ্রিয় করার ব্যাপারটিকে ছোট ও অবহেলা করেছেন এবং অনাবশ্যক জোর দিয়েছেন মানোন্নয়নের ওপর। মানোন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া উচিত, কিন্তু সেটা একতরফাভাবে, এককভাবে ও মাত্রাতিরিক্তভাবে করা ভুল। 'কাদের জন্যে' এই সমস্যার পরিষ্কার সমাধানের অভাব, যার কথা আমি আগে বলেছি, এই প্রসঙ্গেও প্রকাশ পায়। যেহেতু এই কমরেডরা 'কাদের জন্যে' সমস্যাটির ব্যাপারে স্পষ্ট নয়, 'মানোন্নয়ন' বা 'জনপ্রিয়করণ'-এর যে-কথা তারা বলেন সে-সম্পর্কেও তাদের কোন পরিচ্ছন্ন ধারণা নেই এবং স্বভাবতই এতদুভয়ের যথার্থ সম্পর্ক নির্ণয়েও তারা কম সক্ষম। আমাদের সাহিত্য ও শিল্প মূলত কৃষক শ্রমিক ও সৈনিকদের জন্যে বিধায় জনপ্রিয়করণের অর্থ তাদের মধ্যে জনপ্রিয় করা এবং 'মানোন্নয়ন' বলতে বোঝায় তাদের বর্তমান স্তরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাদের মধ্যে আমরা কী জনপ্রিয় করব ? সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণীর কাছে যা প্রয়োজনীয় ও সহজে গ্রহণযোগ্য সেটা

www.pathagar.com

জনপ্রিয় করা? বুর্জোয়াদের কাছে যা জনপ্রিয় এবং সহজে গ্রহণযোগ্য সেটা জনপ্রিয় করা? পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের কাছে যা প্রয়োজনীয় এবং সহজে গ্রহণযোগ্য সেটা জনপ্রিয় করা? না, এগুলোর কোনটাই চলবে না। আমাদের জনপ্রিয় করতে হবে সেগুলো যা শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের কাছে প্রয়োজনীয় এবং সহজে গ্রহণযোগ্য। স্বভাবতই, শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের শিক্ষিত করে তোলার পূর্বে তাদের কাছ থেকে শেখার কাজটি রয়েছে। এমনকি, মানোন্নয়নের বেলায় সেটা অধিকতর সত্য। এমন এমন একটি ভিত্তি অবশ্যই থাকা দরকার যেখান থেকে উন্নতি করা হবে। উদাহরণস্বরূপ এক বালতি জলের কথা ধরুন; যদি ভূমি না-হয় তবে কোথা থেকে এটাকে টেনে তুলতে হবে? বায়ুস্তরের মাঝ থেকে? তাহলে শিল্প ও সাহিত্যকে কোন ভিত্তি থেকে ওপরে তুলতে হবে? সামন্তশ্রেণীর পর্যায় থেকে? বুর্জোয়া শ্রেণীর পর্যায় থেকে? পাতিবুর্জোয় বুদ্ধিজীবীদের পর্যায় থেকে? না, এগুলোর কোন একটির পর্যায় নয়; শুধু শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক জনতার পর্যায় থেকে? এটা বলতে অবশ্য বোঝায় না যে, শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের সামন্তশ্রেণী, বুর্জোয়া শ্রেণী বা পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের 'উচ্চতায়' উন্নীত করা; এর অর্থ শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের প্রলেতারিয়েতদের চেতনায় উন্নীত করার লক্ষ্যে সাহিত্য ও শিল্পকলার মানকে উন্নীত করা। এখানে পুনর্বার প্রসঙ্গটি আসে শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণের। শুধু শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের কাছ থেকে যাত্রা করে 'জনপ্রিয়করণ' ও 'মানোন্নয়ন' এবং এ-দুয়ের মধ্যকার যথার্থ সম্পর্ক বিষয়ে আমরা সঠিক উপলব্ধি পেতে পারব।

শেষ বিচারে, সমস্ত সাহিত্য ও শিল্পের উৎস কী? আদর্শগত কাঠামোরূপে, সাহিত্য ও শিল্পকলা হলো মানবমস্তিষ্কে বিশেষ সমাজজীবনের প্রতিফলনের ফসল। বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্পকলা হলো বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের মস্তিষ্কে মনুষ্যজীবনের প্রতিফলনের ফসল। মানবজীবন সবসময় সাহিত্য ও শিল্পের জন্যে কাঁচামালের খনিস্বরূপ– ঐ মালমসলা স্বাভাবিক আকৃতিতে বা অমার্জিত প্রকৃতিতে থাকলে হয় সবচেয়ে প্রাণবান, সমৃদ্ধ ও মৌলিক; এর তুলনায় সাহিত্য ও শিল্পকলাকে নিষ্প্রভ মনে হয়; এগুলো সাহিত্য ও শিল্পকে উপহার দেয় অফুরন্ত উৎসের এবং একমাত্র উৎসের। এগুলোই একমাত্র উৎস, কেননা এর অতিরিক্ত অন্য কোন উৎস নেই। কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন এর বাইরে বইপত্রে, প্রাচীনযুগে ও ভিন্‌দেশের সাহিত্য ও শিল্পে কি অন্য একটি উৎস নেই? প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকালের সাহিত্য ও শিল্প উৎস নয়, বরং একটি স্রোতধারা বিশেষ– তাদের কালের ও স্থানের জনসাধারণের জীবনে প্রাপ্ত সাহিত্যিক-শৈল্পিক কাঁচামালের ভিত্তিতে আমাদের পূর্বপুরুষ ও ভিন্‌দেশীরা সেগুলো রচনা করেছিলেন। সাহিত্যিক ও শৈল্পিক ঐতিহ্যের সব সুন্দর জিনিসকে আমাদের অবশ্যই নিতে হবে, যা-কিছু উপকারী সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে আত্মস্থ করতে হবে এবং আমাদের নিজের কালের ও স্থানের

www.pathagar.com

মানবজীবনের সাহিত্যিক ও শৈল্পিক কাঁচামালের ভিত্তিতে রচিত কর্মের সঙ্গে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণের জন্যে সে-ঐতিহ্য সৃষ্টি করে একটি তারতম্যের– যে তারতম্য অমার্জিত ও মার্জিতের, সূক্ষ্মতার ও স্থূলতার, নিম্নস্তর ও উচ্চস্তরের, ধীর গতির ও দ্রুত গতির। সুতরাং কোন অবস্থায়ই প্রাচীন ও বিদেশী সম্ভারকে আমাদের পরিত্যাগ করা চলবে না বা সেগুলো থেকে শিক্ষাগ্রহণে বিরত থাকা চলবে না– হতে পারে সেগুলো বুর্জোয়া বা সামন্তশ্রেণীর সৃষ্টি। কিন্তু উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করার সময় বা সেগুলোকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে আমাদের নিজস্ব সৃজনশীল কর্মের স্থানে সেগুলোকে কখনো স্থাপন করব না। সেটা কোনমতেই সম্ভব নয়। প্রাচীন ও বিদেশী সাহিত্যকে নির্বিচারে গ্রহণ করা ও নকল করা হলো সাহিত্য ও শিল্পে সর্বাধিক বন্ধ্যা ও ক্ষতিকর গোঁড়ামীবাদ। চীনের বিপ্লবী সম্ভাবনাময় লেখক ও শিল্পীদের অবশ্যই জনগণের মধ্যে যেতে হবে; সকল লোককে, সকল শ্রেণীকে, সমগ্র জনসাধারণকে, জীবন ও সংগ্রামের প্রাণবন্ত সর্বাধিক রূপরীতিকে, সাহিত্য ও শিল্পের সমস্ত কাঁচা উপাদানকে পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধি, সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ করার জন্যে তাদেরকে দীর্ঘ সময়ের জন্যে নির্দ্বিধায় ও সর্বান্তকরণে শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক জনতার মধ্যে, সংগ্রামের উত্তপ্ত এলাকায় প্রবেশ করতে হবে, প্রবেশ করতে হবে বৃহত্তম ও সমৃদ্ধতম একমাত্র উৎসে। শুধু তখনই তারা সৃজনশীল কর্মে এগুতে পারে। অন্যথায়, কাজ করার আপনাদের কিছুই থাকবে না এবং অন্তঃসারশূন্য লেখক ও শিল্পী ব্যতীত আপনারা কিছুই হবেন না, যাদের কথা উইলে উল্লেখ করে লু সুন তার পুত্রকে সেসব হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। [৭]

যদিও সাহিত্য ও শিল্পের একমাত্র উৎস হচ্ছে মানুষের সমাজজীবন এবং সেটা বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখতে গেলে তুলনাহীনভাবে প্রাণবন্ত ও সমৃদ্ধ, তবু জনগণ শুধু জীবন নিয়ে তৃপ্ত নয়, তারা একই সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্পের অভিজ্ঞতাও পেতে চায়। এর কারণ কি? কারণ দুটোই সৌন্দর্যমণ্ডিত হলেও, সাহিত্যে ও শিল্পে প্রতিফলিত জীবন উচ্চতর মার্গের, তীব্রতর, অধিকতর সংহত, বেশি প্রতিনিধিত্বশীল ও আদর্শরূপের অধিকতর নিকটবর্তী হতে পারে, হওয়া উচিত এবং সেজন্যেই দৈনন্দিন জীবনের চেয়ে বাস্তব অধিকতর সর্বজনীন। বিপ্লবী সাহিত্য-শিল্পকে বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে বিচিত্র ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে এবং ইতিহাসকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে জনগণের সাহায্যে আসতে হবে। উদহরণস্বরূপ বলা যায়, সমাজে একদিকে আছে ক্ষুধা, শৈত্য ও নির্যাতন, অপর দিকে মানুষের ওপর মানুষের শোষণ ও নির্যাতন। এ-সত্য সর্বত্র বিরাজিত এবং মানুষ এগুলোকে গতানুগতিক ঘটনা হিসেবে দেখে। লেখক ও শিল্পীরা এ ধরনের দৈনন্দিন ঘটনাকে কেন্দ্রীভূত করেন, সেগুলোর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামকে

www.pathagar.com

প্রতিনিধিত্বশীল রূপ দেন এবং এ ধরনের শিল্পসৃষ্টি করেন যা জনগণকে জাগ্রত করে, তাদের মধ্যে উৎসাহের আগুন জ্বালায় এবং পরিবেশকে বদলানোর জন্যে একতাবদ্ধ হতে ও সংগ্রাম করতে বাধ্য করে। এ ধরনের সাহিত্য ছাড়া এ কাজ করা সম্ভব হবে না, অন্ততপক্ষে কার্যকরভাবে ও দ্রুতবেগে।

সাহিত্য ও শিল্পের জনপ্রিয়করণ ও মানোন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক বা কী? জনপ্রিয় রচনা সহজতর ও সরলতর এবং সেজন্যে বৃহৎ জনসমষ্টির কাছে বর্তমানে খুব সহজে গ্রহণযোগ্য। উচ্চতর মানের রচনাকর্ম প্রসাধিত বিধায় লেখা অধিকতর কষ্টসাধ্য এবং বর্তমানে সাধারণত অত সহজে ও তাড়াতাড়ি জনগণের মধ্যে প্রচারিত হয় না। শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকরা যে-সমস্যার সম্মুখিন হয় তা এই : বর্তমানে তারা শত্রুর সঙ্গে এক তিক্ত ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত কিন্তু সামন্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা দীর্ঘদিনের শাসনের ফলে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত। সংগ্রামে উৎসাহ পেতে ও বিজয়ে নিশ্চয়তা বৃদ্ধি করতে, ঐক্যকে জোরদার করার ও এক মনে এক প্রাণে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যে তারা আগ্রহভরে আলো, শিক্ষা ও এমন ধরনের সাহিত্যকর্ম চাচ্ছে যা জরুরী প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং যার মর্ম তারা সহজে গ্রহণে সক্ষম। তাদের কাছে প্রাথমিক প্রয়োজন 'রেশমী চাদরের ওপর ফুলের আরো সূচীকর্ম' নয়, বরং 'তুষারের আবহাওয়ায় জ্বালানি কাঠ'। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেজন্যে জনপ্রিয়করণই অধিকতর জরুরি কর্ম। জনপ্রিয় করাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা বা অবহেলা করা ভুল হবে।

তথাপি, জনপ্রিয়করণ ও মানোন্নয়নের মধ্যে কোন স্পষ্ট বিভেদ রেখা অঙ্কন করা সম্ভব নয়। শুধু-যে বর্তমানেও কিছু উন্নতমানের রচনাকে জনপ্রিয় করা সম্ভব তা নয়, বরং বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মানও দৃঢ়গতিতে উন্নত হচ্ছে। যদি জনপ্রিয় করা স্থায়ীভাবে একই পর্যায়ে থাকে, যদি মাসের-পর-মাস, বছরের-পর-বছর একই জিনিস পরিবেশিত হয়,– একই 'ছোট রাখাল বালক' [৮] এবং একই 'মানুষ, হাত, মুখ, ছুরি, গরু, ছাগল, [৯]-এর কথা বলা হয়, তাহলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কি একই মানে এসে দাঁড়াবে না, অর্থাৎ একজন হবে ছয়ের মধ্যে এক অপরজন হবে আধা ডজনের মধ্যে এক? এ ধরনের জনপ্রিয়করণের অর্থ কী দাঁড়াবে? জনগণ জনপ্রিয় জিনিস এবং তার পরে, উন্নত মানের জিনিস দাবি করেন। তারা মাসের-পর মাস, বছরের-পর বছর উন্নত মানের রচনা দাবি করেন। এখানে জনপ্রিয় করার অর্থ হচ্ছে জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করা এবং মানোন্নয়ন বলতে বোঝানো হচ্ছে জনগণের সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি সাধন। এবং এ ধরনের মানোন্নয়ন হওয়ার মধ্যে নয় বা রুদ্ধ দরজার পেছনে বসে নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে এর ভিত্তি জনপ্রিয়তাই। জনপ্রিয়তা দ্বারাই এটা নির্ধারিত হয় এবং জনপ্রিয়তাকেও পরিচালিত করে। সামগ্রিকভাবে চীন দেশে বিপ্লব ও বিপ্লবী সংস্কৃতির বিকাশ অসম; এবং এর বিস্তৃতি ঘটছে

www.pathagar.com

ক্রমান্বয়ে। এক অঞ্চলে জনপ্রিয়করণ চলছে এবং তার ভিত্তিতে পরবর্তী স্তরে মানোন্নয়ন হচ্ছে; আবার অন্য অঞ্চলে জনপ্রিয় করার কাজ শুরুই হয়নি। সুতরাং এক অঞ্চলের জনপ্রিয় করার ভিত্তিতে মানোন্নয়নের মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে অন্য অঞ্চলে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং পথমধ্যস্থ চড়াই-উৎরাইকে পরিহার করে জনপ্রিয় করায় ও মানোন্নয়ন করায় পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করতে পারে।

আন্তর্জাতিকভাবে, বিদেশের, বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়ার সুন্দর অভিজ্ঞতাও আমাদের পথ দেখাতে পারে। সুতরাং আমাদের কাছে, মানোন্নয়ন জনপ্রিয়করণের ওপর নির্ভরশীল এবং জনপ্রিয়করণ পরিচালিত হবে মানোন্নয়ন দ্বারা। ঠিক এ কারণেই, এ পর্যন্ত মানোন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক হওয়ার পরিবর্তে জনপ্রিয়করণের যে-কর্মসূচির কথা আমরা বলছি, সেটা সীমিত পরিসরে পরিচালিত মানোন্নয়নের কাজে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বৃহত্তর পরিসরে ভবিষ্যতে মানোন্নয়নের জন্যে কাজ করার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ প্রস্তুত করছে।

জনপ্রিয়করণের এ ধরনের কাজ যা জনগণের প্রয়োজনকে সরাসরি মেটায়, তার বাইরে আর এক ধরনের কাজ আছে যা পরোক্ষ প্রয়োজন মেটায়– অর্থাৎ যেগুলো ক্যাডারদের প্রয়োজন আসে। ক্যাডাররা হলেন জনগণের প্রাগ্রসর অংশ এবং সাধারণ ভাবে অধিকতর শিক্ষায় শিক্ষিত। তাদের জন্যে একান্তভাবে দরকার হলো উচ্চস্তরের সাহিত্য ও শিল্পের। এটা ভুলে থাকা হবে ভুল। ক্যাডারদের জন্যে যা-ই করা হয়, সেটা পুরোপুরি জনগণের কাজে আসে; শুধু ক্যাডারদের মধ্যে দিয়েই আমরা যদি এই লক্ষ্যের উলটা দিকে যাই, যদি ক্যাডারদেরকে প্রদত্ত জ্ঞান জনগণকে শিক্ষিত ও পরিচালিত করতে তাদের সাহায্য না-করে, মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের কাজ হবে লক্ষ্যহীনভাবে গুলি ছোড়ার মতো এবং জনগণকে সেবা করার মৌলিক নীতি থেকে বিচ্যুত।

উপসংহারে বলা যায়, বিপ্লবী লেখক-শিল্পীদের সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমে লোকজীবনে প্রাপ্ত কাঁচামালগুলোকে জনগণকে সেবা করার জন্য সাহিত্য ও শিল্পের আদর্শগত কাঠামোতে রূপ দেওয়া হয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রাথমিক স্তরের শিল্পসাহিত্যের ভিত্তিতে রচিত উন্নততর সৃষ্টিসমূহ। এগুলো জনগণের মানোন্নীত অংশের প্রয়োজনে আসে, বা, আরো তাৎক্ষণিকভাবে কাজে লাগে ক্যাডারদের। এখানে প্রাথমিক স্তরের রচনাগুলোও অন্তর্ভুক্ত আছে যেগুলো, বিপরীত পক্ষে, উন্নত শিল্পসাহিত্যের আদর্শে সৃষ্ট এবং বর্তমানে, প্রথমত জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রয়োজনে লাগে। উন্নত স্তরের বা প্রাথমিক স্তরের যাই হোক না কেন, আমাদের সমস্ত সাহিত্য-শিল্পকলা জনগণের জন্যে এবং মুখ্যত শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের জন্যে; এগুলো রচিত হয়েছে শ্রমিক-কৃষকদের জন্যে এবং তাদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

এখন যেহেতু আমরা জনপ্রিয়করণ ও মানোন্নয়ন এ দুয়ের মধ্যকার সমস্যার মীমাংসা করেছি, শিল্প-সাহিত্যের বিশেষজ্ঞও সেগুলোকে জনপ্রিয় করার কার্যে নিয়োজিত কর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্কও মীমাংসা করা যেতে পারে। আমাদের বিশেষজ্ঞরা শুধু ক্যাডারদের জন্যে নন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মুখ্যত জনগণের জন্যেও বটে। জনসাধারণের দেয়াল পত্রিকা এবং সেনাবাহিনীতে ও গ্রামাঞ্চলে প্রস্তুত রিপোর্ট– সেসবের দিকে নজর দেওয়া উচিত আমাদের বিশেষজ্ঞদের। সেনাবাহিনীর ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র নাট্যদলের প্রতি আমাদের নাট্য বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। জনগণের সঙ্গীতের প্রতি মনোনিবেশ করার প্রয়োজন সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের, ললিতকলা বিশেষজ্ঞদের নজর দিতে হবে জনগণের ললিতকলার দিকে। শিল্প-সাহিত্যকে জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করার কাজে নিয়োজিত কমরেডদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করার প্রয়োজন আছে। একদিকে তাঁদের সাহায্য ও পরিচালিত করা উচিত জনপ্রিয় করার কাজে নিয়োজিত কর্মীদের, অপরদিকে ওদের কাছ থেকে শেখা উচিত; তার পাশাপাশি জনজীবন থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে নিজেদের পুনর্জীবিত ও সমৃদ্ধ করে তুলবেন যাতে জনগণ ও বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং বিষয়, বা জীবনবিবিক্ত হয়ে তাদের বিশেষজ্ঞান 'গজদন্তমিনারবাসী' না-হয়ে ওঠে। বিশেষজ্ঞদের আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত, কারণ আমাদের কাজের জন্যে তাঁরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাঁদেরকে জানানো দরকার যে, যদি তিনি জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 'ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত না-হন, তাদের চিন্তা-অনুভূতিকে বাণীরূপ না-দেন এবং একজন অনুগত মুখপাত্র হিসেবে তাদের সেবা না-করেন, তবে কোন বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষে অর্থবহ কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। শুধু তাদের পক্ষে কথা বলে তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন এবং শুধু তাদের ছাত্র হয়ে তিনি তাদের শিক্ষক হতে পারেন। যদি তিনি নিজেকে মাস্টার মশাই হিসেবে ভাবেন, নিচু জাতের লোকদের' ওপর প্রভুত্বকারী অভিজাত হিসেবে নিজেকে দেখেন, তাহলে, যত বড় প্রতিভাধরই তিনি হোন না কেন, জনগণের কাছে তিনি আদৃত হবেন না এবং তার রচনারও কোন ভবিষ্যৎ থাকবে না।

আমাদের এই মনোভাব কি 'উপযোগবাদের'? বস্তুবাদীরা সামন্ত শ্রেণী, বুর্জোয়া শ্রেণী ও পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীর উপযোগবাদ ব্যতীত সাধারণভাবে উপযোগবাদের বিরোধিতা করেন না, তারা ওই মোনাফেকদের বিরোধিতা করেন যারা কথায় উপযোগবাদকে আক্রমণ করে কিন্তু কাজের বেলায় আলিঙ্গন করে সবচেয়ে বেশি স্বার্থপর ও অদূরদর্শী উপযোগবাদকে। পৃথিবীতে এমন কোন 'ইজম' নেই, যা উপযোগবাদকে অতিক্রম করে যায়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শুধু এই শ্রেণীর বা ওই শ্রেণীর উপযোগবাদ থাকতে পারে। আমরা প্রলেতারীয় বিপ্লবী উপযোগবাদী– আমরা কাজ আরম্ভ করি লোকসংখ্যার ৯০ শতাংশের, ঐ ব্যাপকতম জনগণের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থের ঐক্যের বিবেচনা থেকে, সেজন্যে, শুধু

www.pathagar.com

আংশিক ও তাৎক্ষণিকের মতো সংকীর্ণ উপযোগবাদ নয়, বরং ব্যাপকতম ও সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সামনে রেখে আমরা বিপ্লবী উপযোগবাদী। যদি, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উপযোগবাদের অনুসারী বলে আপনারা জনসাধারণকে গাল দেন, অথচ নিজেদের স্বার্থে বা ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীর খাতিরে কোন রচনাকর্মকে জোর করে বাজারে চাপিয়ে দেন এবং তাদের মধ্যে প্রচার করেন, যা অল্পলোকের কাছে সন্তোষজনক কিন্তু অধিকাংশের কাছে অপ্রয়োজনীয়, এমনকি ক্ষতিকর, তাহলে আপনারা জনগণকে শুধু অপমান করছেন না, বরং আত্মজ্ঞানের অভাবকেও প্রকাশ করছেন। একটি বস্তু তখনই ভাল যখন সেটা জনগণের কাছে প্রকৃত উপকার নিয়ে হাজির হয়। আপনাদের রচনা 'বসন্তের তুষার'-এর মতো উৎকৃষ্ট হতে পারে কিন্তু যদি আপাতত সেটা শুধু মুষ্টিমেয়ের মনোরঞ্জন করে এবং জনগণ তখনও 'গ্রাম্য দরিদ্রের গান' [১০] গেয়ে চলে, সে-অবস্থায় তাদের মানের উন্নতি সাধনের চেষ্টার বদলে শুধু নিন্দা করা হবে নিরর্থক। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, 'বসন্তের তুষার' ও 'গ্রাম্য দরিদ্রের গান'-এর মধ্যে উন্নত মান ও জনপ্রিয়করণের মধ্যে, ঐক্য আনয়ন করার। এ ধরনের ঐক্য ছাড়া একজন বিশেষজ্ঞের বিবেচনায় স্বীকৃত সর্বোচ্চ মানের শিল্প সংকীর্ণতম অর্থে উপযোগবাদের নিদর্শন বৈ কিছু হবে না, আপনারা এটাকে 'বিশুদ্ধ ও মহৎ' শিল্পকর্ম বলতে পারেন কিন্তু সেটা হবে আপনাদের নিজের দেওয়া নাম এবং জনসাধারণ তাকে কোন স্বীকৃতি দেবে না।

শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের সেবা করার মতো মূল প্রশ্নটির একবার সমাধান হয়ে গেলে, জীবনের উজ্জ্বল না অন্ধকার দিক লেখার বিষয় হবে কিংবা কিভাবে ঐক্যসাধন সম্ভবপর, সে ধরনের সমস্যার সমাধান সহজে হয়ে যাবে। যদি সবাই মূল নীতিতে একমত হয়, তবে আমাদের সমস্ত শ্রমিক, সব বিদ্যালয়, সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের সকল প্রকাশনা ও সংগঠন এবং আমাদের সমস্ত সাহিত্যিক ও শৈল্পিক কার্যকলাপ তদনুযায়ী হওয়া উচিত। এই নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়া ভুল হবে এবং এর সঙ্গে যেটার অমিল দেখা যাবে, সেটাকে শুধরে নিতে হবে।

তিন

আমাদের সাহিত্য-শিল্প জনগণের জন্যে বিধায় আন্তঃপার্টি সম্পর্কের সামগ্রিক কার্যাবলীর সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্পকলা বিষয়ক কার্যাবলীর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে এবং এতদসঙ্গে পার্টির বহিঃসম্পর্কের একটি সমস্যাও আলোচিত হতে পারে— সেটা হলো সাহিত্য ও শিল্পকলা বিষয়ে পার্টির ও পর্টি-বহির্ভূত লোকের কাজের সম্পর্ক। শেষোক্তটি হলো সাহিত্য ও শিল্পে যুক্তফ্রন্টের সমস্যা।

প্রথম সমস্যাটি বিবেচনা করা যাক। বর্তমান পৃথিবীতে সমস্ত সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্প নির্দিষ্ট শ্রেণী আওতাভুক্ত এবং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাইনের প্রভাবের অন্তর্গত। বলতে

www.pathagar.com

কি, শিল্পের-জন্য-শিল্প, শ্রেণীর-ঊর্ধ্বে-শিল্প, রাজনীতি-মুক্ত-শিল্প, বা রাজনীতি-বিচ্ছিন্ন-শিল্প বলে কিছু নেই। প্রলেতারীয় সাহিত্য ও শিল্প হলো সমগ্র প্রলেতারীয় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অংশ, লেনিনের ভাষায় সমগ্র বিপ্লবী যন্ত্রের কাঁটাওয়ালা চাকা ও স্ক্রু। [১১] সুতরাং, পার্টির সমগ্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে পার্টির কাজের একটি নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত স্থান আছে এবং সেটা বিপ্লবী যুগে পার্টির বিপ্লবী কাজের অধীনে থাকে। এই ব্যবস্থার বিরোধিতা নিশ্চিতভাবে দ্বৈততা বা বহুত্বতায় নিয়ে যায়— যার সারমর্ম দাঁড়ায় 'রাজনীতি-মার্কসবাদী, শিল্প-বুর্জোয়া' যেমন দেখা গেছে ট্রটস্কির চিন্তায়। সাহিত্য ও শিল্পকলার গুরুত্বকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষপাতী আমরা নই, কিন্তু অন্যদিকে তার গুরুত্বকে খাটো করে দেখতেও আমরা চাইনি। শিল্প ও সাহিত্য রাজনীতির অধীন কিন্তু সেগুলো আবার রাজনীতির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্য সমগ্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অংশ, এগুলো তার মধ্যে কাঁটাওয়ালা চাকা ও স্ক্রু এবং যদিও অন্যান্য বেশি গুরুতর অংশের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ ও কম জরুরি হতে পারে এবং গৌণস্থানে অবস্থান করতে পারে, তবু, সেগুলো সমগ্র যন্ত্রের অপরিহার্য স্ক্রু ও কাঁটাওয়ালা স্ক্রু, সমগ্র বিপ্লবী তৎপরতার সেগুলো অপরিহার্য অংশ।

ব্যাপকতম ও সবচেয়ে সাধারণ অর্থেও, যদি আমাদের কোন সাহিত্য না-থাকত, বিপ্লবী আন্দোলন চালিয়ে যেতে ও বিজয় অর্জন করতে আমরা পারতাম না । এটা মেনে না-নেওয়া হবে বোকামী। তদুপরি, সাহিত্য ও শিল্পকে রাজনীতির অধীন বলতে গিয়ে আমরা শ্রেণী রাজনীতি ও জনগণের রাজনীতির কথাই বলি, কয়েকজন তথাকথিত রাজনীতিবিদের কথা বলি না। রাজনীতি বিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী যাই হোক না কেন, হলো শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর সংগ্রাম, কয়েকজন ব্যক্তির কার্যকলাপ নয়। আদর্শিক ও শৈল্পিক ফ্রন্টের বিপ্লবী সংগ্রামকে অবশ্যই রাজনৈতিক সংগ্রামের অধীন হতে হবে, কেননা শুধু রাজনীতির মধ্য দিয়েই শ্রেণীর ও জনগণের প্রয়োজন সংহত আকারে প্রকাশ পায়। বিপ্লবী রাজনীতিবিদ বা রাজনীতি-বিশেষজ্ঞ তথা বিপ্লবী রাজনীতির বিজ্ঞান বা শিল্পকে যিনি জানেন তিনি হলেন কোটি কোটি রাজনীতিবিদ তথা জনতার নেতা মাত্র। তাদের দায়িত্ব হলো এসব রাজনীতিবিদের মতামত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ ও বিশোধন করা এবং জনগণের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া, যারা তখন সেগুলো গ্রহণ করে ও কাজে লাগায়। সুতরাং তারা ঐ ধরনের অভিজাত 'রাজনীতিবিদদের' মতো নন, যারা রুদ্ধ দরজার মধ্যে কাজ করেন এবং সমগ্র প্রজ্ঞার একমাত্র অধিকারী বলে কল্পনা করেন। প্রলেতারীয় রাজনীতিবিদ এবং ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের মধ্যে তত্ত্বগত ভাবে পার্থক্য এখানেই। ঠিক এটাই কারণ কেন আমাদের সাহিত্য ও শিল্পের রাজনৈতিক চরিত্র ও সেগুলোর সত্যতার মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য সম্ভব। এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে এবং প্রলেতারিয়েতদের রাজনীতি ও

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদদের চরিত্র হনন করলে ভুল হবে।

সাহিত্য ও রাজনীতিক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রশ্নটি এবার আলোচনা করা যেতে পারে। যেহেতু সাহিত্য ও শিল্পকলা হচ্ছে রাজনীতির অধীন এবং চীনের রাজনীতির মূল
২ সমস্যা হচ্ছে জাপানকে প্রতিরোধ করা, আমাদের পার্টির লেখক ও শিল্পীদের প্রথম পর্যায়ে জাপানকে প্রতিরোধ করার প্রশ্নে পার্টি-বহির্ভূত লেখক ও শিল্পীদের সঙ্গে (পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল এবং পাতিবুর্জোয়া লেখক ও শিল্পীদের থেকে শুরু করে জাপানকে প্রতিরোধ করার পক্ষপাতী সকল বুর্জোয়া ও ভূস্বামীশ্রেণীর লেখক ও শিল্পিরা) অবশ্যই একতাবদ্ধ হতে হবে। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রের প্রশ্নেও তাদের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। জাপবিরোধী লেখক ও শিল্পীদের একাংশ আছেন যারা এই প্রশ্নে আমাদের সঙ্গে একমত নন, ফলে অপরিহার্যভাবে ঐক্যের পরিধি কিছুটা সীমাবদ্ধ থাকবে। তৃতীয়ত, সাহিত্য ও শিল্পের পদ্ধতি ও রীতির প্রশ্নে, তথা সাহিত্য ও শিল্পকলার ভুবনের বৈশিষ্ট্যসূচক ইস্যুতে আমাদের সম্মিলিত হওয়া উচিত, এখানেও, যেহেতু আমরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পক্ষপাতী এবং কিছু লোক এতে একমত নয়, ঐক্যের পরিধি আরো সংকীর্ণ হবে। কখনো একটি প্রশ্নে ঐক্য দেখা দেয়, কিন্তু অন্য একটি প্রশ্নে থাকে মতানৈক্য ও চলে সমালোচনা। প্রশ্নগুলো একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট, যার ফলে জাপানকে প্রতিরোধ করার মতো যেসব প্রশ্ন একতার জন্ম দেয়, একই সঙ্গে সেগুলো সংগ্রাম ও সমালোচনারও সৃষ্টি করে। 'কেবল ঐক্য, কোন সংগ্রাম নয়' এবং 'কেবল সংগ্রাম, কোন ঐক্য নয়'— দুইই যুক্তফ্রন্টের বেলায় ভুল নীতি— অতীতের আমাদের কিছু কমরেড কর্তৃক অনুসৃত দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণবাদ এবং সংকীর্ণতাবাদের মত। এটা রাজনীতিতে যেমনি সত্য, তেমনি সত্য সাহিত্য ও শিল্পকলার বেলায়ও।

চীনের সাহিত্য ও শিল্পের যুক্তফ্রন্টের শক্তিসমূহের মধ্যে পাতিবুর্জোয়া লেখক ও শিল্পীরা গুরুত্বপূর্ণ শক্তিরূপে বিরাজ করে। তাদের চিন্তায় ও রচনায় অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে তাদের ঝোঁক বিপ্লবের দিকে এবং তারা কাছাকাছি শ্রমজীবী মানুষের। সুতরাং, তাদের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার সহায়তা করা এবং শ্রমজীবী মানুষের সেবায় নিয়োজিত ফ্রন্টে নিয়ে আসা, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

চার

সাহিত্য ও শিল্প জগতে লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান পদ্ধতি হলো সমালোচনা। এর বিকাশ সাধন করতে হবে এবং কমরেডগণ যেমন যথার্থই দেখিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে আমাদের অতীত কার্যকলাপ খুবই অপ্রতুল। সাহিত্য-শিল্প সমালোচনা এক জটিল প্রশ্ন এবং এর জন্যে দরকার বিশেষ ধরনের প্রচুর লেখাপড়া। এখানে, সমালোচনার মানদণ্ডের শুধু মূল সমস্যায় আমি মনোনিবেশ করব। কয়েকজন কমরেড কর্তৃক উত্থাপিত কিছু

www.pathagar.com

বিশেষ সমস্যার ওপর এবং কিছু ভুল ধারণা সম্পর্কে আমার মন্তব্য থাকবে।

সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনায় দুটো মাপকাঠি আছে– রাজনৈতিক ও শৈল্পিক। রাজনৈতিক মাপকাঠি অনুযায়ী সবকিছু ভাল যা একতায় ও জাপবিরোধিতায় সহায়তা করে, এক মন এক প্রাণ হবার জন্যে জনগণকে উৎসাহ দেয়, যা পশ্চাদ্বর্তিতার বিরোধী ও অগ্রগতির সহায়ক, অন্যপক্ষে সব কিছুই খারাপ যা একতা ও জাপবিরোধিতার জন্যে ক্ষতিকর, জনগণের মধ্যে বিরোধ ও উৎসাহহীনতা সৃষ্টি করে, অগ্রগতিকে প্রতিহত করে ও জনসাধারণকে পেছনের দিকে টেনে নেয়। কিভাবে আমরা ভাল থেকে মন্দকে পৃথক করতে পারি– উদ্দেশ্য (আত্মগত অভিলাষ) বা ফল (সামাজিক অনুশীলন) বিচার করে? ভাববাদীরা উদ্দেশ্যের প্রতি জোর দেন এবং ফলাফল সম্পর্কে উদাসীন থাকেন, আর যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা ফলাফলের প্রতি জোর দেন, কিন্তু উদ্দেশ্যের প্রতি উদাসীন থাকেন। এ দুয়ের বিপরীতে আমরা বস্তুবাদীরা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ঐক্যের ওপরে জোর দেই। জনগণের সেবা করার উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাদের সমর্থন লাভের ফলাফল অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত– এ দুটোকে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। ব্যক্তিবিশেষ বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সেবা করার উদ্দেশ্য ভাল নয়, জনগণের সমর্থন আদায়ের ও উন্নতি সাধনের ফলাফল ব্যতীত তাদের সেবা করার উদ্দেশ্য থাকাও ভাল নয়। কোন লেখক বা শিল্পীর আত্মগত অভিলাষ পরীক্ষা করার সময়, অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য সঠিক ও ভাল কিনা সেটা দেখতে গিয়ে, আমরা তার ঘোষিত উদ্দেশ্যর ওপরই নির্ভর করি না, বরং সমাজের মানুষের ওপর তার কার্যাবলীর (প্রধানত রচনাবলীর) প্রভাবও লক্ষ্য করি। আত্মগত অভিলাষ বা উদ্দেশ্য বিচার করার মাপকাঠি হচ্ছে সামাজিক অনুশীলন ও তার প্রভাব পর্যালোচনা। সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনায় আমরা কোন সংকীর্ণতাবাদ চাই না এবং জাপপ্রতিরোধ যুদ্ধের ঐক্যের অনুবর্তী হওয়ার সাপেক্ষে, রাজনৈতিক মতামতের বিভিন্নতাসহ সাহিত্য-শিল্পকর্মকে আমাদের মেনে নেওয়া উচিত।

কিন্তু একই সঙ্গে, সমালোচনার সময় আমাদের অবশ্যই নীতির প্রতি অটল থাকতে হবে এবং জাতি, বিজ্ঞান, জনগণ ও কম্যুনিস্ট পার্টি-বিরোধী মতের বাহক সব সাহিত্য ও শিল্পকে নির্মমভাবে সমালোচনা ও খণ্ডন করতে হবে। কারণ, এ ধরনের তথাকথিত সাহিত্য ও শিল্পকর্মের উদ্দেশ্য ও ফলাফল উভয়ই জাপবিরোধী ঐক্যের ক্ষতিসাধন করে। শৈল্পিক মানদণ্ডের বিচারে, উচ্চতর শৈল্পিক মানবিশিষ্ট সমস্ত রচনাই ভাল বা তুলামূলকভাবে ভাল, অপরদিকে নিচু মানের রচনাগুলো খারাপ বা তুলনামূলকভাবে খারাপ। এখানেও, অবশ্য, সামাজিক ফলাফলকে বিবেচনায় আনতে হবে। এমন একজনও লেখক বা শিল্পী নেই যিনি নিজের সৃষ্টিকে সুন্দর মনে করেন না এবং আমাদের সমালোচনায় সকল ধরনের সাহিত্যের স্বাধীন প্রতিযোগিতার স্বীকৃতি থাকা আবশ্যক, কিন্তু

www.pathagar.com

এসব লেখাকে নন্দনতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি অনুযায়ী সঠিক সমালোচনার আওতায় নিয়ে আসা একান্তভাবে জরুরি যাতে নিচুমানের শিল্পকলাকে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর মানে তোলা যায় এবং বৃহৎ জনগণের সংগ্রামের দাবি পূরণ করে না যে শিল্প, তাকেও যেন জনগণের সংগ্রামের দাবি পূরণে সক্ষম শিল্পে রূপান্তরিত করা যায়।

দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক মানদণ্ডও আছে, আবার শৈল্পিক মানদণ্ডও আছে, এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি? রাজনীতিকে শিল্পের সঙ্গে সমতুল্য ভাবা যায় না, কিংবা সাধারণ বিশ্বদৃষ্টিকেও সমতুল্য ভাবা যায় না শৈল্পিক সৃষ্টি বা সমালোচনা পদ্ধতির সঙ্গে। একটি বিমূর্ত ও চূড়ান্ত অপরিবর্তনীয় রাজনৈতিক মাপকাঠিকে আমরা যেমন স্বীকার করি না, তেমনিভাবে অস্বীকার করি বিমূর্ত ও চূড়ান্তআবে অপরিবর্তনীয় শৈল্পিক মানদণ্ডকে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রতিটি শ্রেণীর নিজস্ব রাজনৈতিক ও শৈল্পিক মাপকাঠি রয়েছে। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজের প্রতিটি শ্রেণী অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক মানদণ্ডটিকে প্রথমে এবং শৈল্পিক মানদণ্ডটিকে পশ্চাতে বিবেচনা করে। যতই শৈল্পিক মানসম্পন্ন হোক না কেন, বুর্জোয়ারা সব সময় প্রলেতারীয় সাহিত্য ও শিল্পকলাকে বাইরে ঠেলে দেয়। সর্বহারাদেরও তেমনিভাবে অতীত যুগের সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং জনগণের প্রতি সেগুলোর মনোভাব ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাদের বিপ্লবী গুরুত্বকে নিরীক্ষণ করে সেগুলোর প্রতি মনোভাব নির্ধারণ করতে হবে। রাজনৈতিকভাবে একেবারে প্রতিক্রিয়াশীল কিছু লেখায় কিয়ৎপরিমাণে শৈল্পিক গুণ থাকতে পারে। সেগুলোর বিষয়বস্তু যত বেশি প্রতিক্রিয়াশীল ও শৈল্পিক সৌন্দর্যে উঁচু স্তরের হবে, জনগণের জন্যে সেগুলো তত বেশি বিষাক্ত হবে এবং সেগুলোকে পরিত্যাগ করার প্রয়োজনও হবে ততোধিক। পতনের যুগে সকল শোষক শ্রেণীর শিল্প-সাহিত্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেগুলোর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর ও শিল্পকাঠামোর মধ্যে বিরোধ। আমাদের দাবি হচ্ছে রাজনীতি ও শিল্পকলার একতা, বিষয় ও আঙ্গিকের একতা, বিপ্লবী রাজনৈতিক বক্তব্যে ও শিল্পরূপের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ খুঁতহীনতার একত্ব। রাজনৈতিকভাবে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন শিল্পগুণবিহীন রচনার কোন শক্তি নেই। সুতরাং, আমরা যুগপৎভাবে বিরোধিতা করি, ভুল রাজনৈতিক দৃষ্টিসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির প্রবণতার এবং প্রচারপত্র ও স্লোগানসর্বস্ব রীতিতে রচনা করার প্রবণতার– যা রাজানৈতিকভাবে সঠিক হলেও শৈল্পিক ক্ষমতাবর্জিত। সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রশ্নে আমাদেরকে অবশ্যই দুই ফ্রন্টে লড়াই চালাতে হবে।

এই দুই প্রবণতাকে অনেক কমরেডের চিন্তায় লক্ষ্য করা যাবে। বেশ কিছু কমরেডের মধ্যে শৈল্পিক কলাকৌশলকে অবহেলা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, সুতরাং এটা প্রয়োজন শিল্পকলাগত মানোন্নয়নের দিকে নজর দেবার। কিন্তু আমার মনে হয়, বর্তমানে রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব আছে এবং তার ফলে তাদের মনে সব রকমের ভুল

www.pathagar.com

ধারণার সৃষ্টি হয়। ইয়েনেনের অভিজ্ঞতা থেকে এধরনের চিন্তাধারার কতিপয় দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি।

'মানব-প্রকৃতি তত্ত্ব'। এ ধরনের কিছু কি আছে যাকে মানব-প্রকৃতি বলা যায়? অবশ্যই আছে। কিন্তু মানব-প্রকৃতি আছে কেবল মূর্ত অবস্থায়, বিমূর্ত অবস্থায় কোন মানব-প্রকৃতি নেই। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মানব-প্রকৃতি আছে শুধু শ্রেণীবিশিষ্টতায়, শ্রেণীর উর্ধ্বে কোন মানব-প্রকৃতি নেই। আমরা প্রলেতারিয়েতের ও জনসাধারণের মানব-প্রকৃতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরি, কিন্তু ভূস্বামী ও বুর্জোয়া শ্রেণীরা তাদের নিজস্ব শ্রেণীর মানব-প্রকৃতিকে তুলে ধরে– যদিও তারা সে কথা বলে না, বরং সেটাকে অস্তিত্বশীল একমাত্র মানবপ্রকৃতি বলে জাহির করে। এক শ্রেণীর পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী যে মানব-প্রকৃতির গুণগান করে, সেটাও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও তার পরিপন্থী, তারা যেটাকে মানবপ্রকৃতি বলে সেটা আসলে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাইরে কিছু নয় এবং সেজন্যে, তাদের চোখে প্রলেতারীয় মানব প্রকৃতি হলো মানবপ্রকৃতির বিপরীত। ইয়েনেনের কিছু লোক তাদের তথাকথিত সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে 'মানবপ্রকৃতি তত্ত্ব'-এর যে ওকালতি করে সেটা ঠিক এইরূপই এবং স্বভাবতই পুরোপুরি ভ্রান্ত।

'সাহিত্য ও শিল্পের গোড়ার কথা ভালবাসা– মানবজাতির প্রতি ভালবাসা।' ভালবাসা গোড়ার কথা হতে পারে, কিন্তু তার চেয়েও মূল কথা আছে। ভালবাসা নামক ধারণাটির উদ্ভব বাস্তবের অনুশীলন থেকে। মূলগতভাবে আমরা যাত্রা করি ধারণা থেকে নয়, বাস্তব অনুশীলন থেকে। বুদ্ধিজীবীদের স্তর থেকে আগত আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রলেতারিয়েতদের ভালবাসার কারণ, সমাজ তাদের বুঝতে শিখিয়েছে যে, তাদের ও প্রলেতারিয়েতদের ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা। আমরা জাপ সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করি যেহেতু সেটা আমাদের ওপর অত্যাচার করে। পৃথিবীতে অকারণ প্রেম বা অকারণ ঘৃণা বলতে কোথাও কিছু নেই। তথাকথিত 'মানবতার প্রতি ভালবাসা' সম্পর্কে বলা যায় যে, সে ধরনের সর্বভুক ভালবাসা কখনো ছিল না, কেননা মানবজাতি প্রথমাবধি শ্রেণীবিভক্ত। অতীতের সব শাসক শ্রেণী এটা ফেরি করে বেড়াতে আগ্রহী ছিল এবং তথাকথিত ঋষি ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তা করেছে, কিন্তু বাস্তবে কেউ কখনো এর অনুশীলন করেনি, কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সেটা অসম্ভব ব্যাপার। মানবতার প্রতি ভালবাসা তখন হবে, যখন পৃথিবী থেকে শ্রেণীসমূহ লোপ পাবে। শ্রেণীগুলো সমাজকে অনেক পরস্পরবিরোধী দলে বিভক্ত করেছে, মানবতার প্রতি ভালবাসা জাগবে শ্রেণীবিলুপ্তির পর, এখন নয়। আমরা শত্রুকে ভালবাসতে পারি না, আমরা সামাজিক ব্যাধিকে ভালবাসতে পারি না, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সেগুলোর ধ্বংস সাধন। এটা সাধারণ জ্ঞানের কথা, এমনকি হতে পারে যে, আমাদের কোন লেখক-শিল্পী এখনো এটা বুঝতে পারেন না?

www.pathagar.com

'সাহিত্য ও শিল্পকলা সবসময় সমানভাবে জীবনের উজ্জ্বল ও অন্ধকার দিকের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।' এই বক্তব্যে অনেক জট পাকানো ধারণা নিহিত। এটা সত্য নয় যে, সাহিত্য ও শিল্প সবসময় এ কাজ করেছে। অনেক পাতিবুর্জোয়া লেখক কখনো উজ্জ্বল দিকের সন্ধান পাননি। তাদের লেখা শুধু অন্ধকারকে অনাবৃত করে এবং সে-সাহিত্য 'স্বরূপ উদঘাটনের সাহিত্য' নামে পরিচিত। তাদের কোন কোন সৃষ্টিকর্ম কেবল দুঃখবাদ ও জগতবিতৃষ্ণা প্রচারে বিশেষত্ব লাভ করেছে। অন্যপক্ষে, সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন কালের সোভিয়েত সাহিত্য প্রধানত উজ্জ্বল দিকের আলেখ্য নির্মাণ করেছে। এটাও, অবশ্য, সীমাবদ্ধ দিককে বর্ণনা করে ও নেতিবাচক চরিত্রের চিত্রিত করে, কিন্তু সেটা ব্যবহৃত হয় সমগ্র চিত্রের উজ্জ্বল দিককে তুলে ধরার পটভূমি হিসেবে এবং তথাকথিত পঞ্চাশ-পঞ্চাশ নিয়মে লাগানো হয়নি। পতনযুগের বুর্জোয়া লেখক-শিল্পীরা বিপ্লবী জনগণকে দাঙ্গাকারী জনতা ও নিজেদেরকে সাধু রূপে জাহির করত এবং উল্টে দিত আসল চিত্রকে। উপদেশ দিতে হবে, না, উদঘাটিত করতে হবে– সে সমস্যাকে সঠিকভাবে সমাধান করতে পারে শুধু সাচ্চা বিপ্লবী লেখক-শিল্পীরা। জনগণের ক্ষতিকারক সকল অশুভ শক্তির স্বরূপকে অবশ্যই উদঘাটিত করাতে হবে এবং জনগণের সকল বিপ্লবী সংগ্রামের অবশ্যই গুণগান করতে হবে– বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের এটাই প্রাথমিক দায়িত্ব।

'সাহিত্য ও শিল্পের কাজ সবসময় স্বরূপ উদঘাটন করা।' এই অভিমত আগেরটির মতই ইতিহাসবিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত । আমরা দেখিয়েছি যে, সাহিত্য ও শিল্প কখনো পুরোপুরিভাবে স্বরূপ উদঘাটনে নিয়োজিত ছিল না। বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীর লক্ষ্য কখনো জনগণের নয়, বরং আগ্রাসনকারী শোষক ও অত্যাচারীর স্বরূপ উদঘাটন করা ও জনগণের ওপর তার অশুভ প্রভাব তুলে ধরা। জনগণেরও সীমাবদ্ধতা আছে– নিজেদের স্তরে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে সেটা অতিক্রম করতে হবে, এই ধরনের সমালোচনা ও আত্মসমালোচনাও সাহিত্য-শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু এটাকে বিবেচনা করা যাবে না 'জনগণের' কোনপ্রকার 'স্বরূপ উদঘাটন' বলে। জনগণের বেলায় মূল সমস্যা হচ্ছে শিক্ষার ও সেটার মানোন্নয়নের। শুধু প্রতিবিপ্লবী লেখক-শিল্পীরাই জনসাধারণকে 'জন্মবোকা' এবং বিপ্লবী জনগণকে ' স্বৈরাচারী দাঙ্গাবাজ' বলে বর্ণনা করে।

'এখনো ব্যঙ্গ রচনার যুগ চলছে এবং লু সুনের রচনারীতির এখনো প্রয়োজন রয়েছে।' অশুভ শক্তির আওতায় থেকে এবং বাক্ স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়ে লড়াইয়ের জন্যে লু সুন গ্রহণ করেছিলেন রচনার আকারে জ্বলন্ত ব্যঙ্গ ও শীতল শ্লেষের পথ এবং তিনি ছিলেন পুরোপুরি সঠিক। আমাদেরও অবশ্যই ফ্যাসিস্টদের, চীনা প্রতিক্রিয়াশীলদের এবং জনগণের ক্ষতিকারক সব কিছুকে তীব্র বিদ্রূপ করতে হবে; কিন্তু শেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে এবং শত্রুসীমানার পেছনে জাপবিরোধী ঘাঁটি এলাকায় অর্থাৎ

www.pathagar.com

যেখানে বিপ্লবী লেখক-শিল্পীদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা পুরোমাত্রায় দেওয়া হয়েছে এবং কেড়ে নেওয়া হয়েছে কেবল প্রতিবিপ্লবীদের কাছ থেকে, সেখানে রচনারীতি শুধু লু সুনের মতো হওয়া উচিত নয়। এখানে আমরা চিৎকার করতে পারি সবচেয়ে উঁচু গলায় এবং প্রয়োজন নেই ইঙ্গিতে বা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলার– যেটা জনগণের জন্যে বোঝা কষ্টকর। জনগণ সম্পর্কে, তাদের শত্রুদের সম্পর্কে নয়, লিখতে গিয়ে লু সুন তাঁর 'ব্যঙ্গ রচনার কালে' বিপ্লবী জনগণ বা বিপ্লবী পার্টিকে কখনো বিদ্রূপ করেননি বা আক্রমণ করেননি এবং দুশমনকে লক্ষ্য করে রচিত রচনাবলীর চেয়ে এই রচনাসমূহ রীতিতে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। আমরা আগেই বলেছি যে, জনগণের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করা দরকার, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আমাদের সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করতে হবে জনগণের ভূমিকা এবং কথা বলতে হবে তাদেরকে রক্ষা করার ও শিক্ষিত করার ঐকান্তিক আগ্রহের সঙ্গে। কমরেডদের সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করার অর্থ শত্রুর ভূমিকা গ্রহণ করা। তাহলে কি আমাদের ব্যঙ্গ রচনাকে বাতিল করতে হবে? না। ব্যঙ্গ রচনার প্রয়োজন সর্বদা আছে। কিন্তু তার প্রকারভেদ আছে– এক-একটির মনোভাব এক-এক রকমের, শত্রুদের বিষয়ে লিখিত ব্যঙ্গ রচনা, আমাদের মিত্রদের সম্পর্কে রচিত ব্যঙ্গ রচনা এবং আমাদের নিজস্ব লোকদের সম্পর্কিত ব্যঙ্গ রচনা। সাধারণভাবে আমরা ব্যঙ্গ রচনার বিরোধী নই, আমাদের নিষিদ্ধ করতে হবে ব্যঙ্গ রচনার অপপ্রয়োগকে।

'গুণগান করা ও উচ্চ প্রশংসা করা আমার কাজ নয়। উজ্জ্বল দিকের যারা প্রশংসা করেন তাদের রচনা মহৎ হবে এবং অন্ধকার দিককে যারা চিত্রিত করেন তাদের রচনা নিকৃষ্ট হবে এমন কোন কথা নেই।' আপনি যদি বুর্জোয়া লেখক বা শিল্পী হন তবে আপনি প্রলেতারিয়েতদের নয়, বরং বুর্জোয়াদের উচ্চ প্রশংসা করবেন, আর আপনি যদি প্রলেতারিয়েত শ্রেণীভুক্ত হন তবে আপনি বুর্জোয়াদের নয়, বরং প্রলেতারিয়েত ও শ্রমজীবী মানুষের উচ্চ প্রশংসা করবেন, হয় এটা নয় ওটা, এর বাইরে অন্য কিছু হতে পারে না।

বুর্জোয়াদের প্রশংসাকারীদের রচনাকর্ম মহৎ হবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না, তেমনি নিশ্চিত নয় যে বুর্জোয়াদের মসীবর্ণে চিত্রিত করলেই সেটা নিকৃষ্ট হবে; প্রলেতারিয়েতদের প্রশংসাকারীদের রচনাকর্ম মহৎ হবে না সেটা নিশ্চিত নয়, কিন্তু প্রলেতারিয়েতদের তথাকথিত 'অন্ধকার'কে যারা চিত্রিত করেন তাদের লেখা নিকৃষ্ট হতে বাধ্য– সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে এগুলো কি ইতিহাসের সত্য নয়? কেন আমরা মানবেতিহাসের স্রষ্টা জনগণের জয়গান করব না? প্রলেতারিয়েত, কম্যুনিস্ট পার্টি, নয়া গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের উচ্চ প্রশংসা কেনই বা আমরা করব না? এক কিসিমের লোক আছে জনগণের স্বার্থের ব্যাপারে যাদের কোন উৎসাহ নেই এবং প্রলেতারিয়েত ও তার অগ্রবর্তী বাহিনীর সংগ্রাম ও সাফল্যের প্রতি তারা সীমারেখায় দাঁড়িয়ে নিরুত্তাপ চোখে

www.pathagar.com

তাকায়, যার সম্পর্কে তার উৎসাহ আছে এবং যার প্রশংসায় তিনি কখনো ক্লান্ত বোধ করবেন না, সে হচ্ছে তিনি নিজে; এবং সম্ভবত তার ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর আরো দু-একজন সদস্য। অবশ্যই এ ধরনের পাতিবুর্জোয়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিপ্লবী জনতার কার্যাবলী ও গুণাবলীর জয়গান করতে কিংবা বিজয়ে বিশ্বাস ও সংগ্রামে পরাক্রমকে বাড়িয়ে তুলতে অনিচ্ছুক। এ ধরনের লোকেরা বিপ্লবী দলে শুধু আবর্জনাসদৃশ; বিপ্লবী জনগণের এ ধরনের 'গায়কের' কোন প্রয়োজন নেই।

আমার দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা নয়, আমার শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি নির্ভুল, আমার উদ্দেশ্য মহৎ এবং আমি সব কিছুকে ঠিকমত দেখি; কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করায় আমি তেমন পটু নয় এবং সেজন্য ফলাফল খারাপ হয়ে পড়ে।' উদ্দেশ্য ও ফলাফলের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী সম্পর্ক নিয়ে আমি ইতিমধ্যে বলেছি। আমি এখন প্রশ্ন করতে চাই, ফলাফলের সমস্যাটি কি দৃষ্টিভঙ্গির নয়? যে লোক শুধু উদ্দেশ্যতাড়িত হয়ে কাজ করে এবং তার কাজের ফলাফল সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করে না, সে হলো ঐ-চিকিৎসকের ন্যায় যে-শুধু ব্যবস্থাপত্র দিয়ে যায় কিন্তু তা দিয়ে কত রোগী যে মারা গেল সে-বিষয়ে চিন্তিত হয় না। অথবা একটি রাজনৈতিক দলের কথা ধরুন যারা শুধু ঘোষণা দেয় কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়িত হলো কিনা সে সম্পর্ক মাথাব্যথা অনুভব করে না। স্বভাবতই প্রশ্ন করা যেতে পারে এটা কি যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি হলো। এবং এখানে উদ্দেশ্যটা কি ভাল? অবশ্য পূর্বাহ্নে ফলাফলের কথা বিবেচনা করলেও ভুলভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়, কিন্তু ফলাফল খারাপ হবার তথ্য-প্রমাণ পাবার পরও কেউ যদি পুরোনো পন্থায় কাজ চালিয়ে যায়, তাহলে কি উদ্দেশ্যকে সৎ বলা যাবে? কোন পার্টি বা চিকিৎসককে মূল্যায়ন করার সময় আমাদের অবশ্যই অনুশীলন ও ফলাফলের দিকে তাকাতে হবে। একজন লেখকের মূল্যায়নের বেলায়ও একই কথা খাটে। সত্যিকারের সৎ উদ্দেশ্যের একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ফলাফলের কথা ভাবতে হবে, অভিজ্ঞতার সার-সংকলন করতে হবে এবং পদ্ধতির পর্যালোচনা করতে হবে, অথবা সৃষ্টিশীল কাজের বেলায় প্রকাশভঙ্গির কৌশল পর্যালোচনা করতে হবে। সত্যিকারের সৎ উদ্দেশ্যের একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই তার নিজের লেখার সীমাবদ্ধতা ও ভুলত্রুটিকে সর্বাধিক অকপটতার সঙ্গে সমালোচনা করতে হবে এবং সেগুলোকে শোধরানোর প্রতিজ্ঞা নিতে হবে। ঠিক এই কারণেই কম্যুনিস্টরা আত্মসমালোচনার পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এটাই একমাত্র সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। শুধু এ ধরনের সিরিয়াস ও দায়িত্বশীল অনুশীলনের মাধ্যমে সঠিক ভূমিকাকে ক্রমান্বয়ে অনুধাবন করা এবং ক্রমান্বয়ে আয়ত্ত করা সম্ভব। যদি এই পন্থায় অনুশীলন না-করা হয়, যদি কেউ এই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে, তিনি 'সব কিছু ঠিকমত বুঝেন' তাহলে প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুই বোঝেননি।

'আমাদেরকে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করতে বলার অর্থ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সৃজনশীল

www.pathagar.com

পদ্ধতির ভুলের পুনরাবৃত্তি করা, যে সৃজনশীল মানসিকতার ক্ষতি করে।' মার্কসবাদ অধ্যয়ন করতে বোঝানো হচ্ছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে জগত, সমাজ ও শিল্পসাহিত্যকে পর্যবেক্ষণ করায় কাজে লাগানো, এর অর্থ নয় সাহিত্য ও শিল্প রচনায় দার্শনিক প্রবন্ধ লেখা। সাহিত্য ও শিল্পকলায় মার্কসবাদ জড়িয়ে আছে কিন্তু সেটা বাস্তবতার বিকল্প হতে পারে না, যেমন করে পদার্থবিদ্যাকে জড়িয়ে থাকলেও আণবিক ও ইলেকট্রনিক তত্ত্বের স্থান সেটা দখল করতে পারে না। অন্তঃসারশূন্য, শুষ্ক, গোঁড়া সূত্রাবলী সত্যিই সৃষ্টিশীল মেজাজকে ধ্বংস করে, শুধু তাই নয়, প্রথমে সেগুলো ধ্বংস করে মার্কসবাদকেই। 'গোঁড়া মার্কসবাদ' মার্কসবাদ নয়, সেটা মার্কসবাদের পরিপন্থী। তাহলে কি মার্কসবাদ সৃষ্টিশীল মেজাজকে ধ্বংস করে? সত্যিই তা করে। মার্কসবাদ নিশ্চিতভাবে সামন্তবাদী বুর্জোয়া, পাতিবুর্জোয়া, উদারতাবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, শূন্যতাবাদী, শিল্পের-জন্যে-শিল্প মতবাদী, অভিজাতবাদী, ক্ষয়িষ্ণু ও দুঃখবাদী এবং জনগণ ও প্রলেতারিয়েতদের থেকে বিচ্ছিন্ন সকল প্রকার সৃষ্টিশীল মেজাজকে ধ্বংস করে। প্রলেতারীয় লেখক-শিল্পীদের কথা যখন বলা হচ্ছে এ ধরনের সৃষ্টিশীল মেজাজ কি ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত নয়? আমার মনে হয় তা হওয়া উচিত, পুরোপুরি সেগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত। এবং সেগুলো ধ্বংস হওয়ার কালে নতুন কিছু গড়া যেতে পারে।

পাঁচ

এখানে আলোচিত সমস্যাগুলো ইয়েনেনের সাহিত্য ও শিল্প সমাজে বিরাজ করে। তা-থেকে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে, আমাদের সাহিত্য ও শিল্প সমাজে ভুল রচনারীতি এখনো বেশ ব্যাপকাকারে বিরাজ করে এবং ভাববাদ, গোঁড়ামি, শূন্যগর্ভ কল্পনা, ফাঁপা কথা, অনুশীলনের প্রতি অবজ্ঞা এবং জনবিচ্ছিন্নতার মতো বহুবিধ ত্রুটি এখনো আমাদের কমরেডদের মধ্যে রয়ে গেছে— যার সবগুলো দূর করার জন্যে কার্যকর ও সিরিয়াস প্রচারাভিযানের দরকার।

আমাদের মধ্যে অনেক কমরেড আছেন যাদের মনে এখনো প্রলেতারিয়েত ও পাতিবুর্জোয়ার মধ্যেকার পার্থক্য স্বচ্ছ ধারণা নেই। অনেক পার্টি সদস্য আছেন যারা সাংগঠনিকভাবে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন কিন্তু আন্তরিকভাবে ও মতাদর্শগতভাবে এখনো এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি। যারা আদর্শিক ভাবে যোগ দেননি তারা এখনো তাদের মস্তিষ্কে শোষক শ্রেণীর ভাবধারা অনেক পরিমাণে বহন করেন এবং প্রলেতারীয় আদর্শ সাম্রাজ্যবাদ বা পার্টি বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। 'প্রলেতারীয় আদর্শ?' তারা ভাবে– 'সেই একই পুরোনো জঞ্জাল!' তারা খুব কমই জানে যে, এই জঞ্জাল অর্জন করা সহজ কাজ নয়। তাদের কারো কারো মধ্যে যতদিন এখানে থাকে

www.pathagar.com

ততদিন কম্যুনিস্ট সৌরভের বিন্দুমাত্রও দেখা যাবে না এবং তাদের পরিণতি হবে পার্টি ছেড়ে চলে যাওয়া। সুতরাং, যদিও আমাদের পার্টি ও দলের অধিকাংশই সৎ ও পরিচ্ছন্ন, আমাদেরকে সমস্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে ও মতাদর্শগতভাবে পার্টিকে সুশৃঙ্খল করতে হবে—যদি আমরা বিপ্লবী আন্দোলনের কার্যকর বিকাশ চাই এবং দ্রুততর সাফল্য আনতে চাই। সাংগঠনিকভাবে সুশৃঙ্খল করার জন্যে প্রথমে দরকার মতাদর্শ ক্ষেত্রের শৃঙ্খলা—অপ্রলেতারীয় ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় ভাবাদর্শের লড়াই শুরু করা। ইয়েনেনের সাহিত্য ও শিল্প সমাজে ভাবাদর্শের লড়াই ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে এবং এটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। পাতিবুর্জোয়া শ্রেণী থেকে আগত বুদ্ধিজীবীরা সবসময় সর্বপ্রকারে প্রাণপণে চেষ্টা চালায় সাহিত্য-শিল্পের মাধ্যমে নিজেদেরকে তুলে ধরতে ও নিজেদের মতামত প্রচার করতে—তারা চান যে, পার্টি ও পৃথিবী তাদের পরিকল্পনা মাফিক পরিবর্তিত হোক। এই পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই 'কমরেডদের' নাড়া দেওয়া ও জোরের সঙ্গে বলা যে 'এভাবে চলবে না! প্রলেতারিয়েতরা নিজেদেরকে তোমাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। তোমাদের কাছে নতি স্বীকার করার অর্থ প্রকৃতপ্রস্তাবে বড় ভূস্বামী শ্রেণী ও বড় বুর্জোয়াদের কাছে নতি স্বীকার করা এবং আমাদের পার্টি ও আমাদের দেশকে অবনমিত করার ঝুঁকি গ্রহণ করা।' তাহলে কার কাছে আমরা নতি স্বীকার করব? আমরা শুধু প্রলেতারিয়েতদের অগ্রবর্তী বাহিনীর ভাবনাচিন্তার অনুসারে পার্টিকে পুনর্গঠিত করতে পারি। আমরা আশা করি যে, শিল্প ও সাহিত্য ক্ষেত্রের আমাদের কমরেডগণ এই বিরাট বিতর্কের গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং সক্রিয়ভাবে সংগ্রামে শরিক হবেন যাতে প্রত্যেক কমরেড বিচক্ষণ হয়ে উঠতে পারেন এবং আমাদের গোটা বাহিনী সাংগঠনিকভাবে ও ভাবাদর্শগতভাবে যথার্থ অর্থে একতাবদ্ধ ও সংহত হতে পারে।

চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির দরুন, আমাদের অনেকে কমরেড বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা ও কুওমিনটাং এলাকার মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য টানতে পুরোপুরি সক্ষম হন না এবং প্রতিক্রিয়ায় তারা অনেক ভুল করেন। বেশ কিছু কমরেড এখানে আসছেন সাংহাইয়ের চিলেকোঠা থেকে। এসব চিলেকোঠা থেকে বিপ্লবী ঘাঁটিতে আসার অর্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া নয়, বরং এক ঐতিহাসিক কাল থেকে অন্য কালো পর্দাপণ করা। একটা হচ্ছে বড় ভূস্বামী ও বড় বুর্জোয়াদের আধাসামন্তবাদী, আধাঔপনিবেশিক সমাজ, অপরটি হচ্ছে প্রলেতারিয়েতদের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী নয়া গণতান্ত্রিক সমাজ। বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় আসার অর্থ হচ্ছে চীনের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব যুগে প্রবেশ করা—যে যুগে জনসাধারণ রাষ্ট্র ক্ষমতার নিয়ন্তা। এখানে আমাদের চারপাশের লোকজন এবং আমাদের প্রচারণার দর্শকেরা সম্পূর্ণ আলাদা। অতীত যুগ একেবারে চলে গেছে, আর

www.pathagar.com

কখনো ফিরে আসবে না। সুতরাং বিনা দ্বিধায় আমাদেরকে নতুন জনতার সঙ্গে মিলে যেতে হবে। যদি, নতুন জনতার মধ্যে বাস করেও কোন কমরেডের মনে, আমি আগে যেমন বলেছি, এখনো 'জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাব থাকে' এবং 'যুদ্ধক্ষেত্রবিহীন যোদ্ধার মতই থেকে যান' তাহলে তাদের জন্যে অসুবিধা সৃষ্টি হবে– তারা যখন গ্রামাঞ্চলে যান তখন শুধু নয়, এমনকি এই ইয়েনেন অঞ্চলেও অসুবিধা দেখা দিতে পারে। কোন কোন কমরেড এমনও চিন্তা করতে পারেন আমি বরং বিরাট পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলের [১২] জন্যে লিখে যাবো, এটা একটা কাজ যা আমি ভালভাবে জানি এবং এর একটি 'জাতীয় গুরুত্ব'ও রয়েছে।' এই চিন্তা পুরোপুরি ভুল। বিরাট পশ্চাদ্বর্তী এলাকা বদলে যাচ্ছে। সেখানকার পাঠকেরা আশা করেন যে, বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার লেখকেরা তাদেরকে বলবেন নতুন মানুষ এবং নতুন জগত সম্পর্কে এবং সেই পুরানো কাহিনী দিয়ে আর তাদেরকে বিরক্ত করবেন না। সেজন্যে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার জনগণের জন্যে যত বেশি লেখা যায়, তত বেশি করে জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ সেটা হবে। ফাদায়েভ তাঁর 'দি ডিবাকল' [১৩] বইতে শুধু একটি ছোট গেরিলা বাহিনীর কাহিনী বলেছেন, পুরোনো জগতের পাঠকদের স্বাদ মেটাবার কোন ইচ্ছা তাঁর ছিল না, তবু বইটি পৃথিবীব্যাপী প্রভাব বিস্তার করেছে। আপনারা জানেন যে, অন্তত পক্ষে চীনদেশে এর প্রভাব বেশ ব্যাপক। চীনের গতি সামনের দিকে, পেছনের দিকে নয় এবং পশ্চাৎপদ অধঃপতিত অঞ্চল নয়, বরং বিপ্লবীঘাঁটি এলাকাই চীনকে সামনে নিয়ে যাচ্ছে। এটা একটি মূল বিষয় যা সর্বোপরি শুদ্ধিকরণ আন্দোলনে কমরেডদের অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে।

নতুন যুগের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যেহেতু জনগণের জন্যে জরুরি সে জন্যে ব্যক্তি ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক পুরোপুরি নির্ধারণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। লু সুনের কবিতার নিম্নোক্ত পদটি হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য।

"হিংস্র কটাক্ষ নিয়ে আমি ধীরভাবে অমান্য করি
তর্জনী উত্তোলিত সহস্র মানুষ
কিন্তু মাথা নত করে ইচ্ছুক বলদের মত
সেবা করি সরল শিশুদের।" [১৪]'

এখানে, 'তর্জনী উত্তোলিত সহস্র মানুষ' হলো আমাদের দুশমন এবং যতই হিংস্র হোক না কেন, আমরা কখনো তাদের কাছে মাথা নত করবো না। 'শিশুরা' এখানে প্রতীক হলো প্রলেতারিয়েত ও জনগণের। সকল বিপ্লবী লেখক ও শিল্পকর্মীর উচিত হবে লু সুনের আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং প্রলেতারিয়েত ও জনগণের জন্যে 'বলদ' হওয়া, মৃত্যু পর্যন্ত ঐ কাজে পিঠ পেতে দেওয়া। জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে ও

www.pathagar.com

জনগণের সেবা করতে আগ্রহী বুদ্ধিজীবীদের অবশ্যই এমন একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, যাতে তারা ও জনগণ একে অন্যকে ভালভাবে জানতে সক্ষম হন। এই প্রক্রিয়ায় সম্ভবত এবং নিশ্চয়ই অনেক ব্যথা ও প্রতিরোধ সহ্য করতে হবে। কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকলে সব কিছুকে আপনি প্রতিহত করতে সফলকাম হবেন।

আজকে, সাহিত্য ও শিল্পকলার আন্দোলনে পুনর্গঠন বিষয়ক শুধু কয়েকটি মৌলিক সমস্যা নিয়ে আমি আলোচনা করেছি, অনেক নির্দিষ্ট সমস্যা রয়ে গেছে যার জন্যে অধিকতর পর্যালোচনা দরকার। আমার স্থির বিশ্বাস যে, নির্দেশিত পথে এগিয়ে যেতে কমরেডগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি বিশ্বাস করি যে, শুদ্ধিকরণ আন্দোলনের পর্যায়ে এবং আগামী দিনের অধ্যয়ন ও কাজ করার দীর্ঘ সময়ে আপনারা নিজেদের মধ্যে ও রচনার মধ্যে পরিবর্তন আনয়নে এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত রচনা সৃষ্টিতে সক্ষম হবেন— যেগুলো জনগণ দ্বারা বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হবে। এবং এভাবে, বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা ও চীনের সাহিত্য ও শিল্পকলার আন্দোলনকে গৌরবোজ্জ্বল নতুন স্তরে উন্নীত করতে সমর্থ হবেন।

টীকা

১। ৪ঠা মে আন্দোলন ১৯১৯ সালের মে মাসের ৪ তারিখে শুরু হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের বিজয়ী শক্তিগুলো চীনকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে চাইলে পিকিং-এর ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। ধীরে ধীরে সমাজের সর্বস্তরে সেটা প্রসারিত হয় এবং সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রূপ পরিগ্রহ করে । নতুন সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তা ও জন্ম নেয় ও তার মধ্যে দিয়ে মার্কসবাদ বিস্তার লাভ করে।

২। বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৩১ সালের পর শেন্সী-কান্সু-নিংসিয়া সীমান্ত এলাকা একটি বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় পরিণত হয় লং মার্চের পর কিছুকাল চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির স্থান হিসেবে এটা ব্যবহৃত হতো।

৩। ভি.আই. লেনিনের 'পার্টি-সাহিত্য' দ্রষ্টব্য (নভেম্বর ১৩, ১৯০৫)। সর্বহারা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সেখানে তিনি বলেছেন : 'তা হবে এক স্বাধীন সাহিত্য, কারণ লোভ বা পদলিপ্সা নয় বরং সমাজবাদী ভাবধারণা আর শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সহানুভূতি নতুন শক্তিসমূহকে এর সপক্ষে টেনে আনবে। তা হবে এক স্বাধীন সাহিত্য, কারণ তা পরিতৃপ্ত নায়িকার সেবায় নিয়োজিত থাকবে না, কিংবা একঘেয়ে জীবনে বিরক্ত কেবল দশ হাজার উপরওয়ালা লোক'— যারা চরম মেদবহুলতার বিকৃতিতে ভুগছে তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে না, বরং তা নিয়োজিত থাকবে দেশের শ্রেষ্ঠতম অংশ, দেশের শক্তি দেশের ভবিষ্যৎ— লাখ কোটি শ্রমজীবী মানুষের সেবায়। তা হবে এক স্বাধীন সাহিত্য

www.pathagar.com

এবং তা মানবজাতির বিপ্লবী চিন্তাধারার সর্বশেষ কীর্তিকে সমাজতন্ত্রী সর্বহারাদের অভিজ্ঞতাও প্রাণবান কাজের ভিত্তিতে আরো সমৃদ্ধ করে তুলবে এবং তা অতীতের অভিজ্ঞতা (বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র আদি কল্প স্বর্গীয় রূপ থেকে যা পরিণতির দিকে বিকশিত হয়েছে) ও বর্তমানের অভিজ্ঞতার (শ্রমজীবী কমরেডদের বর্তমান সংগ্রাম) মধ্যে প্রতিষ্ঠা করবে এক স্থায়ী পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক।'

৪। লিয়াং শি-ছিউ ছিল প্রতিবিপ্লবী জাতীয় সমাজতন্ত্র পার্টির সদস্য। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে দীর্ঘদীন সে প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিন বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা প্রচার করেছিল। সে দৃঢ়ভাবে বিপ্লবের বিরোধিতা করে এবং বিপ্লবী শিল্প সাহিত্যকে তীব্র ভাষায় গালাগালি করেছিল।

৫। ১৯৩৭ সালে জাপানিরা পিকিং ও সাংহাই দখল করলে চৌ জুওরেন ও চাং-জি পিং জাপানি হামলাকারীদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল।

৬। 'বামপন্থী লেখকদের লীগ সম্পর্কে আমার ধারণা', 'দুই হৃদয়' নামক সংকলনে, **লু সুনের রচনাবলী**, ৪র্থ খণ্ড।

৭। 'ছিয়ে চিয়ে থিংয়ে' লিখিত ব্যঙ্গ রচনার শেষ সংকলনের 'পরিশিষ্টে' অন্তর্ভুক্ত 'মৃত্যু' নামক প্রবন্ধ দেখুন, **লু সুনের রচনাবলী**, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

৮। 'ছোট্ট রাখাল বালক', চীনদেশে বহুল প্রচলিত একটি ছোট অপেরা। এতে পাত্রপাত্রী মাত্র দুজন— একজন রাখাল ও অপরজন গ্রাম্য বালিকা। তারা প্রশ্ন ও উত্তরের আকারে গান গায়। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে জাপ-বিরোধী প্রচারকার্য চালাবার জন্যে নতুন শব্দ ব্যবহার করে পদ্ধতিটি কাজে লাগানো হয়েছিল। কিছুকাল তা বিরাট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

৯। 'মানুষ, হাত, মুখ, ছুরি, গরু, ছাগল,— এই ছয়টি অপেক্ষাকৃত সরল, মাত্র কয়েকটি আঁচড় দিয়ে এই অক্ষর লেখা হয়। পুরনো যুগের পাঠশালায় চীনা ভাষার পাঠ্য পুস্তকের প্রথম কয়েকটি পাঠে এগুলো দেওয়া হতো।

১০। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ছু-এর রাজ্যে 'বসন্তের তুষার 'এবং 'গ্রাম্য দরিদ্রের গান' প্রচলিত ছিল। প্রথমটির সঙ্গীতটি দ্বিতীয়টির চাইতে উচ্চ স্তরের ছিল। রাজকুমার চাও মিং-এর গদ্য ও পদ্য সংকলনে 'ছু-এর রাজার প্রতি সোং ইয়ু-এর উত্তর' যে কাহিনীর উল্লেখ আছে তা থেকে জানা যায়, ছু-এর রাজধানীতে যখন কেউ বসন্তের তুষার গান গাইত, তখন মাত্র কয়েক ডজন লোক তার সঙ্গে যোগ দিত, কিন্তু যখন 'গ্রাম্য দরিদ্রের গান' গাওয়া হতো, তখন তাতে যোগ দিত হাজার হাজার লোক।

www.pathagar.com

১১। ভি.আই. লেনিনের 'পার্টি-সংগঠন ও পার্টি-সাহিত্য' দ্রষ্টব্য; তাতে তিনি লিখেছেন : 'সাহিত্যকে হতে হবে সর্বহারা শ্রেণীর সাধারণ কাজ কর্মের একটা অঙ্গ, সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতি সচেতন সমগ্র অগ্রবাহিনী ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক-গণতন্ত্রের যে একটি বিরাট যন্ত্রকে গতিশীল করে তুলেছে সাহিত্যকে হতে হবে তার অন্তর্গত 'দাঁত-ওয়ালা চাকা ও ইস্ক্রুপ'।

১২। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের সময়ে, জাপবিরোধী সম্মুখ-ফ্রন্ট বিস্তৃত ছিল উত্তর চীন, পূর্ব চীন, মধ্যচীন এবং দক্ষিণ চীনের এলাকাসমূহে, আর যে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলগুলো জাপান কর্তৃক অধিকৃত হয়নি এবং কুওমিনটাং কর্তৃক শাসিত, সেগুলোকে সাধারণত 'বিরাট পশ্চাদবর্তী এলাকা বলে অভিহিত করা হতো।

১৩। আলেকজান্ডার ফাদায়েভ (১৯০১-৫৬) সোভিয়েত ইউনিয়নের বিখ্যাত লেখক। তাঁর লিখিত উপন্যাস 'দি ডিবাকল' ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে গৃহযুদ্ধের সময়ে প্রতিবিপ্লবী দস্যুদের বিরুদ্ধে সাইবেরিয়ার শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত গেরিলা শাখার সংগ্রামের কাহিনী বর্ণিত আছে। বইটি লু সুন চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

১৪। পঙক্তিদ্বয় লুসুনের 'আত্মব্যঙ্গচিত্র' থেকে নেওয়া। রচনা সংকলন বহির্ভূত রচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, লু সুনের রচনাবলী,৭ম খণ্ড।

www.pathagar.com

গেওর্গ লুকাচ

অবতরণিকা

[বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন গেওর্গ লুকাচ। হাঙ্গেরির ধনী ইহুদী পরিবারে ১৮৮৫ সালে তাঁর জন্ম হয়। ১৯১৮ সালে হাঙ্গেরির কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তারপর থেকে নানা উত্থান-পতন সত্ত্বেও মার্কসবাদে অবিচলিত আস্থা রেখে সারস্বত জীবন নির্বাহ করেন। ১৯১৯ সালের ক্ষণস্থায়ী কম্যুনিস্ট শাসনে হাঙ্গেরির শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। যুদ্ধান্তে নির্বাসনে যান— অস্ট্রিয়া, জার্মানি হয়ে শেষ পর্যন্ত রাশিয়ায়। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরির অভ্যুত্থানের সময়ও মন্ত্রীসভায় ছিলেন— বিফল অভ্যুত্থানের পর আবার পলায়ন করেন। তবে ধরা পড়ে বুদাপেস্টে গৃহবন্দি থাকেন। তিনি লোকান্তরিত হন ১৯৭১ সালে। মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের আলোচনার ইতিহাসে লুকাচের অবস্থান অনেক ওপরে। তাঁর কর্মে ও চিন্তায়, মতানুগত্যে ও মননশীলতায় রাজনৈতিক অবিচলতার ও নন্দনতাত্ত্বিক মৌলিকতার সমাহার তাঁকে অসাধারণ খ্যাতি দিয়েছে। History and Consciousness (1923), Theory of Aesthetics (১৯৬৩), Studies in European Realism (১৯৫০), The Historical Novel (১৯৩৭) প্রভৃতি তাঁর কয়টি বিশিষ্ট গ্রন্থ। বর্তমান প্রবন্ধটি তৃতীয় গ্রন্থের ভূমিকা।]

এই গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহ রচিত হয়েছে প্রায় বছর দশেক আগে। লেখক ও পাঠক উভয়ের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে ঠিক এখন সেগুলোর পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন কী? প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, কোন সাময়িকতা এগুলোর মধ্যে নেই। জনমতের এক বিরাট অংশের কাছে বিষয় ও সুর দূরবর্তী বলে মনে হয়। কিন্তু আমি মনে করি যে, হাল আমলেও মতবাদের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করায়, বিস্তারিত কোন বিতর্কে জড়িয়ে না-পড়লেও এগুলোর মধ্যে এক প্রকারের সাময়িকতা রয়েছে।

সাধারণ পরিবেশ নিয়ে আরম্ভ করা যাক : মরমীবাদের যে মেঘ কাব্যিক রঙ ও উত্তাপ নিয়ে একদা সাহিত্য প্রপঞ্চকে ঘিরে রেখেছিল এবং তাদের চারদিকে আন্তরিক ও 'উৎসাহব্যঞ্জক' প্রতিবেশের জন্ম দিয়েছিল, সেটা কেটে গেছে। স্পষ্ট ও তীব্র আলোকে জিনিসগুলো এখন আমাদের সামনে প্রকাশিত। মার্কসের শিক্ষার দ্বারা বিকিরিত এ আলো অনেকের কাছে শীতল ও কঠিন মনে হতে পারে। মার্কসবাদ প্রতিটি ঘটনার বস্তুমূল অনুসন্ধান করে, ঐতিহাসক সংযোগ ও আন্দোলনের পটভূমিতে তাদের বিচার করে, মূল থেকে ফুলে তাদের বিকাশ প্রদর্শন করে এবং তা করতে গিয়ে প্রতিটি ঘটনাকে আবেগায়িত, অযৌক্তিক, মরমী কুয়াশা থেকে উদ্ধার করে এবং উপলব্ধির উজ্জ্বল আলোকে টেনে নিয়ে আসে।

www.pathagar.com

এ ধরনের উত্তরণ প্রথম দৃষ্টিতে অনেক মানুষের কাছে হতাশাজনক। এবং এটা হওয়া যে উচিত সেটাও প্রয়োজনীয়। কারণ রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি তাকানো সহজ ব্যাপার নয় এবং প্রথম চেষ্টায় তা অর্জনে কেউ সাফল্য লাভ করে না। এর জন্যে যা দরকার তা হচ্ছে শুধু প্রচুর পরিমাণে কঠোর শ্রম নয়, বরং গভীর নৈতিক চেষ্টাও বটে। হৃদয় পরিবর্তনের এ ধরনের চেষ্টায় প্রথম পর্যায়ে অধিকাংশ লোক বর্জিতব্য বাস্তবতার 'কাব্যিক' স্বপ্নজগতের, যদিও মিথ্যা, দিকে অনুশোচনার দৃষ্টিতে পেছনে ফেরে তাকাবে।

শুধু পরবর্তীকালে ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসবে যে, সত্যকে তার সমস্ত অনিবার্য বাস্তবতার সঙ্গে স্বীকার করে নেয়া ও তদনুসারে কাজ করার মধ্যে কত বড় অকৃত্রিম মানবিকতা—তথা অকৃত্রিম কবিতা লুকিয়ে আছে।

কিন্তু এই হৃদয়-পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু জড়িয়ে আছে। আমি এখানে ভাবছি ঐ দার্শনিক নৈরাশ্যের কথা যা দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের সামাজিক পরিস্থিতিতে এত গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। এটা দুর্ঘটনার কারণে নয় যে, সর্বত্র এমন দার্শনিকের আবির্ভাব হলো যারা উক্ত নৈরাশ্যকে ঘনীভূত করলেন এবং যারা তাদের বিশ্ববীক্ষাকে হতাশার কোন-না-কোন দার্শনিক সাধারণীকরণের ওপর নির্মাণ করলেন। জার্মানির স্প্রেংলার ও হাইডেগার এবং গত কয়েক দশকের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অন্যান্য প্রভাবশালী দার্শনিকও এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেন।

অবশ্য, একালেও আমাদের চারদিকে গভীর অন্ধকার বিরাজ করছে, যেমন ছিল দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে। যারা হতাশ হতে চান তারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রচুর ও অধিক কারণ খোঁজে পেতে পারেন তার জন্যে। একালে আমাদের মনুষ্যজীবনকে ঘিরে রাখা বস্তুগত ও নৈতিক অন্ধকারকে কম করে দেখে বা বাধা-বিপত্তিকে কম গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করে মার্কসবাদ কাউকে সান্ত্বনা দেয় না। পার্থক্য শুধু এখানেই এবং এই শুধুর মধ্যে সমগ্র জগত বিরাজ করে যে, মানবীয় বিকাশের প্রধান গতিপথ সম্পর্কে মার্কসবাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান রয়েছে এবং তার নিয়মাবলীকে সে স্বীকার করে। যারা এ জ্ঞানে উপনীত হয়েছেন তারা সকল ক্ষণিক অন্ধকার সত্ত্বেও, জানেন যে, আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং আমাদের গন্তব্য কোথায়? এবং যারা এটা জানেন, তাদের চোখে পৃথিবী বদলে গেছে, পূর্বেকার একমাত্র অন্ধ, অর্থহীন বিভ্রান্তির বদলে তারা উদ্দেশ্যমূলক বিকাশ লক্ষ্য করেন। যেখানে হতাশার দর্শন পৃথিবীর পতন ও সংস্কৃতির ধ্বংসের চিন্তায় অশ্রুপাত করে, সেখানে মাকর্সবাদীরা নতুন পৃথিবীর প্রসব যন্ত্রণাকে অবলোকন করেন ও যন্ত্রণাকে লাঘব করতে সহায়তা করেন।

এসব প্রশ্ন কেউ কেউ তুলতে পারেন– আমি নিজেও প্রায়শ অনুরূপ আপত্তির

www.pathagar.com

মুখোমুখি হয়েছি– যে প্রসঙ্গগুলো শুধু দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের। উপন্যাসের তত্ত্ব ও ইতিহাসের বিচারের সঙ্গে এসবের প্রাসঙ্গিকতা কী? আমরা বিশ্বাস করি যে, বেশ কিছু করার আছে এ প্রসঙ্গের । যদি আমরা সাহিত্য ইতিহাসের আলোকে প্রশ্নটিকে হাজির করি, তাহলে এই অর্থ দাঁড়ায় : উনিশ শতকের দুই প্রতিনিধিত্বকারী ধ্রুপদী শিল্পী বালজাক ও ফ্লবেরের মধ্যে কে বড় ঔপন্যাসিক ছিলেন? এ বিচার শুধু রুচির বিচার নয়– শিল্পরূপ হিসেবে উপন্যাসের নন্দনতত্ত্বের কেন্দ্রীয় সমস্যা এর সঙ্গে জড়িত আছে। প্রশ্নটা দাঁড়ায় যে, কোন উপন্যাসের মহত্ত্বের সামাজিক ভিত্তি কী– বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জগতের ঐক্য না বিচ্ছিন্নতা? আধুনিক উপন্যাস কী জিদ, প্রুস্ত ও জয়েসের মধ্যে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে, না কি বালজাক, লিও টলস্টয়ের রচনার মধ্যে অনেক আগেই শিখরে উপনীত হয়েছে? যাতে করে বর্তমানে স্রোতের বিপরীতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে শুধু মহৎ শিল্পীরা– যেমন বলা যায় টমাস মান-এর কথা– ইতিপূর্বে বিজিত চূড়ায় পৌঁছুতে পারেন।

এই দুটো নান্দনিক ধারণার মধ্যে উপন্যাসের প্রকৃতি ও ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে দুটো পরস্পর বিরোধী ইতিহাসের দর্শন লুকিয়ে আছে। এবং যেহেতু উপন্যাস হচ্ছে আধুনিক বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রাধান্য বিস্তারকারী শিল্পরূপ, উপন্যাসের নান্দনিক ধারণাদ্বয়ের বৈপরীত্য আমাদেরকে সামগ্রিকভাবে সাহিত্যের বা এমনকি সম্ভবত সংস্কৃতিরও বিকাশের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ইতিহাসের দর্শন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নটি হবে এরূপ : আমাদের বর্তমান কালের সংস্কৃতির সড়কটি আমাদেরকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়, না পেছনের দিকে টেনে রাখে? এ-বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নেই, আমাদের সংস্কৃতি এক অন্ধকার যুগ অতিক্রম করেছে এবং করছে। এটা নির্ধারণ করা ইতিহাসের দর্শনের দায়িত্ব যে, দিগন্তে প্রসারমান যে-অন্ধকার প্রথমবারের মতো ফ্লবেরের Eduction Sentimentale-র মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছে, সেটা কি চূড়ান্ত ও প্রাণান্তকর অস্তগমনের চিত্র, না কি শুধু একটি সুড়ঙ্গ পথ, যা থেকে যতই দেরি হোক-না-কেন, পুনরায় উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আছে?

বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্ববিদ ও সমালোচকেরা, বর্তমান গ্রন্থের লেখক তাদের অন্যতম, এই অন্ধকার থেকে বেরোনোর কোন পথ দেখেননি। তারা কবিতাকে দেখেছেন শুধু অন্তর্জগতের উন্মোচনরূপে, সামাজিক অসহায়তার স্বচ্ছদৃষ্টি স্বীকৃতি হিসেবে, বা সবচেয়ে বেশি বলতে গেলে সান্ত্বনা তথা বহির্মুখে প্রতিফলিত অলৌকিক ঘটনারূপে সেই ঐতিহাসিক-দার্শনিক ধারণার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি দেখা যায় ফ্লবের-বিরচিত oeuvre-কে বিশেষত Education Sentimentale-কে আধুনিক উপন্যাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে বিবেচনা করায়। স্বভাবতই সাহিত্যের সব শাখা পর্যন্ত ধারণাটি প্রসারিত।

www.pathagar.com

আমি শুধু একটি উদাহরণ দেব : War & Peace-এর শেষ ভাষণটির যথার্থ বিরাট দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয় হচ্ছে ঐ-প্রক্রিয়াটি নেপোলনীয় যুদ্ধবিগ্রহাদির পরে রুশ অভিজাত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সবচেয়ে প্রাগ্রসর সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশকে– অবশ্যই অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ– ডিসেম্বরের অভ্যুত্থানে নিয়ে যায়, যে অভ্যুত্থানটি ছিল মুক্তির জন্যে রুশ জনগণের অসাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের বিয়োগান্তক পূর্বাভাষ। ইতিহাস ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত আমার পুরোনো দর্শন এর কিছুই দেখেনি। আমার কাছে উপসংহার ভাষণটি শুধু ফ্লবেরীয় অসহায়তার নির্জিত রঙ, বুর্জোয়া পারিবারিক জীবনের ধূসর পাণ্ডুলিপি দ্বারা আটকে পড়া যৌবনের উদ্দেশ্যে হীন উচ্ছ্বাস ও অনুসন্ধানের হতাশা ইত্যাদিকে ধারণ করে। বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্বের প্রায় প্রতিটি বিস্তৃত বিশ্লেষণ সম্পর্কে এটা প্রযোজ্য। গত পঞ্চাশ বছরের ঐতিহাসিক চিন্তার (যার সার কথা হচ্ছে যে, জ্ঞানের অন্যতম শাখা হিসাবে ইতিহাসের বিষয়বস্তু যে মানবজাতির অবিচ্ছিন্ন ঊর্ধ্বমুখী বির্বতন, সেটাকে অস্বীকার করা) প্রতি মার্কসবাদের বিরোধিতা একই সঙ্গে বিশ্ববীক্ষার বা নন্দনতত্ত্বের সমস্যানিচয়ের প্রতি ধারালো বস্তুগত ভিন্নমতের দ্যোতনা দেয়। একটি অবতরণিকার সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে মার্কসীয় ইতিহাস দর্শনের– এমনকি একটি কংকালসদৃশ রূপরেখা–দেয়া আমার কাছ থেকে আশা করতে পারেন না। কিন্তু তবু আমাদেরকে কতিপয় গতানুগতিক সংস্কার দূর করতে হবে যাতে করে লেখক ও পাঠক পরস্পরকে বুঝতে পারেন, যাতে পাঠক পক্ষপাতশূন্য মনে বইটি পড়তে পারেন, যেখানে সাহিত্য-ইতিহাস ও নন্দনতত্ত্বের কতিপয় গুরুতর সমস্যা সম্পর্কে মার্কসবাদের বিশ্লেষণ রয়েছে এবং যেন প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে এই প্রয়োগের তুলনা না-করা পর্যন্ত পাঠক রায়দানে বিরত থাকেন। মার্কসীয় ইতিহাসদর্শন হচ্ছে একটি ব্যাপকতত্ত্ব যা আদিম সাম্যবাদ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজনীয় অগ্রগতিকে পর্যবেক্ষণ করে এবং একই রাস্তায় আরো অগ্রগতির পটভূমিকায় ঐতিহাসিক ভবিষ্যতের দিকে আমাকে পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়ন্ত্রক কতিপয় সূত্রের স্বীকৃতি থেকে সৃষ্ট এসব নির্দেশনামা রন্ধনপ্রণালীর বই নয়, যেখানে প্রতিটি ঘটনা বা যুগের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া আছে, মার্কসবাদ ইতিহাসের অলি-গলি দেখার নির্দেশিকা নয়, বরং যে-পথে ইতিহাস এগিয়ে যায় সে দিকে নির্দেশক স্তম্ভমাত্র। যে-চূড়ান্ত নিশ্চয়তা এ থেকে পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে ঐ-আশ্বাস যে, মানবজাতির বিকাশ শেষপর্যন্ত শূন্যতায় বা অর্থহীনতায় সমাপ্ত হয় না বা হতে পারে না।

অবশ্য এ ধরনের সাধারণীকরণ মার্কসবাদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার প্রতি পুরোপুরি ন্যায়বিচার করে না—উক্ত নির্দেশনা জীবনের প্রতিটি সাময়িক সমস্যা পর্যন্ত প্রসারিত। মার্কসবাদে সমন্বিত হয়েছে একটি অপরিবর্তনীয় গতিপথকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করার সঙ্গে বিপ্লবের আঁকাবাঁকা পথের জন্যে অবিরাম তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সুবিধাদান। এর সুনির্ধারিত

www.pathagar.com

ইতিহাস-দর্শন ঐতিহাসিক বিকাশের নমনীয় ও পরিবর্তনীয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই আপাতদ্বৈধ– যা প্রকৃতপক্ষে বস্তুনির্ভর বিশ্বদর্শনের দ্বান্দ্বিক ঐক্য– মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য তত্ত্বের নির্দেশক নীতি।

যারা মার্কসবাদকে জানে না বা শুধু ভাসা-ভাসা ভাবে বা লোকমুখে জানে, তারা এই তত্ত্বের যথার্থ বড় প্রতিনিধিদের মধ্যে মানবসমাজের ধ্রুপদী ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সেগুলো থেকে বিরামহীনভাবে নজির টানা দেখে বিস্মিত হতে পারে। বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশের ইচ্ছা না-করেও আমরা উদাহরণ হিসেবে সাম্প্রতিকতম দর্শনের বিবিধ ধারার বিপরীতে দর্শনে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতার কথা বলতে পারি। 'কিন্তু এসব বহুদিন হলো গত হয়ে গেছে' আধুনিকতাবাদী চিৎকার করে বলেন। যারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে ফ্যাসিবাদী আদর্শকে এবং তার অনুষঙ্গী, অতীত ঐতিহ্যের ছদ্মবিপ্লবী বর্জনকে– যা প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি ও মানবিকতাকে বর্জনের নামান্তর, সমর্থন করেন তারা বলেন যে, 'এগুলো হলো উনিশ শতকের অনভিপ্রেত ও সেকেলে উত্তরাধিকার।' চলুন আমরা সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে সাম্প্রতিকতম দর্শনের দেউলেপনার দিকে তাকাই : চলুন আমরা বিবেচনা করি যে, আমাদের কালের অধিকাংশ দার্শনিক যখনই বর্তমানকালের জীবননির্যাসকে এমনকি অতিদূরতরভাবে স্পর্শ করেও কিছু বলতে চান তখন তারা কেমন করে দ্বান্দ্বিকতার ভগ্ন ও ছড়ানো টুকরোকে (পৃথকীকরণের দ্বারা বিকৃতি ও ভ্রান্তি প্রাপ্ত) জড়ো করতে বাধ্য হন; চলুন আমরা তাকাই আধুনিক কালে দর্শনসমন্বয়ের প্রচেষ্টার দিকে এবং তাহলে আমরা সেখানে পাব অধুনাবিস্মৃত পুরোনো অকৃত্রিম দ্বান্দ্বিকতার দুঃখজনক দুর্দশাগ্রস্ত হাস্যকর অনুকরণকে।

এটা আকস্মিক ঘটনা নয় যে, বড়-বড় মার্কসবাদীরা নন্দনতত্ত্বে যেমন তেমনি অন্য ক্ষেত্রেও, আমাদের ধ্রুপদী ঐতিহ্যের ঈর্ষ্যা অভিভাবক ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এই ঐতিহ্যপ্রীতিকে অতীতে-প্রত্যাবর্তন বলে গণ্য করেননি; তাঁদের ইতিহাস দর্শনের এটা একটা প্রয়োজনীয় ফল যে, তাঁরা অতীতকে পুনরাগমনের অসাধ্য এবং নবায়নে অসমর্থ বলে বিবেচনা করেন। মানুষের ধ্রুপদী ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা বলতে নন্দনতত্ত্বে এটাই বোঝায় যে, বড়-বড় মার্কসবাদীরা যে-সূত্রটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তার ভিত্তিতে ইতিহাসের যথার্থ রাজপথ, এর বিকাশের সঠিক দিকচিহ্ন, এর ঐতিহাসিক বাঁকের সঠিক গতিপথ নিয়ে তাঁরা অনুসন্ধান করেন; এবং সূত্রটি সম্পর্কে অবগত আছেন বলে তাঁরা রেখাচিত্রে উঁচুনিচু বাঁক দেখলেই স্পর্শক বরাবর উড়াল দেন না। বিবর্তনের একটি অপরিবর্তনীয় সাধারণ রেখার অস্তিত্বকে তাত্ত্বিকভাবে বর্জন করেছেন বলে আধুনিক চিন্তাবিদেরা সে কাজটি হরহামেশা করে থাকেন।

www.pathagar.com

নন্দনক্ষেত্রের ক্ষেত্রে, ঐ মহৎ শিল্পসৃষ্টির ভেতরে ধ্রুপদী ঐতিহ্য নিহিত, যেগুলো সমগ্র সমাজের পটভূমিতে মানুষকে সমগ্রভাবে চিত্রিত করেছে। পুনরায়, সাধারণ দর্শনই (এ ক্ষেত্রে : প্রলেতারীয় মানবিকতাবাদ) নন্দনতত্ত্বের কেন্দ্রীয় সমস্যাকে নির্ধারণ করে। তার বিকাশের বিভিন্ন যুগে সমগ্রতার আংশিক সিদ্ধি বা অসিদ্ধিসহ মার্কসীয় ইতিহাসদর্শন মানুষকে সমগ্রভাবে বিশ্লেষণ করে এবং মানব বিকাশের ইতিহাসকে অখণ্ডভাবে অনুধ্যান করে। তার চেষ্টা হচ্ছে সমগ্র মানবীয় সম্পর্কের নিয়ামক গুপ্ত নিয়মকে আলোকে নিয়ে আসা। সেজন্যে প্রলেতারীয় মানবিকতাবাদের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ মানবীয় ব্যক্তিত্বকে পুনর্গঠিত করা এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দরুন সৃষ্ট বিকৃতি ও বিকলাঙ্গতা থেকে মুক্ত করা। এই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রেক্ষাপট একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করে যদ্বারা মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে একালের সেতু নির্মাণ করে এবং একই সঙ্গে আমাদের কালের সাহিত্যিক সংগ্রামের ঘনঘটার মধ্য থেকে নতুন ধ্রুপদী সাহিত্যকে আবিষ্কার করে। প্রাচীন গ্রীক, দান্তে, শেক্সপিয়ার, গ্যেটে, বালজাক, টলস্টয় এঁরা সবাই মানবীয় বিকাশের বিরাট যুগের পর্যাপ্ত চিত্র প্রদান করেন এবং একই সঙ্গে অভগ্ন মানবীয় ব্যক্তিত্বের পুনরুদ্ধারের আদর্শিক লড়াইয়ে দিক-নির্দেশক স্তম্ভরূপে কাজ করেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গি উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বিকাশকে উপযুক্ত আলোতে দেখতে আমাদের সাহায্য করে। তারা আমাদের দেখায় যে, গত শতকের গোড়াতে এত গৌরবমণ্ডিতভাবে শুরু হওয়া ফরাসি উপন্যাসের যথার্থ উত্তরাধিকারী ফ্লবের কিংবা বিশেষ করে জোলা নন, বরং শতাব্দী শেষার্ধের রুশ এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান লেখকরা। এই পটভূমিকায় বিশ্লেষিত ফরাসি ও রুশ বাস্তববাদী লেখকদের নিয়ে রচিত আমার লেখাগুলো বর্তমান সংকলনে গৃহিত হয়েছে।

বালজাক ও পরবর্তীকালের ফরাসি উপন্যাসের সংঘাতকে (ইতিহাস দর্শনের অর্থে পরিকল্পিত) যদি আমরা বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক ভাষায় রূপান্তরিত করি তাহলে আমরা হাজির হই বাস্তববাদ ও প্রকৃতিবাদের সংঘাতে। এখানে সংঘাতের প্রসঙ্গ টেনে আনা আমাদের কালের অধিকাংশ লেখক ও পাঠকের কাছে সম্ভাব্যতা বিরোধী বলে মনে হতে পারে। কারণ হাল আমলের অধিকাংশ লেখক ও পাঠক প্রকৃতিবাদী গোষ্ঠীর ছদ্ম-বস্তুবাদ এবং মনস্তত্ত্ববাদী বা বিমূর্ত-আঙ্গিকবাদী গোষ্ঠীর মরীচিকা-অহংবাদের সাহিত্যিক ফ্যাশানের মধ্যে দোদুল্যমান থাকতে অভ্যস্ত। এবং বাস্তববাদে তারা যদি কিছুটা মূল্যও দেখে থাকে, তারা তাদের নিজস্ব চরম মিথ্যার অবস্থাকে প্রায় বাস্তববাদ বা বাস্তববাদের নতুন রূপ বলে বিবেচনা করে। বাস্তববাদ কিন্তু মিথ্যা বস্তুবাদ ও মিথ্যা অহংবাদের মাঝামাঝি কিছু নয়, বিপরীতপক্ষে, আমাদের কালের গোলক ধাঁধায় নকশাবিহীন হাতে সঞ্চরণকারীদের দ্বারা

www.pathagar.com

ভ্রান্তভাবে উত্থাপিত প্রশ্ন থেকে পাওয়া ছদ্মবিভ্রান্তির বিরোধী সমাধান-আনা সঠিক তৃতীয় পথ। বাস্তববাদ হলো এই সত্যের স্বীকৃতি যে, কোন সাহিত্যকর্ম নিষ্প্রাণ মাঝারির ওপর, যেমন ভাবেন প্রকৃতিবাদীরা, বা শূন্যতায় নিজের আত্মাকে হারিয়ে ফেলা ব্যক্তিসর্বস্ব নীতির ওপর দাঁড়াতে পারে না। বাস্তববাদী সাহিত্যের কেন্দ্রীয় শ্রেণীবৈশিষ্ট্য এবং মানদণ্ড হচ্ছে একটি প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা, একটি বিচিত্র সমন্বয় যা সাংগঠনিকভাবে চরিত্রে এবং পরিস্থিতিতে সাধারণ ও বিশেষকে সম্মিলিত করে। যা একটি প্রতিনিধিত্বশীল নমুনাকে এই মর্যাদায় ভূষিত করে তা এর গড় গুণাবলী নয়; বা যত গভীরভাবে মননে ধৃত হোক না-কেন, এর নিছক ব্যক্তিমাহাত্ম্যও নয়, যা একে প্রতিনিধিত্বশীল নমুনার মর্যাদায় ভূষিত করে তা হচ্ছে— এর মধ্যে মানবিক ও সামাজিক দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় নির্ধারকসমূহ মানুষ ও কালের সর্বোচ্চ সীমা ও সীমাবদ্ধতাকে মূর্ত করে, তাদের সুপ্ত সম্ভাবনার চূড়ান্ত উন্মোচন ও চরম বৈশিষ্ট্যের চরম উপস্থাপনা সহকারে বিকাশের সর্বোচ্চরূপ নিয়ে বিদ্যমান থাকে।

সুতরাং প্রকৃত মহৎ বাস্তববাদী সাহিত্য নিছক এক বা অপর বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের বদলে মানুষ ও সমাজকে পূর্ণাঙ্গ সত্তারূপে চিত্রিত করে। এই মাপকাঠি অনুযায়ী, একান্ত অন্তর্মুখিতা বা একান্ত বহির্মুখিতা দ্বারা নির্ধারিত শৈল্পিক ধারা বাস্তবকে সমভাবে শক্তিহীন ও বিকৃত করে। সুতরাং বাস্তববাদ বলতে বোঝায় এক ত্রিমাত্রিকতা, এমন এক সর্বব্যাপকতা যা চরিত্র ও মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে স্বাধীন সত্তা সঞ্চার করে। আধুনিক জগতের সঙ্গে অনিবার্যভাবে বিকশিত আবেগের ও বুদ্ধিবৃত্তির গতিশীলতাকে বর্জনের সঙ্গে এটা কোনভাবেই জড়িত নয়। যার বিরোধিতা এ করে তা হচ্ছে ক্ষণিক মেজাজের মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা দ্বারা মানবীয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার এবং মানুষ ও পরিস্থিতির বস্তুনির্ভর প্রতিনিধিত্বশীল নমুনার ধ্বংসসাধনের। উনিশ শতকের বাস্তববাদী সাহিত্যের মধ্যে এসব প্রবণতাবিরোধী সংগ্রাম নির্ধারক গুরুত্ব অর্জন করেছে। সাহিত্যানুশীলনের মধ্যে এসব প্রবণতা দেখা দেবার বহুপূর্বে বালজাক তার ট্র্যাজি-কমিক গল্প le chef d'oeuvre in connu-তে ভবিষ্যতদ্রষ্টার ন্যায় পুরো সমস্যাকে অবলোকন করে রূপরেখা অঙ্কন করেছেন। তাতে আবেগের উল্লাস ও রঙের দ্বারা নতুন ধ্রুপদী ত্রিমাত্রিকতা সৃষ্টিতে নিয়োজিত আধুনিক ইম্প্রেশানবাদীদের মতো মেজাজের একজন চিত্রকরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে। ফ্রনোফের নামক ট্র্যাজিক নায়ক এমন একটি ছবি আঁকে যা পরিণত হয় রঙের জগাখিচুড়িতে এবং যার ভেতর থেকে নিখুত মডেলের রমণীর পা ও পায়ের পাতা যেন প্রায়-আকস্মিকভাবে বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে। হাল আমলের আধুনিক শিল্পীদের উল্লেখযোগ্য অংশ ফ্রনোফের-সুলভ সংগ্রাম পরিত্যাগ করেছে। তারা তাদের সৃষ্টিতে বিধৃত বিশৃঙ্খল আবেগের যথার্থতা নতুন নন্দনতাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্যে খুঁজে পেয়ে সন্তুষ্ট আছে।

www.pathagar.com

পরিপূর্ণ মানবীয় ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয় উপস্থাপনা বাস্তববাদের কেন্দ্রীয় নান্দনিক সমস্যা। কিন্তু শিল্পকলার প্রতিটি গভীর দর্শনচিন্তার মতো এ ক্ষেত্রেও, নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির শেষসীমা পর্যন্ত অটল অনুসরণ আমাদের নন্দনতত্ত্ব অতিক্রম করে নিয়ে যায়; কারণ যদি সঠিকভাবে তার সর্বাধিক বিশুদ্ধতায় ধরা হয় তাহলে শিল্পকলা সামজিক ও নৈতিক মানবীয় সমস্যা দ্বারা আকীর্ণ। প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্রের বাস্তব সৃজন দুটো প্রবণতার বিরোধী : একটিতে মানুষের জৈবিক সত্তার আত্মসংরক্ষণ ও বংশরক্ষা প্রধান (জোলা ও তার শিষ্যরা এ ধারার প্রতিভূ), অপরটি মানুষকে বিশুদ্ধ মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় উর্ধ্বজগতে উন্নীত করে। কিন্তু আনুষ্ঠানিক নন্দনতাত্ত্বিক বিচারের সীমা থেকে দেখলে এ ধরনের মনোভাব নিঃসন্দেহে পুরোপুরি স্বেচ্ছাচারমূলক হবে, কেননা এমন কোন কারণ নেই বিশুদ্ধ ভাল রচনার দৃষ্টিতে দেখালে শৃঙ্গারমূলক সংঘাতও তার সঙ্গে বিজড়িত নৈতিক ও সামজিক সংঘাত কেন বিশুদ্ধ যৌনতার আদিম স্বতঃস্ফূর্ততার চেয়ে উঁচু স্থানের অধিকারী হবে? শুধু যদি আমরা মেনে নিই যে, পূর্ণ মানবীয় ব্যক্তিত্বের সমাধান ও রূপায়ণ মানুষের সামজিক ও ঐতিহাসিক কর্তব্য, যদি আমরা শুধু মনে করি যে, শিল্পকলার বৃত্তি হচ্ছে যে কারণাবলী উক্ত প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে ও বাঁক সৃষ্টি করে, সকল প্রকার সম্পদসহ ঐ কারণকে ও সৃষ্ট সবচেয়ে গুরুতর বাঁককে চিত্রিত করা; শুধু যদি অনুসন্ধিৎসু আবিষ্কারক ও নির্দেশকের ভূমিকা নন্দনতত্ত্ব শিল্পকলাকে দেয়, তাহলে জীবনের ঘটনাবলীকে নির্দিষ্ট করে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর গুরুত্বের এলাকায় বিভক্ত করা যায়, কোন এলাকা প্রতিনিধিত্বশীল নমুনার ওপর ও বিকাশপথের ওপর আলো নিক্ষেপ করে, অন্য এলাকা অন্ধকার নিমজ্জিত থাকে। কেবল তখনই এটা স্পষ্ট হয় যে, যতই বিশদ ও শিল্পকলার দিক থেকে ত্রুটিহীন হোক না-কেন, যৌনকর্ম বা ব্যথা-বেদনা যাই হোক না-কেন, তথা নিছক জৈবিক ক্রিয়ার বর্ণনা মানুষের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও নৈতিক সত্তাকে নিচে নামিয়ে আনে এবং এটা মানবীয় সংঘাতকে তার সম্পূর্ণ জটিলতায় ও পূর্ণতায় উদ্ভাসিত করার মতো প্রয়োজনীয় শৈল্পিক প্রকাশের পথে উপায় নয়, বরং প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। এই কারণেই প্রকৃতিবাদ থেকে প্রাপ্ত নব্য বিষয় ও নব্য প্রকাশভঙ্গি সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে নয়, বরং তার শক্তিহীনতায় ও সংকীর্ণতায় নিয়ে গেছে।

জোলা ও তার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লিখিত প্রথম যুগের বিতর্ক অনুরূপ চিন্তাধারা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু যদিও মনস্তত্ত্বগোষ্ঠী একাধিকবার সঠিকভাবেই জোলা ও তার অনুসারীদের সুনির্দিষ্টভাবে নিন্দা করেছিলেন, তারা প্রকৃতিবাদের চরম মিথ্যা ধারনার চেয়ে কম চরম ও মিথ্যা নয়, তেমন ধরনের একটি ধারণারও বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ মানুষের অন্তর্জীবন এবং তার প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট ও সংঘাতকে যথার্থভাবে শুধু সামাজিক এবং ঐতিহাসিক হেতুর সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে যুক্ত রেখেই বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু সেটার নিজস্ব অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিকতাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ববাদী গোষ্ঠীরা শরীর নির্ভর প্রকৃতিবাদীদের চেয়ে কম বিমূর্ত নন এবং প্রকৃতিবাদ-বিরোধী হলেও পূর্ণ মানবীয় ব্যক্তিত্বের রূপায়ণকে তাদের চেয়ে কম বিকৃত ও শক্তিশূন্য করেন না।

এটা সত্য যে বিশেষ করে সাহিত্যফ্যাশানের দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে প্রকৃতিবাদীদের তুলনায় মনস্তত্ত্ববাদী গোষ্ঠীর অবস্থান প্রথম দৃষ্টিতে কম স্পষ্ট। প্রত্যেকে সঙ্গে সঙ্গে মানবেন যে, ডিডো-এইনিস বা রোমিও-জুলিয়েটদের মধ্যে জোলার পদ্ধতিতে দেহমিলন বর্ণনা অনেক বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, অপরদিকে ভার্জিল ও শেক্সপিয়ার কর্তৃক রূপায়িত শৃঙ্গার বিষয়কসংঘাতের মধ্য দিয়ে সীমাহীন সাংস্কৃতিক ও মানবীয় ঘটনা ও টাইপের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। প্রকৃতিবাদীদের নিচের সমতলে নামিয়ে আনার আপাতদৃষ্টিতে ঠিক বিপরীত অবস্থানে আছে বিশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টিবাদীরা। কারণ এরা (অন্তর্দৃষ্টিবাদীরা) যা বর্ণনা করে তা হচ্ছে একান্ত ব্যক্তিগত ও অনাবর্তক বৈশিষ্ট্যাবলী। কিন্তু এ ধরনের চরম ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ আবার চরমভাবে বিমূর্তও বটে, এবং সেজন্যেই ঘুরে-ফিরে আসে না। এখানেও, চেস্টারটনের কৌতুক-মিশ্রিত সম্ভাব্যতা- বিরোধী উক্তিটি ঠিক যে, প্রকৃতিবাদীদের স্থূল জৈবিকতা ও প্রচারবাদী লেখকদের মোটা রূপরেখা, দুইই পূর্ণ মানবীয় ব্যক্তিত্বের যথার্থ চিত্রকে বিকলাঙ্গ করে। তাদের সংখ্যা আরো অনেক কম যারা বোঝেন যে, মানুষের আত্মার মধ্যে মনস্তত্ত্ববাদীর সযত্ন অনুসন্ধান এবং এলোমেলো চিন্তা প্রবাহে সমষ্টিতে রূপান্তরিত করে মানুষকে প্রদর্শন পূর্ণ মানবীয় ব্যক্তিত্বের সাহিত্যিক রূপায়ণের প্রতিটি সন্তানকে নিশ্চিতভাবে কম ধ্বংস করে না। আপটন সিনক্লেয়ারের শীতল হিসেবের সব ভাল বা সব মন্দের বাঁধাধরা চরিত্রের মতো ক্ষুদ্রকায় করে জয়েসের মতো তটভূমিবিহীন প্রতীকীস্রোত প্রাণবান মনুষ্যসত্তাকে নির্মাণ করতে পারে।

জায়গার অভাবে সমস্যাটিকে এখানে পুরোপুরিভাবে আলোচনা করা যাবে না। শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বর্তমানে প্রায় অবহেলিত প্রসঙ্গ এখানে গুরুত্ব পাবে। তা থেকে দেখা যাবে যে, পূর্ণ মানবীয় ব্যক্তিত্বের জীবন্ত রূপদান শুধু তখনই সম্ভবপর যখন লেখক প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্রসৃষ্টিতে উদযোগী হন। বিষয়টি হচ্ছে মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা ও সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে সামাজিক সত্তা এ দুয়ের সাংগঠনিক ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে মনে রাখা। আমরা জানি আধুনিক সাহিত্যের সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে জটিল সমস্যা হচ্ছে এটি এবং আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এটা হয়ে আসছে। ওপরে-ওপরে দুটো স্পষ্টভাবে বিভক্ত বলে মনে হয় এবং আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ যত

www.pathagar.com

পূর্ণাঙ্গভাবে বিকাশ লাভ করছে, ব্যক্তির স্বতন্ত্র, স্বাধীন অস্তিত্বের প্রকাশ তত বেশি স্থির নিশ্চিত হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন অন্তর্জীবন, বিশুদ্ধ 'ব্যক্তিগত' জীবন তার নিজস্ব স্বতন্ত্র নিয়মানুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে এবং যেন তার সফলতা ও বিফলতা আগের চেয়েও অধিকমাত্রায় চারপাশের সামাজিক প্রতিবেশ থেকে স্বাধীন হয়ে উঠছে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, অন্যদিকে, মনে হচ্ছে যেন সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার সংযুক্তি তাকে শুধু উচ্চনিনাদিত বিমূর্ততার মধ্যে দীপ্যমান করতে পারে, এবং এর যথাযোগ্য প্রকাশভঙ্গি হতে পারে কৃত্রিম বাগাড়ম্বরপূর্ণ রচনা বা প্রহসন।

জীবন সম্পর্কে পক্ষপাতহীন অনুসন্ধান করা এবং আধুনিক সাহিত্যের মিথ্যা ঐতিহ্য সরিয়ে রাখা– দুয়ের মাধ্যমে সহজে যথার্থ পরিস্থিতির উদঘাটন সম্ভব– যে সব আবিষ্কার করেছেন উনিশ শতকের শুরুতে ও মাঝামাঝিতে মহান বাস্তববাদী শিল্পীরা এবং যেটাকে গটফ্রিয়েড কেলার 'সব কিছুই রাজনীতি' উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। এই মহান সুইস লেখক এ দ্বারা এই বোঝাতে চাননি যে, সব কিছু তৎক্ষণিকভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত; তিনি বোঝাতে চেয়েছেন– বালজক ও টলস্টয়ও যেমন বলেছেন— মানুষের প্রতিটি কর্ম ও চিন্তা ও আবেগ তার সম্প্রদায়ের জীবন ও সংগ্রামের সঙ্গে তথা রাজনীতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা, মানুষ নিজেরা এ সম্পর্কে সচেতন হোক বা অচেতন হোক বা এমনকি যদি তা থেকে পালাতেও চায়, বস্তুগতভাবে তাদের কর্ম, চিন্তা ও আবেগ তবু, রাজনীতি থেকে সৃষ্ট এবং রাজনীতিতেই প্রত্যাগত।

মহান বাস্তববাদী শিল্পীরা এটা শুধু অনুধাবন ও চিত্রিতই করেননি, তারা এর চেয়ে বেশি করেছেন— তাঁরা মানুষের কাছে উত্থাপনযোগ্য দাবি হিসেবে এটাকে স্থাপন করেছেন। তারা জানতেন যে বস্তুনির্ভর বাস্তবতার বিকৃতি (যদিও অবশ্য সামাজিক কারণে), পূর্ণ মানবীয় ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক খাতে বিভক্তি মনুষ্যনির্যাসের অঙ্গহানি স্বরূপ। সেজন্য শুধু বাস্তবতার আলেখ্য নির্মাতারূপে নয়, বরং মানবতাবাদীরূপেও তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন ধনতান্ত্রিক সমাজের এই অলীক কাহিনীর বিরুদ্ধে, স্বতঃস্ফূর্তরূপে গঠিত এই বাহ্যিক রূপ যতই অপরিত্যাজ্য হোক না কেন। মানুষের যথার্থ প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র পুনরুদ্ধার করার জন্যে যদি তাঁরা, লেখক হিসেবে গভীরভাবে কন্দরে ডুব দিয়ে থাকেন, তাদেরকে অনিবার্যভাবে আধুনিক সমাজের চোখের সামনে ঘটা পূর্ণ মানবীয় বিরাট ট্র্যাজেডিকে আবিষ্কার ও উন্মোচন করতে হয়েছে।

বালজাকের মতো মহৎ বাস্তববাদীদের রচনায় আমরা পুনরায় আধুনিক সাহিত্যের দুটো মিথ্যা চরম অবস্থার বিরোধী একটি তৃতীয় সমাধান পাই— যা সদিচ্ছা ও সততা নিয়ে রচিত প্রচারবাদী উপন্যাসের দুর্বল গতানুগতিকতা এবং ব্যক্তিগত জীবনের বিস্তারিত

www.pathagar.com

বর্ণনা ভারাক্রান্ত ঝুটা সমৃদ্ধি— দুইকেই জীবনের যথার্থ কবিতার বিমূর্ত ও দূষিত রূপ বিবেচনায় উন্মোচন করে।

এই প্রসঙ্গটি আজকে মহান বাস্তববাদী লেখকদের রচনার সাময়িককতার প্রশ্নটির মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রতিটি বড় ঐতিহাসিক যুগে একটি যুগ সংক্রান্তি, সংকট ও পুর্নজাগরণের, ধ্বংস ও পুনর্জন্মের পরস্পরবিরোধী ঐক্যের কালে, প্রতিটি সমন্বিত অথচ পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সবসময় নতুন সমাজব্যবস্থার ও নতুন মানুষের আবিভাব ঘটে। এ ধরনের সংকটাপন্ন ক্রান্তিকালে সাহিত্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যতিক্রমীভাবে বিরাট হয়ে ওঠে। শুধু যথার্থ অর্থে মহৎ বাস্তববাদী শিল্পীই কেবল নতুন দায়িত্বকে সফলতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারে : প্রচলিত ফ্যাশনেবল প্রকাশ মাধ্যমসমূহ ইতিহাসে আরোপিত এই কর্তব্য পালনের পথে অধিক থেকে অধিকতরভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলে। এতে কারো বিস্মিত হওয়া উচিত হবে না যদি এই মনোভাব নিয়ে আমরা সাহিত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতার বিরোধিতা করি। বৈধভাবে এটা অনেককে বিস্মিত করতে পারে যে এই পর্যবেক্ষণগুলো জোলা ও জোলাদের প্রতি এক তীব্র বিরোধিতার রূপ নেয়।

প্রধানত এই কারণে বিস্ময়ের ব্যাপার ঘটবে যে, জোলা ছিলেন বামপন্থার লেখক এবং তার সাহিত্যপদ্ধতি মুখ্যত, যদিও একান্তভাবে নয়, ছিল বামপন্থী সাহিত্যের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারকারী। সে জন্যে মনে হতে পারে যে, আমরা নিজেদেরকে গভীর স্ববিরোধিতায় জড়িয়ে ফেলেছি—একদিকে আমরা দাবি করছি সাহিত্যের রাজনীতিকরণ, আর অন্যদিকে শঠভাবে আক্রমণ করছি বামপন্থী সাহিত্যের সবচেয়ে বলবান ও জঙ্গি অংশকে। এই স্ববিরোধিতা কিন্তু নিছক ভাসাভাসা। অবশ্য, সাহিত্য ও বিশ্ববীক্ষার যথার্থ সম্পর্কের ওপর আলো নিক্ষেপ করতে হলে এটা যথার্থই যোগ্য ।

সমস্যাটি প্রথমে (রুশ গণতান্ত্রিক সাহিত্য সমালোচনার বাইরে) উত্থাপন করেন এঙ্গেলস। প্রসঙ্গটি ছিল বালজাক ও জোলার মধ্যে তুলনা। এঙ্গেলস দেখান যে, বালজাকের রাজনৈতিক মতাদর্শ যদিও ছিল পুরুষানুক্রমিক রাজতন্ত্র (legitimist) তবু তিনি অপ্রতিহতভাবে রাজতন্ত্রী সামন্ত ফ্রান্সের পাপ ও দুর্বলতাকে উন্মোচিত করে দেন এবং অসাধারণ কাব্যিক শক্তি নিয়ে তার মৃত্যু আর্তনাদকে বর্ণনা করেন। এই ঘটনা যার উল্লেখ এই পৃষ্ঠাগুলোতে পাঠক একাধিকবার পাবেন, প্রথম দর্শনে এবং ভুলবশত–স্ববিরোধী মনে হবে। এটা মনে হতে পারে যে, বিশ্ববীক্ষা এবং ঐকান্তিক বড় বাস্তববাদী লেখকদের রাজনৈতিক মতাদর্শ এমন ব্যাপারে যা কোন গুরুতর বিবেচনার বিষয় নয়। এটা কিয়ৎপরিমাণে সত্য। কারণ বর্তমান কালের আত্মস্বীকৃতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং

www.pathagar.com

ইতিহাস ও ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যা বিবেচনাযোগ্য তা হচ্ছে রচনার মাধ্যমে প্রকাশিত ছবিটি, ছবিটি রচয়িতার মতামতের সঙ্গে কতদূর সঙ্গতিপূর্ণ সে প্রশ্ন গৌণ প্রসঙ্গ।

এটা অবশ্য নন্দনতত্ত্বের গুরুতর সমস্যায় আমাদের নিয়ে যায়। বালজাক সম্পর্কে লিখতে বসে এঙ্গেলস এটাকে অভিহিত করেছেন বাস্তববাদিতার বিজয় বলে, এটা এমন সমস্যা যা বাস্তববাদী শিল্পসৃষ্টির ঠিক একেবারে মূলে গিয়ে হাজির হয়। এটা বাস্তবাদিতার প্রকৃত নির্যাসকে স্পর্শ করে : মহৎ শিল্পীরা সত্য, বাস্তবতার জন্য গোঁড়া প্রচেষ্টা— নীতিবিদ্যার ভাষায় যাকে বলা যায় লেখকের ঐকান্তিকতা ও ন্যায় পরায়ণতা। একজন বড় বাস্তববাদীর, যেমন বালজাকের, সৃষ্ট পরিস্থিতি ও চরিত্রের অন্তর্নিহিত শৈল্পিক বিকাশ যদি তার সবচেয়ে প্রিয় সংস্কার বা এমনকি তাঁর সর্বাধিক পবিত্র বিশ্বাসের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করে, তবে তিনি এক মুহূর্তে দ্বিধা না-করে নিজস্ব সংস্কার ও বিশ্বাসকে পাশে ঠেলে প্রকৃতই যা দেখেছেন, যা দেখতে চাচ্ছেন তা নয়, তাকে বর্ণনা করবেন। নিজের অহংময় বিশ্বচিত্রের প্রতি এ ধরনের নিষ্ঠুরতা সমস্ত বড় বাস্তববাদীদের উৎকৃষ্টতার নিদর্শন চিহ্ন, এর বিপরিতে আছে দ্বিতীয় শ্রেণীর বাস্তববাদীরা, যারা প্রায় সব সময় নিজস্ব বিশ্ববীক্ষাকে বাস্তবতার সঙ্গে 'খাপ খাওয়াতে' সক্ষম হন, অর্থ্যাৎ তাদের নিজস্ব বিশ্বদৃষ্টির আলোকে বাস্তবতার একটি মিথ্যা বা বিকৃত ছবি জোর করে চাপিয়ে দেন। মহত্তর ও ক্ষুদ্রতর লেখকের নৈতিক দৃষ্টির এই তারতম্য অকৃত্রিম ও শঠ রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বড় বাস্তববাদী শিল্পীর সৃষ্ট চরিত্রসমূহ, একবার স্রষ্টার মানসকল্পনায় রূপ নেওয়ার পর নিজস্ব স্বাধীন জীবনযাপন করে : তাদের আগমন-নির্গমন, তাদের বিকাশ ও তাদের নিয়তি আদিষ্ট হয় তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিক অস্তিত্বের অন্তঃস্থ দ্বান্দ্বিকতার দ্বারা। কোন লেখকই একজন যথার্থ বাস্তববাদী বা এমনকি একজন যথার্থ ভাল লেখক নন, যদি তিনি তার নিজের চরিত্রগুলোর বিবর্তনকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত করে থাকেন!

এসব অবশ্য নিছক ঘটনার বিবরণ। লেখকের নৈতিকতার প্রশ্নটির উত্তর এতে পাওয়া যায় : তিনি যদি বাস্তবতাকে ওই আলোকে দেখেন তাহলে তিনি কী করবেন? কিন্তু এটা আমাদেরকে অন্য প্রশ্নটি সম্পর্কে একেবারে আলোকিত করে না : লেখক কী দেখেন এবং কীভাবে দেখেন? এবং এখানেই শিল্পসৃষ্টির সামাজিক নির্ধারক ভূমিকা সম্পর্কিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি পাওয়া যায়। লেখক যে পরিমাণে তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত, যে পরিমাণে তিনি চারপাশে সংঘটিত যুদ্ধে অংশ নেন, বা নিছক দর্শক হিসেবে দেখেন,–এসব অবস্থানের আলোচনার মাধ্যমে, তার সৃজন পদ্ধতিতে তার কী কী মৌলিক তারতম্যের সৃষ্টি হয়, সেসব বিস্তারিতভাবে এখানে নির্দেশ করা হবে। এসব

www.pathagar.com

পার্থক্য সৃজন প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। সে প্রক্রিয়া পরস্পরের ঠিক বিপরীত হওয়া সম্ভব : এমনকি যে-অভিজ্ঞতা সৃষ্টি সম্ভব করে তোলে সেটা কাঠামোগতভাবে পৃথক হবে এবং এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচনাকে কাঠামোদানের প্রক্রিয়াটাও পৃথক হবে। লেখক কী সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে বাস করেন না কী তিনি শুধু একজন দর্শক, সেটা মনস্তাত্ত্বিক বা জাতি বৈশিষ্ট্যের কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয় না, সমাজের বিবর্তন প্রক্রিয়াই লেখকের বিবর্তনের গতিপথ নির্ধারণ করে (অবশ্য স্বয়ং চালিত বা নিয়তিনির্ধারিত ভাবে নয়।) মূলগত ভাবে ধ্যানী, এমন অনেক লেখক তাঁর কালের সমাজ-পরিস্থিতির দরুন সম্প্রদায়ের জীবনসংগ্রামে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছেন, বিপরীত পক্ষে, জোলা ছিলেন স্বভাবগত ভাবেই কর্মী মানুষ। কিন্তু তার কাল তাকে নিছক দর্শকে পরিণত করে এবং যখন শেষপর্যন্ত তিনি জীবনের আহ্বানে সাড়া দিলেন, সেটা এত বেশি দেরিতে এসেছিল যে, তার লেখক সত্তার বিকাশে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

কিন্তু তবু, আমরা এখনও সমস্যাটির শুধু আঙ্গিকগত দিকেই রয়ে গেছি, যদিও সেটা আর বিমূর্ত আঙ্গিকে সীমাবদ্ধ নয়। একজন লেখক যে অবস্থান গ্রহণ করেন সেটা সুনির্দিষ্টভাবে পরীক্ষা করলেই শুধু প্রশ্নটি অনিবার্য ও নির্ধারক হয়ে ওঠে। কী তিনি ভালবাসেন এবং কী তিনি ঘৃণা করেন? এভাবে এগুলোই লেখকের যথার্থ বিশ্ববীক্ষার গভীরতর ব্যাখ্যায়, শিল্পমূল্যের সমস্যায় এবং তার বিশ্ববীক্ষার উর্বরতার প্রসঙ্গে উপনীত হই। সাহিত্যিকের বিশ্ববীক্ষা এবং তার দৃষ্টজগতের অবিকল চিত্রায়ণ– এ দুয়ের মধ্যেকার সংঘাত সম্পর্কে আমরা আগে অবহিত হয়েছি, কিন্তু এখন সেটা বিশ্ববীক্ষার অভ্যন্তরীণ সংঘাতরূপে তথা শিল্পীর নিজস্ব বিশ্ববীক্ষার গভীর ও অগভীর স্তরের সংঘাতের আকারে স্বচ্ছ হয়ে ধরা দেয়।

বালজাক ও টলস্টয়ের মতো বাস্তববাদীরা যখন প্রশ্নটিকে চূড়ান্তভাবে উপস্থাপন করেন, তারা সব সময় সম্প্রদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টগবগে সমস্যাটিকে আরম্ভ স্থল হিসেবে গ্রহণ করেন; লেখক রূপে তাদের করুণা সর্বদা সেকালের জনগণের সর্বাধিক তীব্রযন্ত্রণার ভিত্তিতে জাগ্রত হয়; এটাই ঐ যন্ত্রণা যা বস্তুকে নির্দিষ্ট করে, ঘৃণা-ভালবাসার গতিপথ নির্দেশ করে এবং এসব আবেগের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয় তারা তাদের কাব্যিক কল্পনায় কী দেখেন ও কীভাবে দেখেন। সেজন্যে, তাদের সচেতন বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে যদি কল্পনায় দৃষ্ট জগতের সংঘাত সৃষ্টি হয়, তাহলে সৃজন প্রক্রিয়ায় প্রকৃতপক্ষে যা বেরিয়ে আসে তা হলো যে, জগত সম্পর্কে তাদের যথার্থ ধারণা সচেতন বিশ্ববীক্ষার মধ্যে শুধু ভাসা-ভাসা ভাবে ধরা পড়ে এবং তাদের বিশ্ববীক্ষার আসল গভীরতা, কালের বিরাট প্রশ্নগুলোর সঙ্গে তাদের গভীর বন্ধন মানুষের যন্ত্রণার প্রতি তাদেরই সহানুভূতি শুধু তাদের

www.pathagar.com

সৃষ্ট নর-নারীর অস্তিত্ব ও নিয়তির মাধ্যমেই যথাযোগ্য রূপ খুঁজে যায়।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় উত্তরণ সমাজের প্রতিটি অংশে যে নির্যাতন চাপিয়ে দিয়েছিল, এই রূপান্তরের সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িত ছিল সমাজের প্রতিটি স্তরের যে প্রগাঢ় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পতন, বালজাকের চেয়ে অধিক গভীরভাবে কেউ সেটা উপলব্ধি করেননি। একই সঙ্গে বালজাক এ সম্পর্কেও গভীরভাবে সচেতন ছিলেন যে, এই রূপান্তর শুধু সামাজিকভাবে অনিবার্য ছিল না, একই সাথে প্রগতিশীলও ছিল। তাঁর অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব তিনি ক্যাথলিক পুরুষানুক্রম নীতির (legitimism) ওপর নির্ভরশীল ও ব্রিটিশ টোরীবাদের কল্পনাবিলাসী ধারণা দ্বারা প্রতারিত একটি পদ্ধতির ওপর চাপিয়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু সেকালের সমাজবাস্তবতা ও তার প্রতিফলক বালজাকীয় মানসকল্পনা দ্বারা উক্ত পদ্ধতি প্রতিনিয়ত অস্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু এই স্ববিরোধিতা নিজেই একটি প্রকৃত সত্যকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছিল : পুঁজিবাদী বিকাশের স্ববিরোধী প্রগতিশীল চারিত্র্য সম্পর্কে বালজাকের গভীর উপলব্ধি।

এভাবে মহান বাস্তবাদিতা ও জনপ্রিয় মানবতাবাদ এক সাংগঠনিক ঐক্যে পরিণতি লাভ করে। কারণ আমাদের কালের নির্যাসকে নির্ধারণ করেছিল সমাজ বিকাশের যে-ধ্রুপদী সাহিত্যগুলো, অর্থাৎ গ্যোটে ও ওয়াল্টার স্কট থেকে গোর্কী ও টমাস মানের রচনাবলী, সেগুলো বিবেচনা করলে, সামান্য রদবদলসহ মূল সমস্যার একই কাঠামো আমাদের নজরে পড়ে। অবশ্য সময় ও নিজস্ব শৈল্পিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রত্যেক বড় বাস্তববাদী শিল্পীই মূল সমস্যার আলাদা সমাধানে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে সবার ঐক্য ছিল যে, তাঁরা তাঁদের কালের বিরাট সর্বজনীন সমস্যার বেশ গভীরে প্রবেশ করেছিলেন এবং যেভাবে দেখেছিলেন তদনুযায়ী বাস্তবতার যথার্থ নির্যাসকে অমোঘভাবে চিত্রিত করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের পর সমাজ-বিকাশ সামনের দিকে এমন লক্ষ্যে এগিয়েছিল যা জ্ঞানী-গুণী-শিল্পী এবং সাধারণ মানুষ এ দুয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সংঘাতকে অনিবার্য করে তুলেছিল। ঐ সমগ্র যুগে, প্রতিদিনের জীবন স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই শুধু একজন লেখক মহত্ত্ব অর্জন করতে পারতেন। এবং বালজাকের পর থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতিও শিল্পকলার গভীরতর প্রবণতার প্রতি দৈনন্দিন জীবনের প্রতিরোধ অবিরাম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তবু এমন লেখক ও সবসময় ছিলেন যাঁরা কালের সব প্রতিরোধ সত্ত্বেও, তাদের জীবনচর্যায় হ্যামলেট কর্তৃক উত্থাপিত চাহিদা to hold the mirror up to Nature-কে পূরণ করেছিলেন এবং এ ধরনের প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির সাহায্যে মানবসমাজের বিকাশ ও মানবিক নীতিসমূহের বিজয়ে সাহায্য করেছিলেন— কিন্তু তারা এটা করেছিলেন ঐ-সমাজে যা প্রকৃতিগতভাবে

www.pathagar.com

এত বিরোধপূর্ণ ছিল যে সেটা একদিকে পূর্ণ মানবীয় ব্যক্তিত্বের আদর্শকে জন্ম দিয়েছিল, আর অন্যদিকে বাস্তবে সেটাকে ধ্বংস করেছিল।

ফ্রান্সের মহান বাস্তববাদীরা তাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী পেয়েছিলেন রাশিয়ায়। বালজাক প্রসঙ্গে এখানে উল্লিখিত সব সমস্যাই এমনকি আরো বেশি করে প্রযোজ্য হয় রাশিয়ার সাহিত্য-ইতিহাসে এবং বিশেষ করে এর কেন্দ্রীয় পুরুষ লিও টলস্টয়ে। এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় যে, লেনিন (বালজাক সম্পর্কে এঙ্গেলসের অভিমত পাঠ না করে) যথার্থ বাস্তবতার নিয়মাবলী সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করেছিলেন টলস্টয়ের সাহিত্যালোচনাসূত্রেই। সেজন্যে সেসব সমস্যার পুনরায় উল্লেখ করার প্রয়োজন এখানে নেই। কিন্তু অধিকতর প্রয়োজন রয়েছে রুশ বাস্তববাদিতার ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার– যেসব ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হয়েছে পরিকল্পিত বিকৃতি বা তথ্য গোপনের ফলে। ইউরোপের সব জায়গার মতো, নবীনতর রুশ সাহিত্য ব্রিটেনের বুদ্ধিমান পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে পরিচিত ও জনপ্রিয়। কিন্তু অন্য সব জায়গার মতই, প্রতিক্রিয়াশীলরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে এই সাহিত্যকে জনপ্রিয় হতে না-দিতে; সহজাত প্রবৃত্তিবশে তারা বুঝেছে যে, প্রতিটি বিচ্ছিন্ন রচনায় নির্দিষ্ট সমাজদৃষ্টি না-থাকলেও, রুশ বাস্তববাদী সাহিত্য সকল প্রতিক্রিয়াশীল সংক্রমণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিষেধকস্বরূপ।

কিন্তু রুশ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতি পাশ্চাত্যে যতই ব্যাপক হোক-না কেন, পাঠক-মনে সৃষ্ট চিত্রটি কিন্তু ছিল অপূর্ব এবং প্রায়শ ভ্রান্ত। এটা অপূর্ব ছিল এ কারণে যে, রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রের মহান বীর পুরুষ হারজেন ও বেলিনস্কি, চেরনিয়াভস্কি ও ডবরোলিয়াবভ প্রমুখের রচনা অনূদিত হয়নি এবং এমনকি রুশ ভাষা-জানা পাঠকদের বাইরে অতি নগণ্য সংখ্যকের মধ্যে তাদের নাম পরিচিত ছিল। এবং শুধু বর্তমানেই সলটিকভ-শ্‌সেডরিনের নাম প্রচারিত হচ্ছে যদিও এই লেখকের ভেতরে নবীনতর রুশ সাহিত্যে এমন একজন ব্যঙ্গ রচয়িতা জন্ম নিয়েছেন, জোনাথান সুইফটের পর থেকে পৃথিবীতে যার জুড়ি মেলা ভার।

আরও বড় কথা, রুশ সাহিত্য-সম্পর্কে ধারণা শুধু অপূর্ব ছিল না, সেটা বিকৃতও ছিল। মহান রুশ বাস্তববাদী শিল্পী টলস্টয়কে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের বলে দাবি করা হয়েছিল এবং তাঁকে অতীতচারী– বর্তমানে সংগ্রাম থেকে অনেক দূরবর্তী 'অভিজাত-চেতনাবিশিষ্ট' মরমী হিসেবে রূপ দেবার চেষ্টা চালানো হয়েছিল। টলস্টয়ের ভাবমূর্তি সম্পর্কে মিথ্যাচার একটি দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও সাধন করেছে; রাশিয়াবাসীদের জীবনের প্রধান প্রবণতা সম্পর্কে ভুল ধারণা দেওয়ার ব্যাপারেও এটা সাহায্য করেছে। ফল হয়েছিল এক

www.pathagar.com

'পবিত্র রাশিয়া' এবং রুশ মরমীবাদ সম্পর্কিত মিথের সৃষ্টি। পরবর্তীকালে রুশ জনগণ যখন ১৯১৭ সালে মুক্তির লড়াইয়ে অংশ নেয় ও বিজয়ী হয়, তখন বুদ্ধিজীবীদের বিরাট অংশ নতুন মুক্ত রাশিয়া এবং পুরোনো রুশ সাহিত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব আবিষ্কার করে। প্রতিবিপ্লবী প্রপাগাণ্ডার অস্ত্র ছিল এই অসত্য অভিযোগ যে, সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীন রাশিয়া আকস্মিক ও সম্পূর্ণ মত পরিবর্তন চাপিয়ে দিয়েছে এবং পুরোনো রুশ সাহিত্যকে বর্জন করেছে, বা সত্যি বলতে কি, তার ওপর জবরদস্তি করেছে।

এসব প্রতিবিপ্লবী অভিযোগ সত্য ঘটনা দ্বারা বহু পূর্বেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। রাশিয়ার মাটি ও রাশিয়ার প্রকৃত সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর শ্বেত রুশ মুহাজিরদের সাহিত্য, যা অভিযুক্ত মরমী রুশ সাহিত্যের ধারাবাহিকতা বলে দাবি উঠেছিল, শিগগিরই তার নিজের বন্ধ্যাত্ব ও নিষ্ফলতা প্রদর্শন করে। অন্যদিকে, বিচক্ষণ পাঠক-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এটা গোপন রাখা অসম্ভব ছিল যে, জাতির পুনর্যৌবনপ্রাপ্ত জীবন কর্তৃক উত্থাপিত তাজা বিষয়াবলীর প্রাণবান ব্যবহার সোভিয়েত ইউনিয়নে সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় সাহিত্যের জন্ম দিচ্ছে এবং বিচক্ষণ পাঠকেরা নিজেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এগুলোও রুশ ধ্রুপদী বাস্তবতার মধ্যেকার সংযোগ কত গভীরে প্রোথিত। (টলস্টয়ের বাস্তবতার উত্তরাধিকারী শোলোকভের নাম উল্লেখ করাই এখানে যথেষ্ট হবে।)

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিক্রিয়াশীল অপপ্রচার গত যুদ্ধের আগে ও সময়ে তুঙ্গে পৌঁছে এবং যুদ্ধকালীন সময়ে তাতে ধস নামে। জার্মান নাজী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের মুক্ত মানুষেরা পৃথিবীকে বাহুবলের এবং নৈতিক ও বস্তুগত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সিদ্ধির এমন পরিচয় দিয়েছে যে, পুরোনো প্রথায় গীবত গাওয়া ও অপপ্রচার করা তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। অপরপক্ষে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ প্রশ্ন করতে শুরু করল : দুর্জয় গণশক্তির যে-প্রকাশ পৃথিবীশুদ্ধ লোক যুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষ করেছে কি তার উৎস? এ ধরনের ভয়ানক চিন্তা জন্ম দিল পাল্টা ব্যবস্থার এবং বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করছি সোভিয়েত সভ্যতার কঠিন শিলার ওপর কুৎসা রটনার ও অপপ্রচারের নতুন তরঙ্গের ভেঙে পড়ার দৃশ্য। তবু রুশ জনগণের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিবর্তনের ইতিহাস এখনো প্রত্যেকটি দেশে পাঠক-সম্প্রদায়ের কাছে-কৌতূহলোদ্দীপক ও আকর্ষণীয় সমস্যারূপে বিদ্যমান রয়েছে।

রাশিয়ার জনগণের মুক্তি অর্জনের ও তাদের সিদ্ধি সংহত করার ইতিহাস পর্যালোচনা করার সময়, ওই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোতে সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে আমাদের অবশ্যই বিস্মৃত হওয়া ঠিক হবে না– ঐ-ভূমিকা কোন সভ্যজাতির ভাগ্যের উত্থান ও পতনের সাধারণভাবে সাহিত্য কর্তৃক পালিত ভূমিকা থেকে অধিক। একদিকে, কোন

www.pathagar.com

সাহিত্যই রুশ সাহিত্যের মতো গণমানসিকতা সম্পন্ন নয় এবং অন্যপক্ষে, সাধারণভাবে এমন কোন সমাজ পাওয়া যাবে না যেখানে সাহিত্যকর্ম এত বেশি কৌতূহল উদ্রিক্ত করেছে এবং এত সংকটের জন্ম দিয়েছে– রুশ সাহিত্যের ধ্রুপদী বাস্তববাদী যুগে রাশিয়ার সমাজে যেমনটি ঘটেছে। সেজন্য, যদিও এক বহুবিস্তৃত পাঠকসম্প্রদায় রুশ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত, তবু নতুন সৃষ্ট এসব সমস্যাকে নতুন আলোকে উপস্থাপিত করা অবান্তর না-ও হতে পারে। নতুন সমস্যাবলী অনিবার্যভাবে দাবি করে যে, আমাদের ব্যাখ্যা, সামাজিক ও নান্দনিক উভয় দিক থেকে রাশিয়ার সমাজবিকাশের মূলে প্রবেশ করুক।

একারণে আমাদের প্রথম প্রয়াস, স্বল্প পরিচিত মহান রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী সমালোচক বেলিনস্কি, শেরনিয়াভস্কি ও ডবরোলিয়বভ-এর চরিত্রায়ন প্রদান করে রুশ সাহিত্য-সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের প্রধানতম অপূর্ণতার একটি পূরণ করার চেষ্টা। এই প্রশ্নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে সুপরিচিত ধ্রুপদী বাস্তববাদীদের পুনর্মূল্যায়নটি অথবা বলা চলে , চরিত্রায়ন ও তাৎপর্যোপলব্ধি, যা মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পূর্বকালে টলস্টয় ও অন্যদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে পাশ্চাত্য সমালোচক ও পাঠকেরা নিজেদের দিশা হিসেবে গ্রহণ করতেন প্রবন্ধে, চিঠিতে, দিনপঞ্জীতে ও অন্যত্র প্রকাশিত ধর্ম ও শিল্পকলা প্রভৃতি সম্পর্কে এসব মহাপুরুষদের মতামতকে। প্রায়শ অপরিচিত সাহিত্যের এসব মহতী কর্মকে বোঝাবার একটি চাবি সেসব সচেতন বক্তব্যে পাওয়া যায় বলে তারা ভাবতেন। অন্য কথায় প্রতিক্রিয়াশীল সমালোচনা টলস্টয় ও দস্তয়েভস্কির রচনাকে ব্যাখ্যা করেছে তাদের লেখার তথাকথিত আধ্যাত্মিক ও শৈল্পিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখকের কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল অভিমত উদ্ধার করে।

আমার বইয়ে অনুসৃত পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা অত্যন্ত সরল পদ্ধতি–প্রথমত, যে প্রকৃত সামাজিক ভিত্তির ওপর, ধরা যাক, টলস্টয়ের অস্তিত্ব অবস্থিত এবং যে প্রকৃত সামাজিক শক্তির প্রভাবে লেখকের মানবীয় ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব বিকশিত সেগুলোকে সতর্কভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রথম বিবেচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে প্রশ্ন করা হয় টলস্টয়ের রচনা কী উপস্থাপিত করে এবং উপযুক্তভাবে সেসব বিষয়কে প্রকাশ করার সংগ্রামে লেখক কীভাবে তার নান্দনিক কাঠামো নির্মাণ করেন? যদি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার পর আমরা এসব বস্তুগত সম্পর্ককে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করি, শুধু তখনই লেখক কর্তৃক প্রকাশিত সচেতন অভিমতের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদানের এবং সাহিত্যের ওপর তার প্রভাব সঠিকভাবে নির্ধারণের অবস্থা আমাদের হবে।

পাঠকেরা, পরবর্তীকালে দেখবেন যে, উক্ত পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে টলস্টয়ের নতুন ছবি ভেসে উঠেছে। এই পুনর্মূল্যায়ন নতুন হবে শুধু অরুশীয় পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে। রুশ সাহিত্যের নিজের মধ্যে, ইতিমধ্যে বর্ণিত তাৎপর্য উপলব্ধি পদ্ধতির পশ্চাতে এক

www.pathagar.com

প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। যার অগ্রদূত ছিলেন বেলিনস্কি ও হারজেন এবং যার সর্বোচ্চ সিদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে আছে লেনিন ও স্ট্যালিনের নাম। এই পদ্ধতিটি বর্তমান গ্রন্থের লেখক টলস্টয়ের রচনা-বিশ্লেষণে প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন। এই বইয়ে টলস্টয়ের পরে গোর্কির আলোচনা থাকা কাউকে বিস্মিত করবেনা; গোর্কি সম্বন্ধীয় রচনাটিও প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যধারার প্রসঙ্গে একটি প্রতিবাদী বিতর্ক, কিয়ৎপরিমাণে পুনর্মূল্যায়নও বটে; এবং এর মূল বক্তব্য হচ্ছে নতুনত্বের মহান প্রবর্তক গোর্কী ও রুশসাহিত্যে তার অগ্রদূতের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; এবং ধ্রুপদী রুশ বাস্তববাদকে গোর্কি কি পরিমাণে অব্যাহত রেখেছেন এবং এগিয়ে নিয়ে গেছেন সে প্রশ্নের মীমাংসা। এসব সম্পর্কের অনাবৃত্তির মধ্যে একই সঙ্গে এই প্রশ্নেরও সমাধান রয়েছে যে, পুরোনো ও নতুন সংস্কৃতির মধ্যে, পুরোনো ও নতুন রুশ সাহিত্যের মধ্যে সেতুবন্ধন কী?

সর্বশেষে, শেষ প্রবন্ধটি পাশ্চাত্য সাহিত্যে টলস্টয়ের প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেয়, টলস্টয় কিভাবে আন্তর্জাতিক গুরুত্বের ব্যক্তিতে পরিণত হলেন সেটা আলোচনা করে এবং বিশ্বসাহিত্যে তার প্রভাবের সামাজিক ও শৈল্পিক গুরুত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করে। এই প্রবন্ধটিও অবশ্য রুশ বাস্তববাদ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াশীল ধারণার ওপর একটি আক্রমণ যা মিত্রদের বিন্যস্ত করে; এতে দেখা যাবে কিভাবে মহত্তম জার্মান, ফরাসি, ইংরেজ ও আমেরিকান লেখকেরা এ ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল বিকৃতির বিরোধিতা করেছিলেন এবং টলস্টয় ও রুশ সাহিত্যের যথার্থ উপলব্ধির জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন। এ থেকে পাঠকেরা দেখবেন যে, বইয়ে উক্ত অভিমতগুলো একজন বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ লেখকের অলস কল্পনা নয়, বরং নিরন্তর শক্তি অর্জনকারী বিশ্বজোড়া একটি চিন্তাপ্রবাহ।

পদ্ধতিবিষয়ক মন্তব্য, প্রবন্ধসমূহের অন্তঃপ্রবাহী সমাজ-প্রবণতাকে জোরালোভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোর তাৎপর্য কমই অতিরঞ্জিত করা হয়। তবু, এসব প্রবন্ধে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নান্দনিক দিকে, সমাজবিশ্লেষণে নয়; রুশ ধ্রুপদী বাস্তববাদের নান্দনিক চরিত্রকে পুরোপুরি আয়ত্ত করার জন্যে সামাজিক ভিত্তির অনুসন্ধান শুধু একটি উপায় নয়, বরং মুখ্যত প্রকৃতপক্ষে মহৎ সাহিত্য হওয়ার জন্যেও বটে। এই কারণে এর ঐতিহাসিক সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কিত পুরোনো প্রোথিতমূল ভ্রান্ত ধারণার অপনোদনই যথেষ্ট নয়; সামাজিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তির সঠিক মূল্যায়ন থেকে সাহিত্যিক ও নান্দনিক সিদ্ধান্ত টানাও প্রয়োজনীয়। শুধু তখনই বোঝা যাবে কেন শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে শ্রেষ্ঠ রুশ বাস্তববাদী সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছে। আরও বোঝা যাবে কেন এই সাহিত্য অগ্রগতির আলোক-সঙ্কেত ছিল এবং গুপ্ত ও প্রকাশ্য সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়াশীলতার ও নবীনতার প্রবর্তকের মুখোশধারী ক্ষয়িষ্ণুতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কার্যকর অস্ত্র ছিল।

www.pathagar.com

শুধু যদি রুশ ধ্রুপদী বাস্তববাদের নির্যাস সম্পর্কে আমাদের সঠিক নান্দনিক ধারণা থাকে, তাহলে আমরা সাহিত্যের ওপর এর অতীত ও ভবিষ্যতের ফলদায়ক প্রভাবের সামাজিক এবং এমনকি রাজনৈতিক তাৎপর্যকে স্পষ্টভাবে দেখতে পারি। ফ্যাসিবাদের পতন ও নির্মূলের পর প্রত্যেকটি মুক্ত জাতির নবজীবন শুরু হয়েছে। নতুন জীবন প্রত্যেক দেশে যে-নতুন দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে সেটা সমাধান করতে সাহিত্যের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সাহিত্যকে যদি যথার্থই এ দায়িত্ব পালন করতে হয়, যে দায়িত্ব ইতিহাস-আদিষ্ট তাহলে অবশ্যই একটি পূর্বশর্ত থাকতে হবে— সে পূর্বশর্ত পালনের জন্যে দরকার যে লেখকেরা সেটা পালন করবেন, তাদের দার্শনিক ও রাজনৈতিক পুনর্জন্ম। কিন্তু যদিও অপরিহার্য, তবু সেটাই যথেষ্ট নয়। এটা শুধু মতামত পরিবর্তনের ব্যাপার নয়, আবেগের সমগ্র সর্বাধিক কার্যকর প্রচারকেরা হলেন সাহিত্য ও শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। রাশিয়ার অগ্রগতি থেকে যে মহান শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে তা হচ্ছে ঠিক এরকমের একটি শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী সাহিত্য কি পর্যন্ত সাফল্যজনকভাবে জনগণকে শিক্ষিত করতে পারে এবং গণমতকে রূপান্তরিত করতে পারে। কিন্তু এধরনের ফল পাওয়া সম্ভব শুধু যথার্থ অর্থে মহৎ, গভীর ও সর্বব্যাপী বাস্তববাদিতা দ্বারা। সেজন্যে, সাহিত্য যদি জাতীয় পুনর্জন্মের সম্ভাবনাময় উপকরণ হতে চায়, তাহলে তাকেও বিশুদ্ধ সাহিত্যিক, আঙ্গিক সম্পর্কিত ও নান্দনিক দিকেও পুনর্জন্ম নিতে হবে। একে অবশ্যই বাধাপ্রদানকারী প্রতিক্রিয়াশীল, রক্ষণশীল ঐতিহ্য থেকে মুক্ত হতে হবে এবং কানাগলি অভিমুখে পথপ্রদর্শক ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবের চুইয়ে পড়ার রাস্তা রুদ্ধ করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে, জীবন ও সাহিত্যের প্রতি রুশ লেখকদের মনোভাব দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করতে পারে এবং অন্য কোন কারণে না হলেও একারণে টলস্টয় সম্পর্কে সাধারণভাবে গৃহীত প্রতিক্রিয়াশীল মূল্যায়নকে ধ্বংস করা সবচেয়ে জরুরী, এবং এধরনের ভ্রান্ত ভাবাদর্শ ঝেঁটিয়ে বিদায় করার সঙ্গে সঙ্গে, তার সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বের মানবীয় মূল উপলব্ধি করতে হবে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা হচ্ছে তা হলো কিছু ব্যাপক গণআন্দোলনের সঙ্গে লেখকের মানবিক ও শৈল্পিক একাত্মতা থেকে কিভাবে এ ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব জন্ম নেয়, সেটা দেখানো। এটা এ প্রসঙ্গে তাদৃশ গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, ঐ গণ-আন্দোলনটি কী, যার মাধ্যমে লেখক তার নিজের সঙ্গে জনগণের সংযোগসূত্র খুঁজে পান; টলস্টয় তাঁর শেকড় চালিয়ে দিয়েছিলেন রাশিয়ার কৃষক-জনতার মধ্যে এবং গোর্কি শিল্পমজুর ও ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে। দুজনেই তাঁদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে, জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এধরনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলাফল, যা সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ক্ষেত্রে সেকালে ছিল ও একালেও আছে, তাহলো যে, এর দ্বারা লেখক কাটিয়ে উঠতে পারেন তার বিচ্ছিন্নতার এবং নিছক দর্শকের

www.pathagar.com

ভূমিকাকে– পুঁজিবাদী সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি তাকে সেদিকে অন্যথায় ঠেলে নিয়ে যাবে। সুতরাং তার পক্ষে সম্ভব হয় সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতিকূল একালের সাংস্কৃতিক প্রবণতার প্রতি স্বাধীন, নিরপেক্ষ, সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করার। বিশুদ্ধ শৈল্পিক পদ্ধতিতে, শুধু নতুন আঙ্গিকের আনুষ্ঠানিক ব্যবহারের দ্বারা সেসব প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিকল্পনা পর্যবসিত হবে একটি অর্থহীন প্রয়াসে–গত শতকের পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতিতে সেটা পরিষ্কারভাবে দেখা গেছে। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রাম ও গণআন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, লেখককে ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেয়, তার হাতে তুলে দেয় এমন সুফল প্রসবিনী বিষয়বস্তু, যা থেকে একজন যথার্থ শিল্পী কালের চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ শিল্পরূপ নির্মাণ করতে পারেন, সেটা সেকালের অন্তঃসারশূন্য শৈল্পিক ফ্যাশানের বিরুদ্ধে গেলেও।

আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর আগে এ ধরনের নিতান্ত সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের প্রয়োজনীয়তা ছিল। মানুষ তার সমগ্র ইতিহাসে আজকের মতো জরুরীভাবে আর কখনো বস্তববাদী সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি। এবং সম্ভবত, পূর্বে আর কখনো মহান বাস্তববাদের ঐতিহ্যকে সামাজিক ও শৈল্পিক কুসংস্কারের পাথর কুঁচির এত নিচে সমাধিস্থ করা হয়নি। সেকারণেই আমরা টলস্টয় ও বালজাকের পূনর্মূল্যায়ন এত জরুরী বিবেচনা করি। এমন নয় যে, আমাদের কালের লেখকরা অনুকরণ করুক, সেজন্যে আমরা তাদেরকে আদর্শ হিসেবে স্থাপন করতে আগ্রহী। আদর্শ স্থাপন করা শুধু বোঝায় সঠিকভাবে কর্তব্য নির্ধারণে ও সাফল্যজনক সমাধানের জন্যে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে সাহায্য করা। ঠিক এভাবে গ্যেটে ওয়াল্টার স্কটকে এবং ওয়াল্টার স্কট বালজাককে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু ওয়াল্টার স্কট গ্যেটের শুধু অনুকারক থাকেননি, যেমন থাকেননি বালজাক স্কটের। মানুষের জন্যে প্রচণ্ড ভালোবাসা, জনগণের শত্রুদের জন্যে ও জনগণের ভুলের প্রতি নিরতিশয় ঘৃণা, সত্য ও ব্যস্তবতার অমোঘ পুনরুদ্ধার, সর্বোপরি উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে মানুষের ও তার নিজের সমাজের অগ্রযাত্রার প্রতি দ্বিধাহীন বিশ্বাস– এগুলো হলো লেখকের কাছে সমস্যা-সমাধানের বাস্তব পন্থা।

বর্তমান কালের পৃথিবীতে এমন সাহিত্যের জন্যে সাধারণ আকাঙ্ক্ষা রয়েছে যা তার আলোকরশ্মি নিয়ে আমাদের কালের জটিল অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। জাতিপুঞ্জের গণতান্ত্রিক পুনর্জন্মের কালে শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী সাহিত্য এক্ষেত্রে, অদ্যাবধি অস্বীকৃত প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে। যদি এই পটভূমিতে আমরা জোলা ও তার অনুসারীদের বিপরীতে বালজাককে আবাহন করে থাকি, তবে কারণ এই যে, আমাদের বিশ্বাস আছে যে সেসব সমাজতাত্ত্বিক ও নন্দনতাত্ত্বিক কুসংস্কারকে মোকাবিলা করতে আমরা সাহায্য করছি যেসব কুসংস্কার অনেক প্রতিভাবান লেখককে, তাদের শ্রেষ্ঠ ফসল

www.pathagar.com

মানুষজাতিকে উপহার দেবার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। আমরা ঐসব শক্তিশালী সামাজিক শক্তিকে চিনি যা লেখক ও সাহিত্য উভয়ের অগ্রগতিকে পেছনে ঠেলে রাখছে প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তির এক সিকি শতাব্দী : যা চূড়ান্ত পর্যায়ে ফ্যাসিবাদী ঘৃণ্যতার নারকীয় ভেঙ্চিতে নিজেকে পাকিয়ে তুলেছে।

এসব শক্তি থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিলাভ ইতিমধ্যে এক সিদ্ধ ঘটনা, কিন্তু বৃহৎ জনতার চিন্তাভাবনা এখানো প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের কুয়াশা দ্বারা শয়তানীতে আচ্ছন্ন হচ্ছে এবং এর জন্যে তারা পরিষ্কারভাবে দেখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই দুরূহ ও বিপজ্জনক পরিবেশ জ্ঞানশীল লোকদের কাছে গুরুতর দায়িত্ব অর্পণ করছে। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নগুলো স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখাই লেখকের জন্যে যথেষ্ট নয়। সাহিত্যের প্রশ্নাবলীকে খোলাচোখে দেখাও কম অপরিহার্য নয় এবং সেসব সমস্যার মীমাংসায় এই বই অবদান রাখতে চায়।

বুদাপেস্ট, ডিসেম্বর ১৯৪৮

www.pathagar.com

কবিতার শিল্পরূপ

[১৯০৩ সালে ইংল্যান্ডে জর্জ টমসনের জন্ম হয়। ১৯৩৭ সালে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রিক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সাল থেকে ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যকর সংসদের ছিলেন সদস্য। মূলত কডওয়েলেরই তিনি অনুসারী। কবিতার উৎস তিনি অনুসন্ধান করেন ফসল ফলানোর আদিম যৌথ কর্মকাণ্ডের মধ্যে। তাঁর প্রধান প্রধান রচনা হচ্ছে Greek Lyric Metre (১৯২৯), Aeschylus and Athens (১৯৪১), Marxism and Poetry (১৯৪৫) ও The Prehistoric Aegean (১৯৪৯)। বর্তমান রচনাটি শেষোক্ত বইয়ের অন্তর্গত। এটি সংকলিত হয়েছে ডেভিড ক্রেগ সম্পাদিত Marxism's on Literature (পেঙ্গুইন সিরিজ, ১৯৭৭) নামক সংকলন থেকে। প্রবন্ধটিতে গ্রিক, জার্মান, ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রচুর তথ্য আছে। বাহুল্যবোধে অধিকাংশ বাদ দিয়ে শুধু প্রধান প্রধান ইংরেজি তথ্য নির্দেশ এখানে দেওয়া হলো।]

১. বাক ও ম্যাজিক

এই অধ্যায়ের বিষয় হচ্ছে কবিতার উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিচার; এবং একটি বৈজ্ঞানিক সমস্যা হিসেবে এটাকে বিবেচনা করা হবে। যারা কবিতার জন্যে কবিতাকে উপভোগ করে সন্তুষ্ট, তাদের কাছে এই দৃষ্টিভঙ্গি যথোপযুক্ত ও আকর্ষণীয় মনে হবে না; কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে অধ্যয়ন করলে কম নয় বরং একটু বেশিভাবে কবিতা উপভোগ্য হবে। একে পুরোপুরি উপভোগ করতে হলে আমাদেরকে নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে হবে এটা কী; এবং এটা কী সেটা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের অবশ্যই অনুসন্ধান করতে হবে কিভাবে এর জন্ম হয়েছে এবং বিকাশ ঘটেছে।

এই সমস্যা তোলায় আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে গ্রিক কবিতার প্রাক-ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা; এবং আমাদের পক্ষে সম্ভবপর সর্বাধিক ব্যাপক ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত উপাদানের সঙ্গে তুলনা করেই তার সমাধান সম্ভব। তদনুসারে, আমাদের উদাহরণগুলো গ্রিক কবিতার মধ্যেই শুধু সীমিত থাকবে না। আমি দ্বিধাহীনভাবে ইংরেজি কবিতা থেকে উদাহরণ দেব, যা সবচেয়ে বেশি পরিচিত বিধায় উপকারী হবে; আমি আইরিশ কবিতা থেকে দেব, যা আধুনিক ইউরোপীয় কবিতার বিকাশের একটি প্রাথমিক স্তরের ওপর আলোকপাত করে; আদিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গীত ও নৃত্য থেকেও আমি উদাহরণ টানব।

www.pathagar.com

গ্রিক ও আধুনিক ইংরেজি কবিতার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের অন্যতম হচ্ছে যে, প্রাচীন গ্রিক কবিতা সঙ্গীতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ছিল। ওই সময় কোন বিশুদ্ধ যন্ত্রসঙ্গীত ছিল না এবং সুন্দরতম অনেক কবিতা গানের সহযোগী হিসেবে রচিত হয়েছিল। আইরিশ সাহিত্যেও কবিতা ও সঙ্গীতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধন রয়েছে এবং সেটা এক্ষেত্রে শুধু অনুমানের ব্যাপার নয়। বর্তমানেও সেটা একটি জীবন্ত বাস্তবতা। মুদ্রিত আকারে পরিচিত কয়েকটি আইরিশ কবিতাকে প্রথমবারের মতো ঐতিহ্যবাহী রীতিতে একজন দক্ষ কৃষক গায়ক কর্তৃক গাইতে শোনার স্মৃতি আমি কখনো বিস্মৃত হব না। আমার জন্যে সেটা ছিল সম্পূর্ণভাবে নতুন অভিজ্ঞতা। কবিতা না সঙ্গীত কোথাও এ ধরনের কিছু আমি কখনো শুনিনি।

আইরিশ কবিতার আরো একটি বৈশিষ্ট্য আছে। অধিকাংশ ইংরেজের কাছে ইংরেজি কবিতা একটি বন্ধ বইয়ের মতো। তারা সে-সম্পর্কে জানেও না, খোঁজ খবরও রাখেনা। এবং স্বল্পসংখ্যক যারা এতে উৎসাহ দেখায়– এদের মধ্যেও এমন বেশি নেই যাদের সম্পর্কে বলা যায় যে, তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপকভাবে বা গভীরভাবে কবিতা স্থান পেয়েছে। আইরিশ চাষীদের ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। এদের অধিকাংশই হয় নিরক্ষর বা কিছুদিন আগেও তা ছিল। কবিতা তাদের ঠোঁটে বাস করে। সবাই সেগুলো জানে। সবাই সেগুলো ভালবাসে। এটা সবসময় প্রত্যেকের আলাপে-সালাপে জলের বুদ্‌বুদের মতো বেরোতে থাকে। এবং এখনো এটা সৃষ্টিশীল। যখনই কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, সেটা উদযাপনের জন্যে গান রচিত হয়। যদিও আমি 'রচিত' শব্দটি ব্যবহার করছি, সেটা কিন্তু খুব কমই প্রযোজ্য। আমরা যে-অর্থে শব্দটি ব্যবহার করি, সে অর্থে গানগুলো রচিত হয় না। এগুলো মুখে-মুখে রচিত হয়। অনেক আইরিশ পল্লীতে, কিছুদিন আগেও একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত ঐতিহ্যলালিত কবি ছিলেন মুহূর্তের অনুপ্রেরণায় প্রায়শই বিস্তৃত ছন্দোবন্ধে আমাদের আধুনিক ইংরেজির তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত আকারে যার কবিতা-তৈরির ক্ষমতা ছিল। যে পল্লীটিকে আমি সবচেয়ে ভালো জানি, সেখানে একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন, যিনি চল্লিশ বছর আগে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর প্রায় সব কবিতাই ছিল ঘটনাভিত্তিক ও মুখে-মুখে রচিত। আমার মনে আছে যে, তাঁর পরিবারের লোকজন আমাকে বলেছে, তাঁর মৃত্যুর রাত্রে তিনি হাত দিয়ে মাথা উঁচু করে বিছানায় শায়িত ছিলেন এবং নিরবিচ্ছিন্ন স্রোতের মতো তাঁর মুখ থেকে কবিতা নির্গত হচ্ছিল।

অবশ্য এই লোকটি ছিলেন ব্যতিক্রমী প্রতিভা। তিনি ছিলেন পেশাদার কবি এবং গত যুগের কয়েকজন কবির অধীনে তিনি এই কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু শিগগিরই আমি দেখলাম যে, পেশাদার কবি ও সমাজের বাকি অংশের মধ্যে কোন স্পষ্ট বিদারণ

www.pathagar.com

রেখা টানা যায় না। এটা শুধু ডিগ্রির পার্থক্য। কিয়ৎপরিমাণে তারা সবাই কবি। কবিতায় উচ্ছ্বসিত হবার প্রবণতা তাদের কথাবার্তায় আছে। আমাদের সমাজের তুলনায় অধুনা-অপ্রচলিত কবিতা তাদের মধ্যে যেমন ব্যাপকাকারে পরিচিত, তেমনি তাদের সাধারণ লোকের মধ্যেও কবির কিছু প্রবণতা বর্তমান। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

এক সন্ধ্যায়, আটলান্টিকের ওপরে অনেক উঁচুতে উত্থিত এই পল্লীর মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আমি ইঁদারার কাছে উপস্থিত হলাম। ওখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো আমার বন্ধু এক বৃদ্ধ কৃষক রমণীর। তিনি সবেমাত্র তাঁর বালতি জলপূর্ণ করেছিলেন এবং সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন মৃত এবং তার সাত পুত্রের সবাই, তার ভাষায় ম্যাসাচুসেটসের স্প্রিংফিল্ডে 'এক জোটে চলে গিয়েছে'। কিছুদিন পূর্বে তাদের একজনের কাছ থেকে তাঁর কাছে একটি চিঠি এসেছে– যাতে তিনি শেষ জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাতে পারেন সেজন্যে তাঁকে তাদের কাছে যেতে অনুরোধ করা হয়েছে এবং যদি তিনি শুধু সম্মত হন তাহলে রাহা খরচ দেবার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। তিনি সব কিছু আমাকে বিস্তারিতভাবে বললেন এবং তাঁর জীবনধারা বর্ণনা করলেন– পাহাড়ের মধ্যে স্তূপীকৃত ঘাসের চাপড়ার মধ্যে কষ্টকর হাঁটা, মুরগি হারানো, অন্ধকার ধোঁয়াচ্ছন্ন কেবিন, তারপর তিনি বললেন তাঁর কল্পনার আমেরিকার কথা– এলডোরাডার রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা সোনা শুধু কুড়িয়ে নেওয়া, কর্ক পর্যন্ত ট্রেনে ভ্রমণ, অতলান্তিক সমুদ্র অতিক্রম করা, এবং তাঁর ইচ্ছা যেন তাঁর হাড়গুলো আইরিশ মাটিতে বিশ্রাম পায়। যখন তিনি এসব বলছিলেন তিনি উত্তেজিত হলেন, তাঁর ভাষা হয়ে উঠল অধিকতর অবাধ অবিরল, অনেক কারুকার্যমণ্ডিত, ছন্দোময়, গীতল এবং এক স্বপ্নময় দোলার মতো আন্দোলিত। তারপর তিনি হাসি দিয়ে বালতিটি তুলে নিলেন, আমাকে শুভরাত্রি জানালেন এবং বাড়ি গেলেন।

কোন প্রকার শৈল্পিক ভড়ং ব্যতীত একজন নিরক্ষর বৃদ্ধার কাছ থেকে এ ধরনের প্রাক্ ধ্যানবিরহিত উচ্ছ্বাসের মধ্যে কবিতার সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে। এটা অনুপ্রাণিত ছিল। এর দ্বারা আমরা কি বোঝাতে চাই যখন আমরা বলি যে, একজন কবি অনুপ্রাণিত?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে অদ্যাবধি আদিম জাতির মুখে টিকে থাকা আদিম কবিতার দিকে আমাদেরকে ফিরি তাকাতে হবে। কিন্তু তাদের সমাজ সম্পর্কে কিছু না-জেনে এসমস্ত মানুষের কবিতাকে আমরা বুঝতে পারবো না। তদুপরি, কবিতা হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের বাক্‌ভঙ্গি। যদি আমরা কবিতার উৎপত্তি বিশদ জানতে চাই আমাদেরকে অবশ্যই বাক্-উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষ অধ্যয়ন করতে হবে। এবং এর অর্থ মানুষের উৎপত্তিও, কেননা বাক্ হচ্ছে তার অন্যতম স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্য। আমাদের অবশ্যই শুরুর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

www.pathagar.com

কিভাবে মানুষ তার অস্তিত্ব পরিগ্রহ করে সে-ইতিহাস পুরোপুরি জানতে আমাদের এখনো অনেক বাকি, কিন্তু একটা মূল বিষয় আছে যেখানে বিজ্ঞানীরা একমত। পশু থেকে দুটো প্রধান বৈশিষ্ট্যে মানুষ আলাদা– ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও বাক্‌ভঙ্গি।

সোজা হয়ে দাঁড়াবার ও সামনের পা-দুটোকে হাতের মত ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়ে শ্রেষ্ঠ স্তন্যপায়ী প্রাণীরা (Primate) নিম্নপর্যায়ের অমেরুদণ্ডী জীব থেকে পৃথক। মস্তিষ্কের মোটর-অংশগুলোর ক্রমিক নিপুণতার এই বিকাশ পরিবেশের বিশেষ পরিস্থিতি থেকে জন্ম নিয়েছে। সেগুলো ছিল বন্য প্রাণী এবং বৃক্ষনির্ভর জীবনযাত্রা, দর্শন ও স্পর্শের ঘনিষ্ঠ সমন্বয় এবং দাবি করে সূক্ষ্ম পেশীগত নিয়ন্ত্রণ। এবং একবার বিকশিত হবার পর মস্তিষ্কের কাছে নতুন সমস্যা ও নতুন সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়। সুতরাং, গোড়া থেকেই হাত ও মাথার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। [১]

শ্রেষ্ঠ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পরবর্তী উচ্চস্তর মানবাকার বানর থেকে মানুষের পার্থক্য হাঁটতে পারার সঙ্গে দাঁড়াতে পারার ক্ষমতায়। এটা অনুমান করা হয়েছে যে, বননির্মূলের কারণে যা তাকে মাটিতে নামতে বাধ্য করে, সে হাঁটতে শিখে। যাই হোক না কেন, হাত ও পায়ের কর্মের পার্থক্য তার মধ্যে পূর্ণতা পায়। তার পায়ের আঙ্গুল আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা হারায়; তার হাতের আঙ্গুল এমন দক্ষতা অর্জন করে যা বানরদের মধ্যে দেখা যায় না। বানরেরা লাঠি ও পাথর নিজ উদ্দেশ্যে সাধনে ব্যাবহার করতে পারে কিন্তু শুধু মানুষের হাতই সেগুলোকে যন্ত্রের রূপ দিতে সক্ষম।

এই ধাপটি ছিল যুগান্তকারী। এটা নতুন জীবনধারার সম্ভাবনাকে উন্মোচন করে। যন্ত্রসজ্জিত হয়ে মানুষ শুধু আত্মসাৎ করার বদলে খাদ্যোৎপাদন করল। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে সে তার যন্ত্রকে ব্যবহার করল। এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার ইচ্ছানিরপেক্ষ প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হলো যে, প্রকৃতি চালিত হয় নিজস্ব নিয়মে। কিভাবে ঘটনা ঘটে সে বিষয়ে সে শিখল এবং কাজেই কিভাবে ঘটানো যায় সে-সম্পর্কেও। প্রাকৃতিক নিয়মের বস্তুগত প্রয়োজনীয়তাকে যখন সে স্বীকার করল, নিজের উদ্দেশ্য সাধনে সেগুলোকে কাজে লাগানোও সে শিখল। সেগুলোর দাস হওয়ার পালা সাঙ্গ হলো মানুষ সেগুলোর প্রভু হয়ে বসল। অন্যদিকে প্রাকৃতিক নিয়মের বস্তুগত প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিতে সে যে পরিমাণে ব্যর্থ হলো, সে পরিমাণে সে ভেবে নিল যে, শুধু তার ইচ্ছার জোরেই চারপাশের জগতকে বদলানো যাবে। এটাই ম্যাজিক বা জাদুবিশ্বাসের ভিত্তি।

প্রাথমিক স্তরে উৎপাদনের শ্রম ছিল সমষ্টিগত। অনেক হাত মিলিতভাবে কাজ করেছে। এই পরিস্থিতিতে, যন্ত্রব্যবহারের মধ্য দিয়ে যোগাযোগের নতুন প্রণালী উন্মোচিত

www.pathagar.com

হয়েছে। (কাজ চালাবার ক্ষেত্রে) পশুর চিৎকারের সুযোগ অনেক পরিমাণে সীমাবদ্ধ। মানুষের মধ্যে সেটা ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত। দলের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধনের পন্থারূপে সেগুলো বিস্তৃত ও প্রণালীবদ্ধ হয়। এবং সেজন্যে বস্তু আবিষ্কার করে মানুষ কথা (বাক্) আবিষ্কার করেছে। এ ক্ষেত্রে আমরা আবার হাত ও মস্তিষ্কের যোগাযোগকে দেখি। উৎপাদনের প্রকৃত কৌশলের অঙ্গরূপে কথা মিশে গেল। উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে আগেই প্রকাশ করে শরীরের পেশাগত সঞ্চালনকে এটা সাহায্য করল; এবং প্রক্রিয়ার কাছে অনিবার্য হওয়ায় মনে মনে একেই কারণ হিসেবে ভেবে নেওয়া হলো– অন্যভাবে বলতে গেলে, এটা ছিল ঐন্দ্রজালিক। উচ্চারিত শব্দ আদিম মানুষের চিন্তার সর্বজনীনভাবে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় ভূষিত আছে।

টেকনিকের উন্নতির সঙ্গে স্বরের কার্যকলাপ আর শারীরিক প্রয়োজন হিসেবে রইল না। কিন্তু যৌথ রীতিটি বিলুপ্ত হলো না। প্রকৃত কাজ শুরু করার পূর্বে অনুষ্ঠিত রিহার্সেলের আকারে সেটা রয়ে গেল– এটা হলো এক ধরনের নৃত্য যাতে তারা প্রথমদিকে কাজের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত যৌথ (শারীরিক) আন্দোলনকে ফুটিয়ে তুলতে। এটাই অনুকরণ নৃত্য যা আদিম জাতিগুলো এখনো অনুশীলন করে।

ইতিমধ্যে কথা বিকাশ লাভ করল। যন্ত্রব্যবহারের সহযোগী নির্দেশ হিসেবে শুরু হয়ে সেটা পরিবর্তিত হলো আজকের দিনের ভাষায়,–সেটা পরিণত হলো ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ভাব আদান-প্রদানের একটি পূর্ণাঙ্গ ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত পরিপূর্ণ সচেতন প্রণালীরূপে। কিন্তু যেখানে এটা উচ্চারিত অংশরূপে রয়ে গেল, সেই ঐন্দ্রজালিক অনুকরণ-নৃত্যে এর ঐন্দ্রজালিক কার্য রক্ষিত হলো। সেজন্য সব ভাষায় আমরা দুরনের বাক্‌ভঙ্গি দেখি : ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ভাববিনিময়ের জন্যে প্রতিদিনের গতানুগতিক সাধারণ ভাষা, অপরটি গভীরতর, আচারঅনুষ্ঠানের যৌথকাজের উপযোগী কল্পনানির্ভর, ছন্দিত ও ঐন্দ্রজালিক কবিভাষা।

যদি এই বিবরণ সত্য হয়, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, কবিতার ভাষা সাধারণ কথোপকথনের ভাষা থেকে মূলত আদিমতর, কেননা ভাষার অন্তর্নিহিত ছন্দ, সঙ্গীত ও কল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো এতে অনেক পরিমাণে রক্ষিত আছে। অবশ্য এটা একটা অনুমান মাত্র, কিন্তু আদিম ভাষাগুলো সম্পর্কে আমরা যদ্দূর জানি তাতে এটাই সমর্থিত হয়। সেগুলোর মধ্যে কবিতার ভাষা ও সাধারণ ভাষার পার্থক্য তুলনামূলকভাবে অসম্পূর্ণ।

আদিম লোকদের সাধারণ ভাষায় একটি স্পষ্ট জোরালো এবং ললিত গীতল ঝোঁক রয়েছে। কোন কোন ভাষায় ঝোঁকটি এত সংগীতময় এবং অর্থের জন্যে এত প্রয়োজনীয় যে, যখন গীতটি রচিত হয়, তখন এর সুর উচ্চারিত শব্দের সাধারণ সংগীত দ্বারা

www.pathagar.com

বহুলাংশে নির্ধারিত হয়। (২) এবং তদুপরি মাঝখানে একটু থেমে কল্পনার প্রায়-কাব্যিক রথে চড়তে বক্তা সবসময় বাধ্য। এসব বৈশিষ্ট্যের প্রথম দুটো উদাহরণ দিয়ে দেখানো যাবে না, কিন্তু শেষেরটি দেখানো সম্ভব।

সুইজারল্যান্ডের একজন মিশনারি একদা জুলুল্যান্ডের আমবুসি রেলপথের নিকটবর্তী এলাকায় শিবির স্থাপন করেছিলেন। আমবুসির নেটিভদের কাছে রেলওয়ে বলতে বোঝায় দুরবান, লেডিস্মিথ, জোহানস্‌বার্গ প্রভৃতি জায়গায় যাওয়া– যে কাজ, প্রত্যেকের ওপর ধার্য করা ট্যাক্সের ভয়ে তারা বাড়ি থেকে তাড়িত হয়ে ক্রালের যুবকেরা বছরের পর বছর ধরে খনিতে যৌবনক্ষয় করার জন্য করে যাচ্ছে– এবং এর সঙ্গে মেয়েরাও, যাদের অনেকে ব্যাক-স্ট্রিটের পতিতলয়ে তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের জীবনযাপন করে। শিবিরের একজন চাকর পাত্র পরিষ্কার করছিল ঐ সময় একটি ট্রেন আসে এবং নিম্নলিখিত শব্দগুলো বিড়বিড় করে বলতে তাকে শোনা যায় :

The one who roars in the distance.
The one who crushes the young men and smashes them,
The one who debauches our wives,
They desert us, they go to the town to live bad lives,
the ravisher, And we are left alone (৩)

শিল্পবর্জিত আরো একটি স্বগতোক্তির সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যায়। এখানে একজন বৃদ্ধ কালো চাকর নিজের কাছে বিড়বিড় করে কথা বলছে এবং তবু এটা কবিতা। ট্রেনটি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সে তখন ভুলে গেছে পাত্র পরিষ্কারের কথা। এটা তখন আর ট্রেন নয়, বরং তার সর্বাধিক প্রিয় বস্তুগুলোর একটি ধ্বংসকারী শক্তির প্রতীকে রূপান্তরিত। তার অবচেতন মনের মূক প্রতিবাদ ভাষা লাভ করেছে। তারপরে ট্রেনের গর্জন থেমে যায় এবং সে তার কাজে ফিরে আসে।

এসব আদিম লোকদের সাধারণ ভাষা সেজন্যে এমন ছন্দময় সংগীতময় ও কল্পনাসমৃদ্ধ, যা আমরা শুধু কবিতার প্রসঙ্গেই চিন্তা করি। এবং যদি তাদের সাধারণ ভাষা কাব্যিক হয়, তাহলে তাদের কাব্য হবে ঐন্দ্রজালিক। একটিমাত্র কবিতা যা তারা জানে তা হলো সঙ্গীত এবং তাদের গান গাওয়া প্রায় সবসময় কিছু পরিবর্তন আনয়ন করা– বাস্তবতার ওপরে মায়ার প্রলেপ চাপিয়ে দেওয়া।

মাউরীদের মধ্যে আলুনৃত্য বলে এক ধরনের নৃত্য আছে। সবুজ শস্যগুলোর পূর্বের বাতাসে ছিন্নভিন্ন হওয়ার আশংকা থাকে, সেজন্যে তরুণীরা মাঠে যায় ও নাচে এবং তাদের অঙ্গভঙ্গি দ্বারা বৃষ্টিও বাতাসের বেগ, ফসলের অঙ্কুরোদগম ও পুষ্পিত হওয়াকে

www.pathagar.com

অনুকরণ করে; এবং নাচতে নাচতে তারা গান গায়, তাদের আদর্শ অনুকরণ করার জন্য ফসলকে আহ্বান করে। কল্পনায় তারা আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতার বাস্তবায়নের অভিনয় করে। এটা হলো ইন্দ্রজাল, প্রকৃত টেকনিকের পরিপূরক এক মায়াময় টেকনিক। মায়াময় হলেও কিন্তু এটা নিষ্ফল নয়। আলুর ওপর নৃত্যের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকার কথা নয়, কিন্তু স্বয়ং মেয়েদের ওপর এর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকা সম্ভবও আছে। নাচটি ফসলকে রক্ষা করবে এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে আগের চেয়ে বেশি বিশ্বাস ও শক্তিসহকারে তারা গাছের পরিচর্যায় মনোনিবেশ করে। এবং সে জন্যে ফসলের ওপর এর এক প্রকার প্রভাব বর্তায় বৈকি। বাস্তবতার প্রতি তাদের হৃদয়-নির্ভর দৃষ্টি পরিবর্তিত হয় এবং সে জন্যে পরোক্ষভাবে বাস্তবতাকে বদলে দেয়।

মাউরীরা পলিনেশীয় (দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী)। নিউ হেব্রাইড দ্বীপের অধিবাসিরাও তাই। তাদের একটি ঐতিহ্যবাহী গীতিরূপ আছে যার ছন্দ দুই স্তবক পরপর বদল হয়। প্রথমটির নাম 'পাতা', দ্বিতীয়টির নাম 'ফল'। তিকোপিয়া নামক অপর একটি পলিনেশীয় দ্বীপে তিন স্তবকের একটি গীতরূপ প্রচলিত আছে। ঠিকমতো অর্থ করলে প্রথমটির নাম দাঁড়ায় 'গাছের মূল', দ্বিতীয়টির নাম 'মধ্যবর্তী শব্দ' এবং শেষেরটি 'ফলগুচ্ছ'। এই নামকরণ থেকে দেখা যায়, যে মাউরী মেয়েদের নাচের অনুরূপ অনুকরণ নৃত্য থেকে গীতিরূপগুলো বিবর্তিত হয়েছে। কবিতার জন্ম হয়েছে জাদুবিশ্বাস থেকে।

যুক্তিটিকে আরো এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এব্রিয়ান্দ দ্বীপপুঞ্জ থেকে মলিনোস্কি নিচের জাদুমন্ত্রটি সংগ্রহ করেছেন :

It passes, it passes
The breaking pain in the thighbone passes,
The ulceration of the skin passes,
The big black evil of the abdomen passes,
It passes, it passes. [8]

আমরা যাকে কাব্যিক বলি, কবিতাটির বিষয়বস্তু সেরকম নয়, কিন্তু রূপটি সে রকমের। মলিনস্কি মন্তব্য করেছেন যে, 'এর ধ্বনিগত, ছন্দোগত, উপমাগত ও অনুপ্রাসগত প্রভাবের গৌরবের দ্বারা, অলৌকিক স্বরপ্রবাহে ও পুনরুক্তি দ্বারা' জাদুমন্ত্রটির ভাষা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। 'সত্য হোক বলে যাকে আপনি কামনা করেন, তাকে জোর করে সত্য বানিয়ে আপনি তাকে সত্য হতে বাধ্য করেন; এবং সেই জোর করাটি ভাষার মধ্যে এমন ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয় যে, তার মধ্যে অনুকরণ নৃত্যের উল্লাস-সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়, যে-নৃত্যে আপনি আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতার বাস্তবায়নকে কল্পনায় অভিনয় করেছেন।

www.pathagar.com

এখানে নিউ হেব্রাইড-এর আরো একটি গান দেওয়া হয়েছে– এটি এমন দুজন স্ত্রীলোকের প্রতি সম্বোধন করে রচিত যারা পাথরের ভেতরে বাস করেন বলে কথিত আছে।

The song sings, the song cries,
The song cries, Let her be my wife!
The woman who is there
The two women, they two
Who are in the sacred stone,
The song cries, let both come out! [৫]
Who sit inside, who live in the stones

সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা-ঘোলানো বিবৃতির পরিবর্তে এখানে আমরা একটি নির্দেশকে পাচ্ছি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে সরাসরিভাবে নির্দেশটি দেওয়া হচ্ছে না। গানটির আবেশকারী ইন্দ্রজালের সাহায্যে সেটা জানানো হচ্ছে। একটি অতিপ্রাকৃত শক্তি হিসেবে গানটির বহিরাবরণ নির্মিত হয়েছে। পরের উদাহরণটি একজন জার্মান বনবাসীর গান :

Klinge du, Klinge du, Waldung,
Schalle du, Schalle du, Halde,
Halle wider, halle wider, Hainlein,
Tore wider, grosser Laubwald,
Wider meine gute stimme,
Wider meine goldne kehle,
Wider mein Lied, das Lieblichste!

Wo die stimme zu verstehen ist,
Werden bald die Busche brechen,
Schichten sich von selbst die Stamme,
Stap In sich von selbst die scheiter,
Fugen sich zum Hof die Klafter
Haufen sich im Hof die schober
Ohne junger Manner Zutun,
Ohne die gescharften Aexte,

www.pathagar.com

অনুবাদ :
বনানী তুমি ধ্বনিত হও, তুমি ধ্বনিত হও,
পাহাড় তুমি ধ্বনিত হও, তুমি ধ্বনিত হও,
বৃক্ষরাজি তোমরা প্রতিধ্বনি কর,
বৃহৎ বনানী তুমি প্রতিধ্বনি কর,
আমার সুর প্রতিধ্বনিত হউক,
আমার সুকণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হউক,
আমার প্রিয় গান প্রতিধ্বনিত হউক।

যতদূর আমার কণ্ঠস্বর শোনা যায়,
ততদূর পর্যন্ত গাছপালা ভেঙে পড়ুক,
গাছের গুঁড়িগুলি আপনাআপনি স্তূপীকৃত হউক,
গুঁড়ি থেকে খণ্ডিত কাঠ এক জায়গায় জমা হউক,
খণ্ডিত কাঠগুলি খামারবাড়িতে পৌঁছে যাক,
খামার বাড়িতে সেগুলি আপনা থেকেই স্তূপীকৃত হউক,
এসব কিছুই ধারাল কুঠার
যুবকের কঠোর পরিশ্রম ব্যতিরেকে হউক।

বনবাসীরা গান গেয়ে গেয়ে বৃক্ষরাজিকে আহ্বান করছে ভূপাতিত হতে, কাঠের গুঁড়ি হিসেবে ভেঙে পড়তে, জঙ্গল থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে তাদের উঠানে এসে স্তূপীকৃত হতে। বনবাসীরা ভাল করেই জানে যে, এটা হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ঘটছে সেটা কল্পনা করতে তারা পছন্দ করে, কেননা এতে তাদের কাজের সহায়তা হয়। কবিতার জন্ম হয়েছে জাদু বিশ্বাস থেকে। ।

আমার পরবর্তী উদ্ধৃতি একটি প্রাচীন আইরিশ mantic কবিতা থেকে :

সুসংবাদ : সমুদ্র সফল, তরঙ্গ বিধৌত বেলাভূমি, প্রফুল্ল বনরাজি;
ডাইনী পালায়, ফলবাগান মঞ্জুরীত হয়, ফসলের মাঠ পাকে, মৌমাছিরা
ভিড় করে, হাস্যোজ্জ্বল পৃথিবী, শান্তি ও প্রাচুর্য, মধুর গ্রীষ্মকাল। [৬]

একটি ভাল মৌসুমের পূর্বাভাষরূপে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা কর্তৃক এটা স্তব করা হয়েছিল। আকাঙ্ক্ষিত ভবিতব্যকে ইতিমধ্যে আবির্ভূত হিসেবে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এবং সে জন্যে প্রায় ইন্দ্রিয়ের অগোচরে সে ধরনের কবিতায় পৌঁছে যাই যার সঙ্গে আমরা পরিচিত :

Sumer is icumen in,
Lhude sing cuccu!
Groweth sed and bloweth med
And springth the wude nu—
Sing cuccu!

বিবৃতিটি সত্য ঘটনার বর্ণনা কিন্তু তবু এখানে এর সঙ্গে হুকুম প্রদানের সুর জড়িত আছে। ইউরোপীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত এসব মৌসুমী রচিত হয়েছিল গোষ্ঠীগত আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নকে উদযাপন করার জন্যে। কিন্তু এই উদযাপননের মধ্যেও জাদুমন্ত্রের প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। কবিতার জন্ম হয়েছে জাদু বিশ্বাস থেকে।

'উজ্জ্বল তারকা, যদি আমি তোমার মতো অচঞ্চল হতাম।' Den lieb ich der Unmogliches begehrt. (আমি তাকেই ভালবাসি যে অসম্ভব কোন কিছু আশা করে।) কেন কবিরা অসম্ভবের জন্যে পাগল হন? কারণ এটাই কবিতার মূল কাজ যা সে জাদুবিশ্বাস থেকে লাভ করেছে। অনুকরণ নৃত্যের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে চরম মানসিক ও দৈহিক উত্তেজনার হিস্টিরিয়াসুলভ কার্যসহকারে ক্ষুধার্ত সন্ত্রস্ত আদিম লোকেরা প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের সহায়তা প্রকাশ করে এর মধ্য দিয়ে তারা পৃথিবী বাস্তবিক পক্ষে যেমন অবস্থায় আছে সেই বাহ্যিক জগতের চেতনা হারায় এবং অবচেতনে, যেমন হওয়া উচিত, সেই আকাঙ্ক্ষিত কল্পনার-অন্তর্জগতে নিমজ্জিত হয়। ইচ্ছাশক্তির সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তারা বাস্তবতার ওপর মায়াকে চাপিয়ে দিতে প্রয়াস পায়। এতে তারা ব্যর্থ হয় কিন্তু চেষ্টাটি বৃথা যায় না। তার দ্বারা পরিবেশের সঙ্গে তাদের আত্মিক দ্বন্দ্ব মীমাংসিত হয়। সাম্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এবং সেজন্য, যখন তারা বাস্তবে প্রত্যাবর্তন করে, প্রকৃতপক্ষে বাস্তবকে আয়ত্ত করতে তারা পূর্বের তুলনায় অধিক যোগ্য হয়।

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের শেষ চেষ্টায় কিটস যখন ইতালি গিয়েছিলেন তখন তার বয়স ছিল চব্বিশ। ফ্যানি ব্রাউনকে তিনি শেষবারের মতো দেখেন। খারাপ আবহাওয়ায় তাড়িত হয়ে তাঁর জাহাজ চ্যানেলের স্রোতে লুলওয়ার্থ উপসাগরে উপস্থিত হলো– সেখানে তিনি বেলাভূমিতে নামলেন; মাতৃভূমি ইংল্যান্ডের মাটিতে সেটাই ছিল তাঁর শেষ পদচারণা। সন্ধ্যায় তিনি জাহজে ফিরে এলেন এবং তখনই এই সনেটটি রচনা করেন। তিনি এর রূপ দেন শেক্সপিয়রের কবিতার অনুকরণ। চার মাস পরে তিনি ইতালিতে ক্ষয়রোগে মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

Bright star, would I were stedfast as thou art। এটা একটি সচেতন কামনা– মৃত্যুপথযাত্রীর কামনা। কিন্তু ইতিমধ্যে সেটা কাব্যিক-স্মৃতিতে জারিত হয়ে গেছে

But I am constant as the northern star
of whose true-fix'd and resting quality
There is no fellow in the firmament

এটা তাঁর নিজস্ব কল্পনাকে গতিশীলতায় স্থাপন করে। তিনি নিজেকে চিহ্নিত করেন তারকারাজির সঙ্গে এবং তারপর চন্দ্রের সঙ্গে–আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখিয়েছি যে, সুপ্রাচীন কাল থেকে অনন্ত জীবনের প্রতীক হিসেবে চাঁদ পূজিত হয়ে আসেছে। এবং তখনও উপসাগরে ধাবমান তরঙ্গোচ্ছ্বাসে মৃদুভাবে দোলায়িত জাহাজ সম্পর্কে অস্পষ্টভাবে সচেতন থেকে তিনি চাঁদের দিক থেকে আমাদের গ্রহের সীমারেখার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে আগত-নির্গত তরঙ্গের আন্দোলনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন :

Not in Lone splendour hung aloft the night,
And watching with eternal lids apart,
Like nature's patient, sleepless Eremite,
The moving waters at their priest like task
of pure ablution round earth's human shores,
Or gazing on the soft new-fallen mask
of snow upon the mountins and the moors—

তারপরে, এভাবে অনন্তের কোলে আসন নিয়ে, তখনও জাহজের ঘুম-ঘুম দোলার প্রতি সচেতন থেকে তিনি অমরত্ব লাভ করে পৃথিবীতে অবতরণ করেন :

No, yet still stedfast, still unchangeable,
pillow'd upon my fair love's ripening breast,
To feel forever its soft fall and swell,
Awake for ever in a sweet unrest,
still, still to hear her tender-taken breath
And so live ever

কিন্তু এটা অসম্ভব। মৃত্যু ব্যতীত কোন প্রেম হতে পারে না ; এবং অমরত্বের আকাঙ্ক্ষী তার প্রার্থনা বিপরীতে ফিরে আসে :

And so live ever, or else swoon to death

www.pathagar.com

তিনি চেতনায় জাগরিত হন। নৌকার দোলার ফলে উত্থিত এক স্বপ্নের মতো এটা– যে-স্বপ্নে তার নিদ্রিত ভালবাসার শুভ্র বক্ষদেশ গতিশীল জল-রাশি ও পর্বতস্থ তুষারের প্রতীকে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু স্বপ্নের সাহায্যে তিনি ছুড়ে ফেলেছেন যা তাকে নির্যাতন করছিল। তিনি তাঁর মনে প্রশান্তি পুনরুদ্ধার করেছেন। তখনও কিন্তু পৃথিবী বস্তুগতভাবে একই রয়ে গেছে– যে-পৃথিবীতে

Where youth grows pale, and spectre thin and dies. কিন্তু এর প্রতি তার হৃদয়-নির্ভর মনোভাব বদলে গেছে। এবং সে জন্যে তার কাছে এটা আর আগের অবস্থায় নেই। এটাই কবিতার দ্বান্দ্বিকতা, যেমন ম্যাজিকেরও।

২। ছন্দ ও শ্রম

ব্যাপকতম অর্থে ছন্দের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে স্বরের ওঠানামা ও সময়ের নিয়মিত পর্যায়ে বিন্যস্ত ধ্বনিমালারূপে। এর মূল উৎপত্তি অবশ্যই শরীরগত কিন্তু ঐ পর্যায়ে এটা এমন এক জিনিস যাতে মানুষ ও পশুর মিল লক্ষণীয়। আমরা এখানে ছন্দের শরীর ভিত্তি সম্পর্কে ব্যাপৃত নই বরং যা-থেকে মানুষ তা করেছে সেটা নিয়ে। আমি দেখাতে চাই যে, মানুষের ছন্দ তার যন্ত্রব্যবহার থেকে উৎপন্ন।

আমরা সবাই জানি যে, লেখা শেখার সময় শিশুরা প্রায়ই হাতের সঙ্গে সঙ্গে জিভ ঘোরায়, বা এমনকি শব্দাবলী জোরে উচ্চারণ করে– এটা এ জন্যে নয় যে, তার পড়া শোনবার জন্য কেউ আছে, বরং কলমকে চালিত করতে করতে আঙুলকে সাহায্য করার জন্যে সে এ কাজ করে। আসলে যা-ঘটে তা হলো যে, যে-মস্তিষ্ক জিভ নিয়ন্ত্রণ করে তার পাশের এলাকায় হাতের মোটর-অংশ থেকে সাড়া 'প্রবাহিত' হয়। অনুশীলনের মাধ্যমে শিশু উন্নতিলাভ করলে ঐ সাড়া বন্ধ হয়।

অনুরূপভাবে, যখন কোন লোক কাঠের গুঁড়ি বা পাথর তোলবার জন্যে শ্রমসাধ্য কাজ করে, প্রতিটি পেশাগত চেষ্টা শুরু করার ঠিক পূর্বমুহূর্তে শ্বাস-গ্রহণের জন্যে সে থামে এবং শ্বাসনালীর পাশের সংকীর্ণ ছিদ্রটি বন্ধ করে শ্বাসকে ধরে রাখে; তারপরে কাজ শেষের পরে যখন সে বিরাম নেয় তখন চাপ দিয়ে ঐ সংকীর্ণ দিকটি খুলে আবদ্ধ বায়ু বেরিয়ে আসে– ফলে শ্বাসনালীতে আন্দোলন জাগে ও স্বতঃস্ফূর্ত অসংস্কৃত ধ্বনি নির্গত হয়।

আদিম জাতির লোকেরাও কথা বলার সময়ে শিশুদের মত ভঙ্গি করে। আকার-ইঙ্গিতের কাজ কিন্তু শুধু অন্যদের উপলব্ধিতে সাহায্য করা নয়। নিজেদের সঙ্গে কথা বলার সময়েও তারা অনুরূপ আচরণ করে। পূর্বে বর্ণিত অন্যান্য আন্দোলনের মতো এটা

www.pathagar.com

স্বভাবজাত। পেশীগত অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে যেন স্বরযন্ত্রের আন্দোলন জড়িয়ে যায়। আমাদের কাছে, বাক্ হলো প্রথম ও ভঙ্গি হলো দ্বিতীয়, কিন্তু অর্থ এই নয় যে, আমাদের আদিমতম পূর্ব-পুরুষের বেলায়ও এমন ছিল। আদিম মানসিকতায় বাক্ ও ভঙ্গির অন্তঃনির্ভরশীলতা একটি প্রমাণিত ঘটনা।

এসব বিবেচনার শক্তিতে অর্ধশতাব্দী আগে বুচার বলেছিলেন যে, যন্ত্র ব্যবহার করতে গিয়ে পেশীর কার্যপরম্পরায় স্বরযন্ত্রে যে প্রতিবর্তী স্পন্দন জাগে, তা থেকেই বাক্-এর উৎপত্তি। হাত যত বেশি সুবিন্যস্ত হলো, স্বরযন্ত্র তদনুসারে উন্নত হলো। শেষ পর্যন্ত জাগরিত চেতনা এসব প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে দখলে নিয়ে এলো এবং তাদেরকে সমাজস্বীকৃত ভাববিনিময়ের পদ্ধতিতে উন্নীত করল।

এই অনুমানে পৌঁছার জন্যে বুচার শ্রমসঙ্গীত সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা করেন। এসব গানের কাজ হচ্ছে ছন্দোময় ঐন্দ্রজালিত চরিত্র প্রদান করে উৎপাদন-শ্রমকে ত্বরান্বিত করা। সূতাকাটনী এই বিশ্বাসে গান করে যে, তার গান চরকার চাকাকে ঘুরতে সাহায্য করবে এবং যেহেতু এটা তাকে সাহয্য করে সে জন্যে এটা চরকাকে ঘুরতেও সাহায্য করে।

এই চিন্তা ম্যাজিকের খুবই নিকটবর্তী। বিশেষ ক্ষেত্রে দেখানো যাবে যে, এসব গানের উদ্ভব জাদুমন্ত্ররূপে। [৭]

যেখানে মেশিনের আওয়াজে তলিয়ে গেছে শুধু সেখানে ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র সংস্কৃতির প্রত্যেক স্তরে শ্রমসঙ্গীত প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। আদিম লোকেরা যখনই কোন কায়িক শ্রমকর্মে নিয়োজিত হয়, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে যদি সেটা দৈনন্দিন জীবনের কর্মতালিকার অদম্য ধারাবাহিকতার মধ্যে পড়ে, তবে তাদের ঠোঁট থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগীত প্রবাহিত হয়। এবং কবিতার উদ্ভবের ক্ষেত্রে সেগুলোর একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে কেননা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসহ সেগুলোর মধ্যে ভাষা-শ্রমের মূল সম্পর্ক রক্ষিত আছে। বুচার এটা লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাঁর প্রধান সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ মানুষের বাক্-এর ছন্দ শ্রম প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন, নিঃসন্দেহে অভ্রান্ত। বিশেষ ছন্দের সঙ্গে বিশেষ প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করে তিনি এটা সমর্থন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর যুক্তির এ অংশ ভ্রান্ত এবং আমি সেটা পরিত্যাগ করেছি। তাঁর সিদ্ধান্তের স্পষ্টতম প্রমাণ গানের কাঠামোর নীতিসমূহের বিশ্লেষণের মধ্যে নিহিত আছে এবং এর জন্যে দায়ী আমি।

নৌকার দাঁড় বাওয়ার কাজ, ব্যতিক্রমবিহীনভাবে নিয়মিত বিরতিতে বারংবার করা সরল পেশী-সঞ্চালনের সঙ্গে জড়িত। একটি পৌনঃপুনিক চিৎকার দ্বারা দাঁড়ীর সময় নির্ধারিত হয়– ঐ চিৎকার সরলতম আঙ্গিকে দুই সিলেবলে সীমাবদ্ধ : ও-ওফ্! দ্বিতীয়

www.pathagar.com

সিলেবলটি উদ্‌যোগের ক্ষণটিকে সূচনা করে, প্রথমটি হলো প্রস্তুতির ইঙ্গিত।

দাঁড় বাওয়ার চেয়ে গুণটানা কঠিনতর কাজ। উদযোগ গ্রহণের ক্ষণটি বেশি তীব্র এবং সেজন্যে দীর্ঘতর বিরতিতে প্রসারিত। প্রস্তুতিমূলক সিলেবলের প্রসরণের জন্যে তার ফলে সুযোগ থাকে, যেমন আছে আইরিশ গুণটানার চিৎকারে : Ho-li-ho-hup। কখনো-কখনো বিশ্রামের একটি সিলেবলের মাধ্যমে চিৎকার : যদি পড়ে, যেমন দেখা যায় রুশ গুণটানার চিৎকারে : E-uch-nyem। অনেক ক্ষেত্রে সেটা অংশবিশেষে বা পুরোপুরিভাবে সুবিন্যস্ত হয়ে গেছে : Heave-O-ho Haul away!

দুই সিলেবল বিশিষ্ট সরল শ্রমচিৎকারের এ দুটো পরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনীয় উপাদানকে ছন্দপ্রকরণের উদাত্ত ও অনুদাত্ত (arsis ও thesis) স্বরের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়– এগুলো নৃত্যের সময় হাত বা পায়ের উত্তোলন ও অবতরণকে যথাযথ প্রকাশ করে। সে জন্যে ছন্দের তালের মূল নিহিত আছে আদিম শ্রম প্রক্রিয়ায়–কাঠের গুঁড়িতে পর্যায়ক্রমিক টানে অথবা কাঠিতে বা পাথরে যন্ত্রের আঘাতে। মানবজীবনের সেই শুরুতে, মানুষের মানুষ হবার মুহূর্তে, এটা লক্ষ্য করা যায়। এই সেই কারণ যে জন্যে এটা আমাদেরকে এত গভীরভাবে নাড়া দেয়।

তার ইউরোপীয় নিয়োগকর্তার জন্য রাস্তার পাশে বসে পাথর ভাঙতে ভাঙ্গতে একজন টোংগা বালক স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিচের চুটকি গানটি গাইছিল। পূর্বোল্লিখিত সুইস মিশনারি জুনদ সেটা রেকর্ড করে নেন :

Ba hi shani-sa, ehe!
Ba Ku hi hlupha, ehe!
Ba nwa makhofi, ehé!
Ba nga hi nyiki, ehé! [৮]

অনুবাদ : তারা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে এহে...!
তারা আমাদের ওপর নিষ্ঠুর এহে...!
তারা তাদের কফি পান করে, এহে...!
এবং আমাদের কিছু দেয় না, এহে...!

এখানে বারংবার উচ্চারিত 'এহে...' হলো শ্রমচিৎকার হাতুড়ির আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে এটা বলা হয়। অংশটি অপরিবর্তনীয়। প্রতিবারে এর ভূমিকাস্বরূপ উচ্চারিত হয় মুখে মুখে রচিত কয়েকটি সুবিন্যস্ত শব্দ, যা শব্দটির প্রতি গায়কের হৃদয়গত ধারণা প্রকাশ করে। আওয়াজ থেকে গীতটি জন্ম নিয়েছে, যেমন করে আওয়াজটি বেরিয়ে এসেছে স্বয়ং কাজটি থেকে।

www.pathagar.com

Heave on, cut deep!
How leaps my fluttering heart
At the gleam that flashes from their eyes
O puhi-huia!
Heave on, cut deep! [৯]

মাউরীদের দাঁড় বাওয়ার গান এটা । সর্দার মাঝি মাঝে মাঝে ধ্বনিটি উচ্চারণ করে এবং তার ফাঁকে ফাঁকে নৌকায় আসীন মালিক কন্যার প্রশংসাসূচক গান বাঁধার কালে শব্দ-ছন্দের তালে তালে সময় চিহ্নিত হয়। চিৎকারটি এখনো কাজের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু গানের ধুয়ায় পরিণত হবার দিকে-যে তার গতি, তা বোঝা যায়।

আমার পরের উদাহরণ হচ্ছে ভোলগার মাঝিদের গান।

E-uch-nyem! e-uch-nyem! yeshcho razik! yeshcho da raz!
Razovyom my beryozu, Rezovyom my kudryavu!
Aida da, aida! razovyom! aida da, aida! Kudryavu!
E-uch-nyem! e-uch-nyem! yeshcho razik! yeshcho da raz!

এখানে কাজের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত উপদেশের ভূমিকা ও সমাপ্তি দেয়া হয়েছে গুণটানার চিৎকারের দ্বারা এবং এর ভেতরেই সেটা অন্তর্ভুক্ত আছে ও সংজ্ঞায়িত হয়েছে।

দুই উদযোগ-ক্ষণের মধ্যেকার মুখে-মুখে রচিত অংশটিকে প্রসারিত করে শ্রমগীতি বিকশিত হয়। শ্রমিকদের মনের সর্বোচ্চ অংশে যেটাই থাকে– ঐতিহ্যবাহী লোকগীতির স্বপ্ন-টুকরা বা সমকালীন ঘটানার ওপর এলোমেলো মন্তব্য– তাই সে অংশে স্থান পায়। কোন কিছু চূর্ণ করার সময়ে গীত Grind, mill, grind ধরনের একটি প্রাচীন গ্রিক গান আমরা পেয়েছি যার মাঝে মাঝে অত্যাচারী পিটাক্সের প্রতি ইঙ্গিতবাহী অংশ আসে; আধুনিক গ্রিকে একই ধুয়ার আরেকটি গীত আছে যাতে পাওয়া যায় স্বামীর খোঁজ করতে আসা পুলিশ স্কোয়াডের জন্যে বার্লি চূর্ণ করতে বাধ্য হচ্ছে, তেমন একজন রমণী কর্তৃক রচিত মুখে-মুখের একটি গান। হাতের কাজের সঙ্গে জড়িত অপরিবর্তনীয় অংশটির কোন বদল হয় না; কিন্তু পরিবর্তনশীল অংশটি দিনের পর-দিন অনির্দিষ্টভাবে বদল হতে থাকে। প্রচলিত লোকগীতির অনেক দুর্বোধ্যতা সম্ভবত যে-বিশিষ্ট রূপে এগুলো টিকে আছে, তার উদ্ভবের প্রেরণার পরিবেশটি সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞানতার কারণে ঘটে। একই ধরনের গীতির অন্য উদাহরণ পাওয়া যাবে নিগ্রোদের অধ্যাত্মগীতিতে– যেখানে বারংবার আবৃত্তি করে বাইবেল শিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মনিরত শ্রমিকদের বিনোদন করা হয় গান শুনিয়ে; বিলাতের সমুদ্রতীরের কুটিরবাসীদের গানেও এ ব্যাপারটি লক্ষণীয়,

www.pathagar.com

আঠার শতকের এই গানটিতে যেমন পাওয়া যায় :

Louis was the king of France afore the Revolution
Away, haul away, boys haul away together!
Louis had his head cut off, which spoilt his constitution
Away, haul away, boys, haul away together!

ইতিমধ্যে গানের শিল্পরূপ শ্রমপ্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিশ্রামনিরত শরীরে অবসরকালীন সময়ে গান রচনা শুরু হয় মুখে-মুখে, অবশ্য সেটা ঐতিহ্যবাহী প্যাটার্নের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল। নিচের গানটি মধ্য আফ্রিকার- সাদা মানুষের দলের সঙ্গে যুক্ত কুলীরা তাঁবুর আগুনের পাশে সন্ধ্যাবেলায় বসে এ গান গেত :

The wicked white man goes from the shore—puti, puti!
We will follow the wicked white man—puti, puti!
As long as he gives us, food— Puti, Puti!
We will cross the hills and streams—puti, puti!
With this great merchant's caravan— Puti, puti! [১০]

এবং এভাবে আগুনের পাশে একের-পর-এক গান চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সবাই ঘুমে ঢলে পড়ে। পর্যায়ক্রমে একেকজন মুখে-মুখে গান বেঁধে যেত, আর বাকিরা মিলিতভাবে Puti, Puti (এর অর্থ : শ্রমসাধ্য কাজ করা) উচ্চারণ করত। এর মধ্যে পাওয়া যায় আমাদের পরিচিত একক ও কোরাস গানের সর্বজনীন কাঠামো; শ্রমচিকার এখন গানের ধুয়া ব্যতীত আর কিছু নয়।

শ্রম-প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপরিবর্তনশীল অংশটিও প্রসারিত হয়েছে। এটাকে পুরোপুরি বিন্যস্ত করা হয় এবং ছন্দ-প্যাটার্নে বৈচিত্র্য আনয়নের জন্যে বদলানো হয়, কিন্তু নিয়মিত পুনরুক্তির ধারণাকে নষ্ট করে নয়, কারণ তার ওপরেই সমগ্রের ঐক্য নির্ভরশীল।

Why does your brand sae drop wi'blude,
Edward, Edward?
Why does your brand sae drop wi' blude,
And why sae sad gang ye : O?
O. I hae kill'd my hawk sae gude,
Mither, Mither,
O, I hae killed my hawk sae gude,
And I had nae mair but he, O,

www.pathagar.com

আমরা চতুষ্পদী শ্লোকের ব্যালাডে উপনীত হই, যেখানে ধুয়াটি এভাবে অদৃশ্য হয়েও ছন্দ-কাঠামোতে গুপ্ত রয়ে গেছে— যে-কাঠামো পূর্ব প্রসঙ্গ ও উত্তর প্রসঙ্গ, চাপান ও উতোর— এ দুয়ের অবিরল বদলানোতে বিধৃত আছে :

There liv'd a lass in yonder dale,
    And down in yonder glen, O,
And kathrine Jaffray was her name,
    Well Known by many men O, [১১]

ব্যালাড কাঠামোতে, স্তবক হলো একটি সংগীত 'বাক্য', পদ (শ্লোক) হলো সংগীত 'বাক্যাংশ', কবিতা হলো একটি সংগীত 'মূর্তি'। প্রতিটি বাক্যাংশে দুটো মূর্তি এবং প্রতিটি বাক্যে দুটো বাক্যাংশ আছে। প্রতিটি জোড়ার সদস্যরা পরস্পরের পরিপূরক, সদৃশ কিন্তু স্বতন্ত্র। সংগীতশাস্ত্রজ্ঞরা একেই বলেন দ্বিকাঠামো (Binary form) : কখ।

ব্যালাড কাঠামোর সাংগীতিক শরীর গঠন শুধুমাত্র তুলনার বিষয় নয়। বিশ্লেষণের ওটাই একমাত্র যথার্থ পদ্ধতি। কবিতার জীবন্ত ইতিহাস থেকে আমাদের পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ছন্দপ্রকরণ যত দূরবর্তী, তেমন দূরবর্তী প্রচলিত ব্যাকরণ, ভাষার জীবন্ত ইতিহাস থেকে। ব্যালাড ছিল মূলত একটি নৃত্য, যেমন রয়েছে ইউরোপের কোন কোন এলাকায় এখনো। ফারো দ্বীপপুঞ্জ থেকে সংগৃহীত নিচেরটি তার একটি উদাহরণ।

প্রধান গায়ক ব্যালাড গান করেন এবং তাল দেওয়া হয় পায়ে ঠুকে। নর্তকরা তার উচ্চারিত শব্দ নিবিষ্টভাবে শ্রবণ করেন– উচ্চারণ খুব স্পষ্ট হতে হবে, কেননা বর্ণিত অংশের বৈশিষ্ট্য অভিনয়ের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। হাতগুলো যুদ্ধ হাঙ্গামার ঢংয়ে দৃঢ়ভাবে এঁটে রাখা হয়; একটি উল্লসিত লম্ফ বিজয় সূচনা করে। প্রতিটি স্তবকের শেষের কোরাসে সব নর্তকরা অংশ নেয়, কিন্তু স্তবকটি গীত হয় শুধু দু-একজন বিশেষ খ্যাতনামা গায়কের দ্বারা। [১২]

সঙ্গীতযন্ত্রের বিশ্লেষণী পদ্ধতি ছন্দ-গবেষণার আওতাভুক্ত, এই বিবেচনায় যে, কবিতা, সঙ্গীত ও নৃত্যের সাধারণ ভিত্তি সেটা।

আমাদের অধিকাংশ লোকগীতি দ্বিকাঠামো বিশিষ্ট কিন্তু কতগুলো পাওয়া যায় বিস্তৃত আঙ্গিকের। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ভোলগানদীর নৌকা-গানের স্তবকের আগে ও পরে থাকে ঐতিহ্যবাহী গুণটানার চিৎকার বিশিষ্ট পদ্য। সংগীতের প্রতিশব্দে প্রথম বিষয়ের পরে আসে দ্বিতীয় একটি বিষয়, তারপরে প্রথমটি হয় পুনরায় গীত হয় বা তা দিয়ে পুনর্বার আরম্ভ করা হয়। এটা হলো ত্রিকাঠামো আঙ্গিক : কখক। দক্ষ হাতের পরিচর্যায় ক১-এর পুনরুক্তির চেয়ে ক২ অধিক তাৎপর্যময় হয় : এটা খ দ্বারা প্রভাবিত

www.pathagar.com

নতুন রূপের ক১। এবং সে জন্যই ত্রিকাঠামো আঙ্গিক দ্বিকাঠামোর চেয়ে অধিক সুসম্বন্ধ, অধিক দ্বান্দ্বিক। এজন্যেই আধুনিক গানে এর অনুশীলন হয়েছে এত বেশি। গ্রীকরা দুটো রূপই ব্যবহার করেছে। গ্রিক সঙ্গীতের সুর হারিয়ে গেছে; কিন্তু যেহেতু মহাকাব্য ও নাটকীয় সংলাপ-ব্যতীত, অধিকাংশ গ্রিক কবিতাই গীত হবার জন্যে রচিত হয়েছিল, শব্দব্যবহার বিশ্লেষণ করে এর ছন্দকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। আমার Greek lyric Metre-সে-সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে– আমি সেখানে দেখিয়েছি যে, গ্রিক নাট্যগীতের strophe [যৌথ সঙ্গীতের অংশ বিশেষ, একদল এই অংশ গাইবার পর অপর দল এর উত্তর দিত] আধুনিক স্তবকের মতো ঠিক অনুরূপ সংগঠন।

গোড়া থেকে আবার শুরু করা যাক। নৃত্য সঙ্গীত ও কবিতা এই ত্রয়ী শিল্পকলার শুরু হয়েছিল একক অবিভাজ্য শিল্পরূপ হিসেবে। এগুলোর উৎস ছিল যৌথ শ্রমে নিয়োজিত মানবশরীরের ছন্দোময় আন্দোলন। এই আন্দোলনের ছিল দুটো দিক– শারীরিক ও মৌখিক। প্রথমটাতে ছিল নৃত্যের বীজ, দ্বিতীয়টাতে ভাষার। ছন্দ-নির্দেশক অসংস্কৃত চিৎকার থেকে যাত্রা করে ভাষা বিভক্ত হয়ে যায় কাব্যিক ভাষায় ও মুখের ভাষায়। কণ্ঠ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে এবং যন্ত্রের আঘাতে উৎপন্ন হয়ে অসংস্কৃত চিৎকার পরিণত হলো যন্ত্রসঙ্গীতের কেন্দ্র বিন্দুতে।

সঠিকভাবে সে মত বলতে গেলে নৃত্যের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া ছিল কবিতার দিকে প্রথম পদক্ষেপ। এভাবে আমরা গান পাচ্ছি। গানের ভেতর কবিতা হচ্ছে সঙ্গীদের বিষয়, আর সঙ্গীত হচ্ছে কবিতার রূপ। তারপর দুটো ভিন্ন মোড় নিল। সঙ্গীতবিরহিত কবিতার রূপ হচ্ছে এর ছন্দোময় কাঠামো, যা সে গান থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে কিন্তু সহজতর রূপ পরিগ্রহ করেছে যুক্তিরপরম্পরায় বিষয়কে বিকশিত করার জন্যে। কবিতার মধ্যে একটি গল্প থাকে, যা ছন্দোময় কাঠামো থেকে স্বতন্ত্র কিন্তু নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সঙ্গতির অধিকারী। এবং সে জন্যে পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণনামূলক কবিতা থেকে জন্ম নিল গদ্যরোমান্স ও উপন্যাস– যার ভেতরে কাব্যিক ভাষার স্থানে এসেছে মুখের ভাষা এবং ছন্দোময় খোলস খসে গেছে, অবশ্য গল্প নিজে রূপ নিয়েছে সমন্বিত ও সুসমঞ্জস আঙ্গিকে।

ইতিমধ্যে এক ধরনের সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে যা পুরোপুরি যন্ত্রনির্ভর। সিম্ফনি হলো উপন্যাসের প্রতিপক্ষ। উপন্যাসকে যদি বলা যায় ছন্দোবিহীন ভাষা, সিম্ফনি তা-হলে ভাষাবিহীন ছন্দ। উপন্যাস তার ঐক্য লাভ করে দৃশ্যমান জীবন থেকে আহরিত কাহিনী হতে, সিম্ফনি তার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করে আজগুবি কল্পনারই জগত থেকে। আঙ্গিক ছাড়া এর কোন অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য নেই। সুতরাং উপন্যাসে যেসব কাঠামোগত

www.pathagar.com

নীতি বিলুপ্ত হয়েছিল, তার সবই অভূতপূর্ব মাত্রায় সঙ্গীতে বিস্তার লাভ করেছে। সঙ্গীতে বিশেষ এলাকারূপে সেগুলো বিবেচিত হতে শুরু করেছে। সেগুলোকে সাঙ্গীতিকরূপ বলতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তথাপি এখনো সেগুলোর মূল অনুসন্ধান করা যেতে পারে কবিতায়– আমি শুধু ছান্দিক কাঠামোকে বোঝাতে চাই না, সঙ্গীতের ধারণা নিয়ে সে সম্পর্কে গবেষণা করলে বিষয়বস্তুর বিন্যাসে সেটা পাওয়া যাবে। দুটো উদাহরণ বিশ্লেষণ করা যাক– যেগুলো আলোচ্য বিষয়কে ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে কবিতার সাথে জাদু বিশ্বাসের সম্পর্ককে পুনরায় তুলে ধরে।

মহিলা কবি সাপপোর 'ওড টু আফ্রোদিতি' হলো প্রাচীনতম গীতিকবিতা এবং প্রকৃত অর্থেই এটা একটা গীতিকবিতা (lyric), কেননা বাদ্যযন্ত্র lyri সহযোগে সেটা গীত হয়েছিল। সাপপো ছিলেন দেবী আফ্রোদিতির প্রতি নিবেদিত তরুণীদের ধর্মসংঘের সভানেত্রী। দেবীর প্রতি আবেগ মাতাল অবস্থায় অনুরক্ত এ ধরনের একজন তরুণীর প্রেমের প্রতিদান দিতে দেবী ব্যর্থ হয়েছেন :

Aphrodite, goddess enthroned in Splendour,
Child of Zeus Almighty, immortal artful,
I beseech thee, break not my heart, O Queen
with sorrow and anguish

Rather Come, O Come as I often saw thee,
Quick to hear my voice from afar, descending
From thy Fathe's mansion to mount thy golden chariot
drawn by
Wings of sparrows fluttering down from heaven
Through the cloudless blue; and a smile was shining
Blessed Lady, on thy immortal lips, as standing beside me

Thou didst ask : 'well, what is it now? what is that
Frantic heart's desire? Do you need my magic?
Whom then must I lure to your arms? who is it, Sappho
that wrongs you?

On she flies, yet soon she shall follow after;

www.pathagar.com

Gifts she spurns, yet soon she shall be the giver;
Love she will not, yet, if it be your will, then surely she
shall love'.
So come now, and free me from grief and trouble!
Bring it all to pass as my heart desires it!
Answer, come, and stand at my side in arms, O Queen, to
defend me!

সাপপো আরম্ভ করেছেন প্রার্থনা দিয়ে। তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, অনুরূপ প্রার্থনা অতীতে পূর্ণ করা হয়েছে। প্রার্থনাটি তারপর পুনরায় উচ্চারিত হয়। এর রূপ ত্রিকাঠামোর– একজন সচেতন শিল্পী দ্বারা গতিশীলভাবে ব্যবহৃত। প্রার্থনা শুরু হয় নেতিবাচকতায়, পরীক্ষা মূলকভাবে; এটা সমাপ্ত হয় ইতিবাচকতায় বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে; মধ্যবতী অবস্থায় যা এসেছে, তা যেন প্রত্যাশিত জবাবের নিশ্চয়তা।

মধ্যবর্তী অবস্থায় কি এসেছে? তিনি আফ্রোদিতিকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : If ever before..so now এটা ছিল ঐতিহ্যসম্মত। আপনি যখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, অতীতে যে আপনি তার সাহায্য পেয়েছেন বা কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন– যেসব ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপনার আবেদনকে জোরদার করেন। এটা আচারের একটি সূত্র। এবং আচার বিশ্বাস আমাদেরকে জাদুবিশ্বাসে নিয়ে যায়। জাদুবিশ্বাসে আপনি, আপনার আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতার পূর্ণ হবার কল্পনার অভিনয় করেন। ঠিক একই কাজ সাপপো এখানে করছেন, শুধু পার্থক্য এই যে, এখানে কোন ক্রিয়া নেই, কোন নৃত্য নেই, শুধু আছে কল্পনায় ভ্রমণ। দেবীকে উপস্থিত হতে তিনি মিনতি করেন; তারপর তার আগমনকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেন– তাকে দেখেন, শ্রবণ করেন; এবং তারপরে, কল্পনার এই প্রয়াসে বৃহত্তর আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে, তার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করেন। এখানে ম্যাজিক রূপান্তরিত হয়েছে শিল্পকলায়।

সংগীতের সঙ্গে কম ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে ইংরেজি কবিতায় সংগীত কাঠামোর এ –ধরনের সংরক্ষণের ঘটনা কেবল বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায় এবং সেজন্যে উদ্ভবের ব্যাপারে অনুৎসাহী সাহিত্য-সমালোচকেরা সেগুলোকে লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হন। তবু তারা সবাই শেক্সপিয়রের এই সনেটটির সঙ্গে পরিচিত যেটা গ্রিকসাহিত্যের যে কোনটির মতো ত্রিকাঠামো রূপের নিখুঁত একটি উদাহরণ।

When, in disgrace with fortune and men's eyes
I all alone beweep my outcast state,

www.pathagar.com

And trouble deaf heaven with my bootless cries,
    And look upon myself, and curse my fate,
Wishing me like to one more rich in hope,
    Featur'd like him, like him with friends possesst,
Desiring this man's art and that man's scope,
    With what I most enjoy contented least,
yet in these thoughts myself almost despising.
    Haply I think on thee, and then my state,
Like to the lark at break of day arising
    From sullen earth, sings hymns at heaven's gate;
For thy sweet love rememb'red such wealth brings
That then I scorn to change my state with kings.

শুধু একজন সমালোচক এই কবিতার কাঠামো ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি একজন সংগীত শাস্ত্রবিশারদ। [১৩] চৌদ্দ লাইনের মধ্যে, পৃথিবীর প্রতি তার মনোভাবকে কবি বিপ্লবী করেছেন। শুরুতে তিনি একজন ব্রাত্য, বধির দেবতার কাছে ক্রন্দনরত; সমাপ্তিতে একজন রাজা, স্বর্গের প্রবেশপথে স্তবগানে নিরত। এখানে বিপ্লবী মানসিকতা আবর্তিত হয় অবস্থা শব্দটিকে ঘিরে। শুরুতে এটা হতাশাকে সূচিত করে– একটি ছোট্ট চাবির মতো; কিন্তু যখন এটা ঘুরে আসে– এর সুর বদলে গেছে এবং আমরা সামনে নীত হয়ে সমাপ্তির বিজয় দুন্দুভিতে উপনীত হই।

পৃথিবীর প্রতি আমাদের মনোভাবে এখানে একটি বিপ্লব প্রকাশিত হয়েছে। কবিতার বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিশ্লেষণ করে– জাদুমন্ত্র, মৌসুমী গীত, কিট্‌সের ঐ সনেট পার হয়ে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে কবিতার মূল কাজ ছিল এটাই। কবিতার কাঠামো বিশ্লেষণ করেও আমরা অনুরূপ সিদ্ধান্তে হাজির হয়েছে।

৩. স্বতঃস্ফূর্ত রচনা ও অনুপ্রেরণা

কবিতা আমাদের কাছে প্রায়শ, প্রায়-কখনো স্বতঃস্ফূর্ত রচনা নয়। এটা কলম ও কাগজের ব্যাপার। বর্তমান কালে নিশ্চয়ই এমন কবি আছেন যাদের সুর আক্ষরিক অর্থেই অশ্রুত। এগুলো লিখিত হয় কবি দ্বারা, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, এবং স্বতন্ত্র ক্রেতা দ্বারা নীরবে পঠিত হয়। আমাদের কবিতা একটি লিখিত শিল্প, মুখের ভাষার তুলনায় অনেক দুরূহ; এবং দাবি করে উঁচু মাত্রায় সচেতন প্রয়াসের।

www.pathagar.com

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, আধুনিক কবিতার এসব বৈশিষ্ট্য নিতান্তই সাম্প্রতিক। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে, এমনকি এ কালের কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে, সাক্ষরতার দেয়াল দ্বারা কবি তাঁর দর্শক-শ্রোতা থেকে বিচ্ছিন্ন নন। তাঁর ভাষা, সাধারণ ভাষা থেকে পৃথক, কিন্তু এটাও মুখের ভাষা, তাঁর ও দর্শক-শ্রোতাদের জন্যে সাধারণ। অন্যদের চেয়ে তাঁর অনর্গল বলার ক্ষমতা আছে, কেননা তিনি সেটা বেশি অনুশীলন করেন। কিয়ৎপরিমাণে তাঁরা সবাই কবি। অধিকাংশ লোক কবিতায় রচয়িতার নাম না থাকার এটাই কারণ। দৈনন্দিন জীবন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্থিত হয়ে পরিবর্তিত হতে-হতে এটা মুখ থেকে মুখে, পিতামাতা থেকে পুত্র কন্যায় প্রবাহিত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত-না স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচনার ক্ষমতা হ্রাস পায় ততদিন পর্যন্ত তা চলতে থাকে। শুধু তখনই সেটা এক নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে এবং তখনও এর বিশিষ্ট লক্ষণ রক্ষিত থাকে। সেটাকে এই বলে আমরা বর্ণনা করি যে, শিল্পকলার দিক থেকে যতই নিখুঁত হোক-না কেন, সচেতন শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য তাতে অনুপস্থিত। এটাই ঠিক ঐ অভাব, যা এর মধ্যে অনুপস্থিত অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ছাপ। এ রকমটা হওয়া অনিবার্য কেননা এটা ব্যক্তিবিশেষের নয়, বরং একটি গোষ্ঠীর রচনা। মুখের ভাষা থেকে তার মাধ্যম-যে স্বতন্ত্র কিছু, আদিম কবি সে-সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না; এবং প্রকৃতপক্ষে আমরা যেমন দেখেছি, পার্থক্য ছিল কম। সে-জন্যই তিনি মুখে-মুখে রচনায় সক্ষম ছিলেন। তার মাধ্যমকে বস্তুনির্ভর করতে যত সক্ষম তিনি হন, মুখে-মুখে রচনার ক্ষমতা তত হ্রাস পায়; কিন্তু একই সময়ে, নিজস্ব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঐ-ক্ষমতাকে খাপ খাইয়ে নেবার শক্তি তিনি অর্জন করেন এবং এভাবে একজন সচেতন শিল্পীতে পরিণত হন।

অন্যদিকে কবিতার কার্যকারিতা বর্তমানেও হচ্ছে, অতীতেও যেমন ছিল, দৃষ্টিগ্রাহ্য জগত থেকে চেতনাকে কল্পনার জগতে নিয়ে আসা। মুখের ভাষার সঙ্গে তুলনায় আমরা দেখি যে কবিতার ভাষা অধিক ছন্দোময়, কল্পনাবিলাসী, মোহাচ্ছন্ন ও ঐন্দ্রজালিক। কিন্তু আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি যেসব উপাদান মিলে আমাদের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানবিকতা গড়ে তোলে, তার সবগুলোই আমাদের সচেতন জীবনে ক্রিয়াশীল; ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য এখানে তাদের সর্বোচ্চ মাত্রায় বিরাজিত। সেজন্যে, সচেতন জীবনের মানসিক প্রক্রিয়া যেমন ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সর্বাধিক বৈচিত্র্যের দ্যোতনা করে, অনুরূপভাবে, তাদের বাহক মুখের ভাষা ব্যক্তিগত প্রকাশভঙ্গির সর্বাধিক স্বাধীনতা দ্বারা চিহ্নিত। কিন্তু দৃশ্যমান জগত থেকে ছুটি নিয়ে যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি ও স্বপ্ন দেখি, তখন আমাদের ব্যক্তিত্ব সুপ্ত হয় এবং আমাদের সচেতন জীবনে সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ অথচ সবার মধ্যে লভ্য মৌলিক প্রবণতা ও আকাঙ্ক্ষাকে স্বাধীন বিচরণ-ক্ষমতা দেয়। আমাদের স্বপ্নের জগত কম ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত, জাগ্রত জীবনের তুলনায় অধিকতর পরস্পর-সদৃশ।

www.pathagar.com

কবিতা এক ধরনের স্বপ্নজগত। ইয়েট্‌স থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে– ছন্দের লক্ষ্য হচ্ছে ধ্যানের মুহূর্তটিকে দীর্ঘায়িত করা, যে মুহূর্তটিতে আমরা একই সঙ্গে নিদ্রিত ও জাগ্রত এবং যা সৃষ্টি-সম্ভব মুহূর্ত; ছন্দ তার বৈচিত্র্যের দ্বারা আমাদের জাগিয়ে রাখে। এটা করে সম্ভবত-প্রকৃত-সমাধিমগ্ন অবস্থায় আমাদেরকে রাখার জন্যে যে অবস্থায় ইচ্ছার চাপমুক্ত মানুষের মন প্রতীকের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়।

[১৪]

'মুক্ত' শব্দটি নিয়ে হয়তো কারো আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু সেটা বর্তমানে বিবেচ্য নয়। কবিতার ভাষা ছন্দোময় হওয়ার কারণে মোহমুগ্ধ করে। কিন্তু এমন মোহাচ্ছন্ন করে না যাতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। কোন ভাষার 'মাত্রা' বিশ্লেষণ করলে আমরা তার মধ্যে একঘেয়েমী ও বৈচিত্র্যের পছন্দ ও অপছন্দের এমন সমন্বয় লক্ষ্য করব যা ইয়েটস দেখিছিলেন, এটাই কল্পনার জগতে সুপ্তি ও জাগৃতির মধ্যে ধৃত কবিতার বিশেষ আবেশ।

এবং এজন্যে, যখন আমরা বলি, একজন কবি অনুপ্রাণিত, তখন আমরা বোঝাই যে, কল্পনার এই অবচেতন জগতে অন্যদের চেয়ে তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তিনি মানসিক বিযুক্তির দিকে ব্যতিক্রমী ঝোঁকসম্পন্ন। এই প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর অন্তঃস্থ-দ্বন্দ্বসমূহের– সমাজের প্রতি তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়– নির্গমন ও নিরসন ঘটে। বাস্তবতার বিবাদসমূহ মীমাংসিত হয় কল্পনায়। কিন্তু আমাদের যে জগতে তিনি বাস করেন সেটা তার সহযোগী মানুষদের কাছে সাধারণ বিধায় যে কবিতায় তিনি তাঁর বাস্তবতা বিষয়ক অভিমতকে ধারণ করেন, সেটা এমন এক সাধারণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যা তাঁর সহযোগীরা অনুভব করে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। এভাবে সবাইকে কল্পিত সহানুভূতির ঘনিষ্ঠ বন্ধনে তিনি টেনে নেন।

'যখন লোক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকে, তখন একজন দেবতাই আমাকে বলার সুযোগ দেয় কি যন্ত্রণা আমি ভোগ করছি'। [১৫]

যা তারা ব্যখ্যা করতে ও প্রকাশ করতে পারে না। সে ধরনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার দ্বারা তাঁর সহযোগীরা নির্যাতিত। তিনি নিজেও সেগুলোকে ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ, কিন্তু অনুপ্রাণতার ঐ ক্ষমতাকে ধন্যবাদ দেই যে, এর কারণে তিনি সেগুলোকে অন্তত প্রকাশ করতে পারেন। এবং যখন তিনি সেগুলোকে প্রকাশ করেন, তারা সে আকাঙ্ক্ষাসমূহকে নিজের বলে চিনতে পারে। তাঁর কবিতা শুনতে শুনতে তারা অনুরূপ অভিজ্ঞতা পরিক্রমা করে, যা কবি রচনাকালে পেয়েছিলেন। তারা কল্পনার একই জগতে নীত হয় এবং একই মুক্তি উপলব্ধি করে।

www.pathagar.com

দলপতি কর্তৃক পরিচালিত অনুকরণ নৃত্যে আদিম শিকারীরা সাফল্যজনক শিকারের অনুষ্ঠানকে আগেই অভিনয় করে এবং ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বাস্তবতার ওপর মায়ামোহকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেদের দুর্বলতাকে কিয়ৎপরিমাণে জয় করতে তারা সমর্থ হয়। যখন নাচ শেষ হয়, প্রকৃতপক্ষে পূর্বের চেয়ে ভাল শিকারিতে তারা পরিণত হয়েছে। কবিতার মধ্যে উচ্চতর পর্যায়ে একই প্রক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করি। সভ্য মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সক্ষম হয়েছে কিন্তু এর দ্বারা তার সমাজ-সম্পর্ক শুধু জটিল হয়েছে। আদিম সমাজ ছিল সরল, শ্রেণীহীন, প্রকৃতির বিরুদ্ধে দুর্বল হলেও সম্মিলিতভাবে দণ্ডায়মান। সভ্য সমাজ জটিলতর, সমৃদ্ধতর, অধিকতর শক্তিশালী, কিন্তু এর একটি অনিবার্য শর্ত হলো যে– সে সবসময় নিজের বিরুদ্ধে বিভক্ত রয়ে আছে। এ জন্যে ম্যাজিকের ভিত্তি সমাজ ও প্রকৃতির বৈরিতা, আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে কবিতার ভিত্তি ব্যক্তি ও সমাজের বৈরিতা দ্বারা। নৃত্য দলের অধিপতি তার সহযোগী আদিম লোকদের জন্যে যা করেন, সে কাজ কবি করেন আমাদের জন্যে।

আদিম কবি এককভাবে কাজ করেন না। তার দর্শক-শ্রোতারা তার সঙ্গে সহযোগিতা করে। শ্রোতৃবর্গের উদ্দীপনা ব্যতীত তিনি মোটেই কাজ করতে পারেন না। তিনি লিখেন না, তিনি আবৃত্তি করেন। তিনি রচনা করেন না, তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে যান। যে-মুহূর্তে তিনি অনুপ্রাণিত হন, তার শ্রোতাদের মনে সেটা তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর সৃষ্টি করে। সেই মায়ার কাছে তারা তাৎক্ষণিকভাবে ও সম্পূর্ণ হৃদয় নিয়ে আত্মসমর্পণ করে। এই পরিস্থিতিতে কবিতা নির্মাণ একটি সম্মিলিত সামাজিক কর্ম।

যখন আমরা কবিতা পড়ি বা আবৃত্তি শুনি, আমরা গভীরভাবে অভিভূত হলেও প্রায়শ পুরোপুরি 'ভেসে যাই না।' আদিম জাতির শ্রোতৃবর্গের প্রতিক্রিয়া কম উর্ধপাতিত। দলের সব লোক সৃষ্ট-বলে বিশ্বাস্য জগতে নিজেদের নিক্ষেপ করে : তারা নিজেদের ভুলে যায়। আয়ারল্যান্ডের পশ্চিমাঞ্চলে আমি এটা বহুবার দেখেছি। অথবা শুনুন ওনেগা হ্রদের একটি দ্বীপের কুটিরে রুশ চারণ কবির আবৃত্তি সম্পর্কিত এই বিবরণটি :

উতকা কাশি দিল। সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেল। তিনি তার মাথা পেছনে হেলালেন এবং মৃধু হাসির সঙ্গে চারপাশে তাকালেন। তাদের অধীর আগ্রহ দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ গাইতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে বৃদ্ধ গায়কের মুখমণ্ডল বদলে গেল। তাঁর সমস্ত ধূর্ততা তিরোহিত হলো। এটা শিশুসুলভ, সরল রূপ ধারণ করল। ওখানে চোখগুলো বিস্তৃত হলো ও জ্বলতে লাগল। দুটো ছোট অশ্রুবিন্দু তাতে ঝলমল করে উঠল এবং শ্যামল কপোলে রক্তিমাভা বিস্তৃত হলো। দুর্বল গলা হঠাৎ কেঁপে গেল। তিরিশ বছর

ধরে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী মুরোনের ইলিয়ার সঙ্গে তিনি বেদনার্ত হলেন, ডাকাত সোলোডেইর বিরুদ্ধে তার বিজয়ের সঙ্গে গৌরবান্বিত হলেন। উপস্থাপিত ব্যালাডের নায়কের সঙ্গে উপস্থিত সকলে সহবাসী হলো। কখনো বিস্ময়ের একটি চিৎকার একজনের কাছ থেকে বেরিয়ে এলো, বা অন্য একজনের হাস্যধ্বনি ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। অন্য একজনের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল এবং সে সেটা অনিচ্ছুক হাতে মুছে নিল। যতক্ষণ চলছিল, তারা অপলক চোখে বসে রইল। এই একঘেয়ে কিন্তু বিস্ময়করভাবে মৃদু সুরের প্রতিটি তরঙ্গ তারা ভালবেসেছিল। [১৬]

লোকগুলো ছিল নিরক্ষর, তবু তাদের কাছে কবিতার কিছু তাৎপর্য ছিল; যা আজকের দিনে ইংরেজদের কাছে নেই। সত্য বটে আমরা শেক্সপিয়র ও কীটসকে জন্ম দিয়েছি, এবং তারা উতকার চেয়ে বড় ছিলেন। কিন্তু উতকা ছিল জনপ্রিয়; সেটা আমাদের দেশে বর্তমানে শেক্সপিয়র বা কিটস সম্বন্ধে যা বলা যায়, তার চেয়ে বেশি।

এবার রাশিয়া থেকে মধ্য এশিয়ার দিকে যাওয়া যাক এবং দেখা যাক ষাট বছর আগে তুর্কমেনরা কিভাবে তাদের কবিতা শুনত :

আমি যখন ইতরেক-এ ছিলাম, আমাদের পাশেই ছিল এরকমের একজন চারণ কবির তাঁবু। এক সন্ধ্যায় তিনি তার যন্ত্রসহ আমাদের তাঁবুতে সাক্ষাৎ করতে এলে আশপাশের যুবক ছেলেরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল, যাদের তিনি তাঁর বীরত্ব গাথা শুনিয়ে আনন্দ দিতে বাধ্য ছিলেন। তার গানে ছিল জোর করা কণ্ঠধ্বনি, গানের তুলনায় ঘর্ঘর আওয়াজ বেশি এবং প্রথম দিকে গীত হতো যন্ত্রের তারে মৃদু স্পর্শ সহযোগে। কিন্তু তিনি যত বেশি উত্তেজিত হলেন, স্পর্শগুলো ততো বন্য হয়ে উঠল যুদ্ধ যত বেশি তীব্র, গায়ক ও যুবক শ্রোতাদের উৎসাহ তত বেশি জঙ্গি; বলতে কি দৃশ্যটি একটি রোমান্সের রূপ নিল– যুবক যাযাবরেরা গভীর আর্তনাদ করে তাদের টুপিগুলো শূন্যে নিক্ষেপ করল এবং তাদের হাতগুলো বাতাসের মধ্যে এমন আবেগে ছুড়ে দিল যে, যেন তারা নিজেদের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। [১৭]

এই তুর্কমেনরা, কবি ও শ্রোতা সবাই, আক্ষরিক অর্থেই অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।

প্রাচীনাকাল থেকে উদাহরণ টানতে গিয়ে অ্যাটিলার দরবারে উপস্থিত একজন বাইজেন্টাইন লেখকের ঘটনাটিকে স্মরণ করতে পারি :

যখন অন্ধকার নামল, টর্চ জ্বালানো হলো এবং দুজন হুন অ্যাটিলার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তার বিজয় গৌরব ও যুদ্ধদক্ষতা সম্পর্কে গান শুরু করল। ভোজে আগত ব্যক্তিরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করল গায়কদের ওপর, কেউ কেউ আনন্দে মত্ত, অন্যেরা যুদ্ধের কথা স্মরণ করে ভীষণভাবে উত্তেজিত, আর বৃদ্ধ বয়সের জন্যে যার নিষ্ক্রিয়তার

www.pathagar.com

শিকার তাদের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল।

এটাই ঐ প্রসঙ্গ, যে পটভূমিতে আমাদের ইলিয়াড ও ওডেসি পাঠ করতে হবে। প্রাচীন গ্রীকরা কিভাবে হোমারের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাত? কালবিলম্ব না-করে আমরা ধারণা করে নেই যে, তারা আমাদের মতই আচরণ করত, কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। প্লেটোর একটি সংলাপে একজন হোমারীয় চারণকবি তার নিজের ওপর ও শ্রোতাদের ওপর তাঁর আবৃত্তির প্রভাব বর্ণনা করেছেন :

> যখন আমি কোন দুঃখজনক ঘটনা বর্ণনা করতে থাকি, আমার চোখ জলে ভরে আসে, যখন কোন ভয়ানক বা আশ্চর্য প্রসঙ্গ আসে আমার চুল খাঁড়া হয় ও হৃদয় স্পন্দিত হয় এবং যখনই উচ্চ মঞ্চ থেকে আমি তাকাই, শব্দাবলী শ্রবণের সঙ্গে-সঙ্গে উদ্বেলিত চোখে বন্যদৃষ্টি বিশিষ্ট শ্রোতাদের আমি কাঁদতে দেখি।

যখন এ কবিদের তাদের শিল্পকলার প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা সবই একই জবাব দেয়। ভগবানের নিশ্বাস দ্বারা পূর্ণ হয়ে আক্ষরিক অর্থেই অনুপ্রাণিত হয়েছে তারা দাবি করে।

> কিরঘিজ জাতির একজন দক্ষ চারণকবি পূর্বপ্রস্তুতি ব্যতিরেকে আবৃত্তি করতে পারে তার ইচ্ছামাফিক যে কোন বিষয়, তার আকাঙ্ক্ষানুযায়ী যে-কোন গল্প, যদি শুধু ঘটনাপ্রবাহের ক্রম তার কাছে স্পষ্ট থাকে। যখন আমি তাদের সবচেয়ে নিপুণ একজন চারণকবিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এই গানটি বা ওই গানটি গাইতে পারেন, তিনি উত্তর করলেন আমি যে কোন গান গাইতে পারি, কেননা গান গাইবার এই শক্তি ভগবান আমার হৃদয়ে প্রোথিত করে দিয়েছেন। আমি চাওয়ার আগেই তিনি আমার জিভে শব্দগুলো দিয়ে দেন। আমার কোন গান আমি শিখিনি। সবগুলো আমার অন্তঃস্থ সত্তা থেকে উৎসারিত হয়।

আমরা স্মরণ করতে পারি ক্যাডমোন এর কথা, যিনি স্বপ্নে আগত দেবতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; হেসিওডের কথা, যিনি হেলিকনে মেষ চড়াবার সময় বাগ্‌দেবী কর্তৃক শিক্ষা পেয়েছিলেন ইথাকা ও প্যাসিয়ার দুজন চারণকবি প্যামিউজ এবং ডেমোডোকোজ এর কথা মনে পড়বে এ প্রসঙ্গে– প্রামিউজ বলতেন আমি নিজের চেষ্টায় শিক্ষিত হয়েছি। কারণ সকল প্রকার গানের বীজ ভগবান আমার মধ্যে বপন করে দিয়েছেন।

সব জায়গায় আদিম জাতির লোকেরা কবিকে নবী বলে মনে করে, যিনি দেবতা দ্বারা অনুপ্রাণিত বা অধিকৃত হয়ে দেবতার কণ্ঠে কথা বলেন। প্রাচীন গ্রিকদের কাছে ভবিষ্যৎ বলা (mantike) ও পাগলামী করা (mani) যে সম্পর্কযুক্ত ছিল, শব্দ দুটো থেকে তা

www.pathagar.com

বোঝা যায়। তাদের কাছে কবিতা ও ভবিষ্যদ্বানীর ঐন্দ্রজালিক উৎপত্তি ছিল স্বতঃপ্রকাশিত, কেননা এ-দুটোর লক্ষণ তাদেরকে ডাইনোসিয়াসের সম্প্রদায়ের মধ্যে সংরক্ষিত রাত্রিকালীন তাণ্ডব নৃত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়

> সব বড় মহাকবিই শুধু শিল্পের কলাকৌশলের দ্বারা শিল্প রচনায় সক্ষম হন না, বরং তারা দেবতাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত বা অধিকৃত হন। গীতি কবিদের বেলায়ও একই কথা বলা যায়। রচনাকার্যে নিয়োজিত থাকার সময়ে তারা নৃত্যরত কোরিবানটিসদের চেয়ে বেশি প্রকৃতিস্থ থাকে না। যখনই তারা ছন্দ গ্রন্থনে বা ঐকতান সৃষ্টিতে নিয়োজিত হয়, তারা গ্রিকদের মদের দেবতা ব্যাকাসের পূজারীর মতো ভুলো মন বা ভূতে-পাওয়ার মতো হয়ে যান, যারা পাগলামীর অবস্থায় স্রোতস্বিনী থেকে দুগ্ধ বা মধু আহরণ করত। [১৮]

ধর্মের এসব ভক্তরা সঙ্গীতের প্রভাবে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ত– যেটাকে এই বলে ব্যাখ্যা করা হতো যে, তারা ছিলেন entheoi, 'অর্থাৎ তাদের মধ্যে একজন দেবতা' বিরাজ করছে। এ পর্যায়ে আমরা আর শিল্পকলার কথা বলতে পারছি না। আমরা এর শেকড় দেখতে পাচ্ছি না ম্যাজিকের ভেতর।

অনুপ্রেরণা লাভ করা ও অধিকারে যাওয়া একই জিনিস। আদিম সমাজে চেতনার অবলুপ্তি ও খিঁচুনি বিশিষ্ট মানসিক বৈকল্যকে দেবতার বা পশুর আছর করা, পূর্ব-পুরুষের আত্মায় পাওয়া বলে গণ্য করা হতো। অনুকরণ নৃত্যের উল্লাস থেকে ধারণাটি আসে– যেখানে নর্তকেরা তাদের টোটেম প্রাণীর ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করার মধ্য দিয়া নিজেদের সম্পর্কে চেতনা হারায়– ঐ নৃত্যের মাধ্যমে জাগ্রত ঊর্ধ্বায়িত সাধারণ সত্তার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয় ঐ-প্রাণীটি।

হিস্টিরিয়া একটি মানসিক ব্যাধি– ব্যক্তি ও তার পরিবেশের মধ্যকার দ্বন্দ্বের এক ধরনের পরিণতি, যা অবচেতন সত্তার দ্বন্দ্বের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সেটা সাধারণ রোগ– এই জন্যে নয় যে, উক্ত দ্বন্দ্বের প্রবণতা আমাদের চেয়ে তাদের মধ্যে বেশি, বরং তাদের চেতনা অগভীর ও কম স্থিতিস্থাপক হওয়ার কারণে সেটা হয়। ম্যাজিকের সাহায্যে এর চিকিৎসা হয়। প্রথম লক্ষণ যখন প্রকাশিত হয়, রোগীর কাছে একটা গান গাওয়া হয়। এর ফলে মানসিক বিযুক্তির সুবিধা ঘটে এবং হঠাৎ ফিট হয়ে পড়া ত্বরান্বিত হয়। তাহলে, এখানে বিশুদ্ধ ম্যাজিকের পর্যায়ে আমরা কবিতাকে পাচ্ছি বা একেবারে কবিতা নয় বরং এক ধরনের রোগ নিরাময়কারী ম্যাজিক, যার মধ্য থেকে কবিতার উদ্ভব ঘটেছে। কারণ ম্যাজিকও চেতনাপ্রবাহের এক ধরনের বিদ্রোহ এবং একই উপায়ে তার চিকিৎসা হয়। পার্থক্য হলো এই যে, অনুকরণ নৃত্য হিস্টিরিয়ার জজবা

www.pathagar.com

সংঘবদ্ধভাবে জাগিয়ে তোলা হয়- এটা হলো গণহিস্টিরিয়া; আর ব্যক্তিগত ভূতে পাওয়া হলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু উভয়ের চিকিৎসা মূলত অভিন্ন। রোগীর ওপর আছর করা ভূতকে তাড়ানো হয়। আছর করা দুষ্ট আত্মাকে ডেকে আনা হয় এবং গানের ইন্দ্রজালের সাহায্যে বিতাড়িত করা হয়। চিকিৎসা পরিচালনা করেন যে ওঝা, শামান, ঔষধের লোক, বা, ভূতের ডাক্তার প্রভৃতি নামে যিনি কথিত, তিনিও সাধারণত একজন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত লোক। তিনি বিশেষ শিক্ষায় প্রশিক্ষিত। সুতরাং ওঝা ও রোগীর সম্পর্ক অনুকরণ নৃত্যের দলপতি ও তার অনুসারীদের সম্পর্কের অনুসারীদের সম্পর্কের অনুরূপ।

ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা ভূতে পাওয়ার বিকশিত রূপ। কোন রোগীকে ভূত ছাড়ানোর সবচেয়ে সাধারণ শর্ত হলো ভর করা ভূতকে নিজের নাম বলতে বাধ্য করা; এবং প্রায়ই নাম বলার পর শিকারকে ছেড়ে যাওয়ার প্রতিদানে তাকে প্রসন্ন করে দেবার দাবি সে করে। এভাবে প্রক্রিয়াটি দেবতার ইচ্ছা-ঘোষণায় ও সে জন্যে ভবিষ্যৎ-বলার মধ্যে পর্যবসিত হয়। হিস্টিরিয়ার আক্রমণ ভবিষ্যৎ বলার ধ্যান-সমাধির রূপ পরিগ্রহ করে। এখানে রোগী, আধুনিক আধ্যাত্মিক পরিভাষায়, মাধ্যমে পরিণত হয়, যে মাধ্যম দেবতা বা আত্মার কণ্ঠের প্রকাশক। এ অবস্থায় সে প্রকাশ করে ভয়, আশা ও ভবিষ্যতের ছায়াকে- সচেতন অবস্থায় যেগুলো সম্পর্কে সে অজ্ঞ থাকে। আমরা এখানো বলি আসন্ন ঘটনা আগেভাগেই তাদের ছায়া ফেলে। সেগুলো আমাদের অবচেতন মনে প্রবিষ্ট হয়ে এক অনির্দেশ্য আন্দোলন জাগায়; আর নবীর মধ্যে, অস্বাভাবিকরূপে সক্রিয় হওয়ার কারণে যার অবচেতন মন সর্বক্ষণ বিস্ফোরণোন্মুখ থাকে সেগুলো প্রকাশিত হয়।

এবং শেষপর্যন্ত, নবী একজন কবিতে পরিণত হন। আদিম চিন্তায় ভবিষ্যৎ বলা ও কবিতা-রচনার মধ্যে কোন স্পষ্ট বিভাজন রেখা নেই। হোমারের কবিতায় বর্ণিত চারণ কবিরা দ্বিতীয় দ্রষ্টা বলে কীর্তিত ও তাদের ব্যক্তিসত্তা অতি পবিত্র বলে বিবেচিত হতো। ভাবাবেশের ঊর্ধ্বায়নে কবি নবীতে পরিণত হন। ভাবোন্মত্ততার দৈহিক তীব্রতা কমে গেছে, কিন্তু তবু এটা ভবোন্মত্ততাই। তার মানসিকতা কল্পচিন্তার খাদে স্থান লাভ করে- যে-অবস্থায় তার অবচেতন মন সংগ্রাম করে ও আকাঙ্ক্ষাসমূহ নির্গমনের পথ খুঁজে পায়। এবং যেমন নবীর ভবিষ্যদ্ববাণী ঠিক সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা দাবি করে, তেমনিভাবে কবির সকল হৃদয়কে মথিত করে।

এভাবে, কডওয়েলের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়ে, শিল্পকলার মূল প্রকৃতি নিরূপণে আমরা সমর্থ হই।

শিল্পকলা মানুষের চেতনা প্রবাহের আবেগের দিকটি পরিবর্তিত করে, যাতে সে সূক্ষ্মতরভাবে ও গভীরভাবে পৃথিবীর ওপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে। অন্তর্বাস্তবতায়

www.pathagar.com

এই অনুপ্রবেশ, যেহেতু সংঘবদ্ধ মানুষের দ্বারা এটা অর্জিত হয় এবং একক মানুষের অর্জনের ক্ষমতাবহির্ভূত জটিলতা তাতে রয়েছে, সেটা একই সঙ্গে তার সহযোগী মানুষের হৃদয়কে উন্মোচিত করে এবং সমাজের সমগ্র সম্প্রদায় অনুভূতি জটিলতার নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়। অর্থনৈতিক উৎপাদনের দ্বারা অর্জিত বস্তুগত সংঠনের নতুন পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এটা মানুষে-মানুষে সচেতন সহানুভূতি, সমঝোতা ও সহমর্মিতার নতুন স্তরকে সম্ভবপর করে তোলে। ঠিক যেমন করে উপজাতীয় নৃত্যের ছন্দদোলার অন্তর্মুখীনতা দ্বারা, তার সহযোগীদের সঙ্গে চক্ষুগ্রাহ্য জগতে নয়, বরং প্রবৃত্তিনির্ভর ও রক্ততাপিত ছন্দোময় জগতে অংশভাগী হবার জন্যে একেকজন নৃত্যশিল্পী নিজের হৃদয়ে, নিজের স্বভাবের ঝর্ণাধারায় আশ্রয় নেয়; তেমনিভাবে আজকের দিনে শিল্পকলার প্রবৃত্তিগত অহং হচ্ছে এমন ধরনের সাধারণ মানবসত্তা, সহযোগী মানুষের সংস্পর্শে আসার হন্যে যাঁর ভেতরে আমরা আশ্রয় নেই। [১৯]

অনুপ্রেরণার অপর একটি দিক আছে যার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠিক যেমন দীর্ঘকাল ধারে জাদুবিদ্যা ছিল মেয়েদের বিশেষ জগত, তেমনিভাবে আমরা দেখি যে, পৃথিবীর সর্বত্র ভবিষ্যৎ-বলার ক্ষমতা ও কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা বিশেষ করে মেয়েদের অধিকারে আছে। এই প্রমাণটি আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এ কারণে যে, আদিম জীবনযাত্রায় তাদের ভূমিকা পুরুষের মতো এত ভালভাবে দলিলবদ্ধ হয়নি। এ বিষয়ে আমি আর এখানে বিস্তৃত করতে যাচ্ছি না। বুচার, ব্রিফল্ট এবং শাদউইক– এদের রচনায় পাঠক সেটা পাবেন। একজন কবির কল্পনার চেয়েও এটা অতিরিক্ত কিছু ছিল, যা হোমার ও হেসিওডেকে নারী দেবতার সাহায্যযাঞ্চায় উৎসাহিত করেছিল। সংগীতের উদ্ভবে নারীদের ভূমিকায় স্মৃতি মিউজিক শব্দটির মধ্যে নিহিত আছে।

তথ্য নির্দেশ

১। G. Elliot Smith, Evolution of Man (Oxford, 1924), PP. 17-46; G. Clark, From Savagery to Civilization, (Central Books, 1946), pp. 1-6.

২। I, Schapera, The Bantu-Speaking Tribes of South Africa (1937), pp. 282-3, 286, 401-2.

৩। H. A. Junod, The Life of a South African Tribe (1927ed.) II, pp. 196-7,

www.pathagar.com

৪। Malinowski, Coral Gardens and their Magic (1935), II, pp. 236-7.

৫। J. Layard, The stone men of Malekula (1942), p.142.

৬। K. Jackson, Early Celtic Nature Poetry (Cambridge, (1935), p. 170.

৭। H. M. Chadwick, The Growth of Literature (Cambridge,1932-40), III, p, 783.

৮। Junod, South African Tribe. II, p. 284.

৯। J. C. Anderson, Maori life in Ao-tea (Wellington, N.Z. 1907), p. 373.

১০। R. F. Burton, The Lake Regions of Central Africa (1860), pp. 361—2.

১১। F. B. Gummere, Old English Ballads (Boston, 1894), PP. 169, 263.

১২। Entwhistle, European Balladry (Oxford, 1939), P. 35.

১৩। W. H. Hadow. A Comparison of Poetry and Music (Cambridge, 1926), PP. 10-12

১৪। W. B. Yeats, Essays (1924), pp. 195-6.

১৫। Goethe, Tasso, II. 3432-3.

১৬। Quoted in Chadwick, the Growth of literature, II, P. 241.

১৭। A. Vaubery, Travels in Central Asia, (1864). P, 322.

১৮। Plato, 1. No. 535.

১৯। C. Caud well, Illusion and Reality (1946. ed.) P. 155.

www.pathagar.com

শিল্পকলার ভূমিকা

[তৎকালীন অস্ট্রিয়ার কোমোটাউ অঞ্চলের এক সৈনিক পরিবারে ১৮৯৯ সালে ফিশার জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধ যুদ্ধে করেছেন। মূলত ছিলেন দর্শনের ছাত্র ও সাংবাদিকতার অনুরাগী। কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ১৯৩৪ সালে। ১৯৪৫ সালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে, অস্ট্রিয়ায় অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠায় অংশ নেন। কিছু সময় ওই সরকারের শিক্ষামন্ত্রীও ছিলেন। ১৯৫৯ সালের পর থেকে সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই বছরই প্রকাশিত হয় শিল্প-সমালোচনামূলক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Necessity of Art। মার্কসবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত এই বইয়ে তিনি কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেছেন— কেন শিল্পী বিশেষ পদ্ধতিতে আঁকেন, উপন্যাসবিচারের মাপকাঠি কি হবে, বা শিল্পকলাই বা কি? জার্মান ভাষায় রচিত উক্ত পুস্তকটি প্রকাশের পর থেকে ইউরোপে কৌতূহলী বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ১৯৬৩ সালে এটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধটি তারই প্রথম অধ্যায়।]

'কবিতা অপরিহার্য—যদি আমি শুধু জানতাম কি কারণে।' এই চমৎকার আত্মবিরোধী সুভাষণের সাহায্যে জন ককটিউ শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তার সার সংক্ষেপ করেছেন— একই সঙ্গে তুলে ধরেছেন অন্ত্য বুর্জোয়া যুগে এর সন্দেহজনক ভূমিকাও।

শিল্পের সম্ভাব্য 'অবলুপ্তির' কথা বলেছেন চিত্রকর মন্ডারিন। বাস্তবতা, তিনি বিশ্বাস করতেন, ক্রমবর্ধমান হারে স্থান দখল করে নেবে শিল্পকর্মের— যেটা তার মতে বাস্তবতার মধ্যে বর্তমানে অনুপস্থিত ভারসাম্যের একটি প্রয়োজনীয় বিকল্প। 'জীবনের অধিকতর ভারসাম্য অর্জনের সঙ্গে শিল্প বিলুপ্ত হবে।'

শিল্পকলা 'জীবনের বিকল্প', মানুষকে পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে ভারসাম্যের অবস্থায় স্থাপনের জন্য শিল্পকলা একটি মাধ্যম– এই ধারণাসমূহের মধ্যে নিহিত রয়েছে শিল্পকলার প্রকৃতি ও তার প্রয়োজনীয়তার আংশিক স্বীকৃতির কথা। এবং যেহেতু পরিবেশের সঙ্গে মানুষের স্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থা সর্বাধিক উন্নত সমাজেও কল্পনা করা যায় না, সে জন্যে এই ধারণা আমাদের জানিয়ে দেয় যে, পুরা কালেই শুধু প্রয়োজনীয় ছিল এমন নয়, ভাবীকালেও শিল্পের অনুরূপ প্রয়োজনীয়তা থাকবে।

তথাপি, শিল্পকলা কি বিকল্পের অতিরিক্ত কিছু নয়? এটা কি মানুষ ও পৃথিবীর মধ্যে গভীরতর সম্পর্ক প্রকাশ করে না? আসলে প্রকৃতই কি শিল্পের ভূমিকা একটি মাত্র সূত্রে

www.pathagar.com

সংক্ষেপ করা সম্ভব? একে কি বহু ও বিচিত্র প্রয়োজনীয়তা মেটাতে হয় না? এবং শিল্পকলার উৎপত্তি সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে আদিতে এর ভূমিকা-সম্পর্কে যদি আমরা অবহিত হই, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে ঐ ভূমিকারও কি পরিবর্তন হয়নি কিংবা নতুন ভূমিকা তার পরে যুক্ত হয়নি?– সেটা জানতেও আগ্রহ জাগে।

এসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা হয়েছে বর্তমান বইয়ে। আমরা এ মতে বিশ্বাসী যে, অতীত, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সব সময় শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ছিল, আছে এবং থাকবে।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অবশ্য অনুধাবন করতে হবে যে, একটি বিস্ময়কর ব্যাপারকে অতি সহজভাবে নেবার প্রবণতা আমাদের রয়েছে। এবং এটা নিশ্চিতভাবে বিস্ময়কর : লক্ষ লক্ষ লোক বই পড়ে, থিয়েটার দেখে, সিনেমায় যায়। এর কারণ কি? যদি বলা হয় যে, তারা বিক্ষিপ্তি, বিনোদন ও মনোরঞ্জন চায়, তাহলে উত্তরকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। কেন অপর একজনের জীবন ও জটিলতায় নিজেকে নিমজ্জিত করা, নিজেকে একটি চিত্রকর্ম, সংগীতাংশ অথবা, উপন্যাস, নাটক বা চলচ্চিত্রের পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে একাত্ম অনুভব করা বিক্ষিপ্তি, মনোরঞ্জক ও আমোদজনক? কেন আমরা এ ধরনের 'অবাস্তবতাকে' বাস্তবতার তীব্রতা মনে করে সাড়া দেই, এটা কী ধরনের অদ্ভুত, রহস্যময় বিনোদন? এবং যদি কেউ উত্তর দেন যে, একটি অসন্তুষ্ট অস্তিত্ব থেকে সমৃদ্ধ অস্তিত্বে ও ঝুঁকিবিহীন অভিজ্ঞতায় আমরা আশ্রয় নিতে চাই, তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন দাঁড়ায়, কেনইবা আমাদের অতৃপ্ত জীবনকে অন্যদের চরিত্র ও কাঠামোর মাধ্যমে তৃপ্ত করার আকাঙ্ক্ষা, কেনইবা মিলনায়তনের অন্ধকার থেকে আলোকোজ্জ্বল মঞ্চের দিকে নিবিষ্ট চিত্রে তাকিয়ে থাকা, যেখানে শুধু অভিনয়ের আতসবাজি চলছে?

স্পষ্টত, মানুষ তার একান্ত নিজত্বকে অতিক্রম করে আরো বেশি হতে চায়। সে হতে চায় একজন সমগ্র মানুষ। আলাদা ব্যক্তিবিশেষ হয়েই সে সন্তুষ্ট নয়; ব্যক্তিগত জীবনের আংশিকতা অতিক্রম করে অনুবেদ্য ও অভীপ্সিত 'পূর্ণ জীবনের' সে অভিসারী, যে-পূর্ণতার নামে খণ্ড জীবন তাকে নিয়ত ছলনা করে চলছে; অধিকতর বোধগম্য ও ন্যায়পরায়ণ এমন জগতের সে অভিলাষী, যে-জগত অর্থহীন নয়। সে বিদ্রোহ করে স্বীয় জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করার, নিজেদের ব্যক্তিত্বকে ভঙ্গুর, নিয়তিনির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ করার বিরুদ্ধে। অহং-বহির্ভূত কিন্তু তার চেয়ে বৃহত্তর ও নিজের কাছে প্রয়োজনীয় এমন কিছুর সঙ্গে সংলগ্ন হতে সে প্রত্যাশী। তার আকাঙ্ক্ষা অনুসন্ধিৎসু, বিশ্বগ্রাসী অহংকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরতম নক্ষত্রজগত ও গভীরতম অণুপরমাণুর রহস্যালোক পর্যন্ত প্রসারিত করায়, আমিত্বকে গোষ্ঠীর অস্তিত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকে সামাজিক করে নিতে।

www.pathagar.com

যদি মানুষের প্রকৃতি হতো যে, সে-একজন ব্যক্তির অতিরিক্ত কিছু হবে না, তাহলে এই আকাঙ্ক্ষা হতো অবোধ্য ও অর্থহীন, কারণ একজন ব্যক্তিরূপেই সে তাহলে হতো পরিপূর্ণ; তার পক্ষে যা হওয়া সম্ভবপর ছিল, সে তার পুরোই হতো। বৃহত্তর হবার ও অন্যের অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেই, যা কালক্রমে তার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হবে, সে কেবল পূর্ণতা লাভ করতে পারে। তবু একজন মানুষ যাকে নিজের সম্ভাবনা বলে বলে মনে করে, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সমগ্র মানবসমাজের অগ্রগতির ক্ষমতা। শিল্প হচ্ছে সমগ্রের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের নিমজ্জিত হবার অপরিহার্য মাধ্যম। এর মধ্যে প্রতিফলিত হয় অভিজ্ঞতা ও চিন্তার অংশভাগী হবার ও মিলনের অন্তহীন ক্ষমতা।

কিন্তু তবু : শিল্পকলার এই-যে সংজ্ঞা— সমগ্র বাস্তবতার সঙ্গে একাত্ম হবার উপায়, ব্যষ্টির বিরাট বিশ্বে প্রবেশের পথ, সে যা-নয়, তার সঙ্গে অভিন্ন হবার আকাঙ্ক্ষার —এগুলো কি খুব রোমান্টিক? একটা সিনেমার বা উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে নিজেকে এক মনে করার আমাদের যে প্রায়হিস্টিরিয়া প্রবণতার রয়েছে তার ভিত্তিতে, সেটা শিল্পকলার সর্বজনীন ও মৌলিক কাজ বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া কি হঠকারী নয়? নিজেকে হারিয়ে ফেলার এ ধরনের ডাইনোসিয়াস-সুলভ প্রবণতার বিপরীত কি শিল্পে পাওয়া যায় না? আনন্দ পাবার ও সন্তুষ্ট হবার এ্যাপেলো-সুলভ প্রবণতার কি শিল্পে অন্তর্নিহিত নেই যেটা প্রমাণিত হয় এই সত্যের মধ্য দিয়ে, যে উপস্থাপিত বস্তুর সঙ্গে দর্শকের অভিন্নতার নয়, বরং দূরত্বের বোধ জাগ্রত হয়, পরিকল্পিত উপস্থাপনার ফলে দর্শক বাস্তবের প্রত্যক্ষ প্রভাবকে অতিক্রম করার সুযোগ পায় এবং প্রাত্যহিক জীবনের বোঝায় অস্বীকৃত আনন্দদায়ক স্বাধীনতার অনুভূতি লাভ করে। এবং শিল্পী যে ভাবে সৃষ্টিশীলতার মগ্ন থাকে তার মধ্য দিয়ে একপক্ষে বাস্তবতার মধ্যে নিমজ্জন ও অপরপক্ষে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার উল্লাস এই দ্বৈততা কি খুব স্পষ্ট নয়? কারণ এ সম্পর্কে ভুল করার কোন সুযোগ নেই যে, শিল্প-সৃষ্টি অনুপ্রাণিত মদির মুহূর্তের ফসল নয়, বরং একটি অত্যন্ত সচেতন যুক্তিসঙ্গত প্রক্রিয়া যা বাস্তবকে বশীভূত করার পর সমাপ্তিকে শিল্পীকর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

শিল্পী হবার জন্যে প্রয়োজন অতিজ্ঞতাকে স্মৃতিতে, স্মৃতিকে প্রকাশে, উপকরণকে আকৃতিকে পরিণত করা। একজন শিল্পীর জন্যে আবেগই সবকিছু নয় একই সঙ্গে তাকে জানতে ও উপভোগ করতে হবে ব্যবসাকে— বুঝতে হবে সকল নিয়ম, কৌশল, বৈচিত্র্য, ও অভ্যাস এবং এর মধ্য দিয়ে প্রকৃতি সেই মুখরা-কে বশে আনতে হবে এবং শিল্পের চুক্তিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হবে। ভাবাবেগ একজন চপল শিল্পীকে দগ্ধ করলেও প্রকৃত শিল্পীকে সেবাদাসের মতো সেবা করে : শিল্পী বন্য পশু দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হন না, তিনি সেটাকে পোষ মানান।

টানাপোড়েন ও দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্য শিল্পের স্বভাব; শিল্পসৃষ্টির জন্যে বাস্তবতার তীব্র

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা অপরিহার্য শুধু নয়, এটা অবশ্যই নির্মাণ করতে হবে। বস্তুসত্যের মধ্যে থেকে তাকে রূপ পরিগ্রহ করতে হবে। শিল্পের স্বাধীন সঞ্চরণ সম্ভব হয়েছে ওস্তাদির কারণে। এ্যারিস্টটল, যাকে প্রায়শ ভুল বোঝা হয়, মনে করতেন যে, নাটকের কাজ হচ্ছে আবেগকে পরিস্রুত করা, ভয় ও কারুণ্যকে জয় করা, যাতে অরিস্টিস বা ইডিপাসের সঙ্গে একাত্মতা অনুভবকারী স্পর্শক ঐ বোধ থেকে মুক্তি পায় এবং নিয়তির অন্ধলীলার উর্ধ্বে উন্নীত হয়। জীবনের বন্ধনগুলো কিছুক্ষণের জন্য আলগা হয়, কারণ বাস্তবতা থেকে ভিন্ন উপায়ে শিল্প 'মোহাবেশ' সৃষ্টি করে, এবং এই ক্ষণিক বন্ধনই হচ্ছে 'বিনোদনের প্রকৃত চারিত্র্য– যে আনন্দ এমনকি বিয়োগান্ত রচনা থেকে পাওয়া যায়।

এই আনন্দ তথা শিল্পকলার মুক্তিদানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বারটোল্ট ব্রেখট বলেছিলেন: আমাদের থিয়েটারকে অবশ্যই উপলব্ধির উত্তেজনাকে উৎসাহিত করতে এবং বাস্তবতাকে বদলানোর আনন্দে দর্শককে প্রশিক্ষণ দিতে হবে; কিভাবে প্রমিথিউস মুক্ত হয়েছিলেন আমাদের দর্শককে শুধু সেটা জানলেই চলবে না নিজেদেরকে মুক্ত করার আনন্দদায়ক কর্মে নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করতে হবে। আমাদের থিয়েটারে এসে যেন তারা আবিষ্কারকের আনন্দ ও তৃপ্তি এবং মুক্তিদাতার বিজয়ানুভূতির স্বাদ অনুভব করতে পারে সেটা তাদের অবশ্যই শেখাতে হবে।

ব্রেখট নির্দেশ করেছেন যে, শ্রেণীবিক্ষুব্ধ সমাজে আধিপত্য বিস্তারকারী নন্দনতত্ত্ব শিল্পকর্মের কাছে তাৎক্ষণিক প্রভাব হিসেবে দাবি করে দর্শকের মন থেকে সামাজিক বৈষম্যের চেতনা দমিয়ে দেওয়া এবং শ্রেণীবিভক্তি নয়, যৌথ 'সর্বজনীন মানবিক' চেতনা সৃষ্টি করা। অন্যপক্ষে 'অ-এ্যারিস্টটলীয় নাটকের' ব্রেখট যার প্রবর্তনা দিচ্ছেন, কাজ হচ্ছে ধনতান্ত্রিক জগতে উদ্ভূত অনুভূতি ও যুক্তির মধ্যেকার বিরোধ দূর করে দর্শককে বিভক্ত করা।

ধনতন্ত্র যখন অবসানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেকালে অনুভূতি ও যুক্তি উভয়ের অবক্ষয় দেখা দেয় এবং তারা পরস্পর কুৎসিত অনুৎপাদনশীল বিরোধে লিপ্ত হয়। কিন্তু উদীয়মান নতুন শ্রেণী এবং যারা এর পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছে, অনুভূতি ও যুক্তি উৎপাদনশীল বিরোধের ব্যাপারে আগ্রহী। আমাদের অনুভূতি আমাদের মুক্তির সর্বাধিক প্রয়াসের দিকে প্রবর্তনা দেয় এবং আমাদের যুক্তি আমাদের অনুভূতিকে পরিশ্রুত করে।

যে বিচ্ছিন্ন জগতে আমাদের বাস সেখানে বিষয় ও পাত্রপাত্রীদের 'বিচ্ছিন্নতার' মাধ্যমে সমাজবাস্তবতাকে নতুন আলোকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে, যাতে সেটা আমাদের মনকে আবিষ্ট করে। নিষ্ক্রিয় অভিন্নতা বোধের মধ্য দিয়ে নয়, বরং যুক্তিকে জাগ্রত করে শিল্পকর্ম দর্শককে মুঠোর ভেতর নিয়ে যাবে কর্ম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেরণা

www.pathagar.com

প্রবল হয়ে ওঠে। যে নিয়মের দ্বারা মানুষ সমাজ গড়ে তুলছে, নাটকে সেগুলোকে 'ক্ষণস্থায়ী ও সম্পূর্ণ রূপে দেখাতে হবে যাতে দর্শক শুধু দর্শন নয়, তার চেয়ে অধিকতর উৎপাদনশীল কিছু করে, দেখতে-দেখতে ভাবে এবং উপসংহারে এই সিদ্ধান্তে আসে : 'এভাবে করা সঙ্গত নয় এটা খুব অদ্ভুত, প্রায় অবিশ্বাস্য। এভাবে চলতে পারে না।' এবং দর্শক, যিনি একজন শ্রমজীবী পুরুষ বা মহিলা থিয়েটারে আসবেন এজন্যে যে,

> তার নিজের ভয়ংকর ও অন্তহীন শ্রমকে, যদ্দারা তিনি নিজের ভরণপোষণ করেন, আমোদপ্রমোদ হিসেবে উপভোগ করতে ও নিজের বিরতিবিহীন পরিবর্তনের আঘাতের যন্ত্রণাকে ভোগ করতে। এখানে সবচেয়ে সহজ পথে তিনি নিজেকে উৎপন্ন করতে পারেন : কেননা অস্তিত্বের সর্বাধিক সহজ পন্থা শিল্পকলার মধ্যেই রয়েছে।

ব্রেখটের 'এপিক থিয়েটার' ভঙ্গি শ্রমিক শ্রেণীর নাটকের একমাত্র সম্ভাব্য রূপ— এ ধরনের দাবি না করেও আমি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের উদ্ধৃতি দিচ্ছি শিল্পের দ্বান্দ্বিক প্রকৃতি ও পরিবর্তনশীল জগতে শিল্পকলার ভূমিকা কিভাবে পরিবর্তন হয়, সেটা দেখাবার জন্যে।

শিল্পসৃষ্টির কারণ সবসময় সর্বতোভাবে এক থাকে না। মূলগতভাবে শিল্প-কলার যে-ভূমিকা ছিল, অন্তর্দ্বন্দ্বে ভরা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সেটা অনেকাংশে পৃথক। কিন্তু তবু, বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও, শিল্পকলার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করে। ঠিক এ কারণেই আমরা যারা বিশ শতকে বাস করি, তারা প্রাগৈতিহাসিক কালের গুহাচিত্র বা সুপ্রাচীন সংগীত দ্বারা অভিভূত হই। মহাকাব্যকে অবিকশিত সমাজের শিল্পরূপ বলে কার্ল মার্কস ব্যাখ্যা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগ করেছেন :

> কিন্তু এটা বোঝা সমস্যা নয় যে, গ্রিক আর্ট ও মহাকাব্য সমাজ বিকাশের বিশেষ পর্যায়ের সঙ্গে গ্রথিত। বরং সমস্যাটা ঐখানে যে, কি কারণে সেগুলো এখনও আমাদের কাছে নান্দনিক উপভোগের উৎস হিসেবে বিরাজ করছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অনতিক্রমনীয় উৎকর্ষের আদর্শ ও নিদর্শন রূপে পরিগণিত হচ্ছে।

তার পরে তিনি এর উত্তর দিয়েছেন এভাবে :

> মানবজাতির সামাজিক শৈশবকাল, যে কাল সর্বাধিক সুন্দর রূপ লাভ করেছিল এবং যে কাল কখনো ফিরে আসবে না, কেন চিরস্থায়ী মাধুর্য নিয়ে সামনে হাজির হয়? পরিবারে অপলালিত ও অকালপক্ক শিশু দুইই থাকে। অধিকাংশ প্রাচীন জাতি শেষোক্ত আওতায় পড়ে। গ্রিকরা ছিল স্বাভাবিক শিশু। তাদের শিল্পকলার মাধুর্য, সমাজকাঠামোর যে-আদিম স্তর থেকে থেকে সেটা জন্মলাভ করেছে, তার সঙ্গে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না। বরং এই সৌন্দর্য শেষোক্ত কারণের ফল। এবং বলতে গেলে কি, যে অপরিপক্ক সমাজ পরিস্থিতিতে তার জন্ম সম্ভব, যেহেতু তার আর

www.pathagar.com

কখনো ফিরে আসা সম্ভব নয়, সেজন্যে সেটা সুন্দর হয়ে দেখা দেয়।

বর্তমানে আমরা সন্দেহ করতে পারি যে, সত্যিই কি অন্যান্য জাতির তুলনায় প্রাচীন গ্রিকরা ছিল 'স্বাভাবিক শিশু'। প্রকৃতপক্ষে অন্য এক প্রসঙ্গে মার্কস এবং এঙ্গেলস কাজের প্রতি ঘৃণা, স্ত্রী জাতির প্রতি অবমাননা, বেশ্যা ও বালক নির্ভর যৌনজীবন, গ্রিক জীবনের এ ধরনের সমস্যার প্রতি স্বয়ং দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এবং তারপর আমরা গ্রিক সৌন্দর্য প্রশান্তি ও সুষমার উল্টোদিকের অনেক খবর আবিষ্কার করেছি। প্রাচীন জগত সম্পর্কে একালে আমাদের ধারণা ভিঙ্কেলম্যান, গ্যেটে ও হেগেল অংকিত ছবির সঙ্গে অংশবিশেষ মিলে। প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক আবিষ্কারের ফলে ক্ল্যাসিক্যাল গ্রিক আর্টকে 'বাল্যকালের' সম্পদ বলে মেনে নিতে আমাদের কুণ্ঠা হয়। সেগুলোর মধ্যে বরং আমরা তুলনামূলকভাবে পরবর্তীকালের ও পরিণতির কিছু কিছু ছাপ পাই; এবং পেরিক্লিয়ান যুগে এর উৎকর্ষের মধ্যে অবক্ষয় ও পতনের লক্ষণও নজর পড়ে। মহান ফিডিয়াসের অনুসারী ভাস্করদের নির্মিত বীর-এ্যাথলেট, ডিসকাস নিক্ষেপকারী ও অশ্বারোহীদের অনেক ভাস্কর্যই এককালে ক্ল্যাসিক্যাল বলে প্রশংসিত হলেও ঈজিপসীয় ও মাইসিনীয় শিল্পকর্মের তুলনায় একালে খেলো ও অর্থহীন বলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এ নিয়ে গভীর আলোচনা করতে গেলে মার্কস কর্তৃক উত্থিত প্রশ্ন ও উত্তর থেকে আমরা অনেক দূরে চলে যাব।

এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে, একটি অবিকশিত সামাজিক স্তরের কাল নিয়ন্ত্রিত শিল্পকলার মধ্যে মার্কস 'মানবতার-ক্ষণকে' লক্ষ্য করেছিলেন এবং স্বীকার করেছিলেন যে, এর মধ্যেই নিহিত আছে ইতিহাসের সময়কে অতিক্রম করার ও চিরন্তন মোহনীয়তা বিস্তার করার এর ক্ষমতা।

আমরা এভাবে এটা দেখতে পারি : সমস্ত শিল্পই কাল-নিয়ন্ত্রিত এবং নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যতদূর সম্ভব সেকালের চিন্তা ও স্বপ্ন, চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু একইসঙ্গে, শিল্প এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যায় এবং ইতিহাসের কালসীমার মধ্যেই, নিরন্তর বিকাশের সম্ভাবনা নিয়ে 'মানবতার-ক্ষণকে' রচনা করে। প্রচণ্ড পরিবর্তন ও সামাজিক উপপ্লবের সময় থাকলেও, শ্রেণীসংগ্রামের সর্বমুহূর্তে বিরাজিত প্রবহমানতাকে আমাদের খাটো করে দেখলে চলবে না। বিশ্বজগতের মতোই মানুষের ইতিহাস শুধু বিরোধাত্মক বিচ্ছিন্নতার উদাহরণ নয়, বরং প্রবহমানতারও। পুরাকালের আপাতদৃষ্টিতে বহুকালের, বিস্মৃত ঘটানারাজি আমাদের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে এবং প্রায়ই, গোপনে-গোপনে কাজ করে যায়। একদিন, সেগুলো সহসা উপরিতলে মাথা তোলে এবং হেডসের ছায়ামূর্তির মতো, যাদের অডিসিউস নিজের শোণিত পান করিয়েছিলেন আমাদের আছে কথা কয়ে ওঠে। বিভিন্ন কালে সামাজিক

www.pathagar.com

পরিস্থিতি, উদীয়মান বা বিলীয়মান শ্রেণীর প্রয়োজন প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে এতদিন সুপ্ত-থাকা বা হারিয়ে যাওয়া বিচিত্র জিনিস পুনরায় দিনের আলোতে উঠে আসে ও নতুন জীবনে জাগ্রত হয়। এবং এটা যেমন কোন কাকতালীয় ব্যাপার ছিল না যে, সামন্তবাদ, দরবারী সংস্কৃতি এবং পরচুলা ও গ্রীক সভ্যতাভিত্তিক আলেকজান্দ্রিয়ার তৎকালের সকল কৃত্রিম ভাবভঙ্গির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে লেসিং ও হেরডার জার্মানদের জন্য শেক্সপিয়রদের আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনিভাবে এটাও কোন আকস্মিক সাদৃশ্য নয় যে, মানবিকতাবাদ অস্বীকার করতে গিয়ে ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্ধভক্তির স্বভাবে পশ্চিম ইউরোপ আজ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্ধভক্তিতে পৌঁছেছে এবং নিজের সমস্যা গোপন করার জন্য মিথ্যা কল্পকাহিনী নির্মাণ করেছে।

বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজব্যবস্থা, নিজস্ব আত্মিক বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার সঙ্গে সঙ্গে এক বিশ্বজনীন মানবাত্মা সৃষ্টিতেও অবদান রাখে। স্বাধীনতার ধারণা যদিও একটা শ্রেণী বা সমাজব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে, তবু তার ঝোঁক এমন একটি ধারণায় উপনীত হবার দিকে যা সব কিছুকে ধারণ করতে চায়। একইভাবে, মানুষের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যসমূহ এমম কী কাল-নিয়ন্ত্রিত শিল্পকলায়ও ধরা পড়ে। হোমার, এস্কাইলাস এবং সফোক্লিস যখন দাসত্ব প্রথা-নির্ভর সমাজের সরল অবস্থা প্রতিফলিত করেন তখন তারা কালকবলিত ও সেকেলে কিন্তু যখন, ঐ সমাজে তারা মানুষের বিরাটত্ব আবিষ্কার করেন, তার আবেগ ও দ্বন্দ্বকে শৈল্পিক রূপ দান করেন ও তার অনন্ত সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করেন তখন তারা চিরকালের আধুনিকতার পরিচয় দেন। প্রমিথিউসের মর্তে অগ্নি আনয়ন, অডিসিয়সের পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়ানো ও পরিশেষে প্রত্যাবর্তন, এর সবগুলোর মৌলিক ক্ষমতা আমাদের জন্য রক্ষিত আছে। একজন রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়কে সম্মানের সঙ্গে সমাধিস্থ করার অধিকার লাভের সংগ্রাম— এন্টিগনের এই বিষয়বস্তু আমাদের কাছে প্রাচীন মনে হয় এবং সেটা বোঝার জন্যে আমাদের ঐতিহাসিক টীকা-টিপ্পনির প্রয়োজন পড়তে পারে, কিন্তু এন্টিগনের চরিত্র সেকালের মতো একালেও সমভাবে মর্মস্পর্শী এবং যতদিন পৃথিবীতে মানুষ থাকবে ততদিন তারা তাঁর এই উক্তিতে শিহরিত হবে– আমরা প্রকৃতি প্রেমে ঘনিষ্ঠ হওয়া, হিংসায় নয়।' বহুকাল-বিস্মৃত শিল্পকর্মকে আমরা যত বেশি জানতে পারি, তত বেশি স্পষ্ট হয়, শত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, সেগুলোর সর্বজনীন ও প্রবহমান উপকরণসমূহ খণ্ড-খণ্ড মিলে গড়ে তোলে অখণ্ড মানবতা।

ক্রমশ অধিকসংখ্যায় প্রাপ্ত তথ্যের প্রমাণ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি যে, শিল্পকলার উদ্ভবের মূলে ছিল ম্যাজিক— সে ম্যাজিক ব্যবহৃত হতো বাস্তব কিন্তু অনাবিষ্কৃত জগতকে বশীভূত করার কাজে। ধর্ম বিজ্ঞান ও শিল্প অনেকটা ভ্রূণের আকারে সম্মিলিত ছিল ম্যাজিকের সুপ্ত কাঠামোতে। শিল্পের এই ম্যাজিক ভূমিকা ধীরে ধীরে

www.pathagar.com

পর্যবসিত হয়েছে সামাজিক সম্পর্ককে আলোকোজ্জ্বল করার কাজে, অস্বচ্ছ হতে থাকা সমাজের মানুষকে আলোকদীপ্ত করার জন্যে এবং সমাজবাস্তবতাকে চিহ্নিত ও পরিবর্তিত করতে মানুষকে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে। বিচিত্র সম্পর্ক ও সামাজিক বিরোধের সমাহারে গঠিত অত্যন্ত জটিল সমাজকে অবশ্য আর ম্যাজিকের প্রথায় উপস্থাপিত করা সম্ভব নয়। এই ধরনের সমাজে, যেখানে সাহিত্যিক স্বীকৃতি ও সর্বব্যাপী সচেতনতার দাবি আসছে, ম্যাজিক বৈশিষ্ট্যবাহী প্রাথমিক যুগের অনড় কাঠামোগুলো ভেঙে অধিক মুক্ত কাঠামোতে বেরিয়ে আসার, ধরা যাক উপন্যাসের স্বাধীনতায় পৌঁছুবার দাবি, প্রচণ্ড অনুভূত হতে লাগল। সমাজবিকাশের স্তরানুযায়ী, কোন বিশেষ সময়ে, শিল্পকলার যে কোন দুটো উপাদানের একটি প্রভাবশালী হতে পারে : কখনো ম্যাজিকসুলভ ইঙ্গিতময়তা, সময় যুক্তিধর্মিতা ও আলোকধর্মিতা; কখনো স্বপ্নময় স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি, অন্যসময় ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে তীব্রতর করার ইচ্ছা। কিন্তু শিল্পকলা শান্তি পাড়াক বা জাগ্রত করুক, অন্ধকার ছড়াক বা আলোকোজ্জ্বল করুক, এটা কখনো বাস্তবতার ডাক্তারী বর্ণনা নয়। সবসময় শিল্পকলার কাজ হচ্ছে সমগ্র মানুষকে সজাগ করা, ব্যক্তির 'অহং'কে অন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে সক্ষম করা, সে যা নয় কিন্তু হতে সক্ষম, তাকে সে-রকম হতে দেওয়া। ব্রেখটের মতো বড় নীতিপ্রচারক শিল্পীও বিশুদ্ধ যুক্তি ও তর্ককে অবলম্বন করেন না, অনুভূতি ও ইঙ্গিত তাঁরও বাহন। একটি শিল্পকর্ম নিয়ে তিনি যে শুধু দর্শকদের মুখোমুখি হন এমন নয়, তিনি তাদের এর অভ্যন্তরে প্রবেশেরও সুযোগ দেন। তিনি নিজেও এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং নির্দেশ করেছেন যে সমস্যাটি চূড়ান্ত বৈপরীত্যের নয়, বরং স্থানান্তরশীল চাপের। 'এভাবে আবেগময় ইঙ্গিতধর্মিতা বা শুদ্ধ যুক্তিনির্ভর প্রবর্তনা ভাববিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে প্রাধান্য পেতে পারে।

এটা সত্য যে, পৃথিবীকে বদলানোর ইতিহাস-নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাছে শিল্পকলার মূল কাজ ইন্দ্রজাল রচনা নয়, বরং সচেতনা সৃষ্টি ও কর্মে প্রবর্তনা; এতদসঙ্গে এটাও সমভাবে সত্য যে, শিল্পকলার মধ্যে ম্যাজিকের অবশিষ্টাংশকে পুরোপুরি দূর করা যাবে না, যেহেতু মূল প্রকৃতির সামান্য অবশেষ না-থাকলে শিল্প শিল্পের দাবি থেকে খারিজ হয়ে যায়।

এর বিকাশের সমস্ত আঙ্গিকে, গৌরবে ও কৌতুকে, প্ররোচনায় ও অতিশয়োক্তিতে, অর্থে ও অর্থহীনতায়, আকাশকুসুমে ও রূঢ় বাস্তবতায় শিল্পকলার মধ্যে সবসময় কিছু-না-কিছু ইন্দ্রজাল থাকে।

শিল্পকলা প্রয়োজনীয় এ কারণে যে মানুষ যাতে পৃথিবীকে চিনতে ও বদলাতে সক্ষম হয়; কিন্তু শিল্পকলা তার অন্তর্নিহিত ইন্দ্রজালের গুণেও প্রয়োজনীয়।

www.pathagar.com

দ্বান্দ্বিকতা

[প্যারিসের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনা করেন অঁরি আরভো। লেখক ও দার্শনিক হিসেবে বেশ খ্যাতির অধিকারী। বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে তাঁর বই আছে, ফয়েরবাখকে নিয়েও তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব নামক' ১৯৭০ সালে প্রকাশিত তাঁর বইটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার সাহিত্যচিন্তায় বস্তুবাদী যে ধারাটি ছিল, তিনি সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তাঁর বইয়ের আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় ব্রেখট—লুকাচ বিতর্ক। অধ্যাপক আরঁভোর বইটি ইংরেজিতে অনূদিত হয় ১৯৭৩ সালে। 'করনেল ইউনিভারসিটি প্রেস' থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৭৭) থেকে বর্তমান প্রবন্ধটি সংকলিত ও অনূদিত হয়েছে।]

যদি আমরা সোজাসুজি বিভিন্ন মার্কসবাদী তাত্ত্বিকের শরণাপন্ন হই এবং শিল্পও সাহিত্য-সম্পর্কিত তাদের বক্তব্য ও লেখাকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করি, যদি আমরা ঐ সমস্ত মতামতকে– যা ক্বচিৎ এক বিন্দুতে মিলিত হয় এবং যা কোন কোন ক্ষেত্রে পরিপূরক কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী পর্যালোচনা করি তাহলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বকে উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। মার্কসীয় তত্ত্বের ব্যাপক ভিন্নমুখী ব্যাখ্যার মধ্য থেকে নন্দনতত্ত্বকে ছেঁকে নিয়ে আসার চেষ্টা না-করে বরং মূল তত্ত্ব থেকেই যাত্রা শুরু করা কি বিচক্ষণতার পরিচায়ক হবে না? বিশেষ করে যখন মানবীয় বাস্তবতার সর্বদিকস্পর্শী দৃষ্টিভঙ্গি বলে সেটা দাবি করে; এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অবিচলিত চিত্তে দেখলে যে বাস্তবতার বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে শুধু বোঝা সম্ভব।

যদি আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি, তাহলে দেখা যাবে যে, মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে শিল্পকর্ম ও মানবজীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকারী জটিল দ্বান্দ্বিকতা। আমরা জানি যে, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানব জীবনের মূল কাঠামো, মানবীয় সম্পর্কের সমগ্ররূপ বলে যাকে বিচেনা করা হয়, নির্ভর করে অর্থনীতির ওপর, যে শব্দটির মধ্যে নিহিত আছে প্রকৃতিকে জয় করার ও কাজে লাগানোর জন্যে মানুষের সমস্ত কর্ম প্রয়াস। এই অন্তর্শায়ী অর্থনৈতিক কাঠামো এবং বিভিন্ন ভাবাদর্শের– রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শৈল্পিক ও দর্শন সম্বন্ধীয় যাই হোক না কেন– মধ্যে একটা মৌলিক সমান্তরালতা বিরাজিত; নীতিগতভাবে, কোন নির্দিষ্ট কাঠামোর সঙ্গে সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট সমান্তরাল একটি

www.pathagar.com

ওপরকাঠামো থাকবে। সে জন্যে প্রতিটি ঐতিহাসিক কালের আধিপত্য বিস্তারকারী ভাবরাজির সব সময় অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে একটি শ্রেণীর ভাবনা রূপে– যে শ্রেণীকে এক বিশেষ অর্থনৈতিক পদ্ধতি প্রধান শক্তিরূপে গড়ে তুলছে।

মার্কসবাদের বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় এই সমগ্রতা, কখনোই একটা রূপ হিসেবে বিবেচ্য হবে না, যা পাওয়া যায় সমগ্রতাকে শুধু অর্থনৈতিক উপাদানে কমিয়ে এনে। বরঞ্চ এটা বিভিন্ন উপাদানের সমবায়ে গঠিত একটি সম্ভাবনাময় সমগ্রতা– যে-উপাদানগুলো যথেষ্ট বিচিত্র এবং কখনো পরস্পর-বিরোধী, কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত একই কেন্দ্রাভিসারী। বলতে কি, ওপরকাঠামো শুধু তাদের সাধারণ কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং তার ওপর অর্থনৈতিক কাঠামোর সাধারণ প্রভাবের বাইরে, তারা সবাই পরস্পরের ওপর ক্রিয়া করে এবং এমনকি যে অন্তর্শায়ী অর্থনৈতিক কাঠামো তাদের জন্ম দিয়েছে, সেটার ওপর প্রভাব ফেলে। সুতরাং, ওপরকাঠামোকে কাঠামো থেকে স্বতন্ত্র করে দেয়ার ভ্রান্তির মতো ভাববাদী ধারণা সম্পর্কেই-যে মার্কসবাদ আমাদের সতর্ক করে এমন নয়, কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যেকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে অস্বীকার করার যন্ত্রবৎ প্রবণতা সম্পর্কেও।

১৮৯৪ সালের ২৫-এ জানুয়ারি হাইনজ স্টারকেনবুর্গের কাছে লিখিত ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের চিঠিতে এ দিকটি পরিচ্ছন্নতমভাবে বলা হয়েছে; 'রাজনৈতিক, বিচার বিভাগ বিষয়ক, দর্শন সম্বন্ধীয়, ধর্মীয় ও সাহিত্যিক বিষয়াবলীর বিবর্তন অর্থনৈতিক বির্তনের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সেগুলো পরস্পরের ওপর ক্রিয়া করে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কারণ নয়, এটাই একমাত্র ক্রিয়াশীল বিষয় এবং বাকিরা শুধু নিষ্ক্রিয় প্রতিফলক তা-ও নয়, বরঞ্চ অর্থনৈতিক প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত পারস্পরিক প্রভাব এখানে বিদ্যমান, যদিও শেষপর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রয়োজনটাই সব সময় নির্ধারক ভূমিকা হিসেবে দেখা দেয়।'

অর্থনীতির প্রতি এই অচলাভক্তি একবার ছাড়ানো গেলে শিল্প ও সাহিত্যকে আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা মার্কসবাদের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে। কারণ যদিও শিল্পী বা লেখক সামাজিক অভিজ্ঞতানুযায়ী গড়ে ওঠেন এবং সচেতন বা অচেতনভাবে তার সমাজের নান্দনিক রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হন, তবু প্রথমত ও প্রধানত তিনি একজন স্রষ্টা এবং তার কার্যকলাপ দ্বারা, মানুষের মনে ও হৃদয়ে, মানবজাতির প্রকৃত তথা বাস্তবায়ন সম্ভব প্রচ্ছন্ন শক্তির উদ্বোধনের আশা ও ইচ্ছা জাগ্রত করার মাধ্যমে এবং এভাবে তার লেখায় পৃথিবীর অন্তর্নিহিত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার স্বাপ্নিক মূর্তি নির্মাণ করে, মানুষকে তার পশু অবস্থা থেকে উন্নীত করার যে প্রয়াস চলছে, তাতে নিজের পক্ষ থেকে তিনি অবদান রাখেন।

চিন্তাক্ষম অহং-এর এই ক্রিয়াশীলতা, পুরুষ-পরম্পরায় প্রবাহিত শ্রমের প্রতিফলন

www.pathagar.com

হিসেবে শিল্পকর্মের যে সংজ্ঞা, সমগ্র মানবজীবনকে ফুলের ন্যায় বিকশিত করার লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্ন বস্তুগত যে রচনা, এসবের রূপরেখা তরুণ মার্কস তার ১৮৪৪ সালের 'ইকোনিমিক অ্যান্ড ফিলজফিক ম্যানাসক্রিপ্ট'-এ স্পষ্ট করে অঙ্কন করেছেন। তিনি লিখেছেন—'মানুষের সমৃদ্ধ সম্ভাবনাকে তথা মানুষের হৃদয়নির্ভর বাস্তবতার সমৃদ্ধিকে বস্তুগতভাবে বিকশিত করেই শুধু একটি সংগীতপ্রিয় কান, অঙ্গরূপের প্রতি স্পর্শকাতর চোখ, এককথায় মানুষের উপভোগ করার ক্ষমতা জন্মলাভ করে এবং মানুষের গ্রহণশীল ইন্দ্রিয়সমূহ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে; এটা মানুষের শক্তিরূপে নিজে উদ্ভাসিত হয় এবং তারপরে হয় বিকাশলাভ করে বা জন্ম নেয়।'

মানবজাতির উর্ধ্বমুখী অগ্রগতির এই দৃষ্টিভঙ্গি একবার গ্রহণ করলে শিল্পের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় মানুষকে তার পশুসুলভ সুষুপ্তি থেকে জাগ্রত করা, অল্পে অল্পে অর্জিত আত্মজ্ঞানকে বাড়িয়ে তোলা এবং মানুষের সমস্ত প্রচ্ছন্ন শক্তির প্রকাশ ঘটানো। শিল্পের সত্য তখন মানব প্রজাতির আত্মসচেতনতার সমার্থক হয়ে ওঠে। একই রচনায় মার্কস লিখেছেন— 'অতীতের সব মানুষের কাজ ছিল পঞ্চেন্দ্রিয়কে শিক্ষিত করা। মৌলিক চাহিদা ছাড়া অন্য কোন সজাগতার প্রতি অনুগত না-হওয়া সেজন্য শুধু একটি সীমিত সজাগতা আর কিছু নয়। ক্ষুধায় মুমূর্ষু মানুষের চিন্তায় খাদ্যদ্রব্য পাচকপ্রস্তুত অবস্থায় নয়, বরং শুধু বিমূর্তরূপ নিয়ে হাজির হয়; অত্যন্ত স্থূলতম রূপ নিয়েও সেগুলো দেখা দিতে পারে এবং এ ধরনের আহার্য ও পশুসুলভ আহার্যের মধ্যে মূলত কোন তফাৎ থাকে না। বস্তুজগতে অভাবে পীড়িত ভয়াবহ কষ্টে জর্জরিত মানুষ এমনকি সৌন্দর্যমণ্ডিত দৃশ্যকেও উপভোগ করতে পারে না; বহুমূল্য ধাতুর বিক্রেতা শুধু সেগুলোর বাজারমূল্য সম্পর্কেই সচেতন থাকে, সেগুলোর ধাতব সৌন্দর্য সম্পর্কে তার কোন বোধ থাকে না; সেজন্যে মানুষের অনুভূতিকে মানবীয় করার জন্যে এবং মনুষ্য ও প্রাকৃতিক সত্তার সমস্ত সমৃদ্ধ প্রচ্ছন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মানবীয় তাৎপর্য সৃষ্টি করার জন্যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দু'দিক থেকেই মনুষ্যসত্তার বস্তুতন্ত্রায়ন প্রয়োজন।

শিল্পকলাকে যখন মানবীয় পছন্দের ওপর নির্ভরশীল সৃজনশীল কর্মরূপে বিবেচনা করা হয় ও এভাবে ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকারের পুনর্প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন পূর্ববর্তী নন্দনতত্ত্ব থেকে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের পার্থক্য কিভাবে সূচিত হয় সেটা আমাদের ভালভাবে চিন্তা করতে হবে। কান্টের 'ক্রিটিক অব জাজমেন্ট' কি সৃজনশীল ও গ্রহণশীল বিষয় হিসেবে নন্দনতত্ত্বের কার্যাবলীর দার্শনিক ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়? কিন্তু যেহেতু তার দার্শনিক তন্ত্র একটি আত্মগত ভাববাদ বিশেষ, কান্ট শুধু বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের সম্পর্কেই নিবিষ্ট ছিলেন। অপরপক্ষে, তার নিজস্ব যথাযোগ্য অভ্যন্তরীণ ছন্দ খুঁজে ফিরছে যে—পৃথিবী, তাকে নিখুঁত

www.pathagar.com

করার জন্যে মানবসম্প্রদায়ের সাধারণ প্রয়াসে সৃজনশীল ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে মূল্যায়ন করতে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব চেষ্টা চালায়।

পূর্ববর্তী অন্যান্য নন্দনতত্ত্বের মতো, মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব মনে করে যে, অতীতে যার অস্তিত্ব ছিল তার স্মৃতি বা যা ইতিমধ্যে অস্তিত্বশীল আছে তার হুবহু প্রতিফলন-শিল্পকলা তার কোনটাই নয়, বরং ভবিষ্যৎকে যা মেলে দেয় এবং সেজন্যে মানবজাতির সৃজনশীল শক্তিকে প্রকাশ করে, শিল্পকলা হচ্ছে তার একটি প্রতীকী উপস্থাপনা। কিন্তু যেখানে পূর্ববর্তী নন্দনতত্ত্ব সতর্কভাবে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব ইতিহাসের প্রতিটি যুগের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টার তাৎপর্য ও প্রভাবকে আলোকে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। হেগেলীয় দর্শনের অন্যতম বিশ্বাসকে অবলম্বন করে মার্কসবাদ মনে করে যে, চেতনার এই জাগরণ গভীরতর উপলব্ধি ও সম্পষ্টতর দৃষ্টিলাভে নিয়ে যেতে বাধ্য। প্রাচীনকাল থেকে সমাজতান্ত্রিক শিল্প-সাহিত্য পর্যন্ত প্রসারিত প্রকৃত বাস্তববাদী ঐতিহ্যের ধারাবিহকতাকে আলোকে নিয়ে এসে মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব অতীতের সমস্ত মূল্যবান সম্পদের সংরক্ষণ করাকেই শুধু সম্ভবপর করে তোলে না বরং শিল্পী ও সাহিত্যিককেও এমনভাবে আলোকিত করে যে, সচেতন সৃজনশীল কর্মতৎপরতার বিস্তৃত রাজপথটিকে যেন তারা তাৎক্ষণিকভাবে আবিষ্কার করেন। গেওর্গ লুকাচ তার 'ইনট্রোডাকশান টু দি এসথেটিক রাইটিংস অফ মার্কস অ্যান্ড এঙ্গেলস'-এ লিখেছেন 'নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-ইতিহাসের এলাকায় আমরা এভাবে অবস্থার সারসংক্ষেপ করতে পারি যে, মার্কসবাদ সৃজনশীল শ্রমের ঐসব নীতিকে প্রদীপ্ত ধারণার পর্যায়ে উন্নীত করে যা হাজার হাজার বছর ধরে শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের তন্ত্রে ও সবচেয়ে খ্যাতিমান লেখক-শিল্পীদের রচনায় জাগরূক ছিল।'

এর সঙ্গে আমাদের অবশ্যই যোগ করতে হবে যে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের স্বায়ত্তশাসন যদিও তাদের স্থূল ধরনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে, তবু এই বিপদ রয়ে যায় যে তাকে একচেটিয়াভাবে পার্টির কাজে লাগানো হবে। কেউ কেউ এমনও বলতে পারে যে, শিল্প ও সাহিত্যকে অন্য সব ধরনের অধীনতা থেকে ঠিক যত বেশি মুক্ত করা হয়, একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার ও সমর্থন করার জন্যে সেগুলো সে পরিমাণে সহজলভ্য হয়ে ওঠে। 'মার্কিসিজম অ্যান্ড কোশ্চেনস অব ল্যাংগুয়েজ' শিরোনামের স্ট্যালিনের লেখাটি যখন আমরা পাঠ করি, তখন যেভাবে হোক, এই সিদ্ধান্তটির কথা মনে হয়। লেখক এটা স্বীকার করতে যথেষ্ট রাজি আছেন যে ওপর-কাঠামোর বাকি অংশের কাছে যে ধরনের অনৈচ্ছিক সেবা দাবি করা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পকলা সে ধরনের দাবির অধীন নয়, কিন্তু সাহিত্যকে উক্ত সুবিধা শুধু এজন্যেই

www.pathagar.com

দেওয়া হয়েছে যাতে এর আওতাভুক্ত সকল সার্বভৌম উপায়ই রাজনৈতিক আদর্শের সমর্থনে লিপিবদ্ধ করা যায়। স্ট্যালিনের বক্তব্যের ভাষ্য রচনা করতে গেয়ে লুকাচ সাহিত্যের এই রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন : 'প্রতিটি সাহিত্য কর্মকে তার ভাষার রীতি চিত্রকল্প ও শব্দযোজনা, ছন্দ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অবশ্যই সে-ধরনের ভাব, অনুভূতি ও মেজাজকে জাগ্রত ও ঘটনা-চিন্তাকে উদ্রিক্ত করতে হবে যাতে তা কোন কিছুর পক্ষে বা বিপক্ষে আমাদের সংগঠিত করার ক্ষমতা অর্জন করে।'

নান্দনিক বিষয়বস্তুর সৃজনশীল স্বাধীনতাকে শক্ত ভিত্তি দিতে হলে সে স্বাধীনতাকে শুধু যে অনিবার্যভাবে অনুশীলনের সাধারণ ধারণার ওপর দাঁড় করতে হবে তাই নয়, সেটা প্রমাণ করাও অপরিহার্য যে, নান্দনিক কার্যাবলী মানবীয় অনুশীলনের মধ্যে অনেক পর্যায়ক্রম রয়েছে, যেগুলো নিজেদের বিশেষ শৃঙ্খলাকে মান্য করে। এটাই প্রসিদ্ধ 'অসম বিকাশের নীতি'– যার বিবিধ প্রয়োগকে মার্কস ও এঙ্গেলস বিশেষ আয়াসে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

১৮৯০ সালের ২৭ অক্টোবর তারিখে কার্ল স্মিদট-এর কাছে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, ইতিহাসে কয়েকবার দর্শনই অর্থনীতির বিবর্তনের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। তিনি পত্র প্রাপকের সৃষ্টি ঐ দিকে আকর্ষণ করনে যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশগুলো প্রায়শ দর্শনের ক্ষেত্রে ঠিক সামনের কাতারে থাকে। উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায় যে, আঠার শতকের ফ্রান্সে সে-ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। যদিও ব্রিটেন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক বেশি প্রাগ্রসর ছিল, তবু ব্রিটেনে উদ্ভূত দার্শনিক তন্ত্র অবলম্বন করে দর্শন চিন্তায় ফ্রান্স ব্রিটেনের বেশ সামনে চলে যায় এবং পরবর্তীকালে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের তুলনায় জার্মানি সেই একই সুপ্রসিদ্ধ অবস্থানে এগিয়ে যায়।

আঙ্গিকের বিবর্তন ও কাঠামোর বিকাশ —এ দুয়ের মধ্যে যে অস্থায়ী দূরত্ব দেখা দিতে পারে তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা শিল্পরূপের বহুমুখিতা ও তাদের প্রায় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে রয়েছে বলে মার্কস মনে করতেন। মহাকাব্য নামীয় শিল্পরূপটি প্রথম দিকে যখন স্মৃতিনির্ভর ও অলিখিত অবস্থায় ছিল, তখন সেটা সঙ্গতকারণেই গণ্য হতো নিম্নস্তরের শিল্পের উদাহরণ বলে; লিখিতরূপ একে একটি নির্দিষ্ট নির্ধারিত শিল্পকাঠামো প্রদান না করা পর্যন্ত সেটা ক্ল্যাসিক্যাল রূপ অর্জন করেনি। 'আমরা জানি যে, কোন যুগের শিল্পরূপ সেকালের সমাজের সাধারণ বিবর্তনের সঙ্গে অর্থাৎ বলতে গেলে ঐ সমাজ কাঠামোর কঙ্কালের বস্তুগত ভিত্তির সঙ্গে কোন সম্পর্ক বহন করে না।' —মার্কস বলছেন 'দি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকোনমি'র ভূমিকায়। উদাহরণ দিতে গেলে আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে,

www.pathagar.com

বা এমনকি শেক্সপীয়রের সঙ্গে তুলনায় গ্রিকদের কথা বলা যায়। কয়েকটি শিল্পরূপের ব্যাপারে, যেমন মহাকাব্যে, বলতে গেলে এটা সাধারণ কথা যে, একবার এদের শৈল্পিক সৃষ্টি নিজস্ব রূপে যবনিকার সামনে এসে গেলে, সেগুলোকে মূল রূপাবয়বে আর কখনো রচনা করা সম্ভব হবে না; এবং সেজন্যে শিল্পকলার পরিধির মধ্যে কয়েক ধরনের আঙ্গিক শুধু শৈল্পিক বিকাশের নিম্নতর পর্যায়েরই সম্ভব। যেহেতু শিল্পকলার নিজস্ব পরিধিভুক্ত বিভিন্ন রূপের পারস্পরিক সম্পর্কের বেলায় এটা সত্য, এটা আরো কম বিস্ময়জনক যে, সামগ্রিকভাবে শিল্পকলার সঙ্গে সমাজের সাধারণ বিবর্তনের সম্পর্কের বেলায়ও সেটা সত্য'।

শিল্পকলার সঙ্গে সমকালীন সমাজের সামগ্রিক সম্পর্কের জটিলতার যে কথা উপরের উদ্ধৃতিটির শেষ বাক্যে মার্কস বলেছেন, কতিপয় রচনা থেকে সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে এঙ্গেলস সেটার ব্যাখ্যা করেছেন। অন্ত্য ক্ল্যাসিক্যাল যুগে উদ্ভূত উপন্যাসের আলোচনায় এঙ্গেলস বলেছেন যে, এ সমস্ত রচনায় এত উল্লেখযোগ্যভাবে বিবৃত রাখালিয়া ভালবাসার বিষয়টি ঐ কালের সমাজে সাধারণভাবে গৃহীত রীতি ও নীতিকে কোনমতেই প্রতিফলিত করে না— শুধু সমাজের প্রান্তে এসবের বিকাশ সম্ভব ছিল। এগুলোর নায়কেরা ছিল ক্রীতদাস, যারা স্বাধীন নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অথবা, সামাজিক কর্মতৎপরতার অংশভাগী হতে পারত না। পরবর্তীকালের যেসব উপন্যাস বুর্জোয়া সমাজের প্রচণ্ড দ্বন্দ্বকে প্রতিফলিত করে, সেগুলো বস্তুত গ্রিক ও রোমান সামাজিক শৃঙ্খলার অবক্ষয়ের ফসল।

প্রকৃতিবাদী নাটকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আরনল্ড হোল্টজের তরুণ বন্ধু ও শিষ্য পল আরনস্টের সঙ্গে পত্রালাপে এঙ্গেলস ঠাট্টা করেছেন এই বলে যে, জার্মানির ঐ শ্রেণীর সদস্যদের সঙ্গে সাদৃশ্য টেনে হোল্টজ ইবসেনকে 'পাতিবুর্জোয়া' বানাবার চেষ্টা করেছেন, যদিও সঠিক হতো ইবসেনকে তাঁর দেশ নরওয়ের সমাজের সুনির্দিষ্ট বিবর্তনের ভিত্তিতে বিচার করলে।

অর্থনৈতিক বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ভিন্নমুখিতার সমস্যার মধ্যে লেখকের বিভক্ত ব্যক্তিত্ব থাকার সম্ভাবনাও জড়িত আছে— এ ক্ষেত্রে এক দৃষ্টি সমাজের সদস্যরূপে এবং সম্পূর্ণ আলাদা এক দৃষ্টি শিল্পীরূপে। এজন্যে মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব ও সমগ্র মার্কসবাদী তত্ত্ব দুইই মুখোমুখি হয় 'প্রতারক চেতনা' নামক সমস্যার : অর্থাৎ এটা এমন ধরনের চেতনা যা সমাজের চাপকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে না এবং সে জন্য হয় মন্ময় দিককে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় যার পরিণতি মন্ময়বাদে, অথবা, সেটাকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল বিবেচনা করে, যেমন দেখা যায় যান্ত্রিক ধারণায়। শ্রেণী অবস্থানের জন্যে স্বাভাবিক ভাবেই প্রলেতারিয়েতরা অদ্বিতীয়ভাবে সুবিধাজনক পর্যায়ে রয়েছে তথা পরিস্থিতির বাস্তবতা

www.pathagar.com

সম্পর্কে তার চেতনা অবিসংবাদিত রূপে সঠিক। 'বাস্তবায়িত করার জন্য প্রলেতারিয়েতদের কোন আদর্শ নেই; যা দরকার তা হচ্ছে ভেঙে ভেঙে পড়া বুর্জোয়া সমাজের ভেতরে ইতিমধ্যে বিকশিত নবীন সমাজের উপাদানসমূহকে স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হতে দেয়া।'—মার্কস লিখেছেন তাঁর 'দি সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স' গ্রন্থে। অন্য শ্রেণীর, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের বেলায় ব্যাপারটি তেমন নয়; বুদ্ধিজীবীরা দৃঢ় বিশ্বাসী যে, বুদ্ধিবৃত্তি হচ্ছে সর্বশক্তিমান, তারা সে জন্যে চেতনাকে এবং অনুশীলন তথা নির্দিষ্ট মানবীয় কার্যাবলীকে, দুটো স্বতন্ত্র ও স্পষ্ট ব্যাপার বলে বিবেচনা করে। 'প্রতারক চেতনা'র মূল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কস 'জার্মান আইডিওলজি' গ্রন্থে শ্রম বিভাগ পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছেন : 'শ্রম বিভাগ শুধু তখনই প্রকৃত বিভাগ হয়ে ওঠে যখন কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য জন্ম নেয়। সেই মুহূর্ত থেকে বিদ্যমান অনুশীলনী চেতনার পাশাপাশি স্বতন্ত্র কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে বলে চেতনাকে কার্যকরভাবে বোঝানো যায়।'

সাহিত্য অবশ্য প্রতারক চেতনার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে। মহৎ রচনা কখনো একটি একক শ্রেণীর পক্ষপাতমূলক ছাঁচে গড়ে ওঠে না; সামগ্রিকভাবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পর্ককে সেটা প্রকাশ করে এবং বলার কায়দা লেখককে তার শ্রেণী-পক্ষপাতের ওপরে উঠতে সাহায্য করে। এ জন্যে দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত চিন্তায় একজন লেখক, রাজনৈতিকভাবে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল প্রমাণিত হতে পারেন, আবার শিল্পী হিসাবে প্রগতিশীল রচনার লেখকরূপে আবির্ভূত হতে পারেন। ব্যক্তি হিসেবে সম্পূর্ণ তার শ্রেণীর অন্তর্গত থেকে তিনি এর ভাবাদর্শে পুরোমাত্রায় অংশগ্রহণ করেন, অথচ ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন একজন শিল্পী বা লেখকরূপে তিনি সমাজ বিবর্তনের অন্তর্শায়ী প্রকৃত গতিশীল শক্তিকে তথা বস্তুগত উপাদানকে আলোকে নিয়ে আসেন।

বালজাকের উপন্যাসে লভ্য সাহিত্যানুশীলনে অন্তর্নিহিত উল্লিখিত সত্যকে এঙ্গেলস কখনো প্রশংসা করতে বিরত থাকেননি। যেহেতু তিনি ছিলেন প্রাচীন সমাজপ্রস্থার একজন উৎসাহী সমর্থক তাহলে কেন বালজার তাঁর লেখায় তাঁর কালের অভিজাতদের সম্পর্কে এমন বিষন্ন ছবি হাজির করেছেন? 'বালজাক এই যে, তাঁর নিজস্ব শ্রেণী সহানুভূতি ও রাজনৈতিক মতাদর্শের বিপক্ষে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন', কুমারী হারকনেসের কাছে ১৮৮৮ সালে লেখা তাঁর বিখ্যাত পত্রে এঙ্গেলস লিখছেন, 'তিনি যে তাঁর প্রিয় অভিজাতদের পতনের প্রয়োজনীয়তা লোচন করেছিলেন এবং তারা-যে এর চেয়ে ভাল কোন ভাগ্য আশা করতে পারে না সেটা চিত্রিত করেছেন; এবং তিনি যে প্রকৃত মানুষদের প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভবিষ্যতে, যেখানে আপাতভাবে হলেও তাদেরই শুধু পাওয়া যাবে—সেটাকে আমি বাস্তববাদিতার মতত্তম বিজয়ের অন্যতম নিদর্শন বলে বিবেচনা করি এবং

www.pathagar.com

সেটাই প্রবীণ বালজাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।'

মার্কস গিয়েছেন আরো বেশি। তিনি বালজাককে প্রশংসা করেছেন শুধু এ জন্যে নয় যে, তিনি তার কালের সমাজবাস্তবতাকে উন্মোচন করেছেন, বরং এ জন্যেও যে, ঐ-সমাজের অপেক্ষমাণ অনিবার্য ভবিষ্যৎকেও তিনি চিত্রিত করেছেন। 'বালজা তোর কালের সমাজের শুধু ইতিহাসকারই ছিলেন না, বরং ঐসব টাইপ চরিত্রেরও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা স্রষ্টা ছিলেন যেগুলো লুই ফিলিপের শাসনামলে শুধু ভ্রূণাকারে ছিল এবং পূর্ণ বিকশিত হয় তৃতীয় নেপোলিয়নের কালে, তথা লেখকের মৃত্যুর পরে।' –মার্কস লিখেছেন তাঁর কন্যাজামাতা পোল লাফার্গের কাছে চিঠিতে।

রাজনৈতিক বা দার্শনিক দৃষ্টিঙ্গির বিচারে 'প্রতারক' বা 'পক্ষপাতী' চেতনাও বাস্তবতাকে অত্যন্ত যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে সক্ষম শৈল্পিক চেতনার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলতে পারে— এ কথায় আস্থা রাখায় মনে হতে পারে যে, মার্কস ও এঙ্গেলস মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের মূল্যকে যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে ফেলেছেন। একজন লেখক কেন সমাজবাস্তবতা সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে কষ্ট করবেন যখন তার নিজস্ব কৌশলের সদ্ব্যবহার তাকে মোটমুটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রেণী অবস্থানের বাইরে তাকাতে ক্ষমতা দেয় এবং তার রচনার সম্পূর্ণ জীবন্ত গঠনকৌশলকে শুধু চলমান বাস্তবতার সম্মুখগতি নির্দেশ করার ও তথা ভবিষ্যতের ছবি দেখারও ক্ষমতা দেয়?

মার্কসবাদ রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গৃহীত হবার মুহূর্ত থেকে সমস্যাটি বিশেষ তীব্র হয়ে উঠেছে; এবং একে অনুধাবনের চেষ্টায় গেওর্গ লুকাচ দু-স্তর বিশিষ্ট এক সমাধান হাজির করেছেন। সেটা স্ববিরোধী এই অর্থে যে, সেটা দু'ভাগে বিভক্ত। একদিকে তিনি দাবি করেন যে, একজন লেখক পৃথিবীকে ঘিরে সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন লালন করেন এই কারণে যে, 'অন্য যে-কোন স্বপ্নের চেয়ে অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গতার ও অনেক বেশি গভীরতার কারণে সেটা লেখককে এমন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেয় যা সামাজিক অস্তিত্ব ও সামাজিক চেতনা,মানুষ ও মানবীয় সম্পর্ক, মানবজীবনের মুখোমুখি হওয়ার সমস্যা ও এতে অন্তর্নিহিত সমাধান প্রভৃতিকে প্রতিফলিত ও উপস্থাপিত করার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে স্বচ্ছদৃষ্টি সম্পন্ন।' কিন্তু অন্যদিকে মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষার প্রতি তিনি বিশ্বস্ত থাকেন এই অর্থে যে, যতই ভাববাদী হোক না কেন, একই প্রতারক চেতনা বাস্তববাদী শিল্পরচনার পথে কোন প্রকারেই প্রতিবন্ধক হতে পারে না বলে তিনি বিশ্বাস করেন। লেনিন নিজেই কি একদা গোর্কিকে বলেননি যে, 'একজন শিল্পী যে কোন দর্শন থেকে নিজের জন্য উপকারী অনেক উপাদান নিষ্কাশিত করে নিতে পারেন, ঐ দর্শন ভাববাদী হয়ে থাকলেও।'

লেখকের রাজনৈতিক অঙ্গীকার সম্পর্কে গেওর্গ লুকাচের আন্তরিক বিশ্বাসকে

www.pathagar.com

উপলব্ধি করা খুব কষ্টকর মনে হয় না। উনিশ শতকের মহান বাস্তববাদীদের এবং টমাস মানের ব্যাপারে তাঁর আবেগপ্রবণ কৌতূহলের কথা সর্বজনবিদিত। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের প্রসেঙ্গে তাঁর অসংখ্য আপত্তি সবার জানা। যদিও তিনি হালকাভাবে মনে করেন যে, ভবিষ্যতকে চকিতে দর্শন করতে সক্ষম যে-সাহিত্য তার রচনার জন্য সচেতনতা, তথা পার্টি সিদ্ধান্তের প্রতি অনুগত থাকা, প্রয়োজনীয় শর্ত; তবু একই নিশ্বাসে তিনি যোগ করেন যে, এই উপযুক্ত সচেতনতা প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণের চেয়ে অনেক দূরে অবস্থিত। তাঁর মত হচ্ছে এ ধরনের সচেতনতার ওপর সাহিত্য সৃষ্টি নির্ভরশীল নয়। তিনি লিখছেন, 'এ কথা বিশ্বাস করা হবে আত্মঘাতী ভুল যে, যথার্থ সচেতনতাকে বাস্তবের সঠিক, বাস্তববাদী এবং শৈল্পিক প্রতিফলনে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া প্রতারক চেতনাকে রূপান্তরিত করার তুলনায় নীতিগতভাবে অধিকতর প্রত্যক্ষ ও সহজতর।' সে জন্যে পার্টির চাপের মুখে কিছু আপাত সুবিধা দিলেও উদার মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের পোষক লুকাচ সম্পর্কে এটাই সত্য যে, তাঁর কাছে সাহিত্যকর্মের কাজ নিজের ভেতরে ও নিজের জন্যেই এবং তাঁর মতে সাহিত্য-সমালোচনা অভ্যন্তরীণ নীতি মেনে চলে এবং সেগুলো বিশুদ্ধ রাজনৈতিক মানদণ্ড থেকে পৃথক।

মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের ভাবাদর্শ ও সৃজনশীল কর্ম— এ দুয়ের সম্পর্ক নিয়ে দুটো অভিমত আছে : প্রাথমিক বিবেচনায় এদের গতি কেন্দ্রমুখী বলে মনে হলেও শেষ পর্যন্ত সেগুলো দুটো স্পষ্ট ভিন্নমুখী অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে। বিশেষ করে ১৯৩৪ সালে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা পার্টির আদর্শ বলে গৃহীত হওয়ার পূর্বেকার আলোচনার মাধ্যমে এ-ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

এদের প্রথমটি হচ্ছে সাধারণভাবে যেটাকে 'উদ্দেশ্য প্রবণতা' বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস 'তরুণ জার্মানি আন্দোলন' থেকে নামটি গ্রহণ করেছেন– সেখানে এটা ব্যবহৃত হতো বিশুদ্ধ শিল্পকলার বিপরীতে প্রগতিশীল পক্ষপতিত্ব বা উদ্দেশ্যমুখী সাহিত্যকে বর্ণনা করার জন্য। কিন্তু সরাসরি গ্রহণ করলেও মার্কস ও এঙ্গেলস শব্দটিকে নতুন তাৎপর্য প্রদানে প্রয়াসী হন। তাদের মতে এ প্রশ্ন সৃজনশীল রচনাকে দুটো স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করার নয়– যে দুটোর একটা হচ্ছে 'উদ্দেশ্যমুখী' শব্দ দ্বারা উপস্থাপিত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, অপরটি হচ্ছে কিছুটা রাজনৈতিক বা সামাজিক রঙ বিশিষ্ট বলে মোটামুটি শিথিলভাবে বর্ণিত নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি– বরং রচনাকে তার 'সামাজিক অনুশীলনের' সঙ্গে আন্তরিকভাবে যুক্ত করার ব্যাপার– অর্থাৎ লেখকের নৈতিক কর্তব্যের ও সামাজিক বিবর্তনের মধ্যেকার সুগভীর, অবিচ্ছেদ্য মিলনকে প্রদর্শন করা।

একজন লেখক ভুল করেন তখন যখন তিনি বাস্তবতার অভ্যন্তরীণ ও দ্বান্দ্বিক

www.pathagar.com

নিয়মকে উন্মোচিত করার পরিবর্তে নিজস্ব মতামত সরাসরিভাবে ও তাৎক্ষণিকভাবে লেখায় চাপিয়ে দেন। সাহিত্যে ও শিল্পকলার লেখকের উদ্দেশ্যপ্রবণ মনোভাব সামঞ্জস্যপূর্ণ শুধু তখনই হয় যখন সেটা লেখার শৈল্পিক নির্যাসের সাংগঠনিক ফসল হিসেবে দেখা দেয়। এটাই সেটা যা কাউটস্কির কাছে লেখা ১৮৮৫ সালের ২৬-এর নভেম্বরের চিঠিতে এঙ্গেলস বিশেষ করে নির্দেশ করেছেন— 'আমি কোনক্রমেই উদ্দেশ্যমুখী কবিতার বিরোধী নই। ট্র্যাজেডির জনক ইস্কাইলাস ও কমেডির জনক এ্যারিস্টোফেনিস উভয়ে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্দেশ্যমুখী ছিলেন, দান্তে ও সার্ভেন্টিস কোন অংশেই কম ছিলেন না এবং শিলারের Kabale und liebe সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল এটাই বলা যায় যে, রাজনৈতিক সমস্যাভিত্তিক জার্মান নাটকের সেটা প্রথম উদাহরণ। আধুনিক রাশিয়ান ও নরওয়েজীয়ান, যারা চমৎকার সব উপন্যাস লেখেন, তারা সবাই উদ্দেশ্য নিয়ে কলম ধরেন। আমি অবশ্য মনে করি যে, একেবারে সরাসরি বর্ণিত না-হয়ে পরিস্থিতি ও কার্যকলাপ নিজেই উদ্দেশ্যকে মূর্ত করে তুলবে এবং লেখকের বর্ণিত সামাজিক দ্বন্দ্ব ভবিষ্যৎ ইতিহাসে যেভাবে মীমাংসিত হবে সেটা বড় থালায় রেখে পাঠকের সামনে তুলে ধরার কোন দরকার নেই।' অপর এক লেখকের কাছে প্রেরিত চিঠিতে তিনি আরো পরিষ্কার করে বলে বলেছেন, কোন লেখায় প্রকাশিত বাস্তবতার নির্যাসকে নিজেই উন্মোচিত হতে দেওয়া লেখকের পক্ষে কত বেশি জরুরি : 'লেখকের নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামতকে তুলে ধরে একটি নির্ভুল সমাজতান্ত্রিক উপন্যাস, আমরা জার্মানরা যাকে বলি উদ্দেশ্যমুখী উপন্যাস, না লেখার জন্যে আপনার অপরাধ হয়েছে সেটা আমি কোনক্রমেই বিশ্বাস করি না। আমি তা বলতে চাই না। লেখকের অভিমত যত বেশি গুপ্ত থাকবে, শিল্পের জন্যে সেটা তত বেশি উপকারী'— তিনি বলেছেন।

লাসালের ট্র্যাজেডি নিয়ে মার্কস যে সমালোচনা করেছিলেন তার ভিত্তি অনেকাংশে এটা যে, লাসালের লেখায় ক্রিয়া ও নৈতিকতার বিচ্ছিন্নতা রয়েছে বলে তাঁর ধারণা। মঞ্চের মধ্যে উন্মোচিত কার্যের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার পরিবর্তে, লেখক যেসব চরিত্রকে নিজের মুখপাত্র হিসেবে নির্বাচিত করেছেন, তাদের মুখে খামখেয়ালীভাবে বসিয়ে দেয়া নির্ধারিত বক্তৃতার মাধ্যমে লেখকের নৈতিক চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে; মার্কসের মতে লাসালের উচিত ছিল ট্র্যাজেডির নায়কদের তাদের নিজস্ব সত্তার কাছে বিশ্বস্ত হবার সুযোগ সৃষ্টি করা, শেষ সীমানা পর্যন্ত তাদের সম্ভাবনাকে পরীক্ষা করা এবং তাদের ব্যক্তিত্বের অন্তঃস্থ সাংগঠনিক দ্বান্দ্বিকতাকে আবিষ্কার করা। 'তাহলেই তোমার পক্ষে সর্বাধুনিক চিন্তাসমূহকে সবচেয়ে অকপট ভঙ্গিতে ও অনেক ব্যাপকাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হতো, কিন্তু এখানে তদস্থলে 'ধর্মীয়' স্বাধীনতার প্রসঙ্গ বাদ দিলে বুর্জোয়া ঐক্য বস্তুতপক্ষে প্রধান চিন্তা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে, তুমি তোমার

www.pathagar.com

ভাবনাসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অধিক শেক্সপিয়রীয় রীতিতে প্রকাশ করাতে বাধ্য হতে, কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হিসেবে আমি নির্দেশ করি তোমার শীলারের পদ্ধতি অনুসরণ করাকে অর্থাৎ চরিত্রসমূহকে সমকালিন চেতনার মুখপাত্রে পরিণত করাকে।' লাসালের কাছে ১৮৯৫ সালের ১৯ই এপ্রিল লিখিত চিঠিতে মার্কস বলেছেন এসব কথা।

দ্বিতীয় অবস্থান 'পার্টি চেতনা' নাম বহন করে। সংবাদপত্র ও পার্টি সাহিত্যকে পরিচালিত করা উচিত যে চেতনা, সেটা বোঝাবার জন্যে লেনিন কর্তৃক ব্যবহৃত এই পদটি পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সতর্ক সংকেতে পরিণত হয়। 'উদ্দেশ্যমুখিতার' আঙ্গিকবাদী বিচ্যুতির (অর্থাৎ যা উজ্জ্বল সমাজতান্ত্রিক ব্যানারে বিচ্ছিন্ন বাস্তবতাকে আচ্ছাদিত করে রাখে এবং এভাবে 'শাশ্বত কর্তব্য' ও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত অমানবিক পৃথিবীর মধ্যেকার সেতুবন্ধনে অক্ষম দূরত্বের মধ্যে নিছক কাগজ টেনে দেয়) বিপরীতে স্বাভাবিকভাবে সমাজতন্ত্র অভিসারী সমাজের গতিপ্রেরণাকে চেতনার পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত করতে পার্টি চেতনা লেখক বা শিল্পীকে সক্ষম করে। অন্তঃস্থ দ্বন্দ্বের কারণে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংস্কৃতির বিস্তার রুদ্ধ হয় কিন্তু সমাজকে ধনতান্ত্রিক যুগের ওপারে প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে লেখক সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। যেহেতু সমাজ বাস্তবতার মধ্যে পার্টি চেতনা মোটামুটিভাবে অন্তর্নিহিত আছে, সেজন্যে বাস্তবতাকে 'বস্তুতন্ত্রতার পার্টি চেতনা' বলে বর্ণনা করা সম্ভব।

পার্টি চেতনা সম্পর্কে ভিন্ন কাঠামোতে ভিন্ন মোড়কে পরিবেশিত হলেও এই উদার ধারণা মার্কস-এঙ্গেলসের রূপরেখাকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে এবং সাহিত্যানুশীলনের সত্য সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করে; কিন্তু ১৯৩০ সালের পর থেকে মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব অধিকতরভাবে দল নিয়ন্ত্রিত হলে সংকীর্ণ রাজনৈতিক চিন্তা ক্রমশ তাকে স্থানচ্যুত করে। পার্টি চেতনা তখন তার মোটামুটি বিমূর্ত চরিত্র হারায় এবং যেহেতু এটা বিমূর্ত সেহেতু ব্যাপকতম ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এটা একান্তভাবে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি রূপে পরিচিত হয়— শুধু এই শ্রেণীই মার্কসীয় তত্ত্বানুযায়ী সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে দূর করার অবস্থানে আছে, যেহেতু এটাই সেই শ্রেণী যা নিজে সর্বাধিক পরিমাণের বিচ্ছিন্নতায় পীড়িত হয়েছে; এবং এটাই একমাত্র শ্রেণী যা নিজস্ব প্রকৃতিগত কারণে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। সেজন্যে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের দায়িত্ব হচ্ছে- 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে' বর্ণিত ঐসব লোকের পাশে দাঁড়ানো যারা 'একদিকে নানা দেশের মজুরদের জাতীয় সংগ্রামের ভেতর জাতি নির্বিশেষে সারা প্রলেতারিয়েতদের সাধারণ স্বার্থটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাকেই সামনে টেনে আনে এবং একই সঙ্গে

www.pathagar.com

বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইকে যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হয় তার মধ্যে তাঁরা সর্বদা সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।'

বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক চাহিদার সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেসব বিবেচনার কোনও প্রকার সম্পর্ক নেই, সেসব দ্বারা অনুপ্রাণিত কৌশল অনুযায়ী, মার্কসবাসী নন্দনতত্ত্ব সেজন্যে আন্দোলিত হয় দু'প্রান্তে : একদিকে বিচ্ছিন্নতার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলা মানবজীবনের সামগ্রিকতার স্বপ্ন দেখায় উৎসাহিত করে, অপরদিকে প্রলেতারিয়েতদের ওপর কঠোর নির্ভরশীলতকার কারণে পার্টি নির্দেশের কাছে অন্ধ আত্মসমর্পণের সমার্থক হয়ে ওঠে। কিন্তু যখনই এটা স্বীকার করে নেয়া হয় যে, সঠিক মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বকে নিশ্চিতভাবে নির্ভর করতে হবে প্রথমত ও প্রধানত দ্বান্দ্বিকতার নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়োগের ওপর এবং যা দরকার সেটা হচ্ছে তালিকাভুক্ত না-হওয়া ঐ-বাস্তবতার সেবায়, যা শুরুতে বিশেষ শ্রেণীর প্রয়োজনের সীমায় পর্যবসিত হয়েছে বরং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমবায়ে নির্মিত সামগ্রিকতার মধ্যস্থ ঐ শ্রেণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে আবিষ্কার করা, তখনই এই নন্দনতত্ত্ব নিয়ে যায় সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদে যার চরম নীতিমালা হচ্ছে মানবতার মূল নির্যাসের লক্ষ্যে প্রগাঢ় অনুসন্ধান এবং ইতিহাসের সর্বপ্রকার স্থানচ্যুতি ও সর্বপ্রকার চোরাগহ্বরের বিরুদ্ধে মানবীয় সমগ্রতার সংরক্ষণ। নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে এ-ধারণা লেখকদের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে না— যে লেখকরা ভিন্ন রাজনৈতিক মতামত পোষণ করলেও শেষ পর্যন্ত এমন বস্তুনির্ভরতার অংশভাগী হয় যাকে লুকাচ তাঁর 'দি হিস্টরিক্যাল নভেল'-এ বর্ণনা করেছেন মানবসমাজের বস্তুনির্ভর বাস্তবতার ভেতরে ঐতিহাসিক শক্তিসমূহের দ্বন্দ্ব থেকে 'সুসম্বন্ধভাবে' উত্থিত বলে। এ ধারণা শেষ পর্যন্ত মন্ময়মূল্যকে একমাত্র মাপকাঠি বলে স্বীকার করে, কেননা চরম আপোষহীন চেতনার অধিকারী ও শিল্পের জন্যে সব কিছু বিসর্জন দিকে ইচ্ছুক মহৎ শিল্পীরাই শুধু সক্ষম এ ধরনের ব্যাপক সাহিত্য প্রয়াসে নিয়োজিত হতে এবং ব্যক্তিগত ঝোঁকের প্রতি প্রতিকূল হয়েও আদর্শগত বস্তুনির্ভরতার অনুশীলন করতে।

লুকাচ তাঁর 'বালজাক অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ রিয়ালিজম' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'যখন পরিস্থিতির মধ্যে অন্তর্নিহিত শৈল্পিক বিকাশ এবং মহৎ বাস্তববাদীদের দ্বারা কল্পিত পাত্র-পাত্রীরা লেখকদের স্বলালিত পক্ষপাতিত্বের এবং এমনকি তাদের সবচেয়ে আন্তরিক বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়, তারা তাদের পক্ষপাতিত্বকে ও বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়ে বাস্তবক্ষেত্রে যা দেখেন তাকে বর্ণনা করতে এক মুহূর্ত ইতস্তত করেন না। তাদের নিজস্ব তাৎক্ষণিক মন্ময় জগতের ছবির প্রতি এই নিষ্ঠুরতা মহৎ বাস্তববাদীদের সবচেয়ে গভীর পেশাগত নীতিবোধকে ধারণ করে— এর বিপরীতে রয়েছে ঐ দুর্বল লেখকেরা যারা প্রায় সবসময় জগত সম্পর্কে তাদের কল্পচিত্রকে বাস্তবতার সঙ্গে আপস-রফায় নিয়ে যেতে সমর্থ হয়।'

www.pathagar.com

যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের যুগে শিল্পকলা *

ওয়ালটার বেনজামিন (১৮৯২-১৯৪০) জার্মান মার্কসীয় সাহিত্যসমালোচক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও দার্শনিক। তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলে সমালোচনাত্মক তাত্ত্বিক হিসেবে যুক্ত ছিলেন এবং বার্টল্ড ব্রেখটের মার্কসবাদ ও জারশম শোলেম-এর ইহুদি অধ্যাত্মবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। সমাজবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-তাত্ত্বিক হিসেবে তিনি ইহুদি অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন যা মার্কসীয় দর্শন ও নন্দনতত্ত্বে নতুন অবদান হিসেবে হাজির হয়েছিল। সাহিত্যের পণ্ডিত হিসেবে তিনি মার্সেল প্রুস্ত ও চার্লস বোদলেয়ারের সাহিত্যের অনুবাদ করেছেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা Critique of Violence, The Origin of German Tragic Drama, Berlin Childhood, On the concept of History, The Author as Producer, 8 notes on Brecht's Epic Theatre, Goethe : The reluctant Bourgeois, Paris—Capital of the 19th century, Charles Baudelaire : A lyric poet in the era of high capitalism. **এছাড়া তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলোর দুটি বিখ্যাত ইংরেজি সংকলন**-Illuminations ও Reflections.
নাজীদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেশত্যাগের সময় তিনি তাদের হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন।

সুদূর অতীতের এমন এক কালে চারুশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল এবং এর বিভিন্ন ঘরানা ও ব্যবহার একটা নির্দিষ্ট রূপ পেয়ে গিয়েছিল, যে-কালটি নানান বিচেনায় আমাদের কাল হতে পৃথক। যাদের পৌরহিত্যে এ-যজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে, বলতেই হবে, আমাদের তুলনায় বস্তুজগতের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল অনেক অনেক কম। প্রয়োজনানুগ পরিবর্তন আর সূক্ষ্মতা অর্জনের মধ্য দিয়ে আজ প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে; এতে করে বদলে গেছে আমাদের ধারণা ও অভ্যাস। ফলে সৌন্দর্য-শৈলী সম্বন্ধে আমাদের পুরানো আন্দাজের-যে বদল ঘটবে তা বলাই বাহুল্য। সব ধরনের শিল্পেই শরীরী অঙ্গসংস্থানের একটা ব্যাপার আছে; ব্যাপারটাকে আগে যেভাবে দেখতে বা ভাবতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, আধুনিক জ্ঞান আর শক্তির প্রভাবে তাতে বড় ধরনের রূপান্তর ঘটেছে। বস্তু, স্থান ও কাল সম্পর্কে স্মরণাতীত কাল থেকে যে-ধারণা আমরা লালন করেছি, গত বিশ বছরে তা আর আগের মতো নাই। এখন দরকার এক বড় ধরনের সৃষ্টিশীলতা, যা আমূল পাল্টে দেবে শিল্পকলার যাবতীয় শৈলী, যা প্রভাবিত করে যাবে শৈল্পিক উদ্ভাবনাকে, আর সম্ভবত রোমাঞ্চকর পরিবর্তন আনবে শিল্পকলা সম্পর্কিত আমাদের বর্তমান ধারণায়। পল ভালেরি, ১৯৩১।

---

* ওয়ালটার বেনজামিনের এই বিখ্যাত প্রবন্ধটি ১৯৩৬ সালে লিখিত। মূল জার্মান থেকে অ্যান্ডি বান্ডেনের করা ইংরেজি থেকে বাংলায় এই অনুবাদটি করা হয়েছে। অ্যান্ডি বান্ডেন ১৯৯৮ সালে অনুবাদটি করেন; ২০০৫ সালে তিনি অনুবাদটির খানিক পরিমার্জনাও করেন।

www.pathagar.com

ভূমিকা

মার্কস যে-কালে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন, তখনো এর শিশুকাল কাটেনি। বিকশিত পুঁজিতন্ত্রের সম্ভাব্য লক্ষণগুলো বিবেচনায় রেখেই তিনি আলোচনা করেছেন। পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার মূল প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে তা কী রূপ নেবে, তার হদিস দেওয়াই ছিল মার্কসের লক্ষ্য। তিনি দেখিয়েছেন, পুঁজি কেবল ক্রমবর্ধমান হারে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করবে না, শেষতক সে নিজে নিজে নিজেকে ধ্বংস করার শর্তও তৈরি করবে।

বুনিয়াদি-কাঠামোর তুলনায় উপরি-কাঠামোর রূপান্তর ঘটে অনেক ধীর গতিতে। পুঁজির কালে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন-সাপেক্ষে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপরি-কাঠামোর পরিবর্তন স্পষ্ট হতে অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময় লেগেছে। এই পরিবর্তন কী রূপ নিয়েছে, তা এখনই কেবল পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এই বাস্তবতা আমাদের সম্ভাব্য কিছু সিদ্ধান্তের দিশা দেবে। শ্রমিক-শ্রেণী যখন ক্ষমতার কেন্দ্রে আসীন হবে কিংবা যখন শ্রেণীহীন একটা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনকার শিল্পকলাকে ব্যাখ্যা করার তত্ত্ব ও প্রণালি-পদ্ধতি বর্তমান উৎপাদন-কাঠামোর বাস্তবতায় শিল্পকলার বিকাশমান প্রবণতাগুলো ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বেশ কাজে আসবে। অর্থনৈতিক স্তরে ক্রিয়াশীল দ্বান্দ্বিক-প্রক্রিয়া উপরি-কাঠামোতে কিছুমাত্র কম দৃশ্যমান নয়। তাই শিল্পকলার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কৌশল হিসেবে দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব ও প্রণালি-পদ্ধতিকে অবমূল্যায়ন করা ভুল হবে।

শিল্পকলা ব্যাখ্যার কতগুলো পুরানো ধারণা আছে, যেমন সৃষ্টিশীলতা ও মেধা, চিরন্তন মূল্য ও রহস্যময়তা ইত্যাদি। এদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার (এখানকার বাস্তবতায় এগুলো প্রায় নিয়ন্ত্রণ-অযোগ্য রূপেই বিদ্যমান) ফ্যাসিবাদী কায়দায় উপাত্ত-প্রক্রিয়াকরণের দিকে আমাদের চালিত করে। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা শিল্পতত্ত্বের এমন কিছু ধারণার অবতারণা করব, যেগুলো প্রচলিত এই শিল্প-ধারণা থেকে পৃথক। পৃথক এই অর্থে যে, এগুলো পূর্বোক্ত ফ্যাসিবাদী প্রবণতার অনুগামী নয়। তদুপরি, এসব ধারণা শিল্পকলার রাজনীতিতে বৈপ্লবিক সম্ভাবনার দিকনির্দেশনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১

নীতিগতভাবে শিল্পকলা চিরকালই পুনরুৎপাদনযোগ্য। এদের শিল্পকর্ম বরাবরই অন্যের দ্বারা অনুকৃত হত। শৈলীচর্চার অংশ হিসেবে শিষ্যরা ওস্তাদের কাজের নকল বানাত, ওস্তাদ নিজেও নিজ শিল্পকর্মের প্রতিলিপি করত প্রচার-প্রপাগাণ্ডার অংশ হিসেবে, আর অন্যরা

www.pathagar.com

করত লাভের আশায়। শিল্পকলার যান্ত্রিক পুনরুৎপাদন অবশ্য অন্যরকম ব্যাপার। ইতিহাসে এটা ঘটেছে থেমে থেমে এবং দীর্ঘ বিরতির পর, হঠাৎ উল্লম্ফনে। অবশ্য যখন ঘটেছে তখন ঘটেছে প্রবল গতিতেই। গ্রীকরা শিল্পের পুনরুৎপাদনের দুটি মাত্র প্রক্রিয়া জানত; নতুন করে তৈরি করা আর ছাপ দেওয়া। শিল্পকর্মের মধ্যে তারা কেবল ব্রোঞ্জের কাজ, টেরাকোটা এবং মুদ্রা বেশি সংখ্যায় উৎপাদন করতে পারত। অন্যগুলো ছিল একেশ্বর এবং পুনরুৎপাদনের অনুপযোগী। ছাপাখানায় পাণ্ডুলিপির পুনরুৎপাদন শুরু হওয়ার অনেক আগে কাঠ-খোদাই নকশার সাহায্যেই শিল্পকলা প্রথমবারের মতো যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের মুখ দেখে। আর লেখার পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে ছাপাখানা সাহিত্যজগতে যে-অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছিল, তা তো খুব পরিচিত ঘটনা। যাই হোক, বিশ্ব-ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যে-ধারাবাহিক প্রগতি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি, তাতে ছাপাখানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও একটা ঘটনা মাত্র। মধ্যযুগেই কাঠ-খোদাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হল খোদাইকর্ম এবং এচিং (ধাতব প্লেটে সূঁচ ও এসিড ব্যবহার করে ছবি আঁকার বিশেষ পদ্ধতি।- অনুবাদক), উনিশ শতকের শুরুতে আবির্ভূত হল লিথোগ্রাফি (পাথর, দস্তা অথবা এলুমিনিয়ামের পাত ব্যবহার করে বিশেষত ছবি ছাপানোর পদ্ধতি।- অনুবাদক)।

শেষোক্তিটির মধ্য দিয়ে পুনরুৎপাদন-কৌশল যথার্থ অর্থে এক নতুন যুগে প্রবেশ করল। এই পদ্ধতিতে কাষ্ঠখণ্ডে খোদাই বা তামার পাতে ট্রেসিং করতে হত না; বরং একটা পাথরখণ্ডে কোনো নকশা হুবহু ট্রেসিং করা যেত। সরাসরি ট্রেসিং করতে পারার দৌলতে এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো নকশাশিল্প পণ্য আকারে বাজারে আসতে লাগল—কেবল বিপুল সংখ্যাতেই নয়, নিত্যনতুন রূপেও। লিথোগ্রাফির ফলে প্রাত্যহিক জীবনকে নকশায় চিত্রিত করা সম্ভব হল এবং ছাপার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তা এগুতে লাগল। মাত্র কয়েত দশকের মধ্যেই আলোকচিত্র এল, ছাড়িয়ে গেল লিথোগ্রাফিকেও। চিত্রের পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় এই প্রথম আলোকচিত্র শৈল্পিক ক্রিয়াকর্ম থেকে হাতকে মুক্তি দিল। শৈল্পিক কর্মে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল লেন্সের পেছনে ক্রিয়ারত চোখ। চোখ হাতের তুলনায় অনেক দ্রুত কাজ করতে পারায় চিত্রের পুনরুৎপাদন এতটাই গতিশীল হয়ে উঠল যে, তা কথা বলার গতির সঙ্গে সমানতালে চলতে পারল। স্টুডিওতে কাজের সময় একজন চলচ্চিত্রকর্মী অভিনেতার সংলাপের গতিতেই সমানতালে ছবি ধারণ করতে পারেন। লিথোগ্রাফি যে-অর্থে চিত্রসম্বলিত সংবাদপত্রের ইঙ্গিত করেছিল, ঠিক সে-অর্থেই আলোকচিত্র ছিল সবাক চলচ্চিত্রের পূর্বাভাষ। গত শতকের শেষপাদে শব্দের যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনও শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ-ধরনের সমধর্মী নানান চেষ্টা-চরিত্র এমন এক সম্ভাবনার জগৎ উন্মোচন করল, পল ভালেরির ভাষায়, যেখানে :

www.pathagar.com

আজ আমাদের প্রয়োজনীয় পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদির জোগান যেমন সহজে পাচ্ছি, ঠিক তেমন সহজ স্বাভাবিকতায় পাব দৃষ্টি বা শ্রুতিগ্রাহ্য চিত্রমালা–হাতের সামান্য নাড়াচাড়াতেই তারা আবির্ভূত হবে অথবা অপসৃত হবে।

১৯০০ সালের মধ্যে যান্ত্রিক পুনরুৎপাদন প্রয়োজনীয় সম্পন্নতা অর্জন করল। এর ফল হলো দুটো: এক. যেকোনো ধরনের শিল্পকর্মকে পুনরুৎপাদনের আওতায় নিয়ে আসার সাফল্যের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে শিল্পের প্রভাবের ক্ষেত্রে খুব গভীর পরিবর্তন এল; দুই. শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়াগুলোর তালিকায় সে নিজের স্থানটি পাকাপোক্ত করে নিল। শিল্পকলার পুনরুৎপাদন এবং চলচ্চিত্রের কৃৎকৌশল–এই দুই নতুন আয়োজন শিল্পকলার প্রথাগত চরিত্রে যেসব নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে, তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই আমরা পুরো ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পারব।

২

যত নিখুঁতভাবেই পুনরুৎপাদিত হোক না কেন পুনরুৎপাদিত শিল্পকলায় একটা উপাদানের ঘাটতি থাকবেই; মূল শিল্পকলার স্থান ও কাল, অর্থাৎ যে-বিশেষ স্থানিক বাস্তবতায় এটি অস্তিত্ব পেয়েছিল, পুনরুৎপাদিত শিল্পকলা কখনোই তার নাগাল পাবে না। আবির্ভাবের পর থেকে সময়ের নানা আঁচড়ের সাক্ষী হয়ে একটি শিল্পকলা অনন্যতা লাভ করে। কালপ্ররিক্রমায় শিল্পকর্মটি শারীরিক পরিবর্তন ঘটতে পারে, এবং মালিকানার ক্ষেত্রেও বিবিধ পরিবর্তন আসতে পারে। শারীরিক পরিবর্তেনের হদিস পাওয়া যাবে কেবল রাসায়নিক বা উপাদানগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে, পুনরুৎপাদিত শিল্পকলার ক্ষেত্রে যা অসম্ভব। মালিকানার যেকোনো পরিবর্তনও একটা দীর্ঘ ঐতিহ্যের ব্যাপার, যার চিহ্ন মূল শিল্পকর্মটির বাস্তবতার মধ্যে লভ্য।

প্রামাণিকতার ধারণা পুরোপুরি কোনো মূল বস্তুর উপস্থিতির সঙ্গে সমইর্কত। ব্রোঞ্জপাতের উপরিতলের সবুজ চকচকে পর্দার (patina of a bronze) রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রামাণিকতার সন্ধান মেলে, মধ্যযুগের একটা পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে যেরকম প্রমাণ করা সম্ভব যে, তা পঞ্চদশ শতকের কোনো সংগ্রহশালার অংশ। প্রামাণিকতার এই বিবেচনা যান্ত্রিক বা অন্য যেকোনো ধরনের পুনরুৎপাদনের বাইরের জিনিস। হাতে করা পুনরুৎপাদিত বস্তুর ক্ষেত্রে–সাধারণত যা জালিয়াতি হিসেবেই গণ্য হতো–পুনরুৎপাদিত শিল্পকর্মটির তুলনায় মূল শিল্পকর্মটি ছিল যাবতীয় কর্তৃত্বের অধীশ্বর। যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে অবশ্য অতটা বলা যায় না। অন্তত দুই কারণে। প্রথমত, পদ্ধতিগত পুনরুৎপাদন হাতে করা পুনরুৎপাদনের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীন।

www.pathagar.com

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক পুনরুৎপাদন মূলের এমন সব বৈশিষ্ট্য তুলে আনতে পারে, খালি চোখে যেগুলো অধরাই থেকে যেত। লেন্সে কিন্তু এগুলো ধরা পড়ে। লেন্সকে প্রয়োজনমতো খাপ খাইয়ে নিয়ে কিংবা পছন্দ মোতাবেক কোণ (angle) পরিবর্তন করে আমরা ব্যবহার করতে পারি। এভাবে আলোকচিত্রভিত্তিক পুনরুৎপাদন নিজস্ব পদ্ধতিগত সুবিধা, যেমন, ছোট-বড় করা কিংবা ধীর গতির শট নেওয়া ইত্যাদির বদান্যতায় এমন ছবি ধারণ করতে পারে, যা সাধারণ দৃষ্টিসীমায় ধরা পড়ে না। দ্বিতীয়ত, যান্ত্রিক পুনরুৎপাদন মূলের নকলকে এমন বাস্তবতায় নিয়ে আসতে পারে, যে-বাস্তবতায় মূল নিজে কখনো পৌঁছতে পারত না। সর্বোপরি, আলোকচিত্র বা গ্রামোফোন রেকর্ড দর্শক-শ্রোতাকে মূলের স্বাদটাই দিচ্ছে। ক্যাথিড্রাল নিজ অবস্থান ছেড়ে আসর গাড়ছে শিল্প-সমজদারের স্টুডিওতে, অডিটোরিয়াম বা উন্মুক্ত প্রান্তরের কোনো সমবেত প্রযোজনা শোনা সম্ভব হচ্ছে ড্রয়িংরুমের চৌহদ্দিতে।

যান্ত্রিক পুররুৎপাদনের মধ্য দিয়ে কোনো শিল্পকর্মকে আমরা যেভাবে পাই, মূল শিল্পকর্মের পরিস্থিতির সঙ্গে তার তুলনা চলে না। পুররুৎপাদনে মূল্য কমে বলেই ধরে নেওয়া হয়। এই ব্যাপার অবশ্য কেবল শিল্পকলার ক্ষেত্রে নয়, প্রাকৃতিক উপাদানের ক্ষেত্রেও ঘটে। উদাহরণ হিসেবে চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত ভূ-প্রাকৃতিক কোনো দৃশ্যের উল্লেখ করা যায়। চলচ্চিত্রায়িত দৃশ্য মূল দৃশ্যের তুলনায় কম মূল্যই পেয়ে থাকে। যদিও স্পর্শকাতর মূল বিবেচ্য হিসেবে শিল্পকলার ক্ষেত্রে 'প্রামাণিকতা' যতটা গুরুত্বপূর্ণ, প্রাকৃতিক বস্তুর ক্ষেত্রে অতটা কখনোই নয়। কোনো জিনিসের 'প্রামাণিকতা' তার প্রকৃত আয়ুষ্কালের অভিজ্ঞতা দ্বারা চিহ্নিত হয়—শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য যেসব সারবত্তা তার তহবিলে জমা হয়েছে কিংবা ইতিহাসের যেসব সাক্ষ্য সে বহন করছে, সবই এর অংশ। পুররুৎপাদনের ফলে বস্তুর এই ঐতিহাসিক তাৎপর্য ক্ষুণ্ন হয়। আর ঐতিহাসিক তাৎপর্য ক্ষুণ্ন হলে প্রকৃতপক্ষে বস্তুর কর্তৃত্বই নষ্ট হয়ে যায়।

এই নষ্ট-হওয়া উপাদানকে বলতে পারি 'সৌরভ' বা 'মহিমা' (aura)। বলতে পারি: পুররুৎপাদনের এই যুগে শিল্পকর্ম 'মহিমা' হারায়। এই লক্ষণসূচক প্রক্রিয়া শিল্পকলার বর্তমান পরিধি-বহির্ভূত নতুন এক তাৎপর্যের জন্ম দিয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, পুররুৎপাদন-কৌশল বস্তুকে ঐতিহ্যচ্যুত করে। পুররুৎপাদনের মাধ্যমে একক ও অনন্য বস্তুর জায়গায় অসংখ্য নকল উৎপন্ন হয়। দর্শক বা শ্রোতা তার নিজের অবস্থানে থেকেই পুররুৎপাদিত শিল্পকর্ম উপভোগ করতে পারে—এ যোগ্যতা পুররুৎপাদন প্রক্রিয়ার বৈধতার প্রধান ভিত্তি। উপর্যুক্ত দুই প্রক্রিয়ার যৌথফল ঐতিহ্যচ্যুতি, যা আমাদের কালেরই প্রতিচ্ছবি। আর এত করে পুরো মানবজাতির সম্ভাবনার নতুন এক দিগন্তও উন্মোচিত হয়। সাম্প্রতিক গণজাগরণের সঙ্গে এসব বিষয় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

www.pathagar.com

চলচ্চিত্র পরিবর্তিত গণমানসের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিচ্ছবি। চলচ্চিত্রের সামাজিক তাৎপর্য–বিশেষত এর সবচেয়ে ইতিবাচক রূপে–কিছুতেই উপলব্ধি করা যাবে না, যদি এর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা, বিমোক্ষম ক্ষমতা, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বিদ্যমান প্রথানুগ মূল্যের বিস্মৃতি (liquidation) ঘটানোর ক্ষমতার কথা মনে না-রাখি। এটি সম্পূর্ণ নতুন এক অবস্থার ইঙ্গিত দেয়। এ-প্রসঙ্গে ১৯২৭ সালে করা অ্যাবেল গাঁস-এর উচ্ছ্বাসপূর্ণ মন্তব্যটি স্মরণীয় :

শেক্সপিয়র, রেমব্র্যান্ট কিংবা বেতোভেন এবার চলচ্চিত্র নির্মাণ করবে ... সমস্ত কিংবদন্তি, সমস্ত পুরাণ আর পুরাকাহিনী, ধর্মপ্রবক্তাগণ এবং ধর্মসমূহ–সবকিছুই পুনর্জন্মের প্রহর গুনছে। প্রাচীন বীরগণ দরোজার কাছে ভিড় জমিয়েছে।

অনুমান করি, অজ্ঞাতসারেই অ্যাবেল গাঁস এখানে এক দূরসঞ্চারী বিস্মৃতির আভাস দিয়েছেন।

৩

ইতিহাসের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্বের ধরন পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে তার বোধেরও পরিবর্তন ঘটেছে। বোধের সংগঠন-বিবর্তন-বৈশিষ্ট্য কেবল প্রকৃতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না, হয় ঐতিহাসিক বাস্তবতা দ্বারাও। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে জনসংখ্যার বিপুল পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আমরা রোমান শিল্পকলা এবং ভিয়েনা ঘরানাকে পেয়েছি। এসময় সেখানে পূর্বতন শিল্পকলা থেকে পৃথক নতুন এক শিল্পকলারই কেবল জন্ম হয়নি, শিল্পবোধেরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। রিগল্ আর উইকহফ-এর মতো ভিয়েনা ঘরনার পণ্ডিতগণ ধ্রুপদী শিল্প-ঐতিহ্যের গতিরোধ করে এর পতনকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। এরাই প্রথম তখনকার শিল্পবোধ সংগঠনের ব্যাপারে আলোকপাত করেন। এই পণ্ডিতদের অন্তর্দৃষ্টি যতই দূরসঞ্চারী হোক না কেন, তারা নিজেদের কেবল শেষ-রোমান যুগের বৈশিষ্ট্য-নির্দেশক তাৎপর্য আর বিশিষ্ট নিদর্শন শনাক্তিতেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। বোধের এই পরিবর্তনগুলো যে আসলে সামাজিক রূপান্তরেরই প্রতিফলন— এটা তারা দেখানোর উদ্যোগ নেননি, এবং সম্ভবত দেখানোর ভাষাও খুঁজে পাননি। অন্তর্দৃষ্টির এই হাল একালে আরও প্রকট। বর্তমানকালে শিল্পবোধের যেসব পরিবর্তন ঘটেছে, সেগুলোকে যদি 'মহিমা'র অবক্ষয় হিসেবে পাঠ করি, তাহলেই কেবল এর সামাজিক কারণগুলো দেখানো সম্ভব হবে।

ওপরে শিল্পবস্তুর ঐতিহাসিকতার সাপেক্ষে 'মহিমা'র যে-ধারণা প্রস্তাব করেছি, প্রাকৃতিক বস্তুর তুলনাসূত্রে তাকে আরও কার্যকরভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে। কোনো প্রাকৃতিক বস্তুর মহিমা আমরা সাধারণভাবে অনন্য এক সুদূরতার নিরিখেই ঠিক করি—তা

www.pathagar.com

যতই কাছের বস্তু হোক না কেন। গ্রীষ্মের বিকালে বিশ্রাম নেওয়ার সময় দিগন্তবিস্তৃত শৈলশ্রেণী যদি দৃষ্টিসীমায় আবির্ভূত হয়, অথবা গাছের ছায়াদানকারী শাখাটি যদি দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে ঐ-পর্বতশ্রেণী বা গাছের শাখা এক বিশেষ 'মহিমা'ময় রূপেই আমাদের কাছে ধরা দেবে। শিল্পমহিমার সমসাময়িক অবক্ষয়কে সহজে অনুধাবন করতে এই দৃষ্টান্তটি আমাদের সাহায্য করবে। শিল্পমহিমার বিলোপ দুটি পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল—দুটোই সমসাময়িক জীবনধারায় 'জনতা'র ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রথমত, কোনো কিছুকে স্থানিক ও মানবিকভাবে 'কাছের করে' পেতে একালের জনতার আকাঙ্ক্ষা—যার ফলে অনন্যতাহেতু কোনো বস্তুকে পাওয়ার বাধা অতিক্রমের জন্য তারা পুনরুৎপাদনকে প্রশ্রয় দেয়। সমিল আকারে অর্থাৎ পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে বস্তুকে কাছে পাওয়ার এই আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়ছে। নিশ্চয় ছবি সম্বলিত ম্যাগাজিন ও সংবাদনির্ভর ছায়াছবি যে-ধরনের পুনরুৎপাদিত ছবি হাজির করে, তা সরাসরি দেখা থেকে পৃথক। অনন্যতা আর স্থায়িত্ব সরাসরি দেখার সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত; অপরদিকে ছবিসম্বলিত ম্যাগাজিন ও সংবাদনির্ভর চলচ্চিত্রের সঙ্গে নিবিড় যোগ ক্ষণস্থায়িত্ব আর পুনরুৎপাদনের। দ্বিতীয়ত, 'বস্তুর বিশ্বজনীন সমতার ধারণা' আজ এমন মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে যে, পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে অনন্য বস্তুর সমতাবিধান স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। দূরত্বের খোলস থেকে বস্তুকে বের করে আনা কিংবা 'মহিমা'র ধারণাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া এরই চিহ্ন বহন করে। আমাদের শিল্পবোধের ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তন এভাবেই ধরা পড়ে; আর তত্ত্বীয় অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা লক্ষগোচর হয় পরিসংখ্যানের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব থেকে। বাস্তবতার সঙ্গে জনমানসের সমন্বয় আর জনমানসের সঙ্গে বাস্তবের সমন্বয় একটা অনিঃশেষ সম্ভাবনাময় প্রক্রিয়া—চিন্তার ক্ষেত্রেও, বোধের ক্ষেত্রেও।

৪

ঐতিহ্যের যেসব উপাদান কোনো শিল্পবস্তুর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়, শিল্পবস্তুর অনন্যতাকে তা থেকে আলাদা করা যায় না। এই ঐতিহ্য একই সঙ্গে সজীব ও পরিবর্তনশীল। উদাহরণস্বরূপ ভেনাসের একটা প্রাচীন মূর্তির কথা ধরা যাক, যা গ্রীকদের কাছে ছিল পরম পূজনীয়, আর মধ্যযুগের কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর কাছে অশুভ মূর্তিবিশেষ। তাহলে, ঐতিহ্যের বিবেচনায় এই দুই গোষ্ঠীর কাছে মূর্তিটির তাৎপর্য বেশ পৃথক। উভয়পক্ষের কাছেই কিন্তু আবার মূর্তিটির অনন্যতা অর্থাৎ বিশেষ 'মহিমা' বিদ্যমান। ঐতিহ্যগত পরিবেশের সঙ্গে শিল্পকর্মের যোগসাজস আদতে 'বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর পূজাপদ্ধতি'র (cult) মধ্যেই ধরা পড়ে। আমরা জানি, প্রাচীনতম শিল্পকলা উদ্ভূত হয়েছিল 'শাস্ত্রীয় আচার'-এর (ritual) প্রয়োজনে—প্রথমে জাদুবিদ্যা এবং পরে ধর্মীয় উপলক্ষে। মনে রাখা দরকার, মহিমাময় কোনো শিল্পকর্মের অস্তিত্ব তার এককালীন

www.pathagar.com

আচার-পালন-সহায়ক ভূমিকা থেকে কোনো অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন নয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো 'প্রামাণিক' শিল্পকর্মের অনন্যমূল্য পুরানা শাস্ত্রীয় আচারের ভিত্তিতেই নির্ণিত হয়—আদি উপযোগমূল্যের মধ্যেই নিহিত থাকে। শাস্ত্রীয় আচারভিত্তিক (ritualistic) বিবেচনা, যত আবছাভাবেই হোক না কেন, এখনও চিনে নেওয়া যায় সেকুলারায়িত আচারগুলোর মধ্যে—সৌন্দর্য-ভজনার এমনকি বাজে রেওয়াজগুলোর মধ্যেও এর দেখা মিলবে। সৌন্দর্য-সম্পর্কিত সেক্যুলার আচারগুলো বিকশিত হয়েছিল রেনেসাঁর কালে, আর জায়মান ছিল পরবর্তী তিন শতক ধরে। তখন পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল শাস্ত্রীয় আচারভিত্তিক বিবেচনার পতনদশা সমুপস্থিত। পুনরুৎপাদনের প্রথম বৈপ্লবিক মাধ্যম হিসাবে আলোকচিত্রের উদ্ভব এবং একই সময়ে সাম্যবাদের আবির্ভাবের কাল থেকে শিল্পকলায় নতুন সঙ্কটের সূচনা ঘটেছে। যদিও ব্যাপারটা পুরোপুরি খোলসা হয়েছে আরও অন্তত একশ বছর পরে। এই সঙ্কট 'শিল্পের জন্য শিল্প' (l' art pour l'art) মতবাদের সঙ্কট, যা ছিল আসলে শিল্পকলা সম্পর্কিত এক ধরনের ধর্মতত্ত্ব। এক আমরা বলতে পারি শিল্পকলার 'বিশুদ্ধতা'র ধারণার আবরণে বিকশিত এক প্রকার নঞর্থক ধর্মতত্ত্ব, যা কেবল শিল্পকলার সামাজিক গুরুত্বই অস্বীকার করেনি, বিষয়ানুগ বিভাজন-রীতিকেও অগ্রাহ্য করেছে। (কবিতার ক্ষেত্রে মালার্মে এই অবস্থান গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি)।

যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের এই যুগে শিল্পকলার যেকোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত সম্পর্কগুলোকে যথার্থ মূল্য দিয়ে বিবেচনায় আনতে হবে। তাহলে আমরা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব—বিশ্ব-ইতিহাসে যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনই প্রথমবারের মতো শাস্ত্রীয় আচারের নিগড় থেকে শিল্পকলাকে মুক্তি দিয়েছে। ব্যাপক পুনরুৎপাদন শিল্পকলাকে এমন রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য করেছে, যাপুনরুৎপাদনযোগ্য। যেমন, আলোকচিত্রের একটা নেগেটিভ থেকে যেকোনো সংখ্যাক ছবি ছাপানো সম্ভব। আর এই ক্ষেত্রে কোন কপিটি 'প্রামাণিক'—এই প্রশ্নের কোনো মানেই হয় না। এভাবে শিল্পকলার ক্ষেত্রে প্রামাণিকতার ধারণা রদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভূমিকাও গেছে পাল্টে। শাস্ত্রীয় আচারভিত্তিক হওয়ার পরিবর্তে তা এখন অন্য এক চর্চাকে ভিত্তি মানছে—এই চর্চার নাম রাজনীতি।

৫

শিল্পকলা মূল্যায়নের-উপভোগের নানা পথ আছে। এর মধ্যে দুটি পথ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী; একটা আচারগত মূল্যকে (cult value) বিশেষ গুরুত্ব দেয়, অন্যটি প্রদর্শনযোগ্যতাকে। গোড়ায় উৎসবাদির অনুষঙ্গ হিসাবে বিশেষ আচারের প্রয়োজনেই শিল্পকলার উদ্ভব ঘটেছিল। সেক্ষেত্রে শিল্পকর্মটির উপস্থিতিই ছিল মূল বিবেচ্য, প্রদর্শন

www.pathagar.com

নয়। পাথরযুগে গুহার দেয়ালে বাইসনের (the elk) ছবি আঁকা হত জাদুবিদ্যার উপাদান হিসাবে। অঙ্কনকারী ছবিটিকে সংশ্লিষ্টদের অগোচরে রাখতেন এমন নয়, কিন্তু প্রধানত জাদুবিদ্যাধর আত্মা হিসাবেই তা গ্রাহ্য হত। এখনও বিশেষ আচারগত মূল্য আছে যেসব শিল্পকর্মের, সেগুলোকে গোপন রাখার প্রবণতা দুর্লভ নয়। কিছু দেবমূর্তি আছে, যেগুলোর কোঠায় কেবল ধর্মযাজকরাই প্রবেশ করতে পারে; ম্যাডোনার বিশেষ কিছু মূর্তি প্রায় সারাবছরই ঢেকে রাখা হয়; মধ্যযুগের ক্যাথিড্রালে এমন কিছু ভাস্কর্য আছে, ভূমিরেখা থেকে যেগুলো দর্শকের দৃষ্টিসীমায় ধরা পড়ে না। এরকম দৃষ্টান্ত আরও দেয়া যাবে। যাহোক, বিশেষ আচার-সংশ্লিষ্টতা থেকে মুক্তির প্রেক্ষপটে বিভিন্ন শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হওয়ার ক্রমবর্ধমান সুযোগ তৈরি হয়েছে। মন্দিরের পুরোভাগে নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষিত কোনো দেবমূর্তির তুলনায় স্থানান্তরযোগ্য কোনো আবক্ষ মূর্তি প্রদর্শন করা নিশ্চিতভাবেই অনেক সহজ। মোজাইক-শিল্প বা দেয়ালে আঁকা চিত্রের তুলনায় এদের উত্তরসূরি চিত্রকলার প্রদর্শনযোগ্যতা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে আরেকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। জনসমক্ষে উপস্থাপনের বিচারে সমবেত দলীয় পরিবেশনা গুণমাহাত্ম্যে সম্ভবত সিম্ফনির মতোই গরীয়ান ছিল। কিন্তু সিম্ফনির আবির্ভাব সেই মুহূর্তেই সম্ভব হয়েছিল, যখন উপস্থাপনযোগ্যতার সম্ভাবনায় এটি দলীয় পরিবেশনাকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিল।

শিল্পকর্মের যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের পদ্ধতি আর প্রদর্শনযোগ্যতা এত বেশি বেড়েছে যে, শিল্প উপভোগ আর মূল্যায়নের পূর্বোক্ত দুই বিপরীতধর্মী পন্থায় পরিমাণগত বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে; অর্থাৎ, আচারমূল্যের তুলনায় প্রদর্শনযোগ্যতা বা উপস্থাপনযোগ্যতার গুরুত্ব অনেকগুণ বেড়েছে। এই পরিমাণগত পরিবর্তন শিল্পের প্রকৃতিতে গুণগত পরিবর্তনেরও কারণ হয়েছে। শিল্পকর্ম সম্পর্কে আজকের দৃষ্টিভঙ্গি এক অর্থে প্রাগৈতিহাসিক কালের সঙ্গেই তুলনীয়। তখন শাস্ত্রীয় আচারগত মূল্যকে চরম গুরুত্ব দিয়ে শিল্পকে প্রথমত ও প্রধানত জাদুবিদ্যার উপাদানরূপে গণ্য করা হত। অর্থাৎ উপযোগমূল্যই ছিল প্রধান। শিল্প হিসাবে এগুলো চিহ্নিত হয়েছিল অনেক পরে। ঠিক তেমনই প্রদর্শন প্রদর্শনযোগ্যতার চরম গুরুত্বের এই যুগে শিল্পকলা সম্পূর্ণ নতুন সব তাৎপর্যের অধীশ্বর হয়েছে, যেগুলোর কেবল একটা—নন্দনতাত্ত্বিক তাৎপর্য—সম্পর্কে আমরা সচেতন। অসম্ভব নয় যে, পরে একসময় এই তাৎপর্যটিই সবচেয়ে গৌণ বলে চিহ্নিত হবে। যাই হোক, নতুন কালের নতুন যেসব তাৎপর্যের ইশারা দিলাম, আলোকচিত্র এবং চলচ্চিত্রই সেগুলোর দুই মোক্ষম বার্তাবাহক।

৬

আলোকচিত্রশিল্প শুরু থেকেই আচারমূল্যের পরিবর্তে প্রদর্শনযোগ্যতাকে শিরোধার্য করেছে। অবশ্য আচারমূল্য বিনাযুদ্ধে তার গতি ছাড়েনি—সঙ্কুচিত হতে হতে শেষতক আস্তানা গেড়েছে মানুষের মুখে। এটা কোনো দৈব ব্যাপার নয় যে, প্রথম যুগের

www.pathagar.com

আলোকচিত্রে মানুষের প্রতিকৃতিই ছিল মনোযোগের মূল কেন্দ্র। অনুপস্থিত কিংবা পরলোকগত প্রিয়জনকে স্মরণের রেওয়াজ ছবির আচারমূল্যের শেষ আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। শেষবারের মতো আলোকচিত্রে উদ্ভাসিত মানবমুখের ক্ষণস্থায়ী অভিব্যক্তি থেকে 'মহিমা' বিচ্ছুরিত হল। এটাই প্রথমদিকের আলোকচিত্রের বিষণ্ণতার উৎস, একইসাথে অতুলনীয় সৌন্দর্যেরও। কিন্তু আলোকচিত্র থেকে মানুষ অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আচানমূল্যের চেয়ে প্রদর্শনযোগ্যতার গুরুত্ব গেল বেড়ে। এই নতুন যুগের সূচনা করে আলোকচিত্রী আটগ্যাট এক অতুলনীয় তাৎপর্যের অংশীদার হলেন। ১৯০০ সালের দিকে তিনি প্যারিসের জনমানবহীন বিরান রাজপথের ছবি তুলেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি রাস্তার ছবি তুলেছিলেন অপরাধদৃশ্যের মতো করে। কথাটি গভীরভাবে সারবান। অপরাধদৃশ্যও আদতে বিরান—জনরিক্ত; এই অর্থে যে, কেবল সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকল্পেই অপরাধদৃশ্য ধারণ করা হয়। আটগ্যাটের সময় থেকে আলোকচিত্র ঐতিহাসিক ঘটনার গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হতে শুরু করে; লাভ করে গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য। আলোকচিত্র উপভোগের জন্য দরকার বিশেষ ধরনের কেন্দ্রীভূত মনোভঙ্গি—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবনা ঠিক এর অনুকূল নয়। এগুলো দর্শককে আন্দোলিত করে, দর্শক এক নতুন ধরনের চাপ অনুভব করে। ছবি-সম্বলিত সাময়িকীগুলো শুরু থেকেই পাঠকের জন্য—ভুল-শুদ্ধ যাই হোক—নির্দেশনা দিতে থাকে। ধীরে ধীরে ছবি-পরিচিতি (caption) দাখিল করা প্রায় আবশ্যিক রীতি হয়ে দাঁড়ায়। আর স্পষ্টতই চিত্রকলার শিরোনামার তুলনায় এই ছবি-পরিচিতি চরিত্রের দিক থেকে পুরোপুরি স্বতন্ত্র। চিত্রসম্বলিত সাময়িকীর ছবি-পরিচিতিগুলো দর্শক-পাঠকের জন্য যে নির্দেশনা রাখত, শীঘ্রই চলচ্চিত্রে তা আরও অনেক বেশি প্রকাশ্য আর অপরিহার্য রূপ পায়। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রতিটি একক ছবি পরবর্তী ছবি-পরম্পরার নির্দেশনায় অর্থবান ও বাঙময় হয়ে ওঠে।

৭

চিত্রকলার বিপরীতে আলোকচিত্রশিল্পের নান্দনিক মূল্য সম্পর্কিত উনিশ-শতকী বিতর্ক আজ অসার আর গোলমেলে মনে হয়। এতে করে অবশ্য এই বিতর্কের গুরুত্ব কমছে না। আদতে এই বিতর্ক ছিল এক ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্মারক, যার বিশ্বজনীন প্রভাব সম্পর্কে বিবদমান দুই পক্ষের কেউই সচেতন ছিল না। যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের যুগে বিশেষ আচারের ভিত্তি থেকে শিল্পকলার মুক্তির প্রেক্ষাপটে এর স্বাতন্ত্র্যের ধারণাটি চিরতরে লুপ্ত হয়। এত করে শিল্পকলার কায়-কারবার আর তাৎপর্যে যে-পরিবর্তন ঘটে, উনিশ শতকের বাস্তবতায় তা ধরা পড়েনি। এমনকি বিশ শতকের একটা দীর্ঘ অংশও ব্যাপারটি আমলে নেয়নি, যদিও এরই মধ্যে চলচ্চিত্র এগিয়ে গেছে বহুদূর। আলোকচিত্র আদৌ শিল্প কিনা—এই অসার ভাবনাতেই শুরুর সময়টা কেটে গেছে। গোড়ার প্রশ্ন—আলোকচিত্রের উদ্ভব শিল্পকলার সামগ্রিক চরিত্রে কোনো রূপান্তর এনেছে কিনা—

www.pathagar.com

উত্থাপিতই হয়নি। পরে চলচ্চিত্র বোদ্ধারাও চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে একই রকম প্রশ্নই তুলেছেন। যদিও চলচ্চিত্রের আবির্ভাব সনাতন নন্দন-ধারণায় যেসব নতুন প্রশ্ন নিয়ে এসেছিল, সেগুলো আলোকচিত্রশিল্পের আবির্ভাবে উত্থিত প্রশ্নের তুলনায় অনেক বেশি নিগূঢ় আর জটিল।

চলচ্চিত্রতত্ত্বের শুরুর দিককার বোধবুদ্ধিহীন ও জবরদস্তিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো একবার চেখে দেখা যাক। আবেল গাঁস একবার চলচ্চিত্রের তুলনা টেনেছিলেন হায়ারোগ্লিফিক্স-এর সঙ্গে। তিনি লিখেছেন :

আমরা আরও পিছিয়ে গিয়ে প্রাচীন মিশরীয়দের দুর্বোধ্য প্রকাশভঙ্গির স্তরে নেমে গেছি ... চিত্রভাষা এখনো লায়েক হয়ে ওঠেনি; কারণ, আমাদের চোখ এখনও এতে ধাতস্থ হতে পারেনি। ছায়াছবিতে যা দেখানো হয় তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অপর্যাপ্ত, এর রীতিপদ্ধতিও অপরিণত।

সাভরিন মার্স লিখেছেন :

শিল্পকলার জগতে এটা একটা স্বপ্নের মতো—একই সঙ্গে অতিশয় কাব্যিক আর অতিশয় বাস্তব। এই বিশেষ রীতির দৌলতে ছায়াছবি এক অতুলনীয় প্রকাশভঙ্গি রপ্ত করেছে। কেবল উন্নত মনমানসিকতার লোককেই তার জীবনের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ আর রহস্যঘন মুহূর্তে ছায়াছবির জগতে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত।

আলেকজাণ্ডার আরনক্স নির্বাক চলচ্চিত্র সম্পর্কে তার উচ্ছ্বাসপূর্ণ রচনাটি শেষ করেছিলেন এই প্রশ্ন রেখে : 'আমরা কি প্রার্থনার সংজ্ঞায়নেই আমাদের সবচেয়ে সাহসী বাক্যগুলো শেষ করে ফেলিনি?' সনাতন শিল্পকলার চৌহদ্দির মধ্যে চলচ্চিত্রকে শ্রেণীভুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই তাত্ত্বিকগণ চলচ্চিত্রের মধ্যে প্রথাগত উপাদান অন্বেষণ করেছেন। অন্তর্দৃষ্টির অভাব ছাড়া এর আর কী কারণ থাকতে পারে? তারা যখন এসব লিখছেন তখন *লা-ওপিনিওন পাবলিক* কিংবা *দ্য গোল্ড রাশ*-এর মতো ছায়াছবি এসে গেছে। তা সত্ত্বেও আবেল গাঁস ছায়াছবির সঙ্গে তুলনার জন্য হায়রোগ্লিফিক্স ছাড়া কিছু পাননি। কিংবা স্যাভরিন মার্স ছায়াছবি সম্পর্কে ছিক সেই ভাষায় কথা বলেছেন, যে-ভাষায় ফ্রা অ্যাঞ্জেলিকোর চিত্রকলা সম্পর্কে বলা যেত। এমনকি হালের প্রতিক্রিয়ায়ও লেখকগণ ছায়াছবিকে প্রতিবেশগত মূল্যই কেবল দিয়েছেন—বিচেনা করেছেন পবিত্র কিছু একটা নয়ত অতিপ্রাকৃত কোনো নির্মাণ হিসাবে। ম্যাক্স রেইনহার্থের ছায়াছবি *এ মিডসামার নাইটস ড্রিম* সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ওয়ারফেল লিখেছেন :

নিঃসন্দেহে এই ছায়াছবি দৃষ্টিগ্রাহ্য বাহ্যপৃথিবী, যেমন রাস্তাঘাট, অন্দরমহল, রেলস্টেশন, রেস্তোরাঁ, মটরগাড়ি, সমুদ্রসৈকত ইত্যাদির প্রাণহীন চিত্রায়ন। এই বৈশিষ্ট্যের

www.pathagar.com

জন্যই আজও শিল্পকলা হিসাবে চলচ্চিত্রের কোনো উত্তরণ ঘটল না। চলচ্চিত্র এখনও তার সত্যিকারের তাৎপর্য কিংবা পূর্ণ সম্ভাবনার নাগাল পায়নি ....। এর আছে খুব স্বাভাবিক কায়দায় নিজেকে প্রকাশ করার এক অদ্বিতীয় ভাষা; আর যা কিছু রূপকথার মতো, চমকপ্রদ কিংবা অতিপ্রাকৃত তাকে আত্মীকৃত করে নেওয়ার এক অতুলনীয় প্রণাদনা-শক্তি।

৮

একজন মঞ্চাভিনেতা দর্শকের সামনে নিজের অভিনয়শৈলীর উপস্থাপনা ব্যক্তি-স্বরূপেই করে থাকেন। কিন্তু চিত্রাভিনেতার ক্ষেত্রে তা উপস্থাপিত হয় ক্যামেরার মাধ্যমে। অভিনয়ের পর অন্তত দু'ধাপ পেরিয়ে তা দর্শকের কাছে পৌঁছে। এক্ষত্রে অভিনয়ের কোনো একটা অংশকে একক সমগ্র হিসাবে নেয়ার দায় ক্যামেরার নেই। আলোকচিত্র-শিল্পীর তত্ত্বাবধানে বরং ক্যামেরা অনবরত অভিনয়ের সঙ্গে তাল রেখে অবস্থান পরিবর্তন করে। বিভিন্ন অবস্থান থেকে নেওয়া এসব দৃশ্যপরম্পরা সম্পাদকের কাছে প্রেরিত হয় এবং সম্পাদিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ ছায়াছবির রূপ পায়। কাজেই ছায়াছবিতে আমরা যে-গতিশীলতা বা কর্মচাঞ্চল্য দেখি, তা আদতে ক্যামেরার ব্যাপার; এখানে অবশ্য ক্যামেরার কোণ বা ক্লোজ-আপ শট ইত্যাদি বিশেষত্বের কথা বলা হচ্ছে না। চিত্রাভিনেতাকে অভিনয় করতে হয় ক্যামেরার সামনে টানা পর্যবেক্ষণ থেকে। এর ফল হিসেবে প্রথমত : অভিনেতার শৈলী উপস্থাপিত হয় ক্যামেরার মাধ্যমে; দ্বিতীয়ত: দর্শকের সঙ্গে সরাসরি সংযোগের সুযোগ থেকে চিত্রাভিনেতা বঞ্চিত হন। দর্শকও অভিনেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্পর্কের কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন। এক্ষেত্রে অভিনেতাকে দর্শক আসলে ক্যামেরার তৈরি করা পরিচয়ে চেনেন। অর্থাৎ, দর্শক ক্যামেরার অবস্থান গ্রহণ করেন। ক্যামেরার মতো দর্শকেরও থাকে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি। যে দৃষ্টি আচারমূল্যকে জারি রাখে, এই ভঙ্গি সেই বস্তু নয়।

৯

দর্শকের কাছে নীত হওয়ার উদ্দেশে ক্যামেরার সামনে অভিনেতা নিজেকে উপস্থাপন করে—এটা চলচ্চিত্রের একেবারে গোড়ার সত্য। ক্যামেরার পর্যবেক্ষণে নিজেকে উপস্থাপনের এই প্রক্রিয়ায় অভিনেতার ব্যক্তিমহিমার রূপান্তর ঘটে—এই ঘটনা প্রথম যারা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, পিরানডেলো তাদের অন্যতম। যদিও তার উপন্যাস *সাই গিরা*-র এতদ্বিষয়ক আলোকপাতে তিনি ব্যাপারটির নেতিবাচক দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন, আর সীমাবদ্ধ ছিলেন কেবল নির্বাক চলচ্চিত্রের বিবেচনায়, তবুও তার পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এক্ষেত্রে সবাক ছবি কোনো নতুন মাত্রা যোগ করেনি।

www.pathagar.com

পার্থক্যের মধ্যে কেবল এই যে, সবাক্ ছবির শব্দধারণের জন্য দ্বিতীয়বার যন্ত্রপাতির মুখোমুখি হতে হয়। পিরানডোলা লিখেছেন :

অভিনয়কালে চিত্রাভিনেতার এমন অনুভূতি হয় যেন সে নির্বাসনে আছে। নির্বাসনে— কেবল মঞ্চ থেকেই নয়, নিজের কাছ থেকেও। অস্বস্তির একটা চোরা অনুভূতি তাকে অপ্রকাশ্য মূন্যতার গহ্বরে নিক্ষেপ করে : তার শরীর যেন বাষ্পীভূত হয়ে শরীরবৃত্তীয় সংস্থান হারায়, সে বাস্তবতাচ্যুত হয়; তার প্রাণ, স্বর, নড়াচড়ার ফলে সৃষ্ট শব্দ—সবকিছুই এক টুকরা নিঃশব্দ ছবিতে রূপান্তরিত হয় পর্দায় এক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হবে বলে এবং অতঃপর নৈঃশব্দে বিলীন হয়ে যাওয়া ...। প্রক্ষেপণযন্ত্র দর্শকের সামনে তার ছায়া নিয়ে খেলবে, কিন্তু তাকে তুষ্ট থাকতে হবে ক্যামেরার সামনেই।

এই পুরো বাস্তবতাকে আমরা এভাবে চিহ্নিত করতে পারি : প্রথমবারের মতো—এবং এটা চলচ্চিত্রেরই কুললক্ষণ—প্রক্ষেপণযন্ত্রের সাহায্যে সজীব মানুষকে নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত 'মহিমা' ছাড়াই। কারণ, ব্যক্তির মহিমা তার উপস্থিতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, এর কোনো ছায়া বা নকলের সঙ্গে নয়। মঞ্চায়নের সময় ম্যাকবেথকে আমরা যে-মহিমান্বিত রূপে পাই, তা অভিনেতাকে বাদ দিয়ে হয় না। কিন্তু স্টুডিওতে ধারণকৃত একটা একক দৃশ্যের ক্ষেত্রে দর্শকের স্থলাভিষিক্ত হয় ক্যামেরা। ফলে অভিনেতা স্বয়ং যে-মহিমার আধার তা বিলুপ্ত হয়; আর সঙ্গে সঙ্গে যে-চরিত্র সে রূপায়ণ করছে, তার মহিমাও।

পিরানডেলো চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কিত আলোচনায় হয়ত নিজের অজান্তেই মঞ্চনাটক দেখার রীতিপদ্ধতি নির্দেশ করেছেন। একজন নাট্যকার বলেই তার পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে। নিবিড় বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হবে, যেসব শিল্পকলা যান্ত্রিকভাবে পুনরুৎপাদনযোগ্য, কিংবা চলচ্চিত্রের মতো শিল্প, যা পুরোপুরি যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত—তাদের সঙ্গে মঞ্চনাটকের বড় ধরনের পার্থক্য আছে। বিশেষজ্ঞগণ অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে 'সামগ্রিক শিল্পরূপের খুব সামান্য অংশই অভিনয়জাত...'। ১৯৩২ সালেই রুডল্ফ্ আর্নহেইম লক্ষ্য করেছিলেন :

ছায়াছবির সাম্প্রতিক প্রবণতা হল একটি বিশেষ চরিত্রের জন্য পছন্দকৃত একজন অভিনেতাকে মঞ্চ-সহায়ক বা ঠেকনা হিসাবে ব্যবহার করা .. পরে ঠিক জায়গায় তা জুড়ে দেয়া।

এই মন্তব্য থেকে আমরা সংশ্লিষ্ট আরও কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারব। একজন মঞ্চাভিনেতা তার অভিনীত চরিত্রটির সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারেন; চিত্রাভিনেতা কিন্তু প্রায়শই এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। চিত্রাভিনেতা যা সৃষ্টি করেন তা কোনোভাবেই

www.pathagar.com

কোনো ধারাবাহিক নির্মাণ নয়, বরং বিচ্ছিন্ন অভিনয়াংশের একত্রগ্রথিত রূপ মাত্র। কতিপয় নির্দিষ্ট কিন্তু আকস্মিক বিবেচনা, যেমন, স্টুডিওর খরচ, সহ-অভিনয়শিল্পীদের উপস্থিতি, সাজসজ্জা ইত্যাদি ছাড়াও এমন কিছু প্রাথমিক উপাদানের প্রয়োজন হয়, যা অভিনয়ের পুরো কাজটিকে টুকরা টুকরা নানা অংশে বিভক্ত করে দেয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোকপ্রক্ষেপণ বা এতদংশ্লিষ্ট এনতেজামের কথা বলতে পারি। পর্দায় খুবই দ্রুতগতির একক দৃশ্য হিসাবে দেখা যাবে এমন একটা ঘটনার চিত্রায়ণে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মাত্রার আলোক-নিক্ষেপণে স্টুডিওতে ঘন্টার পর ঘন্টা লেগে যেতে পারে। এখানে আরও গুরুত্বপূর্ণ মন্তাজের প্রসঙ্গ না-হয় বাদই রাখলাম। একইভাবে, জানালা থেকে লাফ দেওয়ার একটা দৃশ্য স্টুডিওতে ফাঁসির মঞ্চ থেকে লাফ দেওয়ার দৃশ্যরূপে চিত্রিত হতে পারে; প্রয়োজনে লাফের উড়ন্ত অংশটির দৃশ্য ধারণ করা যেতে পারে সপ্তাহখানেক পরে বহির্দৃশ্য ধারণের সময়। আরও অনেক বেশি স্ববিরোধী দৃষ্টান্তও দেখানো যাবে। মনে করা যাক, একজন অভিনেতাকে দরজায় টোকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠার অভিনয় করতে হবে। যদি অভিনেতার অভিনয়কালীন অভিব্যক্তি পরিচালকের পছন্দসই না হয়, তাহলে পরিচালক অন্য সুবিধাবাদী পন্থার আশ্রয় নিতে পারেন : অন্য কোনো সময় স্টুডিওতে অভিনেতাকে না-জানিয়েই বা তাকে বুঝতে না-দিয়েই তিনি এরকম একটা দৃশ্য ধারণ করে রাখতে পারেন। দৃশ্যটি পরে জায়গামতো লাগিয়ে দিলেই হল। চলচ্চিত্রের এসব রকম-সকম আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয়, সুন্দরের যে-সুমঞ্জস প্রাসাদে শিল্পের বসতি বলে মনে করা হত, তা থেকে শিল্প অনেক দূরে সরে গেছে।

১০

ক্যামেরার সামনে একজন চিত্রাভিনেতা যেসব অচেনা অনুভূতিতে আবিষ্ট হন, পিরানডেলো তার পরিচয় দিয়েছেন। আয়নায় দেখা নিজ প্রতিবিম্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার যে অনুভূতি, এই অনুভূতি মূলত তারাই সমরূপ। ছায়াছবির ক্ষেত্রে অবশ্য প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব মূল থেকে আলাদা করা যায়, অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায়। কোথায় নেয়া হয়? দর্শকের কাছে। চিত্রাভিনেতা এই সত্য মুহূর্তের জন্যও ভোলেন না। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো মানে, তিনি জানেন, চূড়ান্ত বিচারে দর্শকের সামনেই দাঁড়ানো; ঐ দর্শক, যারা ছবির বাজার তৈরি করেছে। এই যে বাজার, যেখানে অভিনেতা কেবল তার শ্রমই বিক্রি করে না, তার সমগ্র সত্তা, হৃদয় আর আত্মাও সমর্পণ করে, তা কিন্তু তার আওতার বাইরেই থেকে যায়। কারখানায় উৎপন্ন কোনো বস্তুর সঙ্গে বাজারের যে সম্পর্ক, চিত্রধারণের সময় অভিনেতার সঙ্গে বাজারের সম্পর্ক তার চেয়ে একটুও বেশি থাকে না। ক্যামেরা সামনে অভিনেতা যে-পীড়ন আর নতুন উদ্বেগের শিকার হয়, পিরানডেলো বর্ণিত

www.pathagar.com

সেই পীড়ন-উদ্বেগের এটা বোধ হয় একটা কারণ। আগেই বলেছি, চলচ্চিত্রে ব্যক্তি বা শিল্পের মহিমাচ্যুতি ঘটে। স্টুডিওর বাইরে কৃত্রিমভাবে 'ব্যক্তিত্ব' তৈরি করে চলচ্চিত্র এই ঘাটতি পূরণ করে। চিত্রতারকার তারকাখ্যাতির কাল্ট আসলে সিনেমা-নির্মাণ-শিল্পের অর্থেই লালিত-বর্ধিত হয়। এটা ব্যক্তির কোনো অনন্য মহিমা নয়, বরং 'কোনো-একজন অভিনেতা-ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তিকাল বিশেষ'—পণ্যের বাজার-মহিমার মতোই কৃত্রিম আর ক্ষণস্থায়ী। যতদিন চিত্রনির্মাতার পুঁজি ছায়াছবির চল নিয়ন্ত্রণ করবে, ততদিন একে কোনো বিপ্লবী চরিত্র দেওয়া যাবে না। শিল্পকর্মের সনাতন ধারণার সমালোচনা করে যাওয়াই হবে একমাত্র বিপ্লবী কাজ। আমরা অস্বীকার করছি না যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রে সামাজিক অবস্থার বিপ্লবী সমালোচনা উঠে আসছে; এমনকি ধন-বণ্টনের সমালোচনাও কিছু চলচ্চিত্রে দেখা যায়। অবশ্য এটা আমাদের বর্তমান আলোচনার সঙ্গে তেমন সম্পর্কিত নয়। আমাদের বর্তমান লক্ষ্য পশ্চিম ইউরোপের সিনেমা-নির্মাণ-শিল্প।

চলচ্চিত্রের শিল্পকৌশলের মধ্যে এমন এক অন্তর্লীন বিশিষ্টতা আছে যে, দর্শকরা চলচ্চিত্রায়িত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট-ও-ওয়াকিবহাল একজন ব্যক্তিরূপেই তা উপভোগ করে। খেলাধুলার দর্শকদের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি। মনে করা যাক, কয়েকজন সংবাদপত্র-হকার সাইকেলে পথ-চলা অবস্থায় নিজেদের মধ্যে একটা সাইকেল-চালনা-প্রতিযোগিতার ফলাফল নিয়ে আলাপে মগ্ন। পত্রিকার প্রকাশকরা খামোখাই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেনি। এই প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিরাট উদ্দীপনা তৈরি করেছে। কারণ, সম্ভাব্য বিজয়ীর জন্য এটি ছিল হকার থেকে রাতারাতি পেশাদার সাইকেল-আরোহীতে উন্নীত হওয়ার একটা সুযোগ। অর্থাৎ এই হকাররা যে সাইকেল-চালনা-প্রতিযোগিতা নিয়ে আলাপ করছে, তারা নিজেরাই তার অংশ। ঠিক তেমনি সংবাদভিত্তিক চলচ্চিত্র বা সংক্ষেপে সংবাদচিত্র (newsreel) যে-কোনো পথচারীর জন্য সিনেমার এক্সট্রা হওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। ভার্টফের *থ্রি সংস এবাউট লেলিন* কিংবা ইভানের *বোরিনেজ* দেখার সময় যে-কেউ নিজেকে সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মটির অংশ হিসাবে অনুভব করতে পারে। চলচ্চিত্রশিল্পের অংশ হয়ে ওঠার দাবি আজ আর কারো জন্যই অবাস্তব নয়। এই দাবির সারবত্তা প্রতিপন্ন হবে সমসাময়িক সাহিত্যের ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিকে তুলনামূলক দৃষ্টিতে তাকালে।

বহু শতাব্দী ধরে গুটিকতক লেখকের রচনা অগুণতি পাঠক পড়ে আসছে। গত শতকের শেষদিকে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। সংবাদপত্রের ক্রমবর্ধমান প্রসারের ফলে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক, পেশাগত কিংবা স্থানীয় নানা বিষয় পাঠকের সামনে আসছে। এতে বহুসংখ্যাক পাঠক লিখতে আগ্রহী হয়েছেন—প্রথমে হয়ত ঘটনাচক্রেই। দৈনিক কাগজের 'পাঠকের পাতা'তেই এর সূত্রপাত। আর আজ নিজ পেশার অভিজ্ঞতা, অভাব-অভিযোগ, প্রামাণ্য দলিল কিংবা এমন আরও অনেক কিছু

www.pathagar.com

কোনো-না-কোনোভাবে ছাপানোর সুযোগ পান না, এমন কামিয়াব ইউরোপীয় খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। এভাবে লেখক আর পাঠকের ভেদ কার্যত লুপ্ত হয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে একজন পাঠক লেখক হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন। পাঠক যদি কোনো বিষয়ে দক্ষ হন—এই দক্ষতা যদিও হয়ত কোনো বিশেষায়িত পেশার সাথে সূত্রে কোনোরকম পরিকল্পনা ছাড়াই অর্জিত, আর বিষয়টাও হয়ত খুবই গৌণ—তাহলেই তিনি কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গ্রন্থপ্রণেতা হিসাবে গ্রন্থকার-বলয়ে প্রবেশের অধিকার পাচ্ছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে আজ কাজ স্বয়ং স্বর হিসাবে গণ্য হচ্ছে। কাজকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারা কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার যোগ্যতার অংশ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। 'সাহিত্যিক' অভিধা এখন বিশেষ প্রশিক্ষণের বদলে বিচিত্র সব কৌশলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ-কারণেই তা আজ এজমালি সম্পত্তি।

একই কথা সিনেমার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন শতক-পরম্পরায় ঘটেছে, সিনেমার ক্ষেত্রে তা মাত্র এক দশকেই সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে রাশিয়ায় এই পরিবর্তন আংশিকভাবে হলেও বাস্তবের মুখ দেখেছে। রুশ সিনেমায় এমন কিছু কলাকুশলীর দেখা মেলে, যারা ঠিক প্রথাগত অর্থে চিত্রাভিনেতা নন, বরং নিজেদের কর্মপ্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক রূপের মধ্যেই গণমানুষ আকারে উপস্থাপিত। পশ্চিম ইউরোপে কিন্তু চলচ্চিত্রাঙ্গনের পুঁজিবাদী শোষণহেতু পুনরুৎপাদিত হওয়ার ক্ষেত্রে আধুনিক মানুষের বৈধ দাবির স্বীকৃতি মেলেনি। এই বাস্তবতায় সেখানকার সিনেমা নির্মাণ শিল্প মোহবর্ধক রঙিন চশমা আর সংশয়াচ্ছন্ন ভাবনার ধূম্রজাল বিস্তার করে তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রতি জনগণের আগ্রহ বাড়ানোর জোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

১১

সিনেমার, বিশেষত সবাক সিনেমার, চিত্রায়ণ এমন এক বাস্তবতা হাজির করে, যা আগে অকল্পনীয় ছিল। এই প্রক্রিয়ায় ক্যামেরা, আলোক-প্রক্ষেপণ যন্ত্রাদি, সহকারী কলাকুশলী প্রভৃতি বহিঃস্থ উপাদানের সহায়তা ব্যতিরেকে প্রকৃত দৃশ্য দেখার যথার্থ কোনো প্রেক্ষণবিন্দু নির্দেশ করা অসম্ভব। কেবল লেন্সের সমান্তরালে চোখ রেখেই কেউ একজন প্রকৃত দ্রষ্টব্যে অধিকার পেতে পারে। অন্য কারণের তুলনায় প্রধানত এই কারণেই স্টুডিওতে ধারণ করা একটা দৃশ্য এবং মঞ্চের একটা দৃশ্যে খুব সামান্য মিল পাওয়া যাবে। মঞ্চে নিজ অবস্থানটি দর্শকের পুরা নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাই নাটককে সহসা মায়া বা বিভ্রম হিসেবে নেওয়ার অবকাশ থাকে না। কিন্তু সিনেমার জন্য ধারণকৃত কোনো দৃশ্যের ক্ষেত্রে এমনটা বলা যাবে না। এর বৈশিষ্ট্যই বিভ্রমপূর্ণ, আর কাটা ও জোড়া লাগানোর প্রক্রিয়ায় এই বিভ্রম আরও ঘনীভূত হয়। স্টুডিওতে যান্ত্রিক উপকরণসমূহ খুব নিবিড়ভাবে বাস্তবতার গভীরে প্রবেশ করে; কিন্তু সম্পাদিত হওয়ার পর সিনেমায় প্রতিফলন বাস্তবতার মধ্যে

www.pathagar.com

যান্ত্রিক উপকরণের পীড়নটা আর বিদ্যমান থাকে না। বিশেষভাবে সংযোজিত ক্যামেরার সাহায্যে চিত্রধারণ, আর ধারণকৃত ছবিগুলোর কুশলী যোজনার ফলেই এটা সম্ভব হয়। কৃত্রিম কারিগরির ছোঁয়ামুক্ত বাস্তবতা প্রযুক্তি-শাসিত নির্মাণ-দক্ষতার উচ্চমাত্রা-নির্দেশক; আর এভাবে প্রাপ্ত সুসমঞ্জস দৃশ্যাবলি প্রযুক্তির শুষ্ক জগতে অর্কিডের মতো শোভমান হয়।

মঞ্চনাটকের সঙ্গে তুলনা করে সিনেমার যে-পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য আমরা দেখাতে চেয়েছি, চিত্রকলার সঙ্গে তুলনায় তা আরও স্পষ্ট হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল : একজন চিত্রগ্রাহকের সঙ্গে একজন আলোকচিত্রশিল্পীর তুলনা কিভাবে করব? উত্তর খোঁজার জন্য আমরা শল্যচিকিৎসার উপমা টানব। শল্যচিকিৎসকের কর্মপদ্ধতি জাদুকরের ঠিক বিপরীত। জাদুকর অসুস্থ কোনো ব্যক্তিকে হাতের পরশে ভালো করে ফেলে। আর শল্যচিকিৎসক কাটাছেঁড়া করে রোগীর শরীরে প্রবেশ করে। জাদুকর রোগী এবং নিজের মধ্যে একটা স্বাভাবিক দূরত্ব বজায় রাখে, যদিও সে হাত নামিয়ে এনে প্রয়োজনমতো দূরত্ব হ্রাস করে, তবুও জাদুকরী ইন্দ্রজালে সে এই দূরত্ব বাড়িয়েই দেখায়। শল্যচিকিৎসকের কাজ ঠিক উল্টো; রোগীর শরীরে প্রবেশের মধ্য দিয়ে সে রোগী ও নিজের দূরত্ব কমিয়ে আনে, আর সাবধানতার সঙ্গে আন্তঃস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হস্তচালনার মাধ্যমে দূরত্ব একেবারেই ঘুচিয়ে দেয়। সংক্ষেপে, জাদুকরের বিপরীত প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত মুহূর্তে শল্যচিকিৎসক রোগীর মুখোমুখি না হয়ে বরং অপারেশনের মধ্য দিয়ে তার ভেতরে প্রবেশ করে। মনে রাখতে হবে, চিকিৎসকের মধ্যে কিন্তু একজন জাদুকর ঠিকই লুকিয়ে থাকে।

এখানে জাদুকর চিত্রশিল্পীর অনুরূপ, আর শল্যচিকিৎসক আলোকচিত্রীর সদৃশ। চিত্রশিল্পী বাস্তবতা থেকে একটা স্বাভাবিক দূরত্ব বজায় রেখেই তার কাজ করেন, আলোকচিত্রী বাস্তবতার আবহে গভীরভাবে প্রবেশ করেন। এর ফলে দুজনের ছবির মধ্যে বিরাট পার্থক্য ঘটে। তা হল এই : চিত্রশিল্পী পান একক ও সমগ্র শিল্পকর্ম; আর আলোকচিত্রী পান বহুধাবিভক্ত খণ্ড—এক নতুন নিয়মে একত্রগ্রথিত হয়ে যারা সমগ্র তৈরি করে। বর্তমানকালের একজন মানুষের কাছে সিনেমায় প্রতিফলিত বাস্তবতা চিত্রশিল্পের বাস্তবতার তুলনায় অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, যান্ত্রিক উপকরণের সাহায্যে বাস্তবতার গভীর অন্দরে প্রবেশের মধ্য দিয়ে সিনেমা এমন এক বাস্তবতা উপস্থাপন করে, যা উপকরণ-চিহ্ন-মুক্ত। শিল্পকর্মের কাছে মানুষ এ-ই তো চায়।

১২

যান্ত্রিক পুনরুৎপাদন শিল্পের প্রতি জনতার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিরাট পরিবর্তন এনেছে। পিকাসোর ছবির প্রতি ব্যক্তির শঙ্কিত প্রতিক্রিয়াশীল সাড়া, চার্লি চ্যাপলিনের সিনেমার বেলায়

www.pathagar.com

ইতিবাচক গ্রহিষ্ণু প্রাণবন্ততায় রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে গ্রহিষ্ণু প্রাণবন্ততা বলতে বুঝব, দৃষ্টিগ্রাহ্যতা ও আবেগী উদযাপনের এক অবাধ-আন্তরিক মিশ্রণ, আর ঠিক আনাড়ি ভঙ্গিতে নয়, বরং উপস্থাপিত জীবননাট্যে অভিজ্ঞ একজন দর্শক হিসেবে শিল্প-উপভোগ। এর একটা বিরাট সামাজিক তাৎপর্য আছে। শিল্পকর্মের সামাজিক তাৎপর্য যত কমবে, সমালোচকের সন্ধানী দৃষ্টি আর জনতার নির্ভেজাল উপভোগের মধ্যে পার্থক্য ততই বাড়বে। প্রচল কিছু সাধারণত লোকে সমালোচকী দৃষ্টি ব্যতিরেকেই উপভোগ করে; কিন্তু প্রকৃত নতুন কিছু উপভোগের ক্ষেত্রে তার বিতৃষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি ক্রিয়াশীল থাকে। সিনেমার পর্দা হল সেই জায়গা, যেখানে সমালোচকের সন্ধানী-দৃষ্টি আর আমজনতার গ্রহিষ্ণু মানসিকতা একত্রে কাজ করে। এর মূল কারণ, প্রত্যেক দর্শকের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া সমবেত দর্শকের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হওয়ার মুহূর্তে এরা একে অন্যকে প্রভাবিত করে। অন্য যেকোনো শিল্পমাধ্যমের তুলনায় এই ব্যাপারটি সিনেমার ক্ষেত্রেই বেশি ঘটে থাকে। এখানে আবার চিত্রকলার তুলনা প্রাসঙ্গিক হবে। এটাই স্বাভাবিক যে, লোকে সাধারণত একা কিংবা খুব সামান্য কজন মিলে চিত্রকলা উপভোগ করে। উনিশ শতকে চিত্রকলা সম্পর্কে একসঙ্গে অনেক লোক আগ্রহী হয়ে ওঠায় চিত্রকলার এই সঙ্কটটি ধরা পড়তে শুরু করে। এই সঙ্কট বিশেষভাবে আলোকচিত্র-সম্ভূত নয়, বরং শিল্পকর্মের কাছে সমষ্টির আকাঙ্ক্ষার নতুন ধরনের ফলেই উদ্ভূত।

চিত্রকলার শিল্পরীতি এমন নয় যে তা একসঙ্গে সামষ্টিক অভিজ্ঞতার উপলক্ষ হিসেবে কোনো কিছুকে হাজির করবে। এই কাজটি ইতিহাসের সবকালেই স্থাপত্যকলা করেছে, পুরানো অতীতে করেছে মহাকাব্য, আর আজকের দিনে করছে সিনেমা। যদিও এ থেকে চিত্রকলার সামাজিক তাৎপর্য সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা ঠিক হবে না, তবুও নতুন পরিস্থিতিতে এই বিবেচনার বিশেষ মূল্য আছে। বিশেষত, অনেকটা যেন নিজের বৈশিষ্ট্যের বাইরে গিয়েই চিত্রকলা উনিশ শতক থেকে সরাসরি বিপুল জনতার মুখোমুখি হয়, আর মারাত্মক সঙ্কটে পতিত হয়। মধ্যযুগের গির্জা ও মঠ কিংবা আঠারো শতকের রাজসভায় চিত্রকলার সামষ্টিক উদ্‌যাপন সরাসরি হত না, বরং উচ্চমার্গীয় কোনো বুঝদারের মধ্যস্থতায় হত। এই গুটিকতক বিশেষজ্ঞ আর জনতার দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। চিত্রকলা স্বয়ং এই পরিবর্তনের অংশিদার হয় নিজের যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এতে করে শেষ রফা হয়নি। গ্যালারি কিংবা ধনী সমজদার ব্যক্তির অভ্যর্থনাকক্ষে জনতার জন্য উন্মুক্ত চিত্রকলার প্রদর্শনী শুরু হলেও এ-ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করা কিংবা উপভোগের ক্ষেত্রে নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা জনতার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই দেখা যায়, একটা উদ্ভটরসের সিনেমা যেখানে

www.pathagar.com

জনতা অনুকূল ও গ্রহিষ্ণু মনোভঙ্গিতে উপভোগ করে, সেখানে একই জনতা পরাবাস্তববাদী চিত্রকলার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত প্রতিক্রিয়া দেখায়।

১৩

মানুষ যেভাবে নিজেকে যান্ত্রিক উপকরণের সামনে উপস্থিত করে, তার ধরনের ওপরই কেবল চলচ্চিত্রের বিশিষ্টতা নির্ভর করে না। বরং ঐ উপকরণগুলো দ্বারা যেভাবে সে নিজের প্রতিবেশকে চিত্রিত করতে পারে, তার ওপরও নির্ভর করে। প্রতিবেশকে বিশেষরূপে নির্বাচিত ও চিত্রিত করার ক্ষেত্রে এসব উপকরণের ক্ষমতা বুঝে উঠতে মনঃসমীক্ষণবিদ্যা আমাদের সাহায্য করতে পারে—অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে। আমাদের উপলব্ধিজগৎকে চলচ্চিত্র এমন কিছু পদ্ধতিতে সমৃদ্ধ করেছে, যেগুলো ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের পদ্ধতি দ্বারা বিশ্লেষণযোগ্য। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে কথা বলার ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলোর প্রতি আমরা বিশেষ নজর দিতাম না। খুব কম ক্ষেত্রেই আমরা এধরনের ভুলকে সাধারণ কথোপকথনের কোনো গভীরতর মাত্রার নির্দেশক হিসেবে মূল্য দিতাম। প্রাত্যহিক মনোবিকারবিদ্যা (psychopathology of Eceryday Life) প্রকাশিত হওয়ার পর এক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। এতকাল যে-ব্যাপারগুলো আমাদের উপলব্ধির অলক্ষ্যে ছিল, এই পুস্তক সেগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে বিচার-বিশ্লেষণের আওতায় নিয়ে আসে। আমাদের সমগ্র দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং শ্রুতিগ্রাহ্য উপলব্ধির জগতে সিনেমা ঠিক একইরকম গভীর সংবেদন তৈরি করেছে। সিনেমায় প্রদর্শিত আচরণ ও মনোভাব-প্রকাশক উপাদানগুলো চিত্রকলা বা মঞ্চের তুলনায় অনেক সুনির্দিষ্টভাবে এবং আরও বেশি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব—এটা পুরো বাস্তবতার একটা দিক মাত্র। চিত্রকলার তুলনায় চলচ্চিত্রায়িত আচরণ ও মনোভাব নিজেকে অনেক বেশি সম্পন্নরূপে হাজির করে : পরিপার্শ্বকে অনেক নিখুঁতভাবে তা উপস্থাপন করতে পারে। মঞ্চের তুলনায়ও তা সুবিধাজনক; এই অর্থে যে, সিনেমায় খুব সহজেই প্রতিবেশ থেকে একটা বিশেষ উপাদানকে আলাদা করে উপস্থাপন করা সম্ভব। কলা ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমঝোতার দিকে চলচ্চিত্রের বিশেষ আগ্রহ থেকেই এর এই প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পর্দায় উপস্থাপিত কোনো দৃশ্যের ক্ষেত্রে—যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে খুব নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়, যেমন শরীরের কোনো পেশীর প্রদর্শনী—শিল্পমূল্যই বেশি আকর্ষণীয়, নাকি বিজ্ঞানলব্ধ মুন্সিয়ানা বেশি মূল্যবান—তার হিসাব-কষা সহজ কাজ নয়। শিল্পমূল্য আর বিজ্ঞানলব্ধ মূল্যের মধ্যে যে-পার্থক্যরেখা এযাবত টানা হত, আলোকচিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে এখন তার যথাযথ সীমা ও মূল্যনির্দেশ করতে পারা চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান বৈপ্লবিক কীর্তি।

www.pathagar.com

চারপাশের বস্তুনিচয়ের ক্লোজ-আপ শটের মধ্যে দিয়ে, আমাদের পরিচিত বস্তুজগতের গোপনকক্ষে আলো ফেলে কিংবা সাধারণ প্রতিবেশকে উদ্ভাসিত করে ক্যামেরার সুচতুর অভিভাবকত্বে সিনেমা একদিকে প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ নানা বিধির ব্যাপারে আমাদের সচকিত করে, অন্যদিকে বাস্তবতার ব্যাপক-অভাবনীয় সব প্রান্তও আমাদের গোচরে আনে। আমাদের সদররাস্তা, তদুপরি শুঁড়িখানা, অফিস আর গোছানো ঘরদোর, রেলস্টেশন আর কারখানা সকল নিত্যদিনের একঘেয়েমির মধ্যে অনুল্লেখ পড়ে থাকে। এর মধ্যে সিনেমা আবির্ভূত হয় ত্রাতা হয়ে—তার সেকেণ্ডের এক-দশমাংশ সময়ের ডিনামাইটে এই কারাপ্রান্তর ছিন্নভিন্ন করে দেয়; ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সুদূর অনিত্যের আবহ নিয়ে আসে, যার মধ্যে আমরা খোশমেজাজে চমৎকৃত হতে হতে অগ্রসর হই। ক্লোজ-আপ শট পরিসরের বিস্তৃতি ঘটায়, ধীর-গতি শটে গতিবিধি ও নড়াচড়ার প্রলম্বিত রূপ দেখি। একটা বিবর্ধিত স্ন্যাপশট আমাদের পরিচিত বস্তুকে আরও নিখুঁত ও স্বচ্ছভাবেই কেবল উপস্থাপন করে না, সংশ্লিষ্ট বস্তুটির অন্ধিসন্ধির নানা অজানা খবরও জাহির করে। ধীর-গতি শটও তেমনই পরিচিত নড়াচড়া বা গতিবিধিকে নতুন তাৎপর্যে আমাদের সামনে নিয়ে আসে। এটা দ্রুত চলার অক্ষম রূপ নয়, বরং আরও বেশি কিছু—মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলা, ভেসে থাকা কিংবা অতিপ্রাকৃত গতির আবহ। নিশ্চিতভাবেই খালি চোখে দেখার তুলনায় ক্যামেরার চোখে দেখাতে ভিন্ন মাত্রা সংযোজিত হয়—অন্য কারণের কথা বাদ দিয়ে কেবল একারণেও যে, সাধারণভাবে আমরা কোনো কিছুকে আলগোছ অসচেতন দৃষ্টিনিক্ষেপ দেখে থাকি; কিন্তু ক্যামেরার চিত্রধারণ একটা অন্তরঙ্গ সচেতন প্রক্রিয়া। মানুষের হাঁটা সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমরা সবাই ওয়াকিবহাল, কিন্তু হাঁটার সময় খুব ছোট্ট সময়ের পরিসরে কারো পায়ের ভঙ্গি কীরূপ থাকে, তা কেউই খেয়াল করে দেখে না, বা দেখতে পারে না। লাইটার বা চামচের জন্য হাত-বাড়ানো খুবই পরিচিত ঘটনা—কিন্তু ঘটনাটি ঘটার মুহূর্তে আমাদের হাত এই বস্তুগলোকে ঠিক কীভাবে স্পর্শ করে, তা কে-ই-বা আর খেয়াল করে? আমাদের মনোভঙ্গি বদলের সঙ্গে স্পর্শের ধরন যে পরিবর্তিত হতে পারে, সে-প্রসঙ্গ না-হয় নাই তুললাম। এখানেই ক্যামেরার ফজিলত। ক্যামেরা তার অনন্যসাধারণ সব ক্ষমতার—যেমন, উঁচু-নিচু করা, আলাদা করা, বিবর্ধিত ও গতিশীল করা, বড় বা ছোট করা—কসরতে আমাদের খেয়াল না-করা ভুবনে অনুপ্রবেশ করে। যেসব দৃশ্যের ব্যাপারে আমরা অচেতন ছিলাম ইহাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। দেয় ঠিক সেভাবে, যেভাবে মনঃসমীক্ষা কোনো অচেতন প্রবণতার ব্যাপারে আমাদের সচকিত করে।

www.pathagar.com

১৪

চিরদিনই শিল্পকলার অন্যতম প্রধান কাজ হল এমন সব নতুন চাহিদা তৈরি করা, যা পূরণ করা কেবল পরবর্তী কালেই সম্ভব। শিল্পকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব, প্রত্যেক শিল্পকলাই তার অগ্রগতির বিশেষ পর্যায়ে এমন সব উচ্চাভিলাষী অভীপ্সা পোষণ করেছে, প্রযুক্তির পরিবর্তিত উন্নত ধাপ ছাড়া যা লভ্য নয়। বলা যায়, শিল্পকলার পরবর্তী নতুন রূপেই (form) তার পরিপূর্ণ প্রাপ্তিযোগ ঘটে। যাকে সাধারণভাবে আমরা কোনো শিল্পকলার অবক্ষয়ের যুগ বলি, সে সময়ে শিল্পে অপরিমিতি ও স্থূলতার আমদানি হয়। এটা আসলে সংশ্লিষ্ট শিল্পকলার অতীত সমৃদ্ধির উৎসারণ এবং নতুন শিল্পকলার জন্মচিহ্ন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দাদাবাদে (Dadaism) এরূপ বর্বরতার প্রকাশ লক্ষ করেছি। এখনই কেবল এর প্রবণতাগুলো সূক্ষ্মভাবে দেখানো সম্ভব হচ্ছে—আদতে চিত্রশিল্প ও সাহিত্যে দাদাবাদ যে-প্রাপ্তিযোগ ঘটাতে চেয়েছিল, আজ লোকে সিনেমায় তারই রূপায়ণ দেখছে।

মৌলিকভাবে অভিনব অগ্রদূতপ্রতিম যে-কোনো সৃষ্টি সাধারণত তার লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে যায়। দাদাবাদ বাজারমূল্যের তোয়াক্কা না-করে উচ্চতর অন্য অভীপ্সা লালনের মধ্য দিয়ে এটা করতে পেরেছিল। আসলে এটা সিনেমারই বৈশিষ্ট্য। অবশ্য দাদাবাদীরা খুব সচেতনভাবে এই কাজ করেছিলেন, এমন বলা যাবে না। বাজারমূল্যকে গৌণ করে দিয়ে অর্থাৎ প্রজল পথে না হেঁটে, তারা তারা ছবির মধ্যে ভাবনা-উদ্রেককর নতুন নতুন উপাদানের সন্নিবেশ ঘটিয়েছিলেন। দাদাবাদীদের ক্ষেত্রে বহুলশ্রুত উপকরণমানের অবনয়ন এই লক্ষ্য সাধনে প্রভূত সাহায্য করেছিল। তাদের কবিতা ছিল এক অর্থে 'শব্দের সালাদ'—অশ্লীল আর আভিজাত্য-হারানো ভাষিক উপাদানের উপাদেয় মিশেল। একই কথা তাদের চিত্রকলার ক্ষেত্রেও সত্য। প্রায়শই ছবির ওপর তারা বোতাম বা টিকেট সেঁটে দিতেন। তাদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের শিল্পকর্ম থেকে মহিমার সম্পূর্ণ বিলুপ্তিসাধন। এই সাধনা সফল হয়েছিল : নিজেদের সৃষ্ট শিল্পকর্মকে তারা পুনরুৎপাদিত শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য দিতে পেরেছিলেন। আর্পের (Arp) চিত্রকলা কিংবা অগাস্ট স্ট্র্যামের কবিতার ভাবনায়-মূল্যায়নে ঐ পরিমাণ সময় নেওয়া প্রায় অসম্ভব, যা ডিরেইনের চিত্রকলা কিংবা রিলকের কবিতার জন্য নিত্যন্তই জরুরি। মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙনের ফলে সমাজে চিত্তের নিবিষ্টতার পরিসর কমেছে, সামাজিক আচরণের বিকল্প মাত্রা হিসেবে চিত্তের বিক্ষিপ্ততা জোরালো হয়েছে। স্ক্যাণ্ডালকে নিজেদের শিল্পকর্মের কেন্দ্রে স্থান দিয়ে দাদাবাদীরা আসলে এই বিক্ষিপ্ত চিত্তেরই আশ্রয়স্থল হয়েছিলেন। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ভোক্তাকে নির্মমভাবে উসকে দেওয়া।

www.pathagar.com

বেশ লোভনীয় আর প্রণোদনা-সৃষ্টিকারী প্রণালী-পদ্ধতি-যোগে দাদাবাদীদের শিল্পকলা হয়ে উঠেছিল ক্ষেপণাস্ত্রসম। এগুলো দর্শককে বুলেটের মতো বিদ্ধ করেছে—গভীর ভাবনার দাবি না-জানিয়েই স্পর্শের অনুভূতি দিয়েছে, ছুঁয়ে গেছে। এর মধ্য দিয়ে আসলে চাহিদা তৈরি হয়েছে সিনেমার, যা অন্তত প্রাথমিকভাবে গভীর মনঃসংযোগ ছাড়াই দর্শককে স্পর্শ করে। স্থান ও প্রেক্ষণবিন্দুর ক্রমিক পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে সিনেমা দর্শককে বিহ্বল করে। সিনেমার পর্দার সঙ্গে এবার চিত্রপটের (ক্যানভাসের) তুলনা করা যাক। চিত্রকলা দর্শককে ভাবনার অবকাশ দেয়, এর সামনে দর্শক নিজেকে সমর্পণ করতে পারে। কিন্তু সিনেমার পর্দার সামনে এটা সম্ভব নয়। এখানে একটা দৃশ্যে মনোযোগ দিতে-না-দিতেই অন্য দৃশ্য হাজির হয়। ফলে এক দৃশ্য নিয়ে তন্ময় হয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে না। দুহামেল (Duhamel) সিনেমা পছন্দ করতেন না, এর তাৎপর্যও বুঝে উঠতে পারেননি; তবে সিনেমার গঠনশৈলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর একটা মন্তব্যে সিনেমার উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছে এভাবে : 'আমি যা ভাবতে চাই, তা ভাবতে পারি না; চলমান দৃশ্যাবলি আমার ভাবনাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।' এভাবে দৃশ্যাবলির নিশ্চিত কিন্তু আকস্মিক পরিবর্তন দ্বারা সিনেমার সঙ্গে দর্শকের সম্পৃক্তির প্রক্রিয়া চলতে থাকে। দৃশ্য-পরম্পরার অভিঘাতে দর্শক উদ্বেলিত হয়; যেকোনো মানসিক অভিঘাতের মতো সিনেমার এই অভিঘাতও মনের এক উচ্চকিত সক্রিয়তা দ্বারাই কেবল কব্জায় আনা সম্ভব। দাদাবাদের ক্ষেত্রে যা ছিল এক অন্তঃস্থ মানসিক অভিঘাত, সিনেমার বিশেষ যান্ত্রিক সংগঠন তাকেই যেন প্রবলতর শারীরিক-মানসিক অভিঘাতে উন্নীত করেছে।

১৫

শিল্পকলার প্রতি মানুষের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি আজ যে নতুন মাত্রা পেয়েছে, জনতার সম্পৃক্তিই তার জননী। শুরুতে মাত্রাটা ছিল কেবল পরিমাণগত, ক্রমে গুণগত মাত্রা অর্জিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারী জনতার ক্রমবর্ধমান হার খোদ অংশগ্রহণের ধরনকেই দিয়েছে পাল্টে। অংশগ্রহণের এই নতুন ধরনের আকস্মিকতায় বিভ্রান্ত হলে চলবে না। যদিও কেউ কেউ এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন না-করে কেবল বাহ্য বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানিয়েছে। আক্রমণকারীদের মধ্যে দুহামেলের অভিমত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সিনেমায় জনতার অংশগ্রহণের দরুন দুহামেলের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। তার মতে,

সিনেমা নিম্নশ্রেণীর মানুষের অবসর-বিনোদন; অশিক্ষিত, দুর্ভাগ্যপীড়িত আর জীর্ণ মানুষের আশ্রয়, যারা নিজেদের দুর্দশাতেই বিপর্যস্ত। সিনেমা এমন সব দৃশ্যের আকর, যা

www.pathagar.com

দেখার জন্য পর্যাপ্ত মনোযোগ আর বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন নাই; এগুলো দর্শকের অন্তরে আলো জ্বালায় না, তাকে আশায় উদ্দীপ্ত করে না, কেবল লসএঞ্জেল্‌সের 'তারকা' হয়ে ওঠার উদ্ভট স্বপ্ন তৈরি করে।

বোঝা যায়, দুহামেলের এই মন্তব্য সেই পুরানা বিলাপেরই সমরূপ, যেখানে মনে করা হয় : জনতা চায় নির্লিপ্ত উপভোগ, আর ভোক্তার কাছে শিল্পকলা দাবি করে মনোযোগ। সেই পুরানা কাসুন্দি।

প্রশ্ন থেকে যায়, এই কাসুন্দি চলচ্চিত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আদৌ কাজে আসে কিনা। ব্যাপারটিকে আরও অন্তরঙ্গভাবে দেখা দরকার। শিল্পে আসক্তিহীনতা আর মনোযোগ দুই বিপরীত প্রান্ত নির্দেশ করে, যাকে আমরা এভাবে বর্ণনা করতে পারি : মনোযোগ দিয়ে দেখার সময় একজন দর্শক শিল্পকলা কর্তৃক আত্মীকৃত হয়, অর্থাৎ শিল্পকলা তার সত্তাকে গ্রাস করে; শিল্পকর্মে সে এমনভাবে প্রবেশ করে, যেভাবে চীনা চিত্রকর তার সদ্যসমাপ্ত ছবি দেখত বলে কিংবদন্তি আছে। বিপরীতে, শিল্প-নিরাসক্ত জনতা খোদ শিল্পকর্মটিকেই আত্মীকরণ করে, অর্থাৎ এক্ষত্রে শিল্পকলার ওপর ভোক্তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থপত্যকলার ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটে থাকে। বরাবরই স্থাপত্যকলা শিল্পকর্মের এমন এক ঘরনা, যা সামষ্টিকভাবে এক ধরনের নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে (state of distraction) উপভোগ করা সম্ভব। উপভোগের এই ধরনটি বেশ শিক্ষণীয়।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই দালানকোঠা মানুষের সহচর। ইতোমধ্যে বহু শিল্পকলার উত্থান ও পতন হয়েছে। ট্রাজেডি শুরু হয়েছিল গ্রীকদের হাতে, সেখানেই এর অবসান—কয়েক শতাব্দী পর এর প্রণালি-পদ্ধতি পুনঃজাগ্রত হয়েছে মাত্র। ইউরোপে রেনেসাঁর অবসানকালেই মহাকাব্যেরও—যার উত্থানের সঙ্গে একটা জাতীয় উত্থানদশার যোগ নিবিড়—অবসান ঘটেছে। দেয়াল বা সিলিংয়ে অঙ্কন মধ্যযুগের শিল্প—এটি চিরকাল চলবে, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু মানুষের বাসস্থানের প্রয়োজন শেষ হওয়ার নয়। তাই স্থাপত্যকলা কখনোই বেকার বসে থাকবে না। এটা অন্য যেকোনো শিল্পকলার তুলনায় পুরানো, আর ভবিষ্যতেও মানুষের জীবন-সম্পৃক্ত হয়েই জায়মান থাকবে। তাই জনতার সঙ্গে শিল্পকলার সম্পর্ক অনুধাবনের যেকোনো চেষ্টায় স্থাপত্যকলার বিবেচনা গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। দালানকোঠাকে আমরা দুভাবে আবিষ্কার করি : ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এবং উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। অন্যভাবে বলা যায় : স্পর্শের মাধ্যমে আর দৃষ্টিগ্রাহ্যতার মাধ্যমে। এভাবে আবিষ্কারের ব্যাপারটিকে কোনো বিখ্যাত দালানের সামনে একজন পর্যটকের কিছু সময়ের জন্য গভীর মনোনিবেশ দ্বারা বোঝা যাবে না।

www.pathagar.com

দৃষ্টির সাহায্যে উপভোগ কিছুতেই স্পর্শগ্রাহ্য অনুভবের বিকল্প হতে পারে না। স্পর্শগ্রাহ্য অনুভব বা স্পর্শ-ইন্দ্রিয়-স্বরূপে আত্মস্থ করা যতটা মনোসংযোগের ব্যাপার তার চেয়ে অনেক বেশি অভ্যস্ততার মামলা। স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রে অভ্যাস এমনকি চেয়ে দেখার আনন্দকেও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ স্থাপত্যকলাকে দৃষ্টিবৈভবে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রেও নিবিষ্ট মনোযোগের তুলনায় কোনো প্রসঙ্গের অনুনঙ্গে দেখাই অধিক কার্যকর।

আমরা এখানে স্থাপত্যকলা-সূত্রে শিল্প-উপলব্ধির যে ধরনের কথা বললাম, বিশেষ অবস্থায় তা শিল্প-উপভোগের কানুন হয়ে উঠকে পারে। শিল্প-ইতিহাসের আজকের এই বিশেষ পরিবর্তনসূচক ক্ষণে মানুষের শিল্পবোধ কেবল দৃষ্টিগ্রাহ্যতা বা ভাবনা দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে না। বরং অভ্যাস-চালিত হয়ে একধরনের স্পর্শগ্রাহ্য আত্মস্থকরণ প্রক্রিয়াতেই তা সম্ভব।

নিরাসক্ত থেকেও কোনো কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা যায়। নিরাসক্ত থেকেও কোনো কাজ করে যাওয়ার সামর্থ্য প্রমাণ করে যে এই নিরাসক্তির সমাধান আসলে অভ্যাস গড়ে ওঠার মধ্যেই নিহিত। প্রচল শিল্পের প্রতি মানুষের আসক্তিহীনতার বা বিমুখতার মাত্রার মধ্যেই নতুন শিল্পবোধের উদ্বোধন এবং সৃষ্ট শিল্পবোধের আলোকে নতুন শিল্প উপভোগের সূত্র নিহিত আছে। আর যেহেতু এটা পরিষ্কার যে, একক ব্যক্তি এই কাজে উৎসাহী নয়, সেহেতু শিল্পকলার সামনে সবচেয়ে জটিল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি এসে পড়ে : সামষ্টিক উপভোগের খোরাক জুগিয়ে গণচিত্তের জাগরণ। চলচ্চিত্র ঠিক এই কাজটিই করছে। সব ধরনের শিল্পের প্রতি মানুষের নিরাসক্তির ফলে শিল্পবোধের যে নতুন রূপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে, চলচ্চিত্রই হয়েছে তার প্রকৃত চারণভূমি। প্রচণ্ড অভিঘাত সৃষ্টির সক্ষমতায় চলচ্চিত্র দর্শকের নতুন উপভোগ-প্রবণতাকে তৃপ্ত করে। সিনেমায় আচারমূল্যের কোনো স্থান থাকে না। একদিকে দর্শক এখানে হয়ে ওঠে সমালোচক এবং অন্যদিকে, আচারমূল্যের দিকে মনোযোগ দেওয়ার কোনো অবকাশই থাকে না। দর্শক এখানে পরীক্ষক বটে, কিন্তু আসক্তিহীন পরীক্ষক।

পরিশিষ্ট

ক্রমবর্ধমান হারে মানুষের সর্বহারা শ্রেণীভুক্ত হওয়া আর আমজনতার বর্ধিষ্ণু হার একই প্রক্রিয়ার দুই দিক মাত্র। এই জনতা বিদ্যমান সম্পত্তি-কাঠামোর পরিবর্তন চায়; পক্ষান্তরে ফ্যাসিবাদী শক্তি চায় বিদ্যমান সম্পত্তি-কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে জনতাকে সংগঠিত করতে। জনতার অধিকার নিশ্চিত করা নয়, বরং তাদের আবেগকে বিশেষভাবে কাজে লাগানোই ফ্যাসিবাদের উদ্দেশ্য হাসিলের পথ। যেখানে বিদ্যমান সম্পত্তি-কাঠামোর পরিবর্তন

www.pathagar.com

জনতার অধিকার, সেখানে ফ্যাসিবাদ সম্পত্তির বিদ্যমান বিন্যাসে হাত না-দিয়েই জনতার জাগরণ কামনা করে। ফ্যাসিবাদী শক্তির এই নীতির ফলে খুব যৌক্তিকভাবেই নান্দনিকতা (aesthetics) রাজনীতির স্থলাভিষিক্ত হয়। ফুয়েরার (Fuhrer) সংস্কৃতির বন্ধনে ফ্যাসিবাদ জনতাকে বশীভূত করে রাখে। জনতার উত্থান-সম্ভাবনা বিশেষ আচার বা রীতির নিগড়ে বাঁধা পড়ে।

রাজনীতিকে নান্দনিকতায় পর্যবসিত করার চূড়ান্ত পরিণতি যুদ্ধ। পুরানা সম্পত্তি-কাঠামো অক্ষুণ্ন রাখলে বড় ধরনের গণজাগরণ একটা লক্ষ্যের দিকেই ধাবিত হতে পারে। আর তা হল যুদ্ধ। পরিস্থিতি বাগে রাখার এটাই একমাত্র রাজনৈতিক সূত্র। প্রযুক্তির দিক থেকে এ-সূত্রকে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি: বিদ্যমান সম্পত্তি-কাঠামোর মধ্যে অর্থাৎ বিত্তহীন বিপুল অংশকে বঞ্চিত রেখে আজকের প্রযুক্তিগত অর্জনকে কেবল যুদ্ধের মাধ্যমেই সচল রাখা সম্ভব। বলাবাহুল্য ফ্যাসিবাদী যুদ্ধভক্তি এরূপ যুক্তি মানতে চাইবে না। তথাপি, ইথিওপিয়ার ঔপনিবেশিক যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত মারিনেত্তির (Marinetti) ইশতিহারে এই সত্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে :

সাতাশ বছর ধরে আমরা যুদ্ধকে নান্দনিকতার শত্রু হিসেবে অভিহিত করার বিরোধিতা করে আসছি ... আমরা বলি ... যুদ্ধ সুন্দর; কারণ, যুদ্ধ গ্যাস-মুখোশ, ভীতিকর মেগাফোন, অগ্নিশিখা নিক্ষেপক এবং ছোট ছোট ট্যাংকের মাধ্যমে মানুষের কর্তৃত্ব নিশ্চিত করে। যুদ্ধ সুন্দর; কারণ, তা মানবদেহের ঈপ্সিত ধাতবায়নের সূচনা করে; ফুলেল মৃত্তিকাকে সমৃদ্ধ করে মেশিনগান থেকে ঝরা আগুনের অর্কিডে। তোপধ্বনি, বিরামহীন কামান-দাগানো, যুদ্ধবিরতি, বারুদ্ধের গন্ধ, পচনের দুর্গন্ধ—সবকিছুকে একটা সিম্ফনিতে পরিণত করে বলেই যুদ্ধ সুন্দর। যুদ্ধ সুন্দর; কারণ, এটি নতুন স্থাপত্যকলার উন্মেষ ঘটায়—বড় বড় ট্যাংক, বিমানের জ্যামিতিক গঠন, প্রজ্বলিত গ্রামগুলো থেকে উত্থিত ধোঁয়ার কুণ্ডলিসহ আরও অনেক কিছুতে। ... ভবিষ্যৎবাদী কবি এবং শিল্পীগণ! ... সমর-নান্দনিকতার এই নীতিগুলো বিস্মৃত হবেন না; নতুন সাহিত্য ও শিল্পের জন্য আপনাদের সংগ্রাম এগুলো দ্বারা উজ্জীবিত হতে পারে।

এই ইশতিহারের মর্মবাণী একেবারেই স্পষ্ট। এই পর্যবেক্ষণ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীদের কাজে লাগবে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীদের কাছে আজকের যুদ্ধ-বিগ্রহের নিগূঢ় তত্ত্বটি একরম : যদি উৎপাদনশক্তিগুলোর স্বাভাবিক উপযোগিতা সম্পত্তির অসম বন্টন দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে যান্ত্রিক কলাকৌশল, গতি আর শক্তি-উৎসগুলোর প্রাচুর্য কোনো অস্বাভাবিক পথেই ব্যবহৃত হবে—যুদ্ধই সেই পথ। যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ প্রমাণ করে যে প্রযুক্তিকে নিজের জৈব-সমগ্রের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে সমাজ এখনো যথেষ্ট লায়েক হয়নি;

www.pathagar.com

আর প্রযুক্তিও সমাজের অন্য মৌলিক শক্তিগুলোর সঙ্গে তাল মিলানোর মতো পর্যাপ্ত বিকাশ লাভ করেনি। উৎপাদন-ব্যবস্থার আজ প্রভূত প্রবৃদ্ধি ঘটেছে; কিন্তু বেকারত্ব এবং বাজারের তথা ভোক্তার অভাবহেতু পুরো উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত সম্পদের পরিচলন একেবারেই সামান্য—এই পার্থক্য বা পরিস্থিতিই ভয়াবহ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উৎসস্থল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আদতে প্রযুক্তির একরকম প্রতিশোধ। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক উপকরণে ব্যবহৃত হতে না পেরে প্রযুক্তি আজ মানুষকে তার ধ্বংসের লক্ষ্যস্থল করেছে। নদী-খননের পরিবর্তে মানুষ আজ যুদ্ধের জন্য পরিখা খনন করছে; উড়োজাহাজ থেকে বীজ ছিটানোর বদলে নগরীতে ধ্বংসাত্মক বোমা ফেলছে; আর গ্যাসযুদ্ধ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অন্য আরেকভাবে মানবমহিমার বিলয় সাধন করছে।

ফ্যাসিবাদ বলে, 'Fiat ars—Pereat mundus'। আর আশা করে, প্রযুক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়-উপলব্ধিতে যে পরিবর্তন এনেছে, যুদ্ধই তার নান্দনিক তুষ্টির খোরাক জোগাবে। মারিনেত্তির পূর্বোক্ত ইশতিহারে এই মতের অনুরণন দেখতে পাই। এই ধারণা নিঃসন্দেহে কলাকৈবল্যবাদের চরম নিদর্শন। মানবজাতির কী করুণ পরিণতি—হোমারের কালে তারা অলিম্পিয়ান দেবতাদের ক্রীড়ানক ছিল; আর আজ তারা নিজেরাই নিজেদের লক্ষ্যবস্তু। মানুষের আত্ম-বিচ্ছিন্নতা এতটাই চরমে পৌঁছেছে যে, নিজেদের ধ্বংসযজ্ঞকেই তারা উচ্চমার্গের নান্দনিক আনন্দ হিসেবে বিবেচনা করতে পারছে। ফ্যাসিবাদের রাজনীতি থেকে পাওয়া নান্দনিকতার এই হল হাল-হকিকত। বিপরীতে, কমিউনিজমের কাজ খোদ নন্দনতত্ত্বকেই রাজনৈতিক করে তোলা।

অনুবাদ : জাকির হোসেন মজুমদার ও মোহাম্মদ আজম

www.pathagar.com

জেনে, এইচ, বেল-ভিল্লাডা

'শিল্পের-জন্য-শিল্প' মতবাদ : বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্ভব, সামাজিক অবস্থা ও কাব্যিক মতাদর্শ

ভিল্লাডা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের উইলিয়মস কলেজের 'রোমানস ভাষা ও সাহিত্য' বিভাগের অধ্যাপক। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি লাভ করেছেন ১৯৭৪ সালে-তারপরই কলেজে যোগদান করেন। সমালোচক প্রবন্ধকার অনুবাদক ও কথাসাহিত্যিক হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে :

১. Borges and his Fiction : A guide to his Mind and Art (১৯৮১)
২. The Carlos Chadwick Mystery (১৯৯০)
৩. Garcia Marquez : The Man and his Work (১৯৯০)
৪. Ideology and culture of Aesthetics 1790-1990 (১৯৯৬)
৫. Oversis American's: Growing up to Gringo in the tropics (২০০৫)

অনূদিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে Science and Society 'A Marxian Quarters' পত্রিকার ১৯৮৬ সালের শীত সংখ্যায়।

দূরপ্রাচ্যে যাকে 'নান্দনিক আবেগ' বলে অভিহিত করা হয়, তার মধ্যে এখনো ধর্মীয় প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, এমনকি বুদ্ধিজীবীদের চেতনায়ও।

মির্চা ইলিয়াডে

'শিল্পের-জন্য-শিল্প' উক্তিটি বর্তমানে কিছুটা উদ্ভট অথচ মনোরম বলে মনে হয়। সেটা অনিবার্যভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অসকার ওয়াইল্ড এবং The Picture of Dorin Gray কাব্যের ভূমিকা–প্রবন্ধের ব্যাঞ্জনাময় উক্তির দিকে যা তিনি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমাদের ইংরেজ ও আমেরিকান পাঠকের কাছে নন্দনতাত্ত্বিক আদর্শটির সর্বাধিক অর্থগূঢ় সারাংশ হচ্ছে, ওয়াইল্ড সুলভ উত্তেজক ভাষায়-'সৎগ্রন্থ বা অসৎগ্রন্থ বলে কোন কিছু নেই। বই হয় ভালভাবে বা খারাপভাবে রচিত। এটাই শেষ কথা।' বা নৈতিকতা বর্জিত কথাটি 'কোন শিল্পীরই নৈতিকতার প্রতি সহানুভূতি নেই। পাপপুণ্য শিল্পীর কাছে উপকরণ মাত্র।' ওয়াইল্ডের চরমতম শ্লেষাত্মক ও বিকৃত বক্তব্য হচ্ছে-'সব শিল্পই একেবারে অকাজের'।

তত্ত্বটিকে একান্তভাবে অসকার ওয়াইল্ডের সংগে জড়িয়ে ফেললে, একালে ও সেকালে যে এটি ব্যাপক অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল, তার প্রতি আমাদের অন্ধ করে দেয়া হয়। ওয়াইল্ডের জহুরী চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের রোমান্টিক ও প্রতীকী ধারার কবিদের সমতলে :

www.pathagar.com

যারা আবার প্যারিসের গুটি কয়েক অধ্যাপকের (প্রধানত ভিকটর কুজিন) শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত তত্ত্বকে সরল করে ফেলেছিলেন। এই অধ্যাপকেরা নান্দনিক স্বায়ত্তশাসনের ধারণা লাভ করেছিলেন মূলত বহুদূর প্রাসিয়ার একজন দার্শনিকের দুরূহ ও জটিল নিবন্ধ থেকে। শেষবিচারে ইমানুয়েল কান্ট নামক এই দার্শনিকের বিচারক-সুলভ যুক্তিতর্কের মূলে ছিল শ্যাফটেজবারির তৃতীয় আর্লের কঠোর প্রাতিষ্ঠানিক মনোভাব। দেখা যাবে অসকার ওয়াইল্ডের হাস্যরসাত্মক, অশ্রদ্ধেয় ও ভিকটোরীয় মূল্যবোধ-বিরোধী টাইপের নান্দনিক ধারণা বুর্জোয়া ইউরোপে প্রচলিত ছিল।

নন্দনতত্ত্ববিদদের আদর্শ একবার চালু করলে সেটা নিজের জন্য এক আদর্শায়িত জীবন বেছে নেয়, যা সকল সাংস্কৃতিক বিতর্কের অন্তঃশায়ী কিন্তু নীতিনির্ধারণী ভূমিকা নিয়ে এখনো টিকে আছে। স্বকালে বিশুদ্ধ শিল্পের প্রবক্তা রূপে অসকার ওয়াইল্ড ব্রিটিশদের মধ্যে সুনামের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারতেন ; ভাগ্যের পরিহাস যে তাঁর মেজাজ ও জীবনধারা সৌন্দর্যবাদের অনুকূল ছিলনা—তাঁর বিস্ময়কর কৌতুকবোধ, বহির্মুখী সামাজিক দক্ষতা, দ্রুত লেখার ক্ষমতা এবং বাণিজ্যিক নাটক মঞ্চায়নে বিপুল সাফল্য অনেকটা অসংগত মনে হয় তাঁর ফ্লবেরীয় সন্ন্যাসীসুলভ অন্তর্মুখিতা, জাগতিক প্রলোভন থেকে দূরে থাকার প্রবণতা, শিল্পকর্মকে নিখুঁত করার ধীর সংগ্রাম প্রভৃতি মনে রাখলে। তাঁর ঘোর দাম্ভিকতাপূর্ণ উচ্চারণকে তেমনটা এক ধরনের ব্যাজস্তুতি ও এক অপবিত্র ফাজলামো বলে মনে হয়, যা গোতিয়ে বা মালার্মের মধ্যে কল্পনা করা যায় না ; এবং সব মিলেয়ে পাঠকের সামনে এসে দাঁড়ায় দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন এমন একজন মানুষের মূর্তি যিনি ভিকটোরীয় মর্যাদাবোধকে বিদ্রূপ করার জন্য যে কোন ঘটনাকে কাজে লাগাতে আগ্রহ পেতেন। শিল্পের-জন্য-শিল্প তত্ত্বের বড় প্রবক্তা হলেও এর অনুশীলন তিনি করেননি।

এও মনে রাখতে হবে অসকার ওয়াইল্ড ও ১৮৯০-এর দশকে ব্রিটেনে রচিত তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে 'শিল্পের-জন্য-শিল্প' তত্ত্বকে মিলিয়ে ফেলার যে প্রবণতা আমাদের রয়েছে তার ফলে ১৯৪৫-এর পরের দিনগুলোতে উত্তর-আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিভিন্ন নামে ও রূপে যে সেটার চর্চা ছিল তা সাময়িকভাবে আড়ালে চলে যায় ; কিন্তু আবার শুরু হয় 'নতুন সমালোচনা'; অধ্যাপক রেনে ওয়ালেক ও অস্টিন ওয়ারেন সেগুলোকে ছাত্রপাঠ্য করে তুলেন ; তার পরে এলেন নরথ্রুপফ্রাই যিনি সাহিত্যের ইতিহাসকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেন : তার বিবেচনায় সাহিত্য স্বয়ংসম্পূর্ণ; তাতে পরিবর্তনের হাওয়া বয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য থেকে, এবং কখনোই বাইরে থেকে নয়। হাল আমলের ভাষাবিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে বলা যায় ইতিহাস ও আইনের পাঠ্যসহ সব মানবিক বিবরণ

www.pathagar.com

রেফারেন্স অযোগ্য (Non-referentiality) : নান্দনিক অভিজ্ঞতা ও অধিকাংশ মানবীয় বিষয়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ সংযোগহীনতাকে মনে করা হয় মৌলিক ও স্বতঃসিদ্ধ বলে এবং কখন থেকে বিচ্ছিন্নতা শুরু হয়েছে সেই সাহিত্যতত্ত্বের যা দাবি করে গভীর চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা।

সন্দেহ নেই যে, যে দুজন নামকরা পণ্ডিতের উল্লেখ করা হল ভাবাদর্শগত বিচারে অসকার ওয়াইল্ডের সংগে এক কাতারে দাঁড় করানোতে তাঁরা ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু বিভ্রান্তিকর এই দশকগুলোতে পাশ্চাত্যের একাডেমিক সাহিত্যতত্ত্বকে পরীক্ষা করা অথবা তালগোল পাকানো বিতর্কসমূহেও তারতম্য নির্দেশ করা আমার লক্ষ্য নয়। বরং বিশেষভাবে আমি যা করতে চাই তা হল, অতীতের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে আনা, এবং তদ্বারা একটি টেকসই (sustain) মতবাদ হিসেবে শিল্পের-জন্য-শিল্প উদ্ভবের কারণগুলো খুঁজে বের করা, যাকে প্রথমে অনুশীলনরত গীতিকবিরা স্পষ্টভাবে গ্রহণ, সযত্নে লালন ও অবলম্বন করেছিলেন। সেই ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে রচিত বর্তমান নিবন্ধে মোটামুটি একই অর্থে ও তাৎপর্যে ব্যবহৃত aestheticism (নন্দনবাদ), Pure poetry (বিশুদ্ধ কবিতা) Pure Art (বিশুদ্ধ শিল্প), Art for Art's sake (শিল্পের-জন্য-শিল্প) প্রভৃতি শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে পরস্পর-বিনিময় ধরে প্রয়োগ করেছিল। আর আছে আমার নিজের বের করা শব্দ Aesthetic Separatism (নান্দনিক পৃথকীকরণ)। অবশ্য মূল অর্থ ও তাৎপর্য সবচেয়ে বেশি বিধৃত আছে L'art Pour l'art, Poesie Pure-র মত ফরাসী শব্দগুচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে L'art Pour l'art (শিল্পের-জন্য-শিল্প) বাক্যাংশটি রণধ্বনি হিসেবে প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল, সব প্রাগ্রসর আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক শ্লোগানের সূতিকাগৃহ প্যারিসে।

নন্দনবাদীর আদর্শ আমাদের দ্বিধান্বিত ও অস্থির করে। একদিকে নিজেদের স্বজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বিশুদ্ধ নান্দনিক প্রপঞ্চের অস্তিত্ব আছে। মধ্যযুগের পোপদের সম্পর্কে ধারণা যাই হোক না কেন আমরা প্রায় সবাই গথিক গীর্জাগুলোকে পছন্দ করি। একটি গোলাপ বাগান দেখে আমরা আনন্দিত হই। যদি কোন বাজে লোকও বাড়ির পেছনের উঠানে সেটার চাষ করে করে থাকে। বিশ্ববিখ্যাত জার্মান সুরকার রিচার্ড ভাগনার (১৮১৩-১৮৮২) কর্তৃক রচিত 'পত্রমিতালী সংগীত অপেরা' পার্সিকাল (১৮৮২) আমাদের বিচলিত করতে পারে যদিও ভাগনার ছিলেন একজন জার্মান জাতীয়তাবাদী, ছিটগ্রস্ত মরমী এবং অনুতপ্ত নয়, তেমন একজন সেমিটিক জাতি-বিরোধী। সেটা ভালভাবে জানার পরও আমরা সাড়া দেই কারণ আর কিছু নয় সেগুলো আমাদের স্বতোপ্রণোদিত ভাবে আনন্দ দিতে পারে ও হাস্য-কৌতুকপূর্ণ তৃপ্তি প্রদান করে যে আনন্দ আমরা প্রিয়জন ও

www.pathagar.com

সমমতাবলম্বী ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলে উপভোগ করতে চাই।

আমরা খুব সম্ভবত এ-ও বিশ্বাস করি যে, বিশুদ্ধ নান্দনিক আনন্দকে অকার্যকর করার জন্য বিকৃত বৃদ্ধিজাত কয়েকটি সমাজ-রাজনৈতিক চেষ্টা ছিল। পাঠ্য-তালিকা ও অনুমোদিত শিল্প-তালিকা সীমিত করে দিয়ে ক্রমোয়েলের ইংরেজ ও মাওসেতুং-এর সৈনিকদের মন ও হৃদয়কে দরিদ্র করতে সফল হয়েছিল। মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত জয়েস ও স্ট্রাভিনসকির রচনাবলী ইউএস এস আর-এ আঙ্গিকবাদী সাহিত্য' বলে অভিযুক্ত ও অবাঞ্ছিত বলে ঘোষিত ও শেষমেষ বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। বহিষ্কার করার সেই নীতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুটিকয়েক শিল্পী ও শিল্পবোদ্ধার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল।

অন্যদিকে আমরা অনেকেই অস্বস্তি বোধ করি 'শিল্পের-জন্য-শিল্প' তত্ত্বে নৈতিকতার প্রতি ঔদাসীন্য দেখে। 'কোন শিল্পীর নৈতিকতার প্রতি সহানুভূতি নেই'-এই বিশ্বাসের শিল্পীদের চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে ; একজন আহত ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে উদ্ধার করার চেয়ে একটি দুর্লভ ও সুন্দর প্রজাপতিকে শিকারীসুলভ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের গগণস্পর্শী অমানবিক বক্তব্য আরো বেশি অনৈতিক হতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যল্প সময়ের মধ্যে সেসব ধারা ফ্যাসিবাদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। স্মরণ করা যায় ওয়ালটার বেনজামিন কর্তৃক প্রথমে নির্দেশিত সুপরিচিত পার্থক্যটি : কম্যুনিস্টরা করে শিল্পকলার রাজনীতিকরণ আর ফ্যাসিস্টরা নান্দনিক মুখোশ পরায় রাজনীতিকে। শেষোক্ত চিন্তার চূড়ান্ত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে মুসোলিনী পুত্রের উক্তিতে। ইতালী-ইথিওপিয়া যুদ্ধে বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপের সৌন্দর্যকে তিনি প্রশংসা করেছিলেন, এবং তুলনা করেছিলেন প্রস্ফুটিত ফুলের সঙ্গে।

চরম নান্দনিকতা ও এর ফ্যাসিবাদী প্রবণতার উদাহরণ হিসেবে শুনে রক্ত-হিম হয়ে যাওয়ার মত একটি ভবিষ্যতবাণী আমি শোনাচ্ছি জর্জ ম্যুরের স্মৃতিকথা Confession of a young man থেকে। অনুমান করি নীৎসের প্রভাবে দয়া ও ন্যায় বিচার প্রার্থনার মত আবেদনকে ঘৃণা ভরে বাতিল করে দিয়েছেন এমন সুর মুর্ছনা উচ্চারণে যা শুধু আশা করতে পারি ঠাট্টা-কৌতুক করে রচিত-

আমরা পূজা করি অবিচারের, যা কিছু আমাদিগকে জীবনের দুঃখ থেকে উর্ধ্বে তুলে ধরে তা হচ্ছে অবিচারের মহিমান্বিত ফলসমূহ ..... মানুষ মানুষ হত-না যদি-না অবিচার থাকত। সুতরাং তৃতীয়বার স্বাগত জানাই মহান পূণ্য অবিচারকে। ফেরাউনের কশাঘাতে কয়েক লক্ষ হতভাগ্য ইজরাইলী মারা গেছে, তাতে আমার কী। এটা তো ভাল যে তারা মারা যাবার ফলে আমরা পিরামিড দেখতে পাচ্ছি অথবা বিস্ময়কর একটি সংগীত প্রহর কাটাতে

www.pathagar.com

> পেরেছি। আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি এইগুলোর বিনিময়ে কলংকিত মৃত ক্রীতদাসদের ফেরত চাইবেন। না আরো বলি, একটি অন্যায় হয়েছে (লক্ষ লক্ষ ইজরায়েলীকে অত্যাচার-নিপীড়ন করে হত্যা করা হয়েছে) সেই জ্ঞান অতিরিক্ত আনন্দ নিয়ে আসে যা আমি পরিত্যাগ করতে পারিনা। ওই মার্বেল পাথরের বিচারালয়ে নীরবতা।

আমরা সকলে যেমন জানি ম্যুরের নান্দনিক স্বপ্ন আবার সত্য হবে, এবং সম্ভবত কিছু টিউটনিক পিরামিড দেখে আনন্দ পেতে চায়।

আবার বলছি, 'সমাজ বনাম শিল্পের নান্দনিক ধারণা' বিষয় নিয়ে আমি কোন বিতর্ক করছি না। যদি কিছু মনে হয় সেটা হবে দেখানো যে জর্জ ম্যুর ও মুসোলিনীর বিকৃত গীতি-আনন্দ পাগলামির কোন পর্যায়ে শিল্পের জন্য শিল্পকে নিয়ে যেতে পারে। হায়! সম্ভবত অধিকাংশ মতবাদের নিজস্ব খুব চমৎকার ও যথাযথ আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও সেগুলোরও দুঃখজনক পরিণতি হচ্ছে এই। এই ধরনের চরম উদাহরণ নান্দনিক মতবাদের ১৫০ বছরের ইতিহাসে পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ শিল্প ও বিশুদ্ধ কবিতা (Poesies pure) অনন্ত সময়ের ও সর্বজনীন ধারণার নয়, বরং তেমন এক ধরনের চিন্তাধারা যা ইতিহাসের ধারায় প্রথমে শেকড় গজিয়েছিল নেপোলিয়ন-উত্তর ফরাসীদেশে তখন থেকে বিকশিত, পরিমার্জিত ও বিস্তৃত হয়ে মার্কিন মুলুকে গেছে এবং সে দেশে এটি শেষপর্যন্ত অনেকটা গোঁড়া মতবাদে পরিণত হয়েছে। তা সত্ত্বেও নিরবিচ্ছিন্ন উপস্থিতি এবং শিল্পের-জন্য-শিল্প তত্ত্বের অমোঘ আকর্ষণে কিছু আবেগপ্রবণ ভুল বোঝাবুঝির ও চরম প্রত্যয়ের সৃষ্টি হবার আশংকা থেকে যায়। আমাদের কালে নন্দনতত্ত্বের সবচেয়ে সোচ্চার প্রবক্তা ও ব্যবহারকারী ছিলেন নবোকভ। প্রথমাবধি শাস্ত্রবিজ্ঞানী ব্যক্তি ও দক্ষ জাদুকর নবোকভ সাহিত্যে সামান্যতম সমাজচেতনার উপস্থিতিতে বিরক্ত হতেন। সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে মহান কার্য সম্পাদনের ন্যায় তিনি শতশত লেখক ও লেখা বাতিল বলে রায় দেন। যাঁদের তিনি বাতিল বলে রায় দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বালজাক, কনরাড, মান, কামু, ফকনার, এমনকি পিকাসোও। গোয়েরনিকার দোষ ছিল এটি প্রতিবাদী পেইন্টিং— অতএব শিল্পকর্ম হবার অযোগ্য।

নবোকভের মত ভাববাদীরা কল্পনা করেন না যে তাদের চিন্তাধারা, সময় ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। নান্দনিক বিভক্তি (Aesthetic Separatism) আগেই বলা হয়েছে যে এমন একাট মতবাদ যার উদ্ভব উনিশ শতকের আগে হয়েছে বলে ভাবাই যায়না। এবং আমার ধারণা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বাইরে এই মতবাদের কোন উল্লেখ করার মত স্থান নেই। 'শিল্পের-জন্য-শিল্প' মতবাদে প্রতিফলিত হয়েছে বুর্জোয়া সমাজে শিল্পীর

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্নতার ভাব। বহুপ্রচলিত এই ধারণাটির সহজ ব্যাখ্যা—অনেক নামজাদা লেখক বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে যথেষ্ট সুসম্পর্ক এমনকি ফলপ্রসূ বা সমৃদ্ধ সম্পর্ক উপভোগ করেছেন। কেউ কখনো ভাবেন না যে ডিকেনস বা ট্রোলোপ বা বালজাক বা হুগো সমাজ-বিচ্ছিন্ন শিল্পী। ফলকথা অল্পবিদ্যাবুদ্ধির মার্কসবাদীরা যখন বিশ্বাস করেন যে শিল্পের-জন্য-শিল্প তত্ত্বটি ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদন, তখন তারা ইতিহাসের সাক্ষ্যকে বিস্মৃত হন। ১৮২০ সালের পরবর্তী সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে সামান্য ধারণা নিয়েও বলা যায় যে 'শিল্পের-জন্য-শিল্প' তত্ত্বটি কোন-না-কোন ভাবে বুর্জোয়া সংস্কৃতির অংশ ছিল। তত্ত্বটি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা দিয়ে কয়েকটি প্রধান দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা করা যায়না। সেজন্যই বলা যায় সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যাটি হয় খুবই সাধারণ বা খুবই সংকীর্ণ।

দুই

আমি বিশ্বাস কিরে যে, 'শিল্পের-জন্য-শিল্প' মতবাদটির উত্থানের সুস্পষ্ট সামাজিক আর্থনীতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ রয়েছে। যথাসময়ে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে। এক্ষণে মতবাদটির জটিল প্রাক-ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরানো প্রয়োজন। প্রথমে প্রয়োজন 'আলোকিত যুগের চিন্তাবিদদের লেখা থেকে এর সাংগঠনিক অংশগুলো খুঁজে বের করা, তারপরে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের 'ক্রিটিক অব জাজমেন্ট' (Critique of Judgement) গ্রন্থে প্রকাশিত বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা জানা।

বিশুদ্ধ নন্দনতত্ত্বের মত দর্শনের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন 'এনথনি কূপ' নামক নরম মেজাজের প্রতিভাধর একজন সৌখিন দার্শনিক, তিনি শ্যাফটে্জবারীর তৃতীয় আর্ল নামেও পরিচিত ছিলেন। স্বাধীনচেতা বিদ্বান ও শিল্পকলার যথার্থ অনুরাগী শ্যাফটে্জবারী বিতৃষ্ণা বোধ করতেন দু-ব্যাপারেই- একদিকে নন্দনবিরোধী ধর্মপ্রবণতা অন্যদিকে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হবস ও লকের নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক জ্ঞানতত্ত্ব। মনে-মেজাজে প্রেরণাবাদী (Intuitive) শ্যাফটে্জবারী শিক্ষা লাভ করেছিলেন প্রাইভেট টিউটরের কাছে। অদৃষ্টের পরিহাস যে তাঁর টিউটরদের একজন ছিলেন লক্। যুক্তিভিত্তিক ধারণা ও যুক্তিসংগত মতবাদ প্রয়োগ করেন তেমন একজন একাডেমিক তাত্ত্বিক থেকে যতদূরে থাকা সম্ভব তেমন দূরে অবস্থান করে তিনি প্রবর্তন করেন একটি উদ্দীপক ও ইমপ্রেশানিস্টিক রচনাশৈলি যা তাঁর মতের রৈখিক ও প্রয়োগগত বিন্যাসের বাধা হয়ে উঠে। বোধ করি প্রকাশ করার গতানুগতিক নিয়মাবলী অনুসরণ না-করায় তার প্রধান রচনা Characteristics বিপুলভাবে নন্দিত হয়েছিল। তার প্রমাণ ১৭১১-১৭৯০ সালের মধ্যে বইটির ১১টি

সংস্করণ হয় এবং একই সাথে সে কালের প্রধান চিন্তাবিদদের চিন্তায় প্রভাব ফেলে- তাঁদের একজন ছিলেন ইমানুয়েল কান্ট। প্রচলিত অর্থে Characteristics দর্শনের বই হলেও যুক্তি কিংবা যুক্তিসংগত বক্তব্য সেটা প্রচার করেনা। (লেখকেরও তেমন আগ্রহ ছিল না।) তাঁর আগ্রহ ছিল সমন্বিত ও প্রেরণালব্ধ (অনেক পাঠকের মতে প্রেরণাসঞ্চার) প্রজ্ঞা প্রচার করা।

প্রজ্ঞা, শ্যাফটে্‌জবারী মনে করেন, অর্জন করতে হবে পৃথিবীর শৃংখলা সৌন্দর্য ও মহত্তকে উপলব্ধি করে। প্রজ্ঞার বাহন হতে পারেন ভারসাম্যমূলক ও সমন্বিত ব্যক্তিত্ব। নৈতিকতা ও সৌন্দর্যকে পরীক্ষা করার প্রধান হতে পারেন রুচিবোধ ভালোত্ব ও সৌন্দর্য মণ্ডিত উন্নত রুচির অধিকারী ব্যক্তি। সেসব ক্ষেত্রে সৌন্দর্য একটি মাধ্যম যেখানে পৃথিবীর সংগতি প্রতিভাত হয় এবং তিনি সেটা আত্মস্থ করতে সমর্থ হন। সুতরাং আমাদের মহান দেশবাসীর আচার-আচরণ পরিবর্তন করার প্রধান উপায় হল, শ্যাফটে্‌জবারীর মতে, তাদের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে 'উন্নত রুচি'র ধারণা জাগিয়ে তোলা।

মুক্তি স্বায়ত্তশাসন ও নিষ্কাম সৌন্দর্য সম্পর্কে আমাদের আধুনিক ধারণা ইতোমধ্যে শ্যাফটে্‌জবারীর শিল্পকর্মে বিধৃত আছে। তাঁর নান্দনিক আদর্শ চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে ফিলোক্রিস চরিত্রের মাধ্যমে। The Moralist নামক 'দার্শনিক সংলাপ' গ্রন্থ সে লেখকের বুদ্ধিবৃত্তিক মুখপত্র বিবেচিত। ফিলোক্রিসের বিরোধিতা করেছে থিওক্লিস নামধারী একটি চরিত্র যাকে শয়তানের মুখপাত্র মনে হয়। এই চরিত্রটি বারংবার ইঙ্গিত করেছে উপত্যকা বা বৃক্ষের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাইলে তাঁকে অবশ্যই ঐ জিনিসগুলোর মালিক হতে হবে। সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে এডমিরালের মত সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ফিলোক্রিস সে চিন্তাকে বারংবার অ্যাবসার্ড বলে পরিত্যাগ করেছেন।

এত কিছুর পরও কিন্তু শ্যাফটে্‌জবারী সুন্দরের প্রতি ভালবাসাকে সমাজের নীতি বা জ্ঞানতত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন না। বরং তিনি দেখেন যে, সেগুলো বিচিত্র এক বৃহত্তর সমগ্রতার মধ্যে অবস্থান করে যেখানে নৈতিকতা ও সৌন্দর্যের কিছুটা ফলাফল রয়েছে- অবশ্য তার বিপরীতটিও হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে Virtue or merit থেকে কিছু বলা যায়। সেখানে তিনি বলেছেন শৃংখলা, সমন্বয় ও ভারসাম্যের প্রতি প্রশংসা ও ভালবাসা স্বাভাবিকভাবেই মেজাজের জন্য জন্য উপকারী, সামাজিক প্রেম মমতার প্রতি সুবিধাদায়ক এবং পুণ্যার্জনের জন্য খুবই সহায়ক। অন্যকথায় সেটা হল সমাজে শৃংখলা ও সৌন্দর্যের জন্য ভালবাসা। বিপরীতপক্ষে শ্যাফটেজবারী বিচার করেন

www.pathagar.com

নীতি ও চালচলন কতদূর নান্দনিক আনন্দ দিতে পারে তার ভিত্তিতে। তার ইংগিত হচ্ছে যে বন্ধুত্বের মত সুন্দর ও সদাশয় কাজের ন্যায় মাধুর্যমণ্ডিত আর কিছুই নেই। তিনি আরো কল্পনা করেছেন যে মানবীয় মূল্যবোধের নিজস্ব পদ্ধতিতে ভালোত্ব, সৌন্দর্য ও সত্যতা পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে ; তা দিয়ে তিনি অনুমোদন করলেন যে সুন্দর ও সত্য সহজভাবেই উপযোগিতা ও সুবিধাজনক-দুয়ের সঙ্গে যুক্ত। তিনি উপসংহার করেছেন এই বলে যে, যা একই সংগে সুন্দর ও সত্য তা অনিবার্যভাবে শোভন ও উত্তম।

শ্যাফটে্জবারী এভাবে দুটি মতবাদ প্রচার করলেন যা আমাদের কাছে পরস্পর-বিরোধী মনে হতে পারে। একদিকে সৌন্দর্যকে তিনি গ্রহণ করলেন অভিজ্ঞতারূপে যা ব্যবহারিক নিয়ন্ত্রণ বা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার বাইরে স্বাধীনভাবে জন্ম নেয় ; অন্যদিকে তিনি নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে দেখলেন সমগ্রের সাংগঠনিক অংশ হিসেবে-মহিমান্বিত আদর্শের প্রয়োজনীয় অংশরূপে- যে আদর্শ ধারণ করে আছে নৈতিক স্বভাব, চরিত্রের ও সমন্বয় এবং মনুষ্যআত্মার শিক্ষা। আমাদের কালে আমাদের কাছে যা অযৌক্তিক ও পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হয় এবং যা বর্তমান ইউরোপের বিতর্ককে নিয়ন্ত্রণ করছে, (যেমন-নন্দনতত্ত্ব বনাম সমাজ, সুন্দর বনাম উপকারী) সেসব অনড় দ্বিমুখিতাকে মোকাবিলা করতে হবে। আঠার শতকের চিন্তাবিদদের কাছে দুটি মতবাদ অসংগত নয় বরং এক-অন্যের পরিপূরক হিসেবে গৃহীত।

'আলোকিত যুগ' ছিল এমন একটি কাল যখন জীবন ও রুচি নিয়ে হালকা মেজাজের বিনোদনের মত পাশাপাশি গুরুগম্ভীর আলোচনা হত। ১৮৪৭ সালে The Universal Spectator ঐ সমস্ত কেতাদুরস্ত বিতর্ক নিয়ে মন্তব্য করেছিল যে, হাল আমলে আমাদের প্রিয় শব্দরাজির মধ্যে কোনটাই Taste এর মত বহু ব্যবহৃত নয় কিংবা সম্মানের আসনে আসীন নয়। মোটামুটি সেই সময়ে Aesthetics (নন্দনতত্ত্ব) শব্দটি প্রয়োগ করেন সে যুগের প্রভাবশালী জার্মান চিন্তাবিদ আলেকজান্ডার বুমগার্টেন। ল্যাটিন ভাষায় রচিত তাঁর নিবন্ধ Aesthetics (১৭৫০) ছিল আঠার শতকের সৌন্দর্যের একটি প্রণালীবদ্ধ তত্ত্ব (theory) প্রতিষ্ঠার জন্য প্রণীত অনেক বইয়ের একটি। আরো কয়টি গুরুত্বপূর্ণ রচনা হচ্ছে A philosophical Enquiry into the origin of the ideas of the Sublime and the Beautiful (এডমণ্ড বার্ক, ১৭৫৭) Dissertation on Taste (হিউম, ১৭৫৭), An Essay On Taste (আলেকজান্ডার জিরার্ড, ১৭৫৯)। এগুলো ইংরেজি ভাষায় রচিত। অন্য ভাষায় লিখিত বই বা নিবন্ধ হচ্ছে ফরাসী এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রবন্ধ Beau (দিদারো ১৭৫১), জার্মান ভাষায় রচিত Laocoon (লেসিং ১৭৬৬)। এগুলো হল ইমানুয়েল কান্টের পূর্বে রচিত কয়েকটি বিখ্যাত রচনা।

www.pathagar.com

লেখকদের দার্শনিক বিশ্বাস ও চিন্তার কারণে লেখাগুলোতে তাত্ত্বিক বিবেচনায় একটু-আধটু উনিশ-বিশ হয়েছে কিন্তু মূল নীতিতে তাঁরা একই সমতলে দণ্ডায়মান। একটি বিষয় হল যে, নন্দনতত্ত্ব-প্রপঞ্চ বলে একটি বিষয় আছে যার কারণে বস্তু ও অভিজ্ঞতা প্রাথমিকভাবে যুক্ত থাকে সৌন্দর্যের সঙ্গে ; উপযোগিতা, নৈতিকতা বা সত্যের সঙ্গে নয় ; আরেকটি হল যে, মনুষ্য-আত্মার একটি অংশ মানসিক শক্তির অংশরূপে সেখানে অবস্থান করে এবং সৌন্দর্য ও শিল্পকর্মের পূর্বে শান্ত ধ্যানের মধ্যে সাড়া দেয়।

একই সঙ্গে, সৌন্দর্যের এই তাত্ত্বিকেরা সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ না-হলেও ছিলেন ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তি ও সর্বজনীন (general) সংস্কৃতির চিন্তাবিদ, তারাও খুঁজছিলেন কীভাবে নন্দনতত্ত্ব আমাদের অন্যান্য মানসিক অংশের সঙ্গে যুক্ত হয় ; এদের মধ্যে সম্পর্কই বা কী? আরনস্ট ক্যাসিরার যেমন বলেছেন–'আঠার শতকের নামকরা চিন্তাবিদদের মাথায় ছিল দর্শন এবং সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের সমালোচনার মিলন ঘটানো।' আলোতিক যুগে ভাবের চর্চার পূর্বশর্তও ছিল, আরনস্ট ক্যাসিরারের কথায় 'দর্শন ও নন্দনতত্ত্বের সমস্যাবলীর সমন্বয়ের জন্য গভীর ও অন্তর্গত চাহিদা' রয়েছে। সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল যে, এই দুটি পরস্পর নির্ভরশীল এবং তাঁর প্রভাব বিস্তার করে থাকে পরোক্ষভাবে। কিন্তু ঐ সমন্বয়ের মৌলিক প্রকৃতি কেমন হবে এবং এত তত্ত্ব বিস্তারের সর্বশেষ লক্ষ্যই কী তা নিয়ে একমত ছিলেন না। মোটামুটিভাবে প্রবণতা ছিল প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য, দৈব কর্তৃত্ব ও সনাতনী নিয়মাবলীর পরিবর্তে ইহলৌকিক নৈতিকতা ও শিল্পকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ।

যে মানুষটি সব চিন্তা ও কল্পনাকে চূড়ায় নিয়ে গেলেন তিনি হলেন বহু দূরের প্রাশান শহর কনিগজবার্গের ইমানুয়েল কান্ট। তিনি সব চিন্তা ও কল্পনাকে একীভূত ও প্রণালীবদ্ধ করে মন বিষয়ক একটি বৃহৎ তত্ত্বে রূপ দিলেন যা পাওয়া যাবে 'ক্রিটিক' নামে পরিচিত তাঁর তিনটি গ্রন্থে, বিশেষ করে তৃতীয় ক্রিটিকে (Critique of Judgement)। নানা হাত ঘুরে-ঘুরে শেষপর্যন্ত গৃহীত হল যে বইটি হচ্ছে 'শিল্পের-জন্য-শিল্প' তত্ত্বের উৎস এবং মতটি প্রচার করলেন সেই সব সমালোচক যাঁরা বইটি খুব কমই পড়েছেন। কান্টের যুক্তিতর্কের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম হচ্ছে : সৌন্দর্য উপভোগের সঙ্গে ব্যক্তিগত বাসনার চরিতার্থতা অথবা যুক্তিসংগত ধারণার মাধ্যমে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা কোনটারই কিছু করার নেই। কোন বস্তুর সৌন্দর্যকে মূল্যায়ন করা তাৎক্ষণিক আনন্দ প্রাপ্তিকে অতিক্রম করে যায় এবং সবজনীন স্বীকৃতি দাবি করে। সুন্দর বস্তুকে ধ্যান করে কোন ধারণা অর্জিত হবে বা মতলব হাসিল হবে, নিষ্কাম কল্পনা তেমন মনে করে। মুক্ত সৌন্দর্যের গুণ হচ্ছে 'উদ্দেশ্যবিহীন উদ্দেশ্য'। একটি সুন্দর বস্তুর আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য আছে কিন্তু কোন মতলব নেই।

www.pathagar.com

কান্টের নন্দনতত্ত্ব কমবেশি এভাবেই বর্তমানে আমাদের কাছে পরিচিত, এবং তবু শ্যাফট্‌জবারীর মত তিনিও তিন নম্বর ক্রিটিক গ্রন্থে দাবি করেননি যে, তিনি সুন্দরকে নৈতিকতা বা সত্য থেকে মৌলিকভাবে আলাদা করেছেন (যদিও সাধারণভাবে বিপরীতটিই বলা হয়)। মন সম্পর্কে দর্শনের বিশাল সৌধ তিনি নির্মাণ করেছেন, সৌন্দর্য-দর্শন সেই সৌধ-কাঠামোর একটি ব্লক (খন্ড)। সুতরাং প্রথম দুটি ক্রিটিক Critique of Pure Reason এবং Critique of Practical Reason) ভালভাবে অধ্যয়ন না-করে তৃতীয়টির লক্ষ্য, অন্তর্দৃষ্টি এবং গুরুত্ব পুরোপুরি আয়ত্ত করা অসম্ভব ব্যাপার। কান্ট তৃতীয় খণ্ডের নন্দনতত্ত্ব বষয়ক যুক্তিগুলো প্রায়ই প্রথম দুটি খণ্ডের জ্ঞানতত্ত্ব ও নীতি তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে বলতে গিয়ে কান্ট লক্ষ্য করেন যে, যদিও শিল্পকর্মের নান্দনিক বৈশিষ্ট্যগুলো (গুণাবলী) সাধারণ যুক্তিসংগত প্রকাশরূপের স্থান দখল করে, তবু নান্দনিক গুণগুলো মন উজ্জীবিত করতে, যুক্তির সহযাত্রী হতে এবং কল্পনাকে উজ্জীবিত করতে ভূমিকা পালন করে। এক কথায় নান্দনিক অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষমূলক ক্ষমতার পাশাপাশি অবস্থান করে এবং সত্যি বলতে কী সেগুলোকে সমৃদ্ধ হতে সহায়তা করে।

নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনায় কান্ট আবার প্রতিধ্বনি করেছেন 'শ্যাফট্‌জবারীর, এবং সত্য ও সুন্দরের মধ্যে কার্যকারণগত ও উন্নয়নগত সম্পর্ক খুঁজে পান, কিন্তু সুন্দরের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি নিয়ে আলোচনায় তিনি সকল প্রকার সংকীর্ণ বা স্থূল নৈতিক সংস্কার বাতিল করে দেন। এবং বলেন, নৈতিক স্বার্থ কোনভাবেই সৌন্দর্যের অনুভূতির সমান্তরাল হতে পারে না। তিনি অবশ্য ইংগিত দিয়েছেন যে নৈতিক চেতনার বিকাশে সৌন্দর্যের গ্রহণ-ক্ষমতা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ সাহায্য করে। অন্যভাবে বলা যায়, উন্নত নৈতিক চেতনা আমাদেরকে সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, চেতনার মাধুর্য থেকে স্থায়ী নৈতিক স্বার্থে উত্তরণে রুচিবোধ সম্ভবপর করে। নৈতিক অনুভূতির মহিমা ও সৌন্দর্য দুইই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। যেমন, কোন কিছুকে এমনকি প্রকৃতিকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে সৌন্দর্যচেতনা আমাদের প্রস্তুত করে। এবং যদিও কান্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে ইংগিত করেছেন যে, রুচির বিচার-ক্ষমতার কাছে আলস্য, লোভ ও দুর্বৃত্তপনা হারিয়ে যায়, একই সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে তিনি বলতে পারেন যে, (নিঃসন্দেহে দার্শনিক রুশোর প্রভাবে) প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি তাৎক্ষণিকভাবে আগ্রহ দেখানো এক মহৎ আত্মার পরিচয় দেয় এবং সেই আগ্রহ নির্দেশ করে নৈতিক অনুভূতির প্রতি অনকূল মনের। অস্বাভাবিক নয় যে, নন্দনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় ক্রিটিকের

www.pathagar.com

সর্বশেষ অধ্যায়ের সবটা জুড়ে এবং তার শিরোনাম হচ্ছে 'সৌন্দর্য : নৈতিকতার প্রতীক'।

নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার শেষ পর্যায়ে কান্ট সৌন্দর্য ও Ethics-এর মধ্যে বন্ধন তৈরির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সেই বন্ধন স্বীকার না-করলে বা শক্তিশালী না-করায় ভবিষ্যতে যে সমূহ বিপদ হতে পারে তেমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি সতর্ক করেছেন যে সুন্দর শিল্পকর্মগুলোকে নৈতিক ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে কমবেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে না-আনলে আত্মা স্থূল হবে, মন হবে নিজের ওপর অতৃপ্ত ও খিটখিটে। শিল্প ও নৈতিকতার মধ্যে নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক যুক্তিতর্কের শেষের দিকে কান্ট সৌন্দর্য ও নীতির মধ্যে বন্ধন তৈরির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন এবং সেটা সম্পন্ন না-হলে আগামী দিনে ক্ষতি হবার আশংকা ব্যক্ত করেন। তাঁর সতর্কবাণী- যদি সুন্দর শিল্পকর্মগুলোকে নীতির কাছাকাছি না-আনা হয় তাহলে আত্মা খুবই নিস্তেজ হয়ে যাবে এবং মন হবে নিজের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং বিকৃতবুদ্ধির। শিল্প ও নৈতিকতার পরস্পরের অংশিদার ভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন দেখে কান্ট অধ্যয়ন শেষ করেছেন এই বলিষ্ঠ প্রত্যয় দিয়ে যে রুচির বুনিয়াদ গঠন করার যথার্থ উপকরণ হচ্ছে নৈতিক ভাবগুলোর উন্নয়ন, নৈতিক অনুভূতির চর্চা করা, কারণ যখন সংবেদনশীলতা সেটার সংগে সমতায় আসে, তখন বিশুদ্ধ রুচি একটি নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় কাঠামো নিতে পারে। এভাবে চাকাটি সম্পূর্ণ বৃত্তটি ঘুরে আসে : নৈতিকতায় উত্তরণে সৌন্দর্য সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে আবার নৈতিকতাও রুচি তৈরির বুনিয়াদ হতে পারে। সেজন্য কান্ট যার জন্য ওকালতি করেছেন, তাকে অনেকটা শিল্পের-জন্য-শিল্পের অনুরূপ মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে তার ব্যাপক ভিত্তিতে রয়েছে সামাজিক ও নৈতিক সত্তা রূপে আমাদের বৃদ্ধি, অধিকতর সভ্য হবার জন্য আমাদের মানবীয় প্রক্রিয়া- সৌন্দর্যকে ভালবাসা তাঁর একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ।

তিন

কান্টের নন্দনতত্ত্ব কিছু সময়ের মধ্যে ইউরোপের চিন্তাজগতে বিপুল প্রভাব ফেলে। কবি ও নাট্যকার শিলার 'সভ্যতা বিস্তারের প্রেরণাদীপ্ত প্রকল্পের' ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন কান্টের ভাবনাগুলোকে। তিনি Letters on Aesthetic Education-এ (১৭৯৬) তার উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত নন্দনতত্ত্ব নিয়ে এতবড় নিবন্ধ এর আগে রচিত হয়নি। তরুণ অধ্যাপক ও পরিচিতির কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দ্বারা কান্টের চিন্তা ফরাসীদেশে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। শেষ পর্যন্ত সেটা বোহেমিয়ায় ঢুকে পড়ে। মন্থর গতিতে এগুতে গিয়ে সেটা সহজ সরল হয়- তার মূল বক্তব্য হারিয়ে যায়। যাঁরা এই কাজটি করেছেন, তাঁদের এই কাজ করার যোগ্যতা ছিল কিনা, সময় ছিল কিনা, এমনকি Critique of

www.pathagar.com

Judgment বইটি পড়ার মত ধৈর্য ছিল কিনা সে প্রশ্ন না তোলাই ভালো ; অপর দুটি খণ্ডের (Pure Reason এবং Practical Reason) জটিলতা বুঝবার ক্ষমতাও বোধ করি তাদের ছিলনা। যার ফলে কান্টের জটিল ভাবনা কয়েকটি সহজ শ্লোগানে ও বাক্যাংশে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল, হারিয়ে গেল তাঁর বৈশ্বিক সমগ্রতাবোধ ; একালে যেমন হচ্ছে কার্ল মার্কস, সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও এডাম স্মিথের চিন্তাধারা নিয়ে। কয়েকজন চালাক-চতুর বুদ্ধিজীবীর দ্বারা বিকৃত ও তরল হয়ে কান্টের তত্ত্ব অল্পসময়ের মধ্যে উপদলীয় কোন্দলে ব্যবহৃত হবার উপযোগী অস্ত্রে পরিণত হল।

মজার বিষয় যে কান্টের রচনার ফরাসীকরণ শুরু হয়েছিল নেপোলিয়ন বোনাপার্টির স্বৈরাচারী শাসনামলে। সে সময় ফ্রান্সের কয়েকজন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী জার্মানীতে নির্বাসিতের জীবন কাটাচ্ছিলেন। তাদের একজন ছিলেন বেনজামিন কস্তা (১৭৬৭-১৮৩৫)। একালে তাঁর পরিচিতি প্রধানত রোমান্টিক উপন্যাস Adolphe-এর লেখক হিসেবে। সেটা আবার গ্যাটের উপন্যাস 'তরুণ ভের্থর'-এর ফরাসী ভাষ্য হিসেবে বিবেচিত। কস্তা ছিলেন অতিউৎসাহী ও বিভিন্নমুখী নেশার যুবক। তাঁর কাছে বিদ্যাচর্চা ছিল জুয়াখেলা নারীতোষণ ও রাজতন্ত্রবিরোধিতার মত আর দশটি কাজের একটি। সেগুলোতেও তিনি মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। জার্মানীতে থাকাকালে তিনি শিলার ও শেলিং এবং তাদের নিজস্ব বৃত্তের বন্ধুদের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তাঁর সেসময়ের দিনলিপি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য যদিও সব দিনের লিপি নেই। ১৮০৪ সালের একদিনের লিপি হচ্ছে— শেলিং-এর শিষ্য রবিনসনের সঙ্গে খোশগল্প হল, কান্টের নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে তার কিছু প্রাণবন্ত ধারণা আছে। কস্তার রচনা থেকে নেয়া উদ্ধৃতির প্রথম অংশটি হল-L'art pour l'art with no purpose; since any purpose will denature art. But art does attain a purpose which it does not have. এটা অবশ্য কান্টের নন্দনতত্ত্বের অংশ, তবে খুবই প্রাথমিক পর্যায়ের, কিন্তু এটা আবার ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করার প্রথম উদাহরণ, যদি এখনো একটি বাক্যাংশে পরিণত হয়নি।

সেসব সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে পরিচিতির জন্য কস্তা মূলত প্রতিভাময়ী ও কিংবদন্তিতে পরিণত ব্যারোনেস অব লেটার্স মাদাম জারমিনি দ্য স্টয়েলের কাছে ঋণি-যার প্রেমিক তিনি ছিলেন (১৭৯৪-১৮১১) সময়ে। জার্মান সংস্কৃতির পরিচিতি মূলক গ্রন্থ De L'allemagne-র শোভন' ও অত্যন্ত উচ্চমানের ভূমিকা তিনি লিখেছেন। সেটা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১০ সালে। কিন্তু যথার্থভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে ১৮১৪ সালে নেপোলিয়নের পতনের পর। তিনি ছিলেন সে সময় জার্মানীতে নির্বাসিত

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যমনি। রাজনৈতিক নির্বাসনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি রচনা করেছিলেন বড় আকারের উপন্যাস। নির্বাসিত জীবনে তিনি জয় করেছিলেন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের কিন্তু বিরক্তির কারণও হয়েছিলেন অনেকের; শিলার ছিলেন এমন একজন যার বাড়ির দরজা সব সময় অর্গল-বন্ধ ছিল ব্যারোনেসের জন্য। কান্টের বইগুলো তিনি ভালভাবে পড়েছিলেন তেমন মনে হয়না। কান্ট সম্পর্কে তিনি ভাল জ্ঞান অর্জন করেননি। তবে আড্ডায় প্রাপ্ত জ্ঞান তিনি চমৎকার ভাবে ব্যবহার করেছেন বইয়ে। এত কিছু বলার পরও বলতে হবে কান্ট, গ্যাটে, শিলার ও শ্লেগেলদের তিনিই প্রথম পরিচয় করে দিয়েছিলেন ফরাসী পাঠকদের কাছে যারা সরকারী নব্য ক্লাসিকদের কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং খুঁজছিলেন বিকল্প সাহিত্য, শিল্প ও চিন্তা।

De L'allemagne-এর উত্তেজিত পাঠকদের মধ্যে ছিলেন ভিক্টর কুজিন নামের দর্শনের একজন উচ্চাভিলাষী তরুণ ছাত্র। ব্যারোনেসের বুদ্ধিবৃত্তিক Baedekor দ্বারা প্রবলভাবে আচ্ছন্ন কুজিন একদা Rue Royale apartment গিয়ে হাজির হলেন। ঘটনাক্রমে সেখানে সুযোগ পেলেন অগাস্ট শ্লেগেলের সঙ্গে পরিচয়ের। আলাপ পরিচয়ের পর পঁচিশ বছর বয়সী কুজিন সেদেশের সেরা মনীষীদের সঙ্গে বাহাস করার ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে জার্মানী গেলেন। তিনি সেরা বুদ্ধিজীবীদের দরজায় টোকা দিলেন, আলাপ করলেন শ্লাইয়ারমাখার (Schleiermacher), গ্যাটে এমনকি হেগেলের সঙ্গে। বলতে গেলে সবাইকে তিনি চমকে দিলেন। এক পর্যায়ে তুচ্ছ রাজনৈতিক কারণে প্রাসান সরকার তাকে আটক করল, ফাটকে দিল, কিন্তু এর ফলে তাঁর প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে যে প্রতিবাদ হয়েছিল তাতে স্বদেশে তিনি বিপুলভাবে পরিচিতি পেলেন।

ফ্রান্সে ফিরে এলে তাঁকে সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়। আশা করা হয়েছিল যে অলৌকিক কিছু তিনি করবেন। কর্তৃপক্ষকে তিনি নিরাশ করেননি। তিনি ধারাবাহিক কয়েকটি বক্তৃতা দেন কান্ট ও তার দর্শন সম্পর্কে। কান্ট সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল ভাসা-ভাসা। ল্যাটিন ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থ তিনি পড়েননি, মোটামুটিভাবে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ তিনি ভালভাবে পড়েছিলেন, আর তার ছিল চমৎকার অনুসরণের ক্ষমতা। ছাত্ররা কিন্তু বাগ্মী ও অধ্যাপককে পূজা করার মনোভাব নিয়ে যেত। তার নামাংকিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশের একটি বড় সড়ক তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

বক্তৃতাগুলো বিভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল, মুদ্রিত হয়েছিল বেশ কবার। প্রথমবার ছাপা হয়েছিল ১৮২৬ সালে বেশ দীর্ঘ নামে। আলোচিত সব বিষয় সংবলিত নামটি ছিল Cours de philosophie professee a la faculte des lettres

www.pathagar.com

pendant lannee 1818 sur le fondement des idees absoluee du vrai, du beau et du bien (Paris 1836) বক্তৃতায় গদ্যশৈলি ছিল শব্দ ও ধ্বনির উত্থান-পতনে মুখর অলংকারসমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যে ঝলমলে। ধার-করা ভাব ও বিষয় সংবলিত বইটি প্রকাশিত হয়েছিল বহু ব্যবহৃত ফ্রেজই সুন্দর উদ্ধৃতি ও সমকালীন জার্মান থেকে উদ্ধৃতিসহ। (লজ্জাহীনভাবে তিনি তাঁর তত্ত্বের নাম দিয়েছেন Eclecticism (সমন্বয় বাদ)। কান্টের নন্দনতত্ত্বকে তিনি অতিশয় সরল করে ফেলেছেন। এবং যদিও শিল্পকলা থেকে বিভিন্ন মানসিক প্রকৃতিকে (mental faculty) একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়নি, তবু যে জটিল প্রক্রিয়ায় কান্ট সৌন্দর্যকে নীতিকথার ও সত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছিলেন, কুজিনের ব্যাখ্যায় সেগুলো হয়েছে কম স্পষ্ট, কৃশকায়, কিছুটা বাইরের খোলসটির উপস্থাপনা মাত্র। বক্তৃতা থেকে বুঝা যায় তার ছিল নান্দনিক বিভক্তি করাসহ অখণ্ডকে খণ্ড করার প্রতি ঝোঁক। বহু ব্যবহৃত উদ্ধৃতিটি হচ্ছে ধর্মের-জন্য-ধর্ম, নৈতিকতার-জন্য-নৈতিকতা যেমন, শিল্পের-জন্য-শিল্প তেমন। শিল্পের-জন্য-শিল্প ফ্রেজটি আগের চেয়ে একটু বেশি গুরুত্ব পেয়েছে এবং কৌশলগত কারণে বাক্যের শেষে স্থান পাওয়ায় স্থায়ী ফরমূলা বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। একটি যুক্তিসংগত অনুমান হচ্ছে যে কুজিন এই বক্তব্যের দ্বারা প্যারিসের অগ্রগামী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচলিত কিন্তু অনুচ্চারিত ভাবটি স্পষ্ট করলেন এবং ছড়িয়ে দিলেন। কুজিনের ব্যবহৃত বাক্যাংশটি সেজন্য একই সংগে কারণ ও প্রভাব।

বর্তমানে আমরা 'শিল্পের-জন্য-শিল্প' মতবাদটিকে সাধারণভাবে রক্ষণশীল বা বড়জোর বিরাজনীতিক বলে মনে করি। অবশ্য ফরাসী দেশের সাহিত্য-ভাবনার প্রবণতা হচ্ছে রাজনীতি প্রভাবিত থাকা। 'শিল্পের-জন্য-শিল্প' তত্ত্বটি প্রথম দিকে ছিল রাজতন্ত্রবিরোধী বিশাল বাম জনগোষ্ঠীর মতবাদ। ১৮১৪ সালে রেস্টোরেশান শক্তিটি শুধু পুরানো আমলের নবাব ও বুরবন রাজাদের ক্ষমতায় বসায়নি- প্রতিষ্ঠিত করেছিল নব্য অধুনা পরিত্যক্ত ধ্রুপদীকালের গোঁড়া সাহিত্য মতাদর্শটি। ফলত, 'শিল্পের-জন্য-শিল্প' মতবাদে বিশ্বাসীরা নিজেদের দেখাতে চায় শাসকগোষ্ঠী-বিরোধী শিবিরে- রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক যাই হোক না কেন। উদাহরণ হতে পারে ভিকটর কুজিনের ব্যাপারটি। তিনি বীরস্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন না, পোষণ করতেন নিজের নান্দনিক বিশ্বাসসহ রিপাবলিকান ও মধ্যপন্থী লিবারটারিয়ান (মানুষ তার স্বাধীস ইচ্ছাতে সব নষ্ট করে) আদর্শে। বিস্ময়ের কিছু নেই যে, ডিউক দ্য বেরীর গুপ্তহত্যা ও সে ধারায় ১৮২০ সালে ডানপন্থীদের নির্যাতনে কুজিন ও সমমতাবলম্বী বুদ্ধিজীবীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অপসারণ করা হয়। পরবর্তী আট বছর ধরে তাঁরা সম্পাদনায় ও প্রাইভেট পড়ানোতে ব্যস্ত থাকেন। তাঁদের প্রতিবাদী মতামত অংশ হয়ে ওঠে গুপ্ত ভাবাদর্শের।

www.pathagar.com

সেই পটভূমিতে কয়েকটি শক্তির মধ্যে অনানুষ্ঠানিক মৈত্রী স্থাপিত হয়। সেগুলো ছিল বুরবন শাসকদের ঘৃণা করে তেমন জঙ্গী উদারনৈতিক উদীয়মান রোমান্টিকেরা ও বুরবনদের পশ্চাৎমুখী সাংস্কৃতিক আদর্শকে অপছন্দ করেন তেমন প্রতিবাদী নন্দনবাদীরা। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে ১৮৩০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি হারনানী মেলোড্রামা মঞ্চায়নের প্রথম দিনে। ভিকটর হুগো কর্তৃক কবিতায় রচিত মেলোড্রামাটির বহু প্রতীক্ষিত মঞ্চায়নকে ভণ্ডুল করার জন্য বিরোধিরা সংঘবদ্ধ হয়েছিল। মঞ্চটি ছিল কমেডি ফঁসে-র পুরানো প্লে হাউসে। বিরোধীরা ৮ ঘণ্টা আগেই যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে সেখানে হাজির ছিল। ভিক্টর হুগোর তরুণ সমর্থকদের পরনে ছিল স্পেনীয় পোশাক ও রোবসপীরীয়ান স্টাইলের ওয়েস্টকোট। বিরোধীদের নেতা কবি গোতিয়ের বিচিত্র সাজ— কাঁধ পর্যন্ত ঝোলানো চুল, গলদা চিংড়ির রঙের ওয়েস্ট কোট লেখক (vest) দেখে দর্শকেরা শরুতেই বিরূপ হয়ে ওঠে। টান টান উত্তেজনার মধ্যে শুরুর মুহূর্তটি এসে গেল। অপ্রচলিত ছন্দে ও শব্দে রচিত হুগোর কবিতার প্রথম চরণ উচ্চারণের সাথে সাথে নব্যধ্রুপদী রক্ষণশীল আদর্শের সৈনিকেরা হৈ হৈ করে উঠতেই নাট্যকারের উৎসাহী সমর্থকেরা এক সংগে মেঝে জুতা ঘষতে শুরু করে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সনাতনপন্থীরা প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করল। হুগোর দল জয়ী হল, ফ্রান্সে রোমান্টিকতার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হল। ঐ ঘটনাটি নিয়ে 'হারনানীর যুদ্ধ' নামে কিংবদন্তী গড়ে ওঠে।

ধ্রুপদী সাহিত্যরীতির বিরোধী লড়াইয়ে শিল্পের-জন্য-শিল্প অধ্যায়ে ভিকটর হুগো নিজেই দিকনির্দেশকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। Les Orientales (১৮২৯) নামক গীতি সংকলনে তিনি 'শিল্পের-জন্য-শিল্প' তত্ত্বের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ক্রমোয়েল নামক ক্ষুদ্র নাটকের ভূমিকায় তিনি ধ্রুপদীবাদের বিরুদ্ধে রোমান্টিকতার লড়াইয়ের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। সেই লেখায় তিনি নিয়মকানুন ও পদ্ধতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। এবং লক্ষ্য করেন সাহিত্যে পুরানো ধারণার সমান্তরালে রাজনীতিতেও প্রাচীন পন্থার অবস্থান, তেমনিভাবে হারনানি নাটকে ভূমিকায় হুগো প্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করেন রোমান্টিকতা বেশি কিছু নয় সেটা সাহিত্যে উদারনীতি মাত্র। এবং আমাদের কাজ হবে পুরানো সমাজকাঠামোর সঙ্গে পুরানো কাব্যিক কাঠামোকেও ছুঁড়ে ফেলা। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসের উদারনৈতিক বিপ্লব এবং নাগরিকদের রাজা লুই ফিলিপের ক্ষমতাসীন হবার মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রটি সুনির্দিষ্টভাবে নতুন সামাজিক শক্তির করতলগত হয়।

অবশ্য অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নিয়মকানুনের নিগড়মুক্ত সাহিত্য রচনার জন্য ভিক্টর হুগোর স্বপ্ন মরীচিকায় পরিণত হয়। দোকানে-দোকানে ঝুলিয়ে রাখা নব্যধ্রুপদী সাহিত্যের

www.pathagar.com

জীর্ণশীর্ণ নিদর্শনগুলোর স্থান দখল করে নেয় সাহিত্য-বাজার-সংস্কৃতি দ্বারা নির্দেশিত এক সেট নিয়ম ; সাহিত্যের উৎপাদন, আকার ও আঙ্গিক নির্ধারিত ও পরিচালিত হয় সেই সব নিয়মে।

চার

১৭৮৯ সাল থেকে ইউরোপের প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য-যন্ত্রে বিশাল পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। আগেকার দিনে শিল্পকলা একান্তভাবে বাদশাহ ও নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় টিকে ছিল। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই শিল্প ও সাহিত্যের জন্য একটি সামগ্রিক ঘরোয়া পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন, তিনি ইতালীর চিত্রকর ও ভাস্করদের কয়েকটি গ্রুপকে ফ্রান্সে নিয়ে এসে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন বিখ্যাত ভার্সাই প্রাসাদের চারপাশে। মহান নাট্যকার জাঁ রাসিন ছিলেন সরকারী ভাবে রাজকীয় ইতিহাসবিদ ; এবং করনেই (Corneille) ছিলেন প্রকৃত বিশ্বকর্মা। বালজাক থেকে জানা যায় বিপ্লবের পূর্বে ১২ জন লেখকের মধ্যে ৭ জনই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পেনসন পেতেন। বিদেশের শাসক, বিচারালয় বা দেশের শাসক থেকেও উৎসর্গপত্র খোদাই করার পাশাপাশি শিল্পকর্মের উন্মুক্ত প্রদর্শনীর জন্য সরকারিভাবে সম্মান দেয়া প্রচলিত ছিল। তার অনূদিত ইলিয়াড কাব্যের উন্নতির জন্য পরামর্শ দেয়ার আশায় খ্রীস্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ আনুষ্ঠানিকভাবে কাব্যটি পড়ছেন শুনে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স তাতে বাধা দেবার কিছু দেখেননি।

প্রকাশনা শিল্প ১৮০০ সালের পূর্বে ছিল মোটামুটিভাবে শিল্পপূর্ব ও পুঁজিবাদপূর্ব সময়ের। পুরানো বুরবন রাজাদের আমলে মাত্র ৩৬ জন মুদ্রাকরকে সুযোগ দেয়া হয়েছিল প্রকাশনার জন্য ; বই ছাপা হত অল্পসংখ্যায়—সর্বাধিক ১০০০ কপি। ছাপানোর পর সেগুলো চাঁদাদাতা বিত্তবানদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হত, খুব কমই পাওয়া যেত বাজারে। চার যুগের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রভাবে সাহিত্যজগতে অভিজাতদের আধিপত্যের ও প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতার অবসান ঘটে। তার ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ করার জন্য এগিয়ে আসে মুক্ত বাজারের অর্থনৈতিক উদারতা ; এবং দ্রুতবেগে বিস্তৃত হয়ে অদ্যাবধি লিখিত বইপত্রের বৃহদাকারের উৎপাদন ও বিতরণের প্রধান উপায় হিসেবে সেটাই অব্যাহত আছে।

বই-ব্যবসা শিল্পায়িত হবার ফলে মুদ্রণ জগতে বিপুল শক্তির জাগরণ ঘটে। ১৭৯৮ সালে নিকোলাস-লুই রবার্ট নামের একজন ফরাসী ভদ্রলোক প্রথম কাগজ তৈরির মেশিন উদ্ভাবন করেন। তার ফলে প্রতি ঘণ্টায় উৎপাদন দশগুণ বৃদ্ধি পায়। উদ্ভাবন কৌশলটি ব্রিটিশ শিল্পোদ্যগী গ্যাম্বল ও ফোরড্রিনিয়ার চুরি করেন এবং ১৮১০ সালে সোম

www.pathagar.com

(somme)-এ স্থাপিত ডিডোর পারিবারিক মিলে ব্যবহার করেন। পরের দুই দশকে কাঠ থেকে কাগজ তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলে কেটে যায় ছিন্ন কাপড়ের অভাবে কাগজ তৈরির মন্দাভাব। ১৭৯০ সালে উইলিয়াম নিকলসন রবার-ইংক রোলার আবিষ্কার করেন। পরবর্তী দেড় যুগের মাথায় (১৮০৮) পিয়ের লরিয়ে (pierre Lorilleur) বাণিজ্যিকভাবে কাগজ উৎপাদন আরম্ভ করেন। মুদ্রণের কাজে প্রযুক্তির ব্যবহারের নাটকীয় অগ্রগতি সাধিত হয়। কাঠের তুলনায় লোহার চাকার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বেশি হওয়ায় প্রিন্টিং মেশিন নির্মাণে লোহাই প্রধান উপকরণ হয়ে ওঠে। কায়িক পরিশ্রম করে মেশিন চালানো বাদ দিয়ে পা চালিত প্যাডেলের প্রয়োগ শুরু হয়, পরে আসে বাষ্পীয় মেশিন। দ্রুততম হস্তচালিত মেশিন প্রতি ঘণ্টায় সর্বাধিক ২৫০টি শীট তৈরি করত, ১৮৩৪ সালে যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের পর সে সংখ্যা দাঁড়ায় ঘণ্টায় ৩৬০০ টি শীট। ফ্রান্সের পুনরুদ্ধার অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি গতিশীল ছিল মুদ্রণসংকান্ত খাতটি- ১৮১৪ সালে সেই খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ৯ শতাংশের বেশি; বাণিজ্যিকভাবে মুদ্রিত বই ছিল ২৫০০ টি, ১৮২৬ সালে সে সংখ্যা উন্নীত হয় ৮৩০০ টিতে।

সেসব কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা ছিল অবশ্যই অর্থনৈতিক ; বিজয়ী মধ্যবিত্তশ্রেণী পড়ার ইচ্ছা মেটানোর জন্য অধিক হারে উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এদের সাহিত্যবোধ পরাজিত অভিজাতদের তুলনায় কম পরিশীলিত হলেও নিজেদের উপযোগী বই প্রাপ্তির ও পাঠের ক্ষুধা তাদের ছিল অনেক। একই সময়ে বাজারের চিরাচরিত নিয়মানুসারে কারিগরি উন্নতি উৎপাদিত দ্রব্যের অধিক বিক্রি প্রয়োজনীয় করে তুলেছিল। বাজার সমাজের চিরায়িত ইতিহাস রচয়িতা কার্ল পোলানি লিখেছেন– বৃহৎ মেশিনের মূল্য বেশি হওয়ায় উৎপাদিত পণ্য বেশি-না-হলে কিংবা বিক্রি বেশি-না-হলে বিনিয়োগকারীর লাভ হয়না। ব্যবসায়ীর কাছে এর অর্থ হল উৎপাদনে ব্যবহৃত সব কিছুই বিক্রয়ের জন্য তৈরি থাকতে হবে অর্থাৎ যারা বেশি দামে বা বেশি পরিমাণে দ্রব্য কিনতে চান তাদের চাহিদা-অনুযায়ী উৎপাদিত পণ্য দিতে হবে- সমস্ত আয় অবশ্যই আসবে বিক্রিত দ্রব্য থেকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে সেটাই ছিল নতুন যন্ত্রপাতি সজ্জিত সাহিত্য-বাজারের সক্রিয় শক্তি ; দামী কাগজ ও মুদ্রণ যন্ত্র অধিক হারে উৎপাদন করতে পারে- বিক্রিও তদনুসারে বেশি হতে হবে, কারণ দামী মেশিন ব্যবহারের খরচও মেটাতে হবে। অর্থনীতি, জনসংখ্যা ও প্রকৌশল জ্ঞান- তিনের যুগপৎ সমন্বয়ের ফলে যথার্থই সাংবাদিকতা ও কথাসাহিত্যের অভাবনীয় সমৃদ্ধি দেখা গেল। সংবাদপত্রের ব্যবসা যা আমরা এখন দেখি তার জন্ম হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। প্রকৃতপক্ষে যে বছরে সাংবাদিকতা বাজারের সঙ্গে এক হয়ে গেল সে বছরটিকে আমরা পিনবিদ্ধ করতে পারি। সেটা ছিল ১৮৩৬ সাল, যে বছরে এমিল-দ্য-জিরারদিন তার পত্রিকা ল্য প্রেস (La Presse)-এর চাঁদার পরিমাণ অর্ধেক করে দিলেন-

www.pathagar.com

তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল খরচের বাকি অংশ বিজ্ঞাপন থেকে উসুল করতে হবে। সংবাদপত্রের ব্যবসা এভাবে শিল্পজাত দ্রব্যাদির নিয়মিত সরবরাহের সঙ্গে মিলে গেল। ফরাসীদেশের অন্যান্য সংবাদপত্র নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তাড়াতাড়ি একই পদ্ধতি অনুসরণ করল।

ডীফোর সময় থেকে কথাসাহিত্য সাংবাদিকতার পাশাপাশি চলেছে। ডীফো সাহিত্যসাধনা ও সাংবাদিকতা দুক্ষেত্রেই সফলতা দেখিয়ে ছিলেন। ১৮৩০ সালের পর থেকে মুক্ত বাজার ও নতুন প্রযুক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছিল। চাহিদার সংগে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম লেখকেরা অভূতপূর্ব পরিমাণ সম্পদ অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন। ধরা যাক বালজাকের বিষয়টি। তিনি প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা কাটাতেন লেখার টেবিলে, এক বসায় লিখতেন তিরিশপাতা। আলেকজান্ডার দুমা এক বছরে লিখতেন ১ লক্ষ লাইন এবং পেতেন প্রতি লাইনের জন্য ১.৫ ফ্রা।

বহুপ্রজ লেখক ছিলেন পল দ্য কক্ (Paul de kock)। তিনি স্মৃতিকথায় লিখছেন আমি লোভী, এবং আমি সেটা স্বীকার করি। সেকালে সাহিত্যের প্রধান প্রধান রূপের (কাব্য নাটক উপন্যাস) বাইরে কয়েকটি উপরূপের উদ্ভব ঘটে এবং এক্ষেত্রে যারা নতুনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পেরেছিলেন তারাই উপকৃত হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে দেখা দেয় তিন খণ্ডের উপন্যাস। ট্রোলোপি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লাসের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন কীভাবে তিনি প্রতি সপ্তাহে চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লিখেছেন এবং ট্রেনের কামরায় বসে বারচেষ্টার টাওয়ার্স (Barchester Towers) উপন্যাসটি লিখে ফেললেন। তিনি তরুণ ঔপন্যাসিকদের অনুরোধ করলেন তিন খণ্ডের উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করতে। এবং আরো ছিল Roman feuilleton নামক ধারাবাহিক উপন্যাস রচনা। বর্ণনাধর্মী রচনার শিল্প ও সংবাদ পরিবেশনার ছন্দকে সমন্বিত করে রচিত উপন্যাস খবরের কাগজে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগল-পাশে ছাপা হত বিজ্ঞাপন ও নিবন্ধ। ১৮৩০ সালে ফরাসী সংবাদপত্রের এই ছিল চিত্র। এর ফলে পাঠকসংখ্যা বেড়ে গেল। The Wandering Jew উপন্যাসের জন্য ইউজিন স্যু Le Constitutionne পত্রিকা থেকে পেলেন এক লক্ষ ফ্রাঁ। উপন্যাসটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার সার্কুলেশান এক লাফে তিন হাজার থেকে ৪০ হাজারে উঠে যায়। সাৎ-বভে সেগুলোকে তিরষ্কার করলেন 'কারখানার সাহিত্য' বলে অভিহিত করে, কিন্তু শ্ফ্লুরী (Champ-fleury) কথাসাহিত্যের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করলেন। তিনি এটিকে তুলনা করলেন কলে-কারখানায় বাষ্প শক্তিকে ব্যবহার করার সংগে। যাই হোক এই ঘটনাকে গ্রহণ করলেন বৃহদাকারের উৎপাদনের সঙ্গে তুলনা করে যার ফলে

www.pathagar.com

লেখকেরা জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলো সেই আয় থেকে মেটাতে পারলেন। ১৭৯০ সালে আগে সস্তা কাগজ ছিলনা, মুদ্রণ মেশিন ছিলনা, বড় বাজার ছিলনা যার দ্বারা সাপ্তাহিক কাগজের কপি দ্রুত কম্পোজ করে লাভ করার সুযোগ মোটামুটি ব্যবসা করা যায়।

অন্যদিকে নতুন বাজার-ব্যবস্থায় কবিতার স্থান ছিল অনিবার্যভাবে অকিঞ্চিৎকর। এর মূল কারণ ছিল কবিতার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি। রোমান জেকবশন নতুন পথ নির্দেশক নিবন্ধে দেখিয়েছেন যে, কবিতা সাহিত্যশিল্পের এমন একটি শাখা যেখানে প্রধান গুরুত্ব থাকে বিষয়ের ওপর নয়, বক্তার ওপরেও নয়, যার সম্পর্কে বলা হয়, তার ওপরেও নয়, বরং একান্তভাবে বক্তব্যের উচ্চারিত বয়নের ওপর (verbal fabrics of the méssage)। ধ্বনি ও অর্থের সম্পর্ক, পত্রিকার প্রতিবেদন রচনায় অনুল্লেখযোগ্য হতে পারে, গুরুত্বের তারতম্য থাকতে পারে বাস্তববাদী উপন্যাসে, কিন্তু সেটাই একমাত্র সহজতম ও সংক্ষিপ্ততম নির্ধারক গীতি কবিতার। কবিতার ভাষাবিষয়ক উপাদানগুলোর ঘনত্ব ও সহজবোধ্যতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ; মাত্র ১৪ পংক্তির মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য মৌখিক ও অন্যান্য সমান্তরালতা ; বারবার আসা দ্বান্দ্বিক কৌশল এবং উপমার মত সবই মূল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এটা শুধু শব্দ নির্বাচন করার বিষয় নয় বরং এক পৃষ্ঠা কবিতার সামগ্রিক বিন্যাসের মধ্যে শব্দগুলোর আপেক্ষিক অবস্থান নির্ধারণ; যার উর্ধ্বমুখী কাজগুলো কিছুটা অর্কেস্ট্রার স্বরগ্রাম নির্ধারণ করার মত। বর্ণনামূলক গদ্যের একটি পৃষ্ঠার সঙ্গে সেটা তুলনীয় নয় কেননা গদ্যের বিন্যাস হচ্ছে আনুভূমিক এবং রৈখিক। তুলনাটি আরো এগিয়ে নিয়ে গেলে কবিতার সংগীত বাককে (Bach) আর গদ্যের সংগীত ভের্দিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মূলত কবিতার ভাষিক ঘনত্বের কারণে ইতিহাসের ধারায় অধিকাংশ কবিকে ধীরে-সুস্থে কবিতা লিখতে দেখা যায়। বলা হয় ভার্জিল এক দিনে মাত্র তিনটি পংক্তি সম্পূর্ণ করতেন। প্রবল আবেগনির্ভর ওয়েলসের কবি ডিলান টমাস প্রতিদিন দুটি ভাল পংক্তি লিখতে পারলে নিজেকে তৃপ্ত মনে করতেন। ক্লাসিক্যাল যুগ থেকে কবিরা দৃঢ় ভাবে পরামর্শ দিতেন লেখার গতি নির্ধারণে ব্যস্ততাহীন ও সচেতন থাকতে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে কবি হোরেস তরুণ পদ্যকারদের উপদেশ দিয়েছিলেন- তোমাদের সম্পর্কে ভাল ধারণা সৃষ্টি হবে যদি শব্দ ব্যবহারে যত্ন ও সূক্ষ্মতার পরিচয় দাও ; দক্ষতার সঙ্গে শব্দ স্থাপন করে তাতে নতুন অর্থ, তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা দিতে পার। পাঠকদেরও তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন যে-কবিতা বহুদিন ধরে পরিচর্যা করে রচিত হয়নি, এবং ক্ষুদ্রতম ত্রুটিও সংশোধিত হয়নি, সেসব কবিতা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। আঠারশ বছর পরে

www.pathagar.com

নব্যক্লাসিসিষ্ট ফরাসী কবি বৌলিউ যাঁরা খুব বেশি লিখেন তাঁদের তিরস্কার করেন নিম্নমানের বিচারশক্তির অধিকারী বলে এবয় পরামর্শ দিলেন প্রতিটি কবিতাকে বিশ বারের মত পরিমার্জনা করার জন্য। হঠাৎ করে উনিশ শতকের সাহিত্য গ্রন্থাদির উৎপাদন ও বিতরণের নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে কবিদের সম্পর্ক হয়ে গেল বৈর। পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায় যে শ্রমিক সমাজবিজ্ঞানী হ্যারী ব্রেভারমান শিল্পপুঁজির ইতিহাস নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন অধিক থেকে অধিকতর ভাবে বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য বেশি করে পণ্য উৎপাদনের চাপে জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধারণকারী শিল্পগুলোকে অনবরত সমাজের প্রান্তে ঠেলে দেয়া হচ্ছে এবং জটিল পদ্ধতিতে তৈরি দ্রব্যগুলো হয়ে যাচ্ছে সেকেলে ও অচলিত।

ব্রেভারমানের থিসিসের প্রত্যক্ষ উদাহরণ পাওয়া যায় কবিদের জীবনকাহিনিতেই। একালে আমরা গতিয়েকে কবি হিসেবে গ্রহণ করেছি, তাঁর সব কবিতা দু-খণ্ডেই শেষ হয় কিন্তু যদি তাঁর সংবাদপত্রের লেখাগুলো সংকলিত হয় তা হলে সেগুলো ২০০ খণ্ড ছাড়িয়ে যাবে। জীবিত থাকতে বোদলেয়ারের প্রধান পরিচয় ছিল সাহিত্য-সমালোচক ও পো-র কবিতার অনুবাদক হিসেবে ; তাঁর উপার্জনের প্রধান উৎস ছিল সেগুলোই ; কবিতা রচনার সময় তিনি একটি পংক্তি বার বার সংশোধন করতেন এবং মানসম্মত শব্দের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিন্তা করতেন। তাঁর কবিতাসমগ্র ছাপা হয় ৩০০ পৃষ্ঠায়। যদি তিনি কবিতাগুলো সংবাদপত্রে ছাপতেন এবং সম্মানী পেতেন দুমা বা বালজাকের মতন তবু জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আয় তাঁর হতনা। বোদলেয়ার নিজেই বলেছেন সাহিত্য নির্মিত হয় প্রধানত সংবাদপত্রে, অনেক কলাম পূর্ণ করার মধ্য দিয়ে। এবং লেখককে সব রকমের মূল্যে বিক্রি করতে হয়। তিনি আরো বলেছেন বর্তমানের প্রয়োজন হচ্ছে বেশি করে উৎপাদন করা। সেজন্য তাকে অবশ্যই কাজ করতে হবে দ্রুত বেগে ... এবং হিসেব রাখতে হবে প্রতিটি অক্ষরের টানের। অন্যদিকে সে সব কবি, যারা হুগো ও লর্ড বায়রনের মত স্বতঃস্ফূর্ত ও বহুপ্রজ, এবং শিলারের বিবেচনায় সাদাসিধা তারা বাজারে আধিপত্য কায়েম করতে পারেন। বলা হয় যে, হুগোর সব ১৫০ হাজার পংতির মত। গোতিয়ে ২০ বছর লাগিয়েছে ছোট অথচ সুরুচিপূর্ষ কবিতা-সংকলন Emaux et camées শৈলি (craft) গঠনে। মাদমাজোয়েল দ্য মওপি-র বর্ণনাকারী সেসব কবিদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতেন যারা এক বৈঠকে ১০০ লাইন লিখতে পারেন, সে লেখার সময় তাঁদের অন্য দিকে তাকাতে হয়না বা সিলিং-এর কড়িকাঠ গুণতে হয়না।

বাজারের পাঠকদের অবস্থান থেকে দেখলে কবিতার অস্তিত্ব এখন খুবই নাজুক। প্রকৃতপক্ষে কবিতার বই বিক্রি সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌছে ছিল ১৮২৭ সালে- সে বছর উপন্যাস

www.pathagar.com

বিক্রি হয়েছিল ২৯৫টি আর কবিতা সংকলন ৫৩৭টি। সে বছর থেকে উপন্যাসের বিক্রি বাড়তে থাকে এবং কমতে শুরু করে কবিতার বইয়ের বেচা। একটি কবিতার বই প্রতি বছর গড়ে ৩০০ কপিতে গিয়ে থেমে যায়। লেসুর (Lesur) নামের একজন বই বিক্রেতা অনুমান করেছিলেন যে, এমন দিন আসবে যখন গদ্যে রচিত কথাসাহিত্যের বই বিক্রির দিক দিয়ে কবিতাকে স্থানচ্যুৎ করবে। তদুপরি এত বেশি গদ্য মুদ্রিত হয় যে, তার তুলনায় মুদ্রিত সামান্য কবিতা অনিবার্যভাবে ঢাকা পড়ে যায়। সেটা আরো বেশি হয় যদি কবিতাটি শৈল্পিক বিচারে প্রথম শ্রেণীর হয়। আরো বলা যায় যে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় পাঠকের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানোর জন্য এবং পরদিনের সংখ্যাটি তাকে ছাড়িয়ে যায়। এই পরিবেশ কবিতার আকৃতি ও তার কার্যকারিতার জন্য আদর্শ নয় ; বর্তমানের বই ব্যবসা সম্পর্কে কবি কোলরিজের অভিযোগ ছাপানোই আছে। এবং কোন রকম তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত না-নিয়েও তিনি কাব্যের স্টাইল সম্পর্কে কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত দিয়েছেন। প্রথমত, যে কবিতাটি আমরা পাঠ করেছি সেটা নয় বরং আনন্দের সংগে যে কবিতাটি আমরা আবার পড়তে চাই সেটার মধ্যে যথার্থ শক্তি নিহিত আছে, এবং তাকেই প্রকৃত কবিতা বলে অভিহিত করা যায়। কোলরিজের মতামত যে সঠিক, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একটি কবিতা নিজের গুণেই বা নিজের ক্ষমতায় কবিতা হয়ে ওঠে, এবং তার কাজ সবচেয়ে ভালভাবে সাধিত হয় যখন কবিতাটি বারবার পড়া হয় বা পড়া হয়েছে। অপ্রচলিত হয়ে যাচ্ছে যেমন সাময়িক বিষয় ভিত্তি করে সৃষ্ট বইয়ের বাজার কোন বই পুনর্বার পাঠ করতে উৎসাহিত করেনা-আরো বেশি হয় যদি সেটা কাব্য হয়। সেকালে পুরো অবস্থার একটি ক্লাসিক ছবি পাওয়া যায় কোন ইতিহাসে নয়, বালজাক রচিত Lost Illunsion (১৮৩৯) গ্রন্থে। সাহিত্য জীবন নিয়ে রচিত উপন্যাসটির পুরো এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে ডেভিড সেশর্ড নামক এক তরুণ মুদ্রাকরের কাহিনি। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে শিল্পায়নের সঙ্গে চাহিদা বাড়বে সস্তা পোশাক ও সস্তা বইয়ের। তিনি অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন শাকসব্জী থেকে স্বল্পমূল্যের কাগজ তৈরি করার জন্য। পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হন কিন্তু কতিপয় প্রতারক শিল্পোদ্যগী আবিষ্কারটি চুরি করে। তাতেই শেষ নয়, সেই শিল্পে বিনিয়োজিত তার পুরো পুঁজিও মেরে দেয়। আরেকজন জাঁকালো সাহিত্য বীর ছিলেন লুসিয়েন দ্য রুবেমপ্রে নামক এক উচ্চাবিলাষী তরুণ কবি। তিনি প্যারিসে এসেছিলেন খ্যাতিমান হবার স্বপ্ন এবং এক গাদা সনেটের একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে। উপন্যাসের চরিত্রের মতে, সে কালে মুদ্রিত অধিকাংশ কবিতার তুলনায় ...... উচ্চমানের কথাসাহিত্য দিয়ে। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বুঝতে পারলেন যে প্রকাশকদের দৃষ্টি থাকে Book keeping in twenty lessons বা Botany for ladies নামের পাণ্ডুলিপির দিকে এবং প্রকাশকের কাছে পাণ্ডুলিপি হচ্ছে

www.pathagar.com

বস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছে তুলানির্মিত নৈশ টুপির মত। সস্তা দামে জিনিস কিনে চড়াদামে বিক্রি করা জো দৌবিএ (Zou Dauriet) নামের একজন প্রকাশক ব্যক্তিগতভাবে লুসিয়েনকে জানান যে একটি কাব্যের কবি হিসেবে তিনি বিক্রয়যোগ্য নন, স্বীকার করি যে আপনি একজন ভাল কবি, কিন্তু আপনি কি বহুপ্রজ? আপনি কি নিয়মিত সনেট রচনা করতে পারেন, আপনার লেখা কি দশ খণ্ড হবে? আপনি কি লাভজনক ব্যবসা? অবশ্যই নয়। শুধু বইয়ের গুণের কারণে বই প্রকাশ করা করতে না পেরে লুসিয়েন সংবাদপত্রের জগতে নেমে গেলেন, এবং অল্পকিছুদিনের মধ্যে সহজ অর্থ ও দ্রুত বাক্যাংশের আলোকময় জগতে জায়গা করে নিলেন ; হয়ে উঠলেন পিচ্ছিল সফল ও দুর্নীতিগ্রস্ত।

পাঁচ

> শিল্পী হবার পূর্ব পর্যন্ত কবি ছিলেন ওঝা ও ঋষি। তাঁর কাঠামোগুলো ছিলনা বিমূর্ত শিল্প, অথবা শিল্পের-জন্য-শিল্প তত্ত্বের প্রকাশ ..... [সেগুলো] রূপ লাভ করেছিল শিল্পের সেবা করার জন্য নয় বরং সর্বাপেক্ষা মৌলিক তাৎপর্যে ধর্মের সেবা করতে।
>
> আলবার্ট বি লর্ড

এখন এটা কোন দুর্ঘটনা নয় যে, যারা শিল্পের-জন্য-শিল্প মতবাদের সংগে যুক্ত, তাঁরা সবাই ছিলেন মূলত কবি—গোতিয়ে, বোদলেয়র, ফরাসী পারনাসিয়ন্স ও প্রতীকবাদী ল্যাটিন আমেরিকার আধুনিকতাবাদী- আমাদের দেশের পো এবং পরে যারা নতুন সমালোচক (new critics) হয়েছিলেন সেই বিদ্রোহী কৃষকেরা। মুষ্ঠিমেয় যেসব ঔপন্যাসিক নন্দনতত্ত্বের দিকে ঝুঁকেছিলেন ফ্লবের, জয়েস ও নবোকভ- তাঁরা পছন্দ করেই হোক, বা নিজের মেজাজের কারণেই হোক, লিখেছেন খুবই কম বা ধীরে ধীরে। ফ্লবেরের উপন্যাস অবশ্যই পড়া যেতে পারে বা পড়া হয় সামাজিক বিষয়বস্তুর জন্য, কিন্তু তিনি চেষ্টা করেছিলেন উপন্যাসকে নিখুঁত শিল্পকর্ম হিসেবে নির্মাণ করতে। তাঁর সক্রিয় চেষ্টা ছিল গদ্যকে পদ্যের মত প্রসাধিত করতে। সেটা মনে রেখে পাঁচটি বছর ব্যয় করে তিনি রচনা করেছিলেন মাদাম বোভারী। কখনো এক সপ্তাহের চেষ্টায় তিনি লিখেছিলেন মাত্র একটি অনুচ্ছেদ। জয়েসের সম্পূর্ণ গদ্যসাহিত্যের পরিমাণ চারটি উপন্যাস। সেগুলোতে তাঁর সম্পূর্ণ বীরোচিত অঙ্গীকার ছিল শিল্পকৌশলের প্রতি ; Finnegan's wake রচনা সমাপ্ত করেছিলেন বিশ বছরে। সাহিত্যকে বাজার সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে নবোকভের ছিল তীব্র ঘৃণা। উপন্যাস রচনায় তিনি ব্যবহার করতেন ৫ x ৩ মাপের কার্ড। কার্ড পূর্ণ হলে তিনি অন্য শব্দ দিয়ে লিখতেন সেই অংশটি বাক্যকে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করে। এভাবে চলত নতুন সজ্জা, অভূতপূর্ব অস্তিত্ব না-আসা পর্যন্ত।

মৃত্যুর পর প্রকাশিত কার্ল মার্কসের Theories of Surplus Value গ্রন্থে একটি পথ-চলতি মন্তব্য রয়েছে, যা তিনি ব্যাখ্যা করেননি, কিন্তু বার বার সেটা উদ্ধৃত

www.pathagar.com

করা হয় যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা শিল্পকলা ও কবিতার মত কয়েক প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক সৃষ্টির প্রতি শত্রুমনোভাবাপন্ন। মার্কস বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করেননি। তবে আমার আংশিক ব্যাখ্যা আছে, আমার মনে হয় বেশ কিছুদিন পার হবার পর বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়েছে।

শিল্পের-জন্য-শিল্প মতটি অনেক কবি গ্রহণ করেছেন। বিশেষ ধরনের আলোচনা-পদ্ধতি এবং উৎপাদন-বিষয়ে তাদের ব্যক্তিগত প্রণালীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব ছিল নব্য শিল্পায়িত সাহিত্য বাজারের চাহিদার। যদিও কবিদের অনেকে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থাদি উপার্জন করতেন সাংবাদিকতার বাজার থেকে কিন্তু অঙ্গীকারাবদ্ধ গীতিকবি হিসেবে তাদের অবস্থান ছিল ঐ ধরনের উৎপাদন ও শিল্পশাখার অনানুষ্ঠানিক নিয়মকানুনের অনেক বাইরে। বিশেষ প্রতিভার অধিকারী এই কবিরা আক্রমণমুখী সমৃদ্ধ নতুন সাংস্কৃতিক পদ্ধতির সংগে তাদের ব্যবধানের ব্যাপারে দুঃখজনক ভাবে সচেতন থেকে গ্রহণ করলেন একটি জঙ্গী রক্ষণশীল অবস্থান এবং প্রকাশ করলেন মন্ময়ী আদর্শ। সেই অবস্থান তাদের ক্ষুব্ধ মনে কিছুটা শান্তির প্রলেপ দিল; নিজেদের শিল্পকৌশলের ব্যাপারে তাঁদের ছিল সম্পূর্ণ উঁচু মনোভাব। বস্তুগতভাবে তাদের আর্ট সেকালের আধিপত্যশীল সাহিত্য-মানসের প্রান্তবর্তী হলেও তারা তাদের কবিপ্রতিভাকে মন্ময় ভাবে রূপান্তরিত করলেন এমন অবস্থায় যাকে তারা গ্রহণ করলেন নান্দনিক আধ্যাত্মিক ও এমনকি নৈতিক সম্পদরূপে।

সাহিত্য বাজারের প্রতি কবিদের বিদ্বেষমূলক ও আত্মরক্ষামূলক ভূমিকার অবস্থানের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন পরিচয় পাওয়া যায় গোতিয়ের শৃঙ্গারমূলক উপন্যাস মাদমাজোয়েল দ্য মউপি-র (১৮৩৬) ভূমিকাংশে। এটিকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হত শিল্পের-জন্য-শিল্প তত্ত্বের প্রথম সাহিত্য ম্যানিফেস্টো। গোতিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে নিজে সম্পূর্ণ অবহিত নাও থাকতে পারেন, কিন্তু সেটা বেড়েই চলছে এবং কান্টের দর্শনের সস্তা ও পিতৃপরিচয় বিহীন তত্ত্বেও ঢুকে পড়ছে। "কোন কিছুই যথার্থভাবে সুন্দর নয় যদি না সেটা অপ্রয়োজনীয় হয়। যাই প্রয়োজনীয় তাই কুৎসিত। বাড়ির মধ্যে সর্বাধিক দরকারী স্থান হলো শৌচাগারটি।" তদুপরি কবি গোতিয়ের জন্য মানানসই হচ্ছে যে, ঐ ভূমিকাটি যা বই ব্যবসা, সংবাদপত্র ব্যবসা ও শিল্পায়নের ওপর আক্রমণে ভরা। উপন্যাস দুই কাজে লাগে : একটি বস্তুগত, অপরটি আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত। প্রথমটি প্রসারিত অনেক দিকে- লেখকের পকেটে এক হাজার ফ্রাঁ, প্রকাশকের জন্য বিশুদ্ধ বংশজাত একটি ঘোড়া, কাগজ ব্যবসার জন্য অন্য খাতের একটি কারখানা, এবং একটি নয়নাভিরাম বনাঞ্চল ধ্বংস করা। ঔপন্যাসিকের এক হাজার ফ্রাঁ এবং ব্যবসায়ীর পকেটে সঞ্চিত লাভজনক মুনাফা এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান যতই হোক না কেন গোতিয়ে উপন্যাসেরই বিকাশ কামনা করেন, যেহেতু তিনি জানেন যে, উপন্যাসটি অন্তত বিক্রি হয়, কিন্তু আধুনিক কাব্যের

www.pathagar.com

কোন বাজার নেই। (কবিতার বইয়ের এই পরিণতি তিনি দেখেছিলেন সাম্প্রতিক একটি দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে।)

নবোত্থিত প্রযুক্তি-নির্ভর পরিবেশের দিকে কৌতুকের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চাপা উল্লাসের একটি উচ্ছ্বাসপ্রবণ লেখায় গোতিয়ে মন্তব্য করেছেন যে রেল রাস্তা, ইনজেকশনের সিরিন্জ বা অখণ্ড চামড়ায় নির্মিত পাদুকা দেশের ভৌত সমৃদ্ধিতে যতটা অবদান রাখতে পারে, তেমন পারেনা সাহিত্য-সংস্কৃতি। আরো নির্দিষ্ট করে তিনি মন্তব্য করেন যে, মুচি ও ধুনুরীর কাছে কবিতার ছন্দ অলংকার ও বক্রোক্তির কোন উপযোগিতা না থাকলেও সেগুলো কবির কাছে খুবই প্রয়োজনীয়। (কান্ট জীবিত থাকলে হয়ত বলতেন যে, আপাতদৃষ্টিতে 'উদ্দেশ্যবিহীন' শিল্পকর্মের মধ্যে সেগুলো হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক কৌশল।) সম্পূর্ণ আবেগমুক্ত ভাষায় আদর্শিক ও আদর্শবিহীন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ এনে গোতিয়ে রাজা লুই ফিলিপকে পরামর্শ দিয়েছিলেন সেগুলোকে চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিতে। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে পরবর্তী ৩৬ বছর ধরে একটি দৈনিক পত্রিকার নাট্যসমালোচনা অংশের সম্পাদক হিসেবে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে যদিও তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কাজ, তথা- 'আঙ্গিক ও অলংকার ব্যবহারে নিখুঁত প্রসাধন কলায় অনিন্দ্য কবিতা রচনা' করতে না পেরে প্রতিটি মুহূর্ত সেই দায়িত্বকে ঘৃণা করতেন।

কয়েক দশক পরে একই ধরনের আবেগ প্রচার করেছিলেন মালার্মে। মালার্মের কবিতার বিষয়, যা যথার্থই তাঁর আবদ্ধ সংস্কারে পরিণত হয়েছিল, হচ্ছে কবিতা রচনা এবং উদাসীন ও শত্রুকবলিত দেশের সমস্যাদীর্ণ জগতে কবিতার মর্যাদা। গোতিয়ে ও বোদলেয়ার সংবাদপত্রের জগতে কাজ করেছেন, কিন্তু মালার্মে তা করেননি। জীবনধারণের খরচ মেটানোর জন্য উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে (Lycee পর্যায়ে) শিক্ষকতা করে তিনি বিশ শতকের অনেক কবির সামনে একটি প্যাটার্ন স্থাপন করেছিলেন। ঠাস বুনুনি প্রবন্ধের সংকলন Quant Au live (বইয়ের জন্য)-এ মালার্মে বিশেষ এক অপরাধীকে বারংবার চিহ্নিত ও আলাদা করেছেন। প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কিছুকে ঠাট্টা করে তিনি বলেছেন- বিদ্যার উচুমার্গীয় ব্যবসায়। তিনি বিষণ্নভাবে ইংগিত করেছেন প্রেসের অনন্যসাধারণ অতিরিক্ত উৎপাদন, বিজ্ঞাপনের ওপর শোচনীয় নির্ভরতা এবং শিল্পকর্মকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রতি। কবিতার বদলে ধারাবাহিক প্রকাশিত উপন্যাসের সাফল্যকে তিনি নিন্দা করে বলেছেন- কবিতা বিক্রি হয়না এবং বিক্রি হওয়া উচিত নয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে গ্রন্থের যথার্থ প্রভু হল কাব্য; বিজ্ঞাপন, প্রদর্শনী ও হকারের ব্যবহারের সঙ্গে বইয়ের কোন সম্পর্ক নেই।

সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে চুক্তি করে কবি বাস করেন দূরের কৃত্রিম তপোবনে, যেখানে বিজ্ঞাপন পৌছায়না, বইয়ের চাপে কাউন্টার ভেঙ্গে পড়েনা। অন্যদিকে 'নটরডেম

www.pathagar.com

দ্য পারী' বইয়ে হুগো মুদ্রণ কাজকে অভিহিত করলেন ইতিহাসের মহত্তম আবিষ্কার বলে ; তিনি স্বপ্ন দেখতেন মুদ্রণ যন্ত্রের কল্যাণে মানুষের মন মুক্ত হবে; উল্লাসের সঙ্গে তিনি মন্তব্য করলেন যে, মুদ্রণ পদ্ধতি গথিক স্থাপত্যকে শেষ করে দেবে, অথচ গ্যতিয়ে মাদমাজেয়েল দ্য মউপিতে আর্তনাদ করেছেন এই বলে যে, বই ধ্বংস করেছে স্থাপত্যকে, যেমন করে সংবাদপত্র ধ্বংস করেছে গ্রন্থকে, এবং কামান ও গুলিগোলা ধ্বংস করেছে শারীরিক সাহসকে।

সাহিত্য বাজার থেকে বাদ পড়ে গিয়ে কবিতা নিজেকে আরো দেখতে পেল পূর্বেকার সাংস্কৃতিক ব্যবহার ও প্রয়োগ থেকে নির্বাসিত অবস্থায়। আগের কালে বিভিন্ন সময়ে কবিতা-কৌশল নিজেকে দেখত রেনেসাঁজাত মানবিকতা, সরকারী নব্য ক্লাসিকতা, খ্রীষ্টিয় ভক্তিপ্রবণতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ নাট্যচর্চার একই সমতলে। আঠার শতকেও বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্ত প্রকাশ ও সাংবাদিক বা হাস্যরসাত্মক বর্ণনার বাহন হিসেবে ছিল একই মর্যদায় কিন্তু নতুন শিল্পায়িত বাজারে কবিতা নিজেকে আবিষ্কার করল জনশূন্য বিজনে একাকী পরিত্যক্ত অবস্থায়। প্রাপ্য সার্বভৌম স্বায়ত্তশাসিত অবস্থান থেকে সরে গিয়ে যা সে সত্যিকারভাবে কোনদিন কামনা করেনি, কবিতা হয়ে গেল শুদ্ধ শব্দের শিল্প, প্রকৃতি-প্রত্যয়ের উদাহরণ প্রদর্শনের কৌশল, আপাতদৃষ্টিতে সমসাময়িক, ছন্দ-কবি-ভাষা-অলংকার ও ধ্বনির চতুর ব্যবহারের প্রয়াসে নিমগ্ন, অত্যধিক বর্ণনামূলক, অনুকরণে দক্ষ ও এক রৈখিক সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে উল্লেখ করার মত ভূমিকা পালন থেকে বিচ্যুত। শিল্পের-জন্য-শিল্প সেই মহান আদর্শটি, যাঁরা গদ্যরচনায় সন্তুষ্ট ছিলেন না, আবার রজত চাকতির লোভে পদ্য লিখেন নি, তাঁদের জন্য একটি সান্ত্বনা পুরস্কারে পরিণত হল।

www.pathagar.com

ভবানী সেন

একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী

পুরো নাম ভবানীশংকর সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রগুপ্ত ছদ্মনামে লিখতেন। জন্ম খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার অন্তর্গত পয়োগ্রামে, ১৯০৭ সালে জানুয়ারী মাসে। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা। জেলে থাকাকালে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৫৪ সালের ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬৮ ও ১৯৭১ সালে নির্বাচিত হয়েছিলেন কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে মস্কোতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সামাজিক পটভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর পুরো একটি শতাব্দী কেটে গেল, পূর্ণ হয়ে গেল ভারতের জাতীয় জীবনের একটি সম্পূর্ণ মহাযুগ। কবিগুরুর জন্মকালটি ছিল ভারতীয় ইতিহাসের একটি মহাসন্ধিক্ষণ। ১৮৫৭ সালের জনবিদ্রোহ যে আগুন জ্বেলেছিল তা তখন নির্বাপিত, কিন্তু তার স্মৃতি তখনও জাগরূক। জাতীয় জাগরণের জন্য ভারতীয় জনমনের মর্মস্থলে তখন যে অস্পষ্ট রূপরেখা রচিত হচ্ছিল, নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনায় তা ভরপুর, পুরাতনের সঙ্গে নূতনের বোঝাপড়া তখন প্রত্যাসন্ন। ভারতের সামাজিক এবং নৈতিক প্রগতি কোন্ পথ ধরে চলবে, কোন্ পথে হবে নূতন জাতি-সৃষ্টি এই আত্মচিন্তা তখন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। তারপর একশো বছর পরে আজ দেখা গিয়েছে নূতন আত্মচিন্তা,–স্বাধীন ভারত কোন্ পথ ধরে এগোবে। মাঝখানে পড়ে রইল যে একশো বছরের ইতিহাস তার প্রতিটি অধ্যায় কবিগুরুর বিচিত্র সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ। পৃথিবীর এই প্রাচীনতম সমাজের নবীনতম মহাজাতিরূপে উদয়ের পথে সুখে-দুঃখে জয়ে-পরাজয়ে মহাকবির গীতিকাব্য তাকে সর্বদা সজীব করে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবন যখন শুরু হয়, বাংলায় তখন নূতন চেতনা, নূতন মূল্যবোধ, নূতন রসোপলব্ধি এবং নূতন গণঅভিযান ধীরে ধীরে জন্মগ্রহণ করছে। ইতিহাস শুরু করে 'আধুনিক' যুগের সৃষ্টির কাজ।

মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু ও কালীপ্রসন্ন, টেকচাঁদ ও অক্ষয়কুমার ইতিপূর্বেই বাংলার সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে নবযুগের নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছেন, সমাজ-সংস্কারকেরা উদ্যমে ও কর্মপ্রবাহে মধ্যযুগীর সামাজিকতাকে আঘাত করেছেন, তুলে ধরেছেন নূতন সমাজের প্রগতিশীল লক্ষ্যকে; তারই পাশাপাশি উপর্যুপরি কৃষক-বিদ্রোহ থেকেও তখন জন্ম নিয়েছিল নূতন সমাজের নূতন ভাবজগত। সে যুগের নীলবিদ্রোহ এবং

* ধনঞ্জয় দাস সম্পাদিত মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক অখন্ড সংস্করণ, কলিকাতা ২০০৩।

www.pathagar.com

একাধিক প্রজাবিদ্রোহ প্রতীক ওই ভাবসম্পদ হয়ে পড়তো বন্ধ্যা।

১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত, এই ত্রিশ বছর ধরে ভারতে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের যে তীব্র সংগ্রাম চলে তারই ভেতর দিয়ে তখন জন্মগ্রহণ করেছিল এক সৃষ্টিশীল সংস্কৃতি, ভারতের আধুনিক জাতীয় আন্দোলন হলো তারই সহজাত শক্তি ; তারই পুরোভাগে আবির্ভূত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টির সম্পূর্ণ ও অখণ্ড এক ইতিহাস। এই আবির্ভাব আকস্মিক নয়, অলৌকিক নয় ; প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব-সমাকুল এক ঐতিহাসিক মহাযানে রবীন্দ্র সৃষ্টির এই সমারোহময় উদ্বোধন যেমন প্রত্যাশিত তেমনই স্বাভাবিক। শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের ইতিহাসের রবীন্দ্রনাথ সমগ্র একটি যুগ। রবীন্দ্রযুগ বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের উত্থান এবং অবসান,–এই দুইটি যুগের সমষ্টি ; তাঁর সৃষ্টিশীল সাধনা ছিল ইতিহাসের একটি নয় দুইটি বিশিষ্ট যুগে পরিব্যাপ্ত। বিশ্বের মানুষ তখন যুগ থেকে যুগান্তরে চলেছে ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে মহাকালের যাত্রাপথ অনুসরণ করে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহান শিল্পী। সৃষ্টিশীল মহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্যই হল যুগের সমগ্র সত্তাকে প্রতিফলিত করা। তাই সেই যুগের সমস্ত সত্তা, সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং সমস্ত ধারা তাঁর বিপুল এবং ব্যাপক সৃষ্টির মধ্যে বর্তমান। বিজ্ঞানের বিকাশে প্রকৃতির উপর মানুষের জয় যাত্রা যখন শুরু হয়ে গেছে, অথচ সমগ্র এশিয়া এবং আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ত বিজয়োল্লাসে নতুন জাতির স্বতন্ত্র সত্তা যখন বিলুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ তখন তার সৃষ্টির কাজ শুরু করেন, আর যেদিন এই মহান শিল্পীর সৃষ্টির উপর যবনিকা পড়ল সেদিন সেই সাম্রাজ্যবাদের শেষ সংকট সমুপস্থিত।

রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার ইতিহাসের দুটো যুগ দেখে গেছেন। সন্তদের অবসান ঘটিয়ে ধনিক সভ্যতা যখন সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হচ্ছে, আবার ধনিক সভ্যতার অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রথম ভিত্তি যখন প্রতিষ্ঠা হচ্ছেএই দুটো যুগ ধরেই রবীন্দ্রনাথ নিরবচ্ছিন্নভাবে শিল্প সৃষ্টি করেছেন এবং যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করেছেন জাতীয় জীবনের নানাবিধ প্রগতিশীল আয়োজনে। তিনি দেখেছেন ব্রিটেনে ধনতন্ত্রের উদীয়মান সৃষ্টিশীল অবদান, তিনি দেখেছেন দেশে সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র অভিযান, তিনি দেখেছেন এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরাধীন জাতির বহু অভ্যুত্থান ; দুই দুটো সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ, সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম সংকট-এ সবই ছিল তাঁর সৃষ্টির উপাদান। ইতিহাসের এই দ্বন্দ্ব-সমাকুল আবর্তন দেখবার মত দৃষ্টি তাঁর ছিল, ছিল অনুভব করার মত প্রাণ এবং সেই অনুভূতি প্রকাশ করার শক্তি। তাই তাঁর সৃষ্টি হয়েছে অভূতপূর্ব যার মূল্য ও সৌন্দর্য কখনও ম্লান হবার নয়, ইতিহাসের রথচক্রতলে যা কখনও পিষ্ট হবে না, চির অম্লান যার মাধুর্য যুগযুগান্ত ধরে মানুষের অন্তরাত্মাকে বলদীপ্ত করতে সক্ষম।

www.pathagar.com

ধনিক সভ্যতার সৃষ্টিশীল পর্বের প্রদোষকালে রবীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টি শুরু হয় এবং তা সমাপ্ত হয় সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার ব্রাহ্মমুহূর্তে। তাই তাঁর সংস্কৃতিতে পাই দুই সভ্যতার ঐতিহাসিক মর্মবাণী, তাই তাঁর সংস্কৃতি সর্বদা সৃষ্টিশীল, সর্বদা বৈচিত্র্যময় এবং সর্বদা যুগসীমা অতিক্রান্ত। মহান শিল্পীর সৃষ্টিতে এই দুই যুগের নৈতিক বাণীই শুধু নয়, দ্বন্দ্ব সমূহও প্রতিফলিত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে কিছু লেখা কিম্বা কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন, সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। একদিকে নিছক স্তোকবাক্যে তাঁর সৃষ্টিশীলতার অবমাননা এবং অপরদিকে অপরিণত সমালোচনা দ্বারা তাঁর মূল্য উপলব্ধির অক্ষমতা-প্রতিপদে এই দুই রকম ভুলেরই সম্ভাবনা আছে।

রবীন্দ্র-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্রনাথ যে বস্তুবাদী ছিলেন না, ছিলেন ভাববাদী সে বিষয় বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু ভাববাদী হওয়া সত্ত্বে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য বহুলাংশে বাস্তবতাময়। 'গীতালি', 'মহুয়া' এবং 'পূরবীতে' পাই ভাবরূপী চিন্তাধারার চরমোৎকর্ষ বাস্তবধর্ম-বর্জিত নিষ্কর্ষিত প্রেমের গীতিকাব্য। ভাববাদী কবিদের মধ্যে এমন একটি সুর থাকে যা মানুষকে বাস্তব সংগ্রামে বিমুখ করে তোলে, পলায়নের মনোবৃত্তি যোগায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবাবেগ সে জাতের নয়। মানুষকে মানুষ হিসেবে উন্নত করবার জন্য যে আদর্শবাদের প্রয়োজন হয়, তা কোন বস্তুবাদী না হলেও তাঁর মন ছিল বাস্তবতায় স্পর্শকাতর, তা 'নৈবেদ্য'র মধ্যে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে আদর্শবাদকে ভাববাদের দৈন্য থেকে মুক্ত করে সুস্থ সামাজিক আদর্শের অনুকূলে রূপায়িত করেছেন। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়', 'ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা, হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা', 'যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান'-এই সমস্ত ঘোষণাই কবির ভাবাদর্শের বাস্তবানুগত দিক, যা নতুন জাতীয় চরিত্র সৃষ্টির উপাদান। ভাববাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের এবং প্রগতির যে বিরোধ, রবীন্দ্রনাথ তাকে কখনও প্রশ্রয় দেন নি। বলাকার মত মহাকাশে বিচরণ করতে করতে মাটির টানে মর্তে নেমে এসেছেন বারংবার, আবার মর্তের পঙ্কিলতায় অতিষ্ঠ হয়ে আকাশে উড়ে গেছেন কতবার। 'ভাববাদ' মানুষকে জীবন-সংগ্রামে নির্লিপ্ত ও নৈরাশ্যবাদী করে দেয়, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্য' সেই অবসাদের সুর থেকে মুক্ত। প্রেম ও সৌন্দর্যকে তিনি বাস্তব জগৎ থেকে অবিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তার নিষ্কর্ষিত রূপ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের মধ্যে জীবনবাদের বিরোধী কোন সুর নেই, যদিও ভাববাদের সঙ্গে জীবন্ত সত্যের বিরোধিতাই চিরন্তন।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে-ভাববাদ যদি জীবন্ত সত্যের বিরোধই হবে তা হলে রবীন্দ্রনাথ

www.pathagar.com

কেমন করে ভাববাদের আশ্রয় থেকে জীবনের মহাসত্যকেই রূপ দিতে পারলেন, কেমন করে তাঁর পক্ষে সম্ভব হল ভাববাদের ঊর্ধ্বে উঠে, যে সত্য বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদের একান্ত নিজস্ব, তাকে উজ্জীবিত করা? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে তিনি ছিলেন মহান শিল্পী এবং মহান শিল্পীর সৃষ্ট-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই এই যে সত্য তাঁর দার্শনিক বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে, অতিক্রম করে নিয়ে গেছে তাঁকে সেই ভাববাদী দর্শনের সীমা থেকে-যা রূপকে মনে করে ভাবের ছায়া মাত্রা, ভাবকেই মনে করে আসল সত্তা। উপনিষদের প্রতি কবির আস্থা তাঁকে সেই ভাববাদের আকাশে বিচরণ করালেও, শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে কবির অবচেতন মন আবিষ্কার করেছে- "ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।" বলাবাহুল্য, এই অনুভূতি, ভাবের সঙ্গে এই আত্মীয়তাই রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-মনটিকে জীবন্ত সত্যের সংস্পর্শে রেখে দিত। বস্তুবাদ না হয়েও ঠিক ভাববাদও নয়, এ দর্শন হল সর্বাস্তিবাদ তথা বৌদ্ধ বাস্তবতার অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন–

> 'আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী- অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে- আমি সমগ্রকেই মানি, গাছ যেমন আকাশের আলো থেকে আরম্ভ করে মাটির তলা পর্যন্ত সমস্ত কিছু থেকে ঋতু পর্যায়ের বিচিত্র প্রেরণা দ্বারা রস ও তেজ গ্রহণ করে তবেই সফল হয়ে ওঠে- আমি মনে করি আমারও ধর্ম তেমনি- সমস্তের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করে সমস্তের ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ করে সার্থক হতে পারবে।'

এই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন এবং এই দর্শনই তাঁকে পরিচালনা করেছে শিল্পসৃষ্টির কাজে। তাঁর এই জীবনদর্শনের ভিতরই ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব বর্তমান। এই দ্বন্দ্ব রাবীন্দ্রিক শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর সৃজনশীলতার প্রধান উপাদান। এই জীবনদর্শন অনুসরণ করেই তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ধরে যুগ থেকে যুগান্তরে অতিক্রম করার সময় নিত্য নবযুগের উপযোগী প্রগতিশীল ভাবধারাকেই অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। দ্বন্দ্ব-সমাকুল এই ভাবধারাই আবার সত্যসন্ধানে সমস্যা সৃষ্টি করেছে ইতিহাসের জটিল রাজপথের মোড়ে মোড়ে। শুধু তত্ত্বের সাহায্যে যখনই সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে গেছেন তখনই ভুল করেছন, ভুল শুধরেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে। ভুলের এই সংশোধনই তাঁর মহত্ত্ব।

সামন্তবাদের বিরুদ্ধে উদীয়মান ধনিক সভ্যতাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন কিন্তু ধনিক সভ্যতার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও তাঁকে পীড়িত করেছে, এ দ্বন্দ্বের সমাধান ছিল তাঁর অজ্ঞাত। সামন্ত-সমাজের কুসংস্কার ও ব্যক্তিপীড়নের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের বিজ্ঞানানুগততা ও ব্যক্তিত্ববাদ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু ধনতন্ত্রের বিজ্ঞানানুগততা ও ব্যক্তিত্ববাদ ছিল তাঁর চক্ষুশূল। এই সমাজেরও সমস্ত ভড়ং তিনি ধরে ফেলেছেন, দেখতে পেয়েছেন

www.pathagar.com

মানুষের প্রতি মানুষের নির্যাতন এবং ব্যক্তি মনের নিষ্পেষণ, 'মুক্তধারা'র বাঁধ ভেঙ্গে দিতে চেয়েছেন নিষ্ফল আক্রোশে। কিন্তু তিনি সমাধান খুঁজেছেন অতীত সমাজের অতীত ব্যবস্থার মধ্যে। সোভিয়েত রাশিয়ায় ভ্রমণ করে সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের নতুন সৃষ্টিশীলতা তাঁর চোখে ধরা পড়ে, কবি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন সমাজতান্ত্রিক সমাজের। শেষ জীবনে তিনি নিজেই আবিষ্কার করেন নিজের সৃষ্টির মধ্যে কোথায় ছিল ফাঁক, ধরে ফেলেন যে শুধু 'এ পাড়ায়' ঘুরেছেন, 'ও পাড়ার' সঙ্গে আত্মীয়তা করা হয় নি। তাই আহ্বান জানালেন নতুন যুগের কবিকে- "যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রোগশয্যায় শুয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার জয় কামনা করেছেন। "সভ্যতার সংকটে" ঘোষণা করেছেন নতুন যুগের নতুন সমাজের অভ্যুদয় সম্পর্কে তাঁর অবিচলিত আস্থার কথা, কারণ "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ" এই বিশ্বাস ছিল তাঁর মনে।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ পুরাতনের বিরুদ্ধে নতুনের সংগ্রাম এবং "আধুনিক" সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপায়িত করার কাজে হাত দেন। কাব্যের ভিতর তাঁর জীবন-দর্শনের অধ্যাত্মবাদী দিক মূর্ত হয়ে উঠলেও, উপন্যাসে তিনি অনেক বেশি বাস্তব। 'চোখের বালিতে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের যে ছবি আঁকলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষকে তা সফলতার সঙ্গে অতিক্রম করে গেল। প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে ঘটনার যে আবর্ত সৃষ্ট হয় তার ঘূর্ণিপাকে এক মানুষ অন্য হয়ে যায়, সংসারের নৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে যায় চুরমার হয়ে। প্রেমের সঙ্গে বিবাহের যে বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে, সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে তার সমাধান নেই। সমাজ ভেঙ্গে যায়, কিন্তু তবু সেই সমাজ ছাড়া নতুন কোন সমাজের অভ্যুদয়ের চিহ্নমাত্র দেখা যায় নি, তাই রবীন্দ্রনাথ সমাধান খোঁজেন এই প্রতিষ্ঠিত সমাজের মধ্যেই আদর্শ-নীতির আশ্রয়ে। অথচ সে আদর্শ ফানুসের মত হাওয়ায় ভরা নয়, তার মধ্যে আছে বাংলার সামাজিক জীবনের সম্ভাব্য বাস্তব।

'যোগাযোগে' কবির দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত নিয়মে পরিচালিত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের কঠোর বাস্তবে কুমুর আদর্শিকতা ছত্রখান হয়ে গেল, চূড়ান্ত পরাজয় ঘটলো তার। বিবাহের অধিকার ছেড়ে তাকে চলে যেতে হল স্বামীর সংসার ছেড়ে, এই হল তার প্রথম বিদ্রোহ। কিন্তু আবার তাকে যেচে ফিরে আসতে হল সেই সংসারে অপমানের পসরা মাথায় করে। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন যে সামাজিক নীতিবোধ চিরস্থায়ী নয়, যুগে যুগে তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তবু বর্তমান অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান কি?

সমাজের ব্যক্তিসত্তার এই যে বিরোধ তার যে কোন সমাধান নেই প্রচলিত মধ্যে-

www.pathagar.com

কবি তা বুঝলেন, কিন্তু নতুন সমাজের ইঙ্গিত এই সমাজেরই গর্ভে যতক্ষণ না জন্মগ্রহণ করে ততক্ষণ কবির কাছে প্রশ্নটি থেকে যায় সমাধানের অসাধ্য। তাই তিনি প্রতিভার খেলা খেলতে বসলেন 'শেষের কবিতা"য় প্রেমের সঙ্গে বিবাহের যে বিরোধ তার সামঞ্জস্য ঘটালেন এমন এ উচ্চাঙ্গের আদর্শ দিয়ে যা সুন্দর হলেও অবাস্তব, অথচ শিল্পসৃষ্টির প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। সামাজিক সমস্যার যে সমাধানটি তিনি দিলেন তা একটি অলীক কল্পনা। এ থেকেই বোঝা যায় যে এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভাও বাস্তবকে অতিক্রম করে যেতে পারে না ; রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসই তার এক অকাট্য প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল প্রতিভার মহত্ত্ব এই যে এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নতুনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বারংবার। উদাত্ত সূরে ঘোষণা করেছেন- "নব লেখা আসি দর্পভরে...উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়, নবীনের রথযাত্রা লাগি।"

সমাজতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের একটি সত্যকে তিনি মর্মে মর্মে গ্রহণ করেছিলেন, তা হচ্ছে ইতিহাসের গতিশীলতা, পুরাতনের গর্ভে নতুনের অভ্যুদয় এবং সমাজ ব্যবস্থার অনিত্যতা। তাঁর সমগ্র সৃষ্টি এই নীতির দ্বারা প্রভাবিত। এই দৃষ্টি ছিল বলেই ধনতান্ত্রিক সমাজের আত্মবিরোধ তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। রোমাঁ রলাঁর ষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত রচনায় কবি লিখছেন :

> "আমেরিকায় অবস্থানকালে যন্ত্রসংঘসমূহ (organisation) ব্যক্তিগত (Personal) মানুষকে একেবারে নির্বাসন দিয়া যন্ত্রগত মানুষকে (mechanical) প্রকাণ্ড পদ্ধতি-পিণ্ডের মধ্যে সংহত করিয়া প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করিয়া দ্রুত ও বিপুল প্রসার লাভ করিতেছে দেখিয়া আমার মন পীড়িত হইয়াছিল..যে ধর্ম প্রেম ও করুণায় কমনীয় সেই ধর্মের নামে কদর্য রক্তলোলুপ ধর্মমত গড়িয়া তাহা আমরা দেখিয়াছি ব্যবসায়ের দোহাই দিয়া কী বিরাট প্রবঞ্চনা চলিতেছে। অথচ এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যাহারা তাদের সম্মান অক্ষুণ্ন। নিরীহ প্রজাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য রাজতন্ত্রের নামে কী বীভৎস মিথ্যাবাদ প্রচারিত হইতেছে দেখিতেছি, অথচ যাঁহারা এই রাজতন্ত্রের কর্ণধার তাঁহারা সকলেই আচার-আচরণ ও বংশগরিমায় ভদ্র।" রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৬৯-৭০।

আমেরিকা ঘুরে এসে ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা তাঁর চোখে ধরা পড়লেও এর কারণস্বরূপ শ্রেণীগত শোষণ-পদ্ধতির তত্ত্ব তখনও তাঁর অপরিজ্ঞাত ছিল ; তাই তিনি মনে করেছিরেন যে এর কারণ হল "জড় পৌত্তলিকতার প্রভাব।" কিন্তু এ ভুল তাঁর ভেঙ্গে গিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে। সেখানে দেখতে পেয়েছিলেন ঐ একই যন্ত্রের নতুন ভূমিকা; যন্ত্রের হাতে মানুষ নয়, মানুষের হাতে যন্ত্র। এখানে এসে তিনি

www.pathagar.com

বুঝতে পারেন যে আমেরিকায় "যন্ত্র পৌত্তলিকার" মূলে আছে এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর শোষণ। রাশিয়ার চিঠিতে তিনি লিখলেন :

"এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভাল লেগেছে সে হচ্ছে এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।...কেবলমাত্র এই কারণেই এদেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে।" এর আগে কমিউনিস্ট মতবাদ বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভারতে বসে বলশেভিক মতবাদ সম্পর্কে ধনিকদের কাগজে অনেক অপপ্রচার তিনি পড়েছেন, তাঁর মন তা দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছে। কিন্তু তাঁর মুক্তমন সোভিয়েত রাশিয়ার "ঐতিহাসিক যজ্ঞ" স্বচক্ষে দেখে লিখেছিল-সোভিয়েট রাশিয়ায় না এলে "এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।"

সোভিয়েত সমাজের মর্মস্থল লক্ষ্য করে কবি রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছিলেন :

> "আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বজাতির স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।...স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।"

যে মহাকবি তাঁর সৃষ্টিশীল জীবন আরম্ভ করেছিলেন সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠা নিয়ে, তিনি যে এইভাবে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতায় এসে পৌঁছতে পেরেছিলেন কুণ্ঠাহীন মনে, তার কারণ তাঁর জীবনদর্শনের মানবতাবাদ। এই মানবতাবাদই ছিল তাঁর ভাববাদ ও বস্তুবাদের, ব্যক্তিবাদ ও সমাজবাদের এবং ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমস্ত দ্বন্দ্বের সেতুস্বরূপ। তাই 'এ পাড়ায়' অবাধে বিচরণ করেও যখনই 'ও পাড়ার' সংস্পর্শে এসেছেন তখনই তাঁকে চিনতে তাঁর কষ্ট হয় নি একটুও।

রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের মহিমাই উপলব্ধি করেন নি, আবিষ্কার করেছিলেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মহাসত্য। তিনি লিখলেন :

"এই যে বিপ্লবটা ঘটলো এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করছিল। আয়োজন কতদিন থেকেই চলছে। খ্যাত অখ্যাত কত লোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েছে, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেছে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্তু এক একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।

"একদিন ফরাসী-বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন সেখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী।" -রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ৯।

–রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৯৪

www.pathagar.com

এই মহাসত্য রবীন্দ্রনাথ যখন উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা তখনও তাঁর অনেক পিছনে পড়ে। আজও ঐ মহাসত্য স্বীকার করতে তাঁদের সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী নেতাদেরও সংস্কারে বাধে। রবীন্দ্রনাথকে সংস্কারমুক্ত করেছিল তাঁর মানবতাবাদ।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ

এই মানবতাবাদের তাগিদেই তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে নেমে পড়েছেন। অথচ প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন রাজনীতি চর্চার প্রতি বিমুখ। হিজলী বন্দীশালায় গুলিচালনার প্রতিবাদে ১৯৩১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় এক জনসভা হয়। রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন এই সভার সভাপতি। রাজনীতির প্রতি তাঁর মনোভাব এই সভায় নিজেই তিনি ব্যক্ত করে বলেন :

> "প্রথমে বলে রাখা ভাল আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্র-আন্দোলনের বাহিরে। কর্তৃপক্ষের কৃত কোন অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাই নে। এই যে হিজলীর গুলিচালনা ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব যা কিছু আমার বলবার, সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।"
>
> রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৫

সাম্রাজ্যবাদী শাসন তার স্বভাবসিদ্ধ "মনুষ্যত্বের অবমাননা" দ্বারা বারবার কবিগুরুকে রাজনীতির মধ্যে টেনে নামিয়েছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভবে জড়িত ছিলেন তাঁর প্রথম যৌবনে। সেখানকার দরখাস্ত-সর্বস্ব রাজনীতিকে তিনি তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন, স্বদেশী-মেলার মারফৎ শহুরে রাজনীতিগুলিকে গ্রাম্য জনতার সংস্পর্শে জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছেন। গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে জাতিগঠনই ছিল তাঁর কামনা। এদিকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর পূর্বগামী।

তিনি তখন জানতেন যে রাষ্ট্রের মালিক যেই হোক না কেন, সমাজের মধ্যে আমরা লাভ করতে পারি আত্মকর্তৃত্ব। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র ছিল গ্রাম্য সমাজ সম্পর্কে নির্লিপ্ত ; আধুনিক যুগে ধনতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সেই নিরপেক্ষ ভূমিকা যে অবাস্তব এবং অসম্ভব তা তত্ত্বের দিক দিয়ে তিনি মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু তবু তাঁর নিজস্ব আদর্শের বাস্তব সুফল হয়েছিল এই যে, দেশের মধ্যে জাতি গঠনের জন্য গঠনমূলক কাজের নীতি জাতীয় গণজাগরণের উপাদান হয়ে দাঁড়ালো। জাতীয় গণজাগরণের কোন আভাস

www.pathagar.com

দেখলেই মন নেচে উঠতো, বেরিয়ে আসতেন তিনি তাঁর কাব্য-সাধানার মন্দির থেকে, রাজনীতির কলরবের মধ্যে। বঙ্গভঙ্গের যুগে তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন জাতীয় গণজাগরণের কাজে, জাতীয়তা যাতে জনমনের একটি সত্তা হয়ে দাঁড়ায় সেই প্রচেষ্টায়। রাখী-বন্ধনের গান গেয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন নতুন উদ্দীপনা, স্বদেশভক্তির নতুন চেতনা এলো জনমনের গানের মাধ্যমে।

এই স্রোতের জোয়ারে ভেসে এলো বিদেশী দ্রব্য বয়কট আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই দুটোরই বিরোধী। সরকারি জুলুমের প্রতিবাদে স্বদেশী জবরদস্তিও তিনি পছন্দ করতেন না। ভাববাদসুলভ দৃষ্টি নিয়ে তিনি জবরদস্তিকে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখতেন, কার বিরুদ্ধে কার জবরদস্তি সে প্রশ্ন তুলতেন না।

ভারতের স্বাধীনতা কোন পথে আসবে এ তত্ত্ব নিয়ে তিনি কখনও মাথা ঘামান নি এবং এ-বিষয়ে তাঁর মতামত ছিল প্রধানত নেতিবাচক। স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যে যেখানে ফাঁকি দেখেছেন অথবা দেখেছেন বিকৃতি, তারস্বরে তার প্রতিবাদ করেছেন। নব জাতীয়তার শক্তি যাতেই অনুভব করেছেন, তাকেই অভিনন্দন জানাতে কখনও দ্বিধাবোধ করেন নি। সন্ত্রাসবাদ যে নিষ্ফল সে সত্য সহজেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কারণ তা ছিল গণআন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু জাগ্রত জনতা তার শক্তি প্রয়োগ করবে কি ভাবে- এ বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক। তাই ১৯১৯-২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে জাতীয় আন্দোলন জেগে উঠল তাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন দু হাত বাড়িয়ে- যেন তিনি এরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ নীতি, বিলাতি বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ এবং রাজদ্রোহমূলক কোন আন্দোলনই তাঁর সমর্থন পায় নি। ১৯৩১ সালে ২রা অক্টোবর শান্তিনিকেতনে গান্ধীজীর ৬৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধির মূল্য আরোপ করে তাঁকে আমরা দেখব না। যে দৃঢ় শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবলভাবে সচেতন করেছেন, সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি সমস্ত দেশের বুকজোড়া জড়ত্বের জগদ্দল পাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর, জন্মান্তর ঘটে গেল। দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে অভিভূত ছিল।...আমাদের আত্মকৃত পরাভব থেকে মুক্তি দিলেন মহাত্মাজী। এখন শাসন-কর্তারা উদ্যত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে রফা নিষ্পত্তি করতে। কেননা তাদের পরশাসনতন্ত্রের গভীরতর ভিত্তি টলছে, যে-ভিত্তি আমাদের বীর্যহীনতায়। আমরা অনায়াসে আজ জগৎ সমাজে আমাদের স্থান দাবি করচি।" -'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮।

১. পত্রখানি ১৯২৬ সালের ৫ আগস্ট 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। -সম্পাদক

www.pathagar.com

এই উক্তির মধ্যেই প্রকাশ পায় বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তিক্ত মনোভাব ও জাতীয় স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সম্মিলিত কর্মশক্তিকে তিনি কত বড় স্থান দিতেন তারও আভাস এতে পাওয়া যায়। জনশক্তিই যে ইতিহাসের চালনী শক্তি এ বিশ্বাস তাঁর ছিল, যদিও পথের সন্ধান তিনি রাজনীতিক নেতাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান, সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় এবং সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম সংকট। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদীরা বুর্জোয়া-গণতন্ত্র পরিত্যাগ করে ফ্যাশিজম্-এর রাস্তা ধরে এবং পৃথিবীর দেশে দেশে জেগে ওঠে ফ্যাশিস্টদের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ। মানব সভ্যতার এই সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ, প্রগতির শিবিরেই তাঁর নিজস্থান নির্বাচিত করেছিলেন। এদিক থেকে ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের পিছনে ফেলে তিনি এগিয়ে যান। তখন মুসোলিনি তাঁকে দিয়ে ফ্যাশিস্ট মতবাদের স্বপক্ষে আনবার জন্য প্রণচেষ্টা করেন। তত্ত্বের দিক থেকে অবিচ্ছিন্ন ভাববাদের সাহায্যে তিনি প্রথমটা ফ্যাশিজমের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি, তাই তিনি ইতালির জনসভায় ফ্যাশিস্টদের সাজানো গোছানো জনসমাবেশ দেখে মুগ্ধ হন, প্রশংসা করেন ইতালির বৈষয়িক উন্নতির। ফ্যাশিস্ট বর্বরতার স্বরূপ তখনও তাঁর (কাছে) অপরিব্যক্ত ছিল। মহর্ষি রোমাঁ রলাঁ এ বিষয়ে তাঁকে সচেতন করে দেন। রোমাঁ রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে তিনি তাঁর মতামত স্থির করে ফেলেন এবং ফ্যাশিস্ট-বিরোধী শিবিরকে সমর্থন জানান অকুণ্ঠিত মনে। মানবতাবাদই তাঁকে সাহায্য করে আধুনিক বিশ্বের এই বৃহত্তম সংকটে সঠিক শিবির নির্বাচনে। ১৯২৬ সালের ২০মে জুলাই এড্রুজের নিকট লিখিত এক পত্রে মানবতার প্রতি তাঁর স্পর্শকাতর মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ফ্যাশিজমকে তিনি প্রচণ্ড ধিক্কারে ধিকৃত করেন। ইংলণ্ডের ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানে এ পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর থেকে তাঁর সত্য সাধনার অন্যতম লক্ষ্যও হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাশিজম ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ।

জাপানের বিখ্যাত কবি নোগুচি চীনের বিরুদ্ধে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের হামলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার উত্তরে নোগুচি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের তীব্র তিরস্কার নোগুচির প্রতি রবীন্দ্রনাথের এ পত্র প্রগতি শিবিরে একটি অবিস্মরণীয় দলিল। এমনি তাঁর একখানি দলিল হল মিস র‍্যথবোনের নিকট লিখিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কবির ধিক্কারবাণী।

১৯৩০ সাল থেকে কবির মনে জাগছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এক অপরাজেয় গণসংগ্রামের স্বপ্ন। রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক নির্লিপ্ততা তখন থেকেই কেটে

www.pathagar.com

গেছে। তাঁর এই নতুন ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় রাশিয়ার চিঠিতে। ১৯৩০ সালে তিনি রাশিয়া সফরের শেষে ভারত থেকে চিঠি পান আইন-অমান্য আন্দোলন এবং পুলিশী নির্যাতনের। জবাবে তিনি লেখেন :

"যে বাঁধনে দেশকে জড়িয়েছে টান মেরে সেটা ছিঁড়তে হয়। প্রত্যেক টানে চোখের তারা উল্টে যায় কিন্তু এ ছাড়া বন্ধনমুক্তির অন্য উপায় নেই। ব্রিটিশরাজ নিজের বাঁধন নিজের হাতেই ছিঁড়ছে, তাতে আমাদের তরফে বেদনা যথেষ্ট, কিন্তু তার তরফে লোকসান কম নয়। সকলের চেয়ে বড় লোকসান এই যে, ব্রিটিশরাজ আপন মান খুইয়েছে। ভীষণের দুর্বৃত্ততকে আমরা ভয় করি, এই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে। কিন্তু কাপুরুষের দুর্বৃত্তাতাকে আমরা ঘৃণা করি। ব্রিটিশসাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণার দ্বারা ধিককৃত। এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতবো।

"সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেই দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা, পুলিশের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের বলো এখনও অনেক বাকি আছে– তার কিছু বাদ যাবে না। এতএব তারা যেন এখনই বলতে শুরু না করে যে বড়ো লাগছে–সে কথা বললেই লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।"

-রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ৮৫।

কবিগুরুর এই ঐতিহাসিক ঘোষণার সঙ্গে তুলনা করুন "ঘরে বাইরে'তে তাঁর যে ইঙ্গিত আছে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাবের বিরুদ্ধে নিছক সংস্কারপন্থী গঠনমূলক কাজের প্রতি পক্ষপাতিত্বের। কবি বদলেছেন বিস্ময়করভাবে, ইতিহাসের পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত গণবিপ্লবের সঠিক মূর্তি স্বচক্ষে দেখে। বয়স যত বেড়েছে কবির মন ততই তরুণ হয়ে উঠেছে।

মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তাই তিনি কামনা করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের জয়। হিটলারের বর্বর অভিযান যে পরাস্ত হবেই এবং সোভিয়েতের জয়ই যে আনবে বিশ্বের কল্যাণ সে কথা তিনি বুঝে গেছেন এবং বলে গেছেন জীবনের শেষ মুহূর্ত। তাঁর আকাঙ্ক্ষা আজ যে মহাসত্যে পরিণত হয়েছে, তিনি তা দেখে যেতে পারেন নি। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বিশ্বপ্রগতির সঙ্গে যে এগিয়ে চলেছিলেন- এখানেই তাঁর মহত্ত্ব। এই অভিনবত্বের জন্যই তাঁর জীবনচরিত অধ্যয়ন করলে একটি সমগ্র যুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করা হয়।

www.pathagar.com

মানবিকীকরণে শিল্পকলা *

সিডনী ফিনকেলস্টাইন (১৯০৯-১৯৭৪) জন্মগ্রহণ করেছিলেন নিউইয়র্কের ব্রুকলিন এলাকায়। ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রী পেয়েছিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সে প্রয়োজনে লিখেছিলেন The writer in the Victorian Novel। আরেকটি এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেছিলেন চারুকলায়। সে থিসিসটি প্রকাশিত হয়েছিল জার্মান ভাষায় Der Junge Picasso (১৯৬৯) নামে। প্রথমে চাকুরী করতেন ডাকঘরে–সেখানে থাকার সময়ে রচনা করেছিলেন একটি নতুন পুস্তক যা Art and Society (১৯৪৭) নামে প্রকাশিত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসীয় রীতিতে সাহিত্য রচনার ও বিচারের ঐতিহ্য বহুদিনের। কিন্তু যান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করায় ধারাটি গতিশীল ও শক্তিশালী হতে পারেনি। সেই রুক্ষ পরিবেশে Art and Society গ্রন্থের প্রকাশ এক পশলা বৃষ্টির মত নেমে আসে। অনেক তরুণ উৎসাহী হলেন মার্কসীয় রীতির সৃষ্টিশীল আলোচনায়। তাঁর সমালোচনার মূল সুর হচ্ছে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ব এবং মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা বৃদ্ধি। সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পই লোকসাহিত্য থেকে সঞ্জীবনী শক্তি আহরণ করে সেটা মনে রেখে তিনি রচনা করেছিলেন Jazz : A people's Music (১৯৪৮), How Music Expresses Ideas (১৯৫২), Realism in Art (১৯৫৪) এবং Composer and Nation (1960)।

শিল্পকলা হল অনেক উপায়ের একটি যার মধ্য দিয়ে মানুষ বহির্জগতকে খতিয়ে দেখে ও চিন্তা করে; বহির্জগতে তাদের সৃষ্ট পরিবর্তনগুলির মূল্য বিচার করে এবং এ দ্বারা নিজেদের অন্তর্জগতে বিকাশমান মানবীয় গুণাবলী ও সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করে। শিল্পকলা সে কাজ সম্পাদনা করে বিশেষায়িত সৃষ্টিক্ষম শ্রমরূপে। সৃষ্টিক্ষম সে অর্থে যে উৎপাদিত বস্তুটি শিল্পীর কাজ সম্পন্ন হবার পর সামাজিক সম্পদ হিসেবে টিকে থাকতে পারে। এর বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে উৎপাদনের উপকরণ ব্যবহারে দক্ষতার মধ্যে। এ প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায় শব্দের ভাষা, বিবিধ আকৃতিতে কিছু নির্মাণ করা বা খোদাই করা; সাংগীতিক প্যাটার্নের তীক্ষ্ণতা ও দক্ষতা অনুযায়ী শব্দকে বিন্যাস করা, ড্রয়িং, রং ও মডেল ব্যবহার করে শরীরের সুপরিচালিত চালনা দ্বারা প্রতিকৃতি নির্মাণ করা।

এগুলি বলা যায় সমাজ কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতি–উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনকে গভীরভাবে

* পৃষ্ঠা : ২৭৭-২৮০, Marxism and Art. সম্পাদক Maynard Solomon (Detroit 1979)

www.pathagar.com

উপলব্ধি করা বা সংগঠিত করা। উপকরণগুলি হল শিল্পী কর্তৃক গৃহীত সামাজিক উত্তরাধিকার, কিন্তু যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে সেগুলি ইতোমধ্যে পরিচিত হয়েছে জীবন্ত ও মানবিক আবেগ সঞ্চিত সমাজিক সম্পর্কে।

প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত মুখের ও লেখার ভাষা অভিধান-নির্দিষ্ট অর্থে সীমিত থাকেনি-এর মধ্যে এসেছে ছন্দ, স্বরভঙ্গি, সুস্পষ্ট ও রঙিন ভাবমূর্তি। সবচেয়ে অধিক ব্যবহার উপযোগিতার জন্য নির্মিত যন্ত্রপাতি, বাসগৃহ, তথ্য সংরক্ষণের জন্য ড্রয়িং প্রভৃতি যেন-তেন প্রকারের হয়না, সেগুলিতে থাকে সামঞ্জস্য, বক্রতল বুনট (texture) ও ছন্দ। নৃত্য ও গীতের রূপে পরিচিত সংগীতও (Music) ভাষার মত ব্যাপক বিস্তৃত আরেকটি সম্পদ। অধিকাংশ মানবের মনে ও শ্রবণে অন্ততপক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ের স্মৃতি জাগানিয়া আবেগধর্মী মিউজিকের উৎসমূল না-থাকলে ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা কীভাবে সৃজনশীল সংগীত রচিত হতে পারে, সেটা জানা কঠিত হত। মানুষ অনেক সময় তাঁর মনের গহনের অবস্থাকে শরীর দ্বারা প্রকাশ করে। অত্যন্ত তুচ্ছ কাজ বা ইশারায়ও এমন গুণ আছে যা চিত্রকর বা নর্তক প্রয়োজনমত শুধু বাছাই করে বা চিহ্নিত করে আরেকটির ওপর বসিয়ে দিয়ে শিল্পকর্মের জীবন্ত অংশ করে তুলতে পারে।

কেবল যে, শিল্পরচনার উপকরণসমূহ সামাজিক ঐতিহ্য হিসেবে শিল্পীর কাছে হাজির হয় তেমন নয়। সমাজের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে শিল্পকলার অবদান আছে। সেটা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে সমাজউদ্ভূত অবস্থার মধ্যে, অথবা সমাজসৃষ্ট বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেমন- সভ্যতার আদিযুগে নির্মিত সরকারী প্রাসাদসমূহে অবশ্যই ভাস্কর্য ও পেইন্টিং সরক্ষণ করার নীতি ও ব্যবস্থা ছিল। অতিসাম্প্রতিক কালে নাটক রচনার হাত ধরাধরি করে চলছে থিয়েটারের উদ্ভব ও বিকাশ, এবং উপন্যাস এগিয়ে যাচ্ছে মুদ্রণ, বই বিপনন, ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি। ফলে শিল্পসৃষ্টি সমাজবাস্তবতার অংশ হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীকে বদলে দিয়ে মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য যে বিরতিহীন শ্রমপ্রক্রিয়া (Labour Process) চলছে, শিল্পকর্মকে অনুধাবন করার মূলেও আছে সেটা। বহির্জগতের বস্তুনিচয়, পরিকল্পিতভাবে ও নতুন আঙ্গিকে মানুষের ব্যবহারে পরিণত হলে সেগুলির বিচিত্রমুখী গুণাবলী প্রকাশিত হয়,-তার প্রতিক্রিয়ায় বিকাশ ঘটে মানবীয় চেতনাসমূহের। যদি প্রাকৃতিক বস্তুগুলির মোহজাগানিয়া রূপ আছে বলে প্রতিভাত হয়, তবে তার প্রধান কারণ এই যে, গঠন ও কাঠামোর পরিবর্তন; বিবিধ কার্যকলাপের ফলে মানুষের চেতনা ও দক্ষতার যে অগ্রগতি এসেছে, এটাই মানুষকে সক্ষম করেছে বস্তুর সুষমা উপলব্ধিতে।

www.pathagar.com

শিল্পকলার সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্যের পার্থক্য আছে-শিল্প মানুষের সৃষ্টি, এর ব্যবহারিক উপযোগিতা যতই থাকুক না কেন কিংবা বাইরের জগতের সংগে এর রূপের মিল যতই ঘনিষ্ট হোক না কেন, এর আকৃতি ও প্রকৃতি ধারণ করে আছে আবিষ্কারের প্রক্রিয়ায় মানুষের বুদ্ধি ও উপস্থিতি। শিল্পের আছে বিষয় ও শৈলী, আধার ও আবেগ। শিল্পকর্মের বিষয় হচ্ছে বহির্জগতে দৃষ্ট কোন প্রপঞ্চ অথবা পালন করার কোন কাজ যা অবশ্যই বিষয়ে পরিণত হয়–অর্থাৎ শিল্পীর সামনে হাজির হয় চ্যালেঞ্জ রূপে–চিন্তার জন্য উদ্দীপক; সমাধানের জন্য সমস্যা, উত্তরের জন্য প্রশ্ন,–শিল্পকর্মের স্টাইল হচ্ছে একমেবাদ্বিতীয় (Unique) প্যাটার্ন-উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিষয় দিয়ে বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করার লক্ষ্য শিল্পী যা গ্রহণ করে। শিল্পীর লক্ষ্য থাকে শিল্পসৃষ্টির কালে তাঁর চেতনায় জাগ্রত হওয়া সমূহ দক্ষতা, অনুভূতি ও উপলব্ধি পাঠক-দর্শকের চেতনায় মূর্ত ও সঞ্চারিত করা।

শিল্পকলার প্রকৃত আধেয় বা শৈল্পিক আধেয় হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে শিল্পীর আবিষ্কৃত সত্যটি। অন্যভাবে যাকে বলা যায় বাস্তবতার মধ্যে দ্যুতি ছড়িয়ে দেয়া যা, পুরানের মধ্যে নতুনের জয়ের আগামবার্তা, বহির্জগতের প্রতিক্রিয়ায় বিকাশমান মনুষ্যঅস্তিত্বের একটি পর্যায়কে স্ফটিক বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত করে। শিল্পকর্ম সৃজনকালের সামগ্রিক জীবনকাঠামোসহ শিল্পীর অস্তিত্বচেতনার প্রতিফলনই হচ্ছে শিল্পের আধেয়, জীবনপ্রবাহ। জীবনপ্রবাহ শুধু চক্ষু-কর্ণ-হস্ত ও শরীরের সামগ্রিক কার্যাবলী নয়, তাতে অন্তর্গত আছে মনের কাজ, জীবন নিয়ে চিন্তা। হালআমলের সমস্যার সমাধানের জন্য প্রাথমিক অতীত অভিজ্ঞতাগুলিও সেই চিন্তা, যা সমস্ত কার্যটি নির্মাণের প্রতিটি স্তর নির্মাণ করে।

জ্ঞানের সম্প্রসারণের বেলায় যেমন দেখা যায়, তেমনটাই ঘটে শিল্পরচনায়। সমাজের সব মানুষের মিলিত প্রয়াসে ইতোমধ্যে গড়ে ওঠা বাস্তবতার সঙ্গে একজন শিল্পীর আবিষ্কারগুলি দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়ে তৈরি করে বাস্তবতা সম্পর্কে নতুন চেতনা। শিল্পকলার আলোচনায় 'বাস্তবতা' বলতে বহির্বাস্তব ও অন্তর্বাস্তব দুটোই বোঝায়-বহির্বাস্তবের মধ্যে পড়ে প্রকৃতির বস্তুগত পৃথিবী এবং মানুষের কার্যকলাপ, অন্তর্বাস্তবে রয়েছে জীবন সম্পর্কে আত্মগত ও মনস্তাত্ত্বিক চিন্তার ভুবন ও তার প্রত্যুত্তর। বাইরের বস্তুগত জগতকে রেকর্ড করার জন্য শিল্পকলা ছাড়াও আছে অনেক উপায়–প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ইতিহাস রচনা, সাংবাদিকতা, সমাজবিজ্ঞান, সংখ্যাতত্ত্ব, অর্থনীতি ও শুধু ডকুমেন্টারীর জন্য ব্যবহৃত ফটোগ্রাফী। শিল্পের একমেবাদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-যা কখনো ওপরের কার্যাবলীকে স্পর্শ করে এবং বলতে গেলে-আকস্মিকভাবে শিল্পের ভুবনেও নিয়ে যায়-যেটা বহির্বাস্তবের আনুভূমিকভাবে আন্তর্জগতকে প্রকাশ করে। অন্যভাবে বলতে

www.pathagar.com

গেলে এ থেকে বোঝা যায়, সমাজবিকাশের বিশেষ মুহূর্তে বা বিকাশের এক স্তরে অস্তিত্বশীল হওয়া ও প্রকৃতিকে জয় করার অর্থ জানিয়ে দেয়া। এই পর্যায়ে স্থান দখল করে আদর্শ নমুনা (Typically) যা প্রকৃত ঘটনা নয়, বরং মানবীয় আশা ও অনুভবের ওপর ক্রিয়ারত একটি শক্তির বহিস্থ গতিশীলতার প্যাটার্ন মাত্র।

শিল্পকলার ইতিহাসে অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের সম্পর্ক নিয়ে বিপুল মতপার্থক্য নজরে আসে-কোন শিল্পকর্মকে কখনো মনে হয়েছে এটি সর্বাধিক বস্তুসর্বস্ব একটি শিল্পকর্ম মাত্র; কারো কাছে কখনো মনে হয় যন্ত্রবৎ ডকুমেন্টেশনের একটি চমৎকার উদাহরণ, অন্যের কাছে মনে হয়েছে সর্বাধিক তন্ময় একটি শিল্পকর্ম। যে-শিল্পকর্ম এক সময়ে সর্বাধিক বস্তুসর্বস্ব, বলতে গেলে ডকুমেন্টেশনের চমৎকার উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হত, অন্য যুগে সেটির ব্যবহার হয়েছে চূড়ান্ত রকমের মন্ময়, তথা আবেগসর্বস্ব শিল্পের উদাহরণরূপে। সুতরাং শিল্পকর্মকে শুধু প্রকাশ করার জন্য দেখলে চলবে না। একে সমালোচনার নিরিখেই বিচার করতে হবে। সমালোচকের নিরিখেই বলার তাৎপর্য হচ্ছে সব মানুষের চেনাজানা পরিচিত পটভূমিতে রেখে বিবেচনা করা। এভাবে বলা আর নিম্নরূপভাবে বলা একই কথা–শিল্পকর্মকে যথার্থভাবে উপভোগ করতে চাইলে অবশ্যই জানতে হবে এর থেকে চমৎকার কী শিক্ষা আমরা পেলাম, যা সবার জন্য প্রযোজ্য; কোন্ দিকটি খোলাশা করা হয়েছে, যা এতদিন আমাদের অজানা ছিল, বা দুর্বোধ্য মনে হত; কোন্ বিষয়টি আবিষ্কার করায় পৃথিবীর জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে, বা পৃথিবীকে দেখার (Perception) ও সেটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার পদ্ধতি পালটে দিয়েছে।

শিল্পের সৌন্দর্য থাকে - থাকতে হবে অবশ্যই। সৌন্দর্য হচ্ছে মানবীয় অনুভূতির বিকাশ সম্পর্কে সচেতনতা-আর সেই সচেতনতার জন্ম হয় বহির্জগতের সম্পদ আবিষ্কারের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির প্রতিক্রিয়া থেকে–চেতনার অগ্রগতিকে বলা যেতে পারে বস্তুজগতের মানবিকীকরণের ফল। শুরুতে আসে প্রকৃতির মানবিকীকরণ–মানুষের চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রকৃতিকে উপযোগী করে তোলা। এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির রহস্য একটু একটু করে ধরা পড়ে, তার নিয়মকানুন জানা হতে থাকে, এবং সচেতনভাবে প্রযুক্ত হয় মানুষের অন্য অগ্রগতির সাধনা; বৃদ্ধি পায় প্রকৃতির বিবিধ ইন্দ্রিয়ঘন বৈশিষ্ট্য জেনে মানসিক সমৃদ্ধিও, দ্বিতীয় বস্তুটি হল মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে। পরিবর্তনের ধারায়, ভেতরের সংঘর্ষ ও সমাজের পুনর্গঠন যা ইতিহাস সৃষ্টি করে-সমাজনিয়ন্ত্রক বিধানগুলি একের-পর-এক আবিষ্কৃত হয়, সমঝোতা বাড়ে, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ও আইনের পুনর্বিন্যাস ঘটে, মানুষের সর্ম্পক আরো মানবিক হয়-অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক বিরোধিতার বদলে সহযোগিতা; অজ্ঞানতা ও ভীতির পরিবর্তে সহমর্মিতা ও সমঝোতা

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত হয়, সহযোগিতার মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি সক্ষম হয় অধিকতর স্বাধীন অবস্থায় নিজেকে বিকশিত করতে।

প্রকৃতি ও মনুষ্যসমাজের সমবায়ে গঠিত বহির্জগতের মানবিকীকরণের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষের ক্রমোন্নতির এক-একটি স্তরে ব্যক্তিজীবনের সম্প্রসারণ ঘটে, মুক্তির পথে এগিয়ে চলার প্রতীতি জন্মায় - বোধশক্তি প্রসারিত হয়। যা সংঘটিত হয় তা কিন্তু ইন্দ্রিয়জাত ধারণার বস্তুগত ভিত্তির পরিবর্তন নয়; বহির্জগতের সঙ্গে ব্যক্তির অভিনব ও অধিক ফলপ্রসূ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তার চোখ পুরোপুরি খুলে যায়। বাইরের একটি আবিষ্কার ভেতরের শক্তি ও সমৃদ্ধিকে সচেতন করে। অনবরত নিজেকে আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি নিজেকেই বিকশিত করে। মনুষ্যশক্তির উল্লম্ফনের আনন্দপ্রদ এ চেতনার অপর নাম নান্দনিক আবেগ, সৌন্দর্যের স্বীকৃতি। কাজ করে আনন্দ পাওয়া যাচ্ছে ও সৌন্দর্য - দর্শনের শিহরণ জাগছে বলার ইংগিত হচ্ছে এর থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ হয়েছে, বোধশক্তি বেড়েছে, উচ্চে উঠেছে শক্তিমত্তা, পৃথিবীর রহস্য আরেকটু বোধগম্য হয়েছে, আরেকটু ভালভাবে বাস করার যোগ্য হয়েছে। শিল্পকলার ইতিহাস হচ্ছে বাস্তবতার মানবিকী প্রক্রিয়ার স্তর পরম্পরার রেকর্ড। শিল্পচর্চা উন্মুক্ত করে মানবিকীকরণ প্রবাহকে যা অন্য কোন মানবীয় উপাদান পারে না- জীবনে কী রূপায়িত হয়েছে সেটাই দেখায় না, বহির্জগতের সঙ্গে জড়িত থাকার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির আলেখ্য নির্মাণ করে।

www.pathagar.com

'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র ঘোষণাপত্র

গত শতকের চতুর্থ দশকে ভারতবর্ষের কয়েকজন তরুণ উচ্চ শিক্ষার জন্যে লণ্ডনে জমায়েত হয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সেই সময়টিতে সারা পৃথিবীতে, বিশেষত এশিয়া ও ইউরোপের দেশে দেশে চলছিল রাজ্য ভাঙ্গা-গড়ার, রাজার পতন-অভ্যুদয়ের, পুরোনো ও নবীন আদর্শের দ্বন্দ্বের বিচিত্র পালা। এই পটভূমিতে উল্লেখিত তরুণরা মাতৃভূমির পরাধীনতা, দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের পাশব তাণ্ডব দেখে ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছিলেন।এদের অন্যতম ছিলেন সাজ্জাদ জহির। তিনি বন্ধুদের সহযোগিতায় ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সহযোগী হিসাবে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলতে আগ্রহী হন। চার পাঁচজন যুবককে এর জন্যে একটি ঘোষণা পত্র রচনা করতে বলা হয়। প্রথম খসড়া প্রস্তুত করেন মুলক রাজ আনন্দ ; দ্বিতীয় খসড়া প্রস্তুত করেন ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ। এই দুটি মিলিয়ে তৃতীয় খসড়াটি প্রস্তুত করেন সাজ্জাদ জহির নিজে। নানা বিশ্লেষণ ও সামান্য অদলবদলের পর সংঘের প্রথম বৈঠকে এটি গৃহীত হয়। এভাবে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র ভিত্তি স্থাপিত হয়। ঘোষণাপত্রটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের Left Review পত্রিকায়। ভারতবর্ষ, তথা দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে বামপন্থী আদর্শ প্রচলন ও সৃষ্টির ব্যাপারে এই সংগঠনটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘোষণা পত্রটি হলো ঃ

১. ভারতীয় সমাজে মৌলিক রূপান্তর সাধিত হচ্ছে।

২. স্থির ধ্যান-ধারণা ও পুরানো বিশ্বাস-সংস্কার, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। বর্তমানে বিশৃঙ্খলা ও দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়ে চলছে এক নতুন সমাজ।

৩. আধ্যাত্মিক চেতনাসমূহ যদিও মৃতকল্প এবং শেষপর্যন্ত এদের অবলুপ্তি অবধারিত, তবু সেগুলি এখনো ক্রিয়াশীল রয়েছে এবং দীর্ঘস্থায়ী হবার জন্য যারপরনাই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৪. ভারতীয় লেখকের কর্তব্য হচ্ছে ভারতের সমাজে এই যে পরিবর্তন চলছে তাকে ভাষা দেওয়া এবং প্রগতিশীলতার মনোভাবকে সহায়তা করা।

www.pathagar.com

৫. ক্লাসিকাল সাহিত্যের ধারা লোপ পাওয়ার পর থেকে ভারতে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার একটি মারাত্মক প্রবণতা হচ্ছে জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া, বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শবাদের মধ্যে শরণ নেওয়া।

৬. এর পরিণতিতে সাহিত্যে জন্ম নিয়েছে এক স্থূল আঙ্গিকসর্বস্বতার এবং প্রাণহীন ও বিকৃত আদর্শবাদিতার।

৭. লক্ষ্য করুন, আমাদের সাহিত্যের মরমী ভক্তিমূলক বাতিক, যৌন-প্রসঙ্গের প্রতি সকুণ্ঠ ও ভাবালুতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগবহুল প্রদর্শনীর মনোভাব এবং যুক্তিবাদিতার প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি।

৮. এই ধরণের সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে গত দুবছরে, যে সময়টা আমাদের দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়ের একটি যখন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে সামন্ততন্ত্রের কাঠামোটি এবং সারা সমাজে ব্যপ্ত হয়েছে দারিদ্র্য ও অধঃপাতের ভয়াবহ অন্ধকার।

৯. আমাদের সংগঠনের লক্ষ্য হচ্ছে যাদের হাতে পড়ে সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্প মাধ্যম অবক্ষয়িত হয়ে গেছে, সেই সমস্ত পুরোহিত, একাডেমিক ও অবক্ষয়িত শ্রেণীগুলির হাত থেকে সাহিত্যকে উদ্ধার করা; একে জনগণের ঘনিষ্ঠতম সংস্পর্শে নিয়ে আসা, এবং একে এমন একটি শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত করা যা শুধু জীবনের বাস্তবতাকেই রূপায়িত করবেনা, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকেও সামনের দিকে পরিচালিত করবে।

১০. ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে আমরা যেমন দাবি করব, তেমনি এর সমস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক ও প্রতিক্রিয়াশীল চেতনাকে সমালোচনা করব নির্মমভাবে এবং ব্যাখ্যামূলক ও সৃষ্টিশীল (দেশী ও বিদেশী উৎসের) রচনা-কর্মের মাধ্যমে এমন কিছু করতে আমরা চেষ্টা করব যা এদেশকে নবজীবনের (যা এরও লক্ষ্য) অভিমুখে চালিয়ে নিয়ে যাবে।

১১. আমরা বিশ্বাস করি যে, নতুন সাহিত্যকে আমাদের অস্তিত্বের মূল সমস্যা-ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পশ্চাদ্‌মুখীনতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতা-কে অবলম্বন করতে হবে, যাতে এগুলি আমরা উপযুক্তভাবে উপলব্ধি করতে পারি এবং সেই অনুভব নিয়ে কর্মে অগ্রসর হতে পারি।

১২. এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়ঃ

www.pathagar.com

(ক) ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষি অঞ্চলে লেখকের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা ; সম্মেলন অনুষ্ঠান ও সাময়িকী ইশতেহার প্রকাশের দ্বারা এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

(খ) ঐসব সাহিত্য-সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা করা যেগুলির লক্ষ্য এই সংগঠনের লক্ষ্যবিরোধী নয়।

(গ) প্রগতিশীল আদর্শ ও উচ্চ শৈল্পিক গুণ বিশিষ্ট সাহিত্য রচনা ও অনুবাদ করা, সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়াশীলতার সঙ্গে লড়াই করা ; এবং এই পথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও সামাজিক নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করা।

(ঘ) ভারতের জন্যে একটি সাধারণ ভাষা (হিন্দুস্থানী) ও সাধারণ লিপি (ভারতীয়-রোমীয়) গ্রহণের পক্ষে কাজ করা।

(ঙ) লেখকের স্বার্থরক্ষা করা এবং রচনা প্রকাশের ব্যাপারে দরিদ্র (who require) ও উপযুক্ত লেখকদের সাহায্য করা।

(চ) চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের জন্যে সংগ্রাম করা।

www.pathagar.com

খ. প্রগতি লেখক ও শিল্পীবৃন্দের সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্র

১. ধনবাদী সভ্যতার শেষ সংকটের এই চরম পর্যায়ে পৃথিবী দুই শিবিরে বিভক্ত। ইতিহাস আজ প্রত্যেক মানব প্রেমিককে প্রশ্ন করিতেছে, আপনি কোন পক্ষে আছেন? আপনি কি মৃত্যুপথযাত্রী ধনবাদ-ফাশিবাদের শিবিরে, না নবজীবনের জয়গানে মুখর সমাজবাদের শিবিরে? বাংলাদেশের শিল্পী ও সাহিত্যিককে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

২. ডলার-সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে ধনবাদী শিবির তৃতীয়মহাসমরের আয়োজনে মত্ত। পৃথিবীকে তাহা পুনরায় রক্তের প্লাবনে ডুবাইতে চায়। যুক্তিতর্ক, বিচার বিবেক সবকিছু বর্জন করিয়া ধনবাদী সভ্যতা আজ একটি মৃত্যুবর্ষী এ্যাটম বোমার আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতের শাসক সম্প্রদায় নিরপেক্ষতার নামে এই আন্তর্জাতিক সমর-প্রস্তুতিকে সমর্থন করে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

৩. মানবতার বিরুদ্ধে এই হীন চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে সমগ্র পৃথিবীর জনগণ ও ভারতের শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত যে মুক্তির অভিযান চালাইতেছে, আমরা তাহাতে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাকে সফল করিয়া তুলিব। আমরা ঘোষণা করিতেছি, বিশ্ব-মানবিকতার ঐতিহ্য বহনকারী বাঙলার শিল্পী ও সাহিত্যিক আন্তর্জাতিক শান্তি ও প্রত্যেক দেশের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অবিচলিতভাবে লড়াই করিবেন।

৩. মানবতার বিরুদ্ধে এই হীন চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে সমগ্র পৃথিবীর জনগণ ও ভারতের শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত যে শক্তির অভিযান চালাইতেছে, আমরা তাহাতে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাকে সফল করিয়া তুলিব। আমরা ঘোষণা করিতেছি, বিশ্ব-মানবিকতার ঐতিহ্য বহনকারী বাঙলার শিল্পী ও সাহিত্যিক আন্তর্জাতিক শান্তি ও প্রত্যেক দেশের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অবিচলিতভাবে লড়াই করিবেন।

৪. ধনবাদী সংস্কৃতি তাহার প্রথম যুগে মানুষকে বড় করিয়া দেখাইয়াছিল, পুরাতনকে পশ্চাতে ফেলিয়া মানুষকে নূতনের জন্য সংগ্রাম করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ধনবাদী সংস্কৃতির প্রথম যুগে আমরা দেখিতে পাই সামন্তবাদী জীবনযাত্রার

---

* ১৯৪৯ সালে সারা ভারতবর্ষের প্রগতি লেখক ও শিল্পীদের সম্মেলন হয়েছিল কলিকাতায়। সেখানে এই ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হয়েছিল। ধনঞ্জয় দাশ কর্তৃক সম্পাদিত মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, অখণ্ড সংস্করণ, কলিকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৩৯-১৪৬

www.pathagar.com

সুকঠোর সমালোচনা, শাস্ত্রের স্থলে বিজ্ঞান, গোষ্ঠীর স্থলে জাতি, ক্ষুদ্রের স্থলে বৃহৎ, গ্রামের স্থলে বিশ্ব, আচারের স্থলে বিচার, অন্ধবিশ্বাসের স্থলে যুক্তি, এবং পরলোকে স্বর্গসুখের পরিবর্তে ইহলোকে জীবন সম্ভোগের উন্মাদনা।

৫. কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত ধনবাদী সমাজে প্রগতির সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ধনবাদী সমাজে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর একাধিপত্য শ্রমিকশ্রেণীকে ও শ্রমজীবী জনসাধারণকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া ক্রমশ অধিকতর দুর্গতির দিকে ঠেলিয়া দেয় এবং ধনবাদের মধ্যে সৃষ্টি করে ক্রমবর্ধমান সংকট। জনসাধারণের বিক্ষোভ ধনবাদী সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইতে লাগিল। সত্যনিষ্ঠ সাহিত্যিক ও শিল্পী ধনিক ও পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীর মানুষের স্বার্থান্ধতা, লোভ, লক্ষ্যহীনতা, নিষ্ঠুরতা, যৌনবিকৃতি, আত্মরতি ইত্যাদির নিখুঁত চিত্র আঁকিয়া কঠোরভাবে ধনবাদী সমাজের সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

৬. আজ মুমূর্ষু ধনবাদের যুগে ধনবাদী সাহিত্যে হইতে প্রগতিশীলতার সুর ও সত্যনিষ্ঠ সমালোচনার সুর অন্তর্হিত হইয়াছে। ধনবাদী সংস্কৃতি আজ আসন্ন মৃত্যুর বিকৃতিতে আচ্ছন্ন। ভবিষ্যৎ তাহার কাছে একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা। মানুষকে এতটুকু মর্যাদা দিতে তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তাহার বিলাস মানুষের 'পশুত্ব' লইয়া। মৃত্যুই তাহার কাছে জীবনের একমাত্র সার্থক পরিণতি, আত্মহত্যাই বীরত্বের একমাত্র পরিচায়ক। বিজ্ঞানকে এবং প্রেম, বন্ধুত্ব, দেশপ্রীতি ইত্যাদি মানবিক মূল্যকে অস্বীকার করিয়া তাহা মানবের মনে দুর্জ্ঞেয়তা, রহস্যবাদ, দুঃখবাদ, ইত্যাদির পচা রোমান্টিক মোহজাল বিস্তার করিতেছে।

৭. বাংলাদেশের রামমোহন-মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ একদা মানবের বিরাটত্বের সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহিত্যে পাই অতীতকে পশ্চাতে ফেলিয়া নূতনের দিকে জয়যাত্রার প্রেরণা। মানবের মহৎ ভবিষ্যৎ, মহৎ চরিত্র, মহৎ কর্ম, মহৎ চিন্তা ও শক্তি—এই সকল ঐতিহ্য তাঁহার বাঙলা সাহিত্যে রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক ধনবাদী ভারতবর্ষের বাস্তব পরিণতি তাঁহাদের সেই সকল স্বপ্নকে ভাঙিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়াছে। পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্য ধনবাদী সমাজের ক্ষয়িষ্ণু ভাবধারায় আচ্ছন্ন। মধ্যবিত্তশ্রেণীর অহমিকা, আত্মকলহ, নৈরাশ্য, ভাববিলাস ও বিভ্রান্তি এই সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। অন্যদিকে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর সামান্য একটু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা ছিল বলিয়া ধনবাদী ভাবধারা মধ্যবিত্তের মনে একটা মিথ্যা জাতীয়তাবাদী 'প্রগতিশীলতার' ও আশাবাদের মুখোশ পরিয়া দারুণ বিভ্রান্তি জাগাইয়াছে এবং মধ্যবিত্তের মারফৎ বাংলা সাহিত্যকে বিকৃত ও অভিভূত করিয়অছে। আজ ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকার অবসান ঘটিয়াছে বলিয়া ধনবাদী ভাবধারা সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল হইয়াছে

www.pathagar.com

এবং সাহিত্য ও শিল্পকে বিনাশের দিকে লইয়া যাইতেছে। বহু মধ্যবিত্ত লেখক নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন, ধনবাদী সাহিত্যের আর কোনো ভবিষ্যৎ নাই। কিন্তু ধনিকশ্রেণীর উগ্র জাতীয়তাবাদী ফ্যাশিবাদী ভাবধারা এখনও নানারূপ ভেক ধারণ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে কলুষিত করিতেছে। আজ সকল প্রগতিশীল লেখকের কর্তব্য ফ্যাশিবাদী ভাবধারার সমস্ত মুখোশ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা এবং যেসকল সাহিত্যিক এই ভাবধারার বাহক তাঁহাদের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে অভিযান চালোনো।

৮. বাঙলার ধনবাদী সাহিত্যে ও শিল্পে শ্রমিকের গৌরবময় সংগ্রামের চিত্র স্থান পায় না। শ্রমিক-কৃষক-মানুষের হীন নিন্দাবাদে এই সাহিত্য মুখর। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার জয়স্তুতিতে ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের কুৎসা প্রচারে ধনবাদী প্রচার-সাহিত্যের ক্লান্তি নাই। ধনবাদী সাহিত্যিকদের কেহ কেহ আবার 'তৃতীয় শক্তি' সাজিয়া শ্রমিক-কৃষকের 'দাবীদাওয়া'র প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানান এবং 'অহিংস' ও 'উদার' মধ্যবিত্ত শ্রমিক-কৃষককে স্বখাতসলিল হইতে উদ্ধার 'করিতেছে–সযত্নে এই অপপ্রচার চালান। 'তৃতীয়-শক্তির' গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিক ও শিল্পীরা প্রচার করেন, তাঁহারা 'সৃষ্টির স্বাধীনতা' বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নন। তাঁহাদের মতে সাহিত্যে বা শিল্পে রাজনৈতিক মতবাদের স্থান নাই, তাহা একান্ত 'বিশুদ্ধ' ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, শিল্পীর আত্মপ্রকাশেরই তাহা সিদ্ধ, তাহার সামাজিক সার্থকতার প্রয়োজন নাই, তাহাতে বিষয়বস্তুর মূল্য নিরর্থক, প্রকাশভঙ্গীর চাতুর্যই একমাত্র বিচার্য। চিরন্তন সত্য ও সুন্দরের উপাসনার আড়ালে এই সকল লেখক ধনাবাদের বেতনভুক্ত প্রচারকের কাজই করিয়া থাকেন। মুখে সমাজ-বিপ্লবের সমর্থন ও কার্যত বিপ্লবের বিরোধিতা–এই বিভীষণ বৃত্তি 'তৃতীয় শক্তি'কে ভারতের নয়া ফ্যাশিবাদের উপযুক্ত দোসর করিয়া তুলিয়াছে।

৯. মৃত্যুধর্মী ধনবাদী-ফ্যাশিবাদী ভাবধারার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সাহিত্য ও শিল্প কিরূপে নবজন্ম লাভ করিবে ও পূর্ণতম বিকাশের দিকে অগ্রসর হইবে, ইতিহাস আজ তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতেছে। ধনিকশ্রেণীর ধনবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনসাধারণ ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী অপূর্ব প্রতিভার ও বীরত্বের সহিত যে চূড়ান্ত মুক্তিসংগ্রাম চালাইতেছেন, তাহা সমগ্র মানবসমাজকে দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্তি দিবে এবং সমাজবাদী সভ্যতা সৃষ্টি করিয়া শিল্প ও সাহিত্যকে অফুরন্ত বিকাশের সম্ভাবনা দান করিবে।

১০. ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে যে গণবিপ্লবের অভিযান চলিয়াছে, তাহারই মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি মানবের সৃষ্টিশীল শক্তির এক সর্বাঙ্গীন নূতন অভ্যুদয়। এই সৃষ্টিশীল শক্তির মুক্তধারাই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সর্বপ্রকার প্রগতির

www.pathagar.com

ও মূল্যের একমাত্র উৎস। গণবিপ্লবই তাই আজিকার দিনের শ্রেষ্ঠ বাস্তব সত্য। সামাজিক বিকাশের সমস্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইহারই মধ্যে নিহিত।

১১. সাহিত্যে এই গণবিপ্লবের প্রতিফলন কেহই রোধ করিতে পারে না। ইতিহাসের অমোঘ বিধি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে যে গণসাহিত্যের সূচনা করিয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক ভূমিকা হইল ধনবাদী সমাজের ও ধনবাদী সাহিত্যের প্রতিরোধ করা এবং গণবিপ্লবকে জয়যুক্ত করা। অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সাহিত্যেরও দুই শিবির গড়িয়া উঠিয়াছে, ধনবাদী সাহিত্যের শিবির ও গণসাহিত্যের শিবির।

১২. প্রগতিশীল সাহিত্যিকের স্থান এই গণবিপ্লবের ও গণসাহিত্যের শিবিরে। যেখানেই পাঁচজন শ্রমিক বা কৃষক সংঘবদ্ধ হইয়া ধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছেন, সেখানেই আমরা শুনিতে পাইতেছি মানবতার দুর্জয় শপথ–সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমরা শুধু নিজেদের শক্তির জোরে সমাজবাদী সমাজ, গণরাষ্ট্র গণসাহিত্য ও গণশিল্প গড়িয়া তুলিব। ব্যাপক গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নূতন সাহিত্য ও শিল্পকে গড়িয়া তোলার জন্য একদিকে যেমন শ্রমিক ও কৃষক নিজেরাই আগুয়ান হইয়া আসিবেন, অন্যদিকে তেমনই বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষকের পাশাপাশি থাকিয়া গণসাহিত্য ও গণশিল্প সৃষ্টির কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন।

১৩. আমাদের দেশে আজিকার দিনের গণসাহিত্য গণবিপ্লবেরই বাস্তব রূপায়ণ। গণবিপ্লবের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া এবং শ্রমিক-কৃষকের জীবনের সহিত্য একাত্ম না হইয়া যে সার্থক সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, একথা মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রগতিশীল সাহিত্যিক নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই ক্রমশ বুঝিতে পারিতেছেন। বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিককে 'আজ জনগণের নিকটে যাইতে হইবে, তাঁহাদের সংগ্রামশীল জীবনকে নিখুঁতভাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের মধ্যে যে সরলতা, ঋজুতা মানবিক মূল্যবোধ আছে, ধনবাদী সাহিত্যিকগণ আজ তাহা পদদলিত করিতেছেন। প্রগতিশীল সাহিত্যিক এই সকল ঐতিহ্যকে অবলম্বন করিয়া গণসাহিত্য রচনা করিবেন। এই সাহিত্য হইবে জনগণের সম্পত্তি। জনগণের সংগ্রামী চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করিবে এবং সমাজবাদী সমাজের ক্রমবিকাশকে ফুটাইয়া তুলিবে।

১৪. যে মানবতার সাধনা ধনবাদী সাহিত্যের প্রথম যুগে সাহিত্যিকের কল্পনাবিলাস ছিল, আজ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ নিজের বাস্তব জীবনে সেই সাধনাকে মূর্ত করিতেছেন। সাধারণ মানুষ আজ বীরত্বের ও মহত্ত্বের চরম শিখরে আরোহণ করিতেছেন। আমরা এক নূতন এপিক যুগে বাস করিতেছি। সাহিত্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য তাই নির্দেশ দিতেছে, সাহিত্যকে আজ বাস্তবতার আশ্রয় গ্রহন করিতে হইবে। জনগণের বাস্তব জীবনেই আজ সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ মানবিক মূল্য খুঁজিয়া পাইবেন।

www.pathagar.com

১৫. পুরাতন মানবতা–যাহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি আমরা বাংলাদেশে রবীন্দ্র সাহিত্যে পাই–মানুষকে বড় করিয়া দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু এই দেখার মধ্যে দুটি গুরুতর অসম্পূর্ণতা ছিল। পুরাতন মানবতা মানুষকে নিজের আত্মার মধ্যে, একাকীত্বের মধ্যেই বড় করিয়া দেখাইত এবং অশুভের সহিত যে সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিয়া শুভকে প্রতিষ্টিত করিতে হইবে তাহা দেখাইত না। মুমূর্ষু ধনবাদের যুগে মানবতার নীতিও বিকৃত হইয়া মানুষকে পাপী, অপরাধী, ক্ষুদ্র ও করুণাযোগ্য বলিয়া চিত্রিত করিতেছে। প্রগতিশীল সাহিত্য নূতন সমাজবাদী মানবতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিবে। ধনিকশ্রেণীর ধনবাদী অশুভের বিরুদ্ধে তীব্র ও নিষ্করুণ সংগ্রামের চিত্র তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে। মানুষকে তাহা দেখাইবে 'যোদ্ধা ও কর্মী' রূপে, ইতিহাসের স্রষ্টা ও নূতন সমাজের সংগঠক রূপে।

১৬. শ্রমজীবী জনসাধারণের বীরত্ব, মহত্ত্ব ও সংঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টা যে নূতন সমাজের ও সভ্যতার পত্তন করিতেছে, তাঁহার পরিপূর্ণ বিকাশ হইবে সমাজবাদী সমাজ ও সভ্যতায়। শ্রমিক ও কৃষক শুধু যোদ্ধা নন, তাঁহারা নূতন সভ্যতার রচয়িতা। শ্রমিক কৃষকের সংগ্রামের ভিতর দিয়া কিরূপে সমাজবাদী সমাজের ক্রমবিকাশ ঘটিতেছে, আজিকার সাহিত্য ও শিল্প হইবে তাহারই রূপায়ণ। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী, এই দুইয়েরই পূর্ণ সমন্বয় ঘটিবে সমাজবাদী বাস্তবতায়। এই সমাজবাদী বাস্তবতার পথেই সাহিত্য ও শিল্পকে অগ্রসর হইতে হইবে।

১৭. প্রগতিশীল গণসাহিত্যের বিরুদ্ধে ধনিকশ্রেণী, ধনিকরাষ্ট্র ও ধনবাদী সাহিত্যিক আজ সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালাইতেছে। ধনবাদী রাষ্ট্রের জেলখানা আজ অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করিতেছে, প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী কোন শিবিরে। সেন্সরশিপ, নিষেধাজ্ঞা, কুৎসা, অপপ্রচার, খানাতল্লাসি, গ্রেপ্তার ইত্যাদি সর্বপ্রকার অস্ত্র লইয়া ধনবাদ আজ প্রগতি-সাহিত্যকে আক্রমণ করিতেছে। আমরা এই আক্রমণকে প্রতিহত করিব ইহাই আমাদের স্থির প্রতিজ্ঞা। প্রগতিশীল গণসাহিত্য ও গণশিল্প মরিতে পারে না। ইতিহাস ইহার স্বপক্ষে। ইহার জয় অবশ্যম্ভাবী।

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

নাম		পৃষ্ঠা
অক্ষয় কুমার দত্ত	....	২৯২
অসকার ওয়াইল্ড	....	২৪৭
আইনস্টাইন, আলবার্ট	....	১০১
আবেল গাস	....	২২৬, ২৩১
আরনস্ট কেসিয়ার	....	২৫৫
আরনষ্ট পল	....	২১৪
আলবার্ট বি লর্ড	....	২৬৮
আলফ্রেড দ্য মুসসে	....	২১
ইউজিন স্যু	....	২৬৪
ইয়েসনিন, সের্গেই আলেকজান্দ্রোভিচ	....	৯৭
ইসকাইলাস	....	৩৬
উসপেনস্কি, গ্লেব আইভানোভিচ	....	৮১
এনথনি কুপ	....	২৫২
ওয়েন, রবার্ট	....	৩৮
ওসট্রোভস্কি, আলেকজান্ডার নিকোলায়েভিচ	....	৪১
ওয়াল্টার বেনজামিন	.... ২২১, ২৫০	
কনরাড	....	২০১
কান্ট, ইমানুয়েল	....	২০৭
কালীপ্রসন্ন	....	২৯২
কুজিন, ভিক্টর	....	২৫০, ২৬৩
গতিয়ে, থিয়োফিল	....	৪২
গোর্কি, ম্যাক্সিম	....	১৬৭
গ্যেটে, ওলফগ্যাঙ্গ ফন	....	১০১, ১৫৫, ১৬৯, ২০৬
গ্যালিলিও গ্যালিলেই	....	১০১
চসার, জিওফ্রে	....	১০১
চিমাবু	....	৪৯
জয়েস, জেমস	....	১০১, ১৫২
জেনে, এইচ, বেল-ভিল্লাডা	....	২৪৭

নাম	পৃষ্ঠা
জিদ, আঁদ্রে	১৫২
জোলা, এমিল	১৫৭
জোশেনকু	৬০
জোর্তিময় ঘোষ	২৮৮
টলস্টয়, লিঁও	৫০, ৬০, ১৫২
টসভেতেইভা, ম্যারিনা আইভানোভনা	৭১
টেকচাঁদ ঠাকুর	২৯২
ডুমাস ফিস, আলেকজান্ডার	২১
তুর্গেনিভ, ইভান সের্গেইভিচ	৪৪, ৪৫
থেলস	১৯
থ্যাকারে	২৯
দান্তে	৪৫৫
দুকাঁপ, ম্যাক্সিম	৪০
দুচ্চিও দি বোওনিনসগনা	৪১
দুহামেল	২৪২
নেপোলিয়ন বোনাপার্টে	২৫১
পুশকিন, আলেকজান্ডার	৪১, ৪২, ৫৩, ৫৪
পো, এডগার এলান	৪৯
পোপ আলেকজান্ডার	১০১
প্রুস্ত, মারসেল	১৫২
পিরানডেল	২৩৩
পিয়ের লরিয়ে	৪৮, ২৬৩
পোলানি, কার্ল	২৬৩
ফাদায়েভ, আলেকজান্ডার আলেকজান্দ্রোভিচ	১৪৯
ফার্মানোভ ডমিট্রি আন্দ্রেয়েভিচ	৮১
ফ্লবের, গুস্তাভ	৪২, ৪৮, ১৫২
বার্গস হেনরী	১০১
বালজাক	৩৮, ৩৯, ১৫৫, ১৬৩, ১৬৯
বিদ্যাসাগর	২৯২

www.pathagar.com

নাম	পৃষ্ঠা
বেনজামিন কন্স্তা	২৫৮
বেলিনস্কি	৪৪, ৪৫, ১৬৭
বুচার, কার্ল	১৯৯
বোদলেয়ার	৪৯
ব্রিফল্ট, রবার্ট স্টেফান	১৯৯
ব্রেখট, বারটোল্ড	২০৪, ২০৫
ভবানী সেন	২৭২
ভিঙ্কেলম্যান, যোহান	২০৬
ভ্যালেরি, পল	১০১
ভাগনার রিচার্ড	২৪১
মধুসুদন, মাইকেল	২৯২
মান, টমাস	১৫২, ১৬৩, ২৪১
মালার্মে	২৭০
মুলকরাজ আনন্দ	২৮৮
ম্যানসফিল্ড ক্যাথারিন	৯৬
ম্যুর জর্জ	২৫০
মারিনেত্তি	২৪৫
মির্চা ইলিয়াড	২৪৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৭২, ৮০
রাসিন, জ্যঁ	২৬১
রুডলফ, আর্নেহেইম	২৩৩
লকুতে দ্য লিজল	৪২
লাসালে, ফার্ডিনান্ড	২১৮
লেসিং	২০৭
ল্যামারতিন	৪০
শ্যাফটজবারী	১৫২, ২৫৪
শিলার, ফ্রেডারিক ফন	২৪, ২৮, ২১৮
শ্‌কলোভস্কি, ভিকটর বোরিসোভিচ	৬৭
শলোকভ, মিখাইল	১৬৩

www.pathagar.com

নাম	পৃষ্ঠা
শাদউইক, জর্জ হোয়াইটফিল্ড	১৯১
শেক্সপীয়ার	২৭, ৩১, ৩৬
সল্টিকভ, মিখাইল	৮৯
সাঁৎ সাইমো	৩৮
সারভেন্টিস	২১৮
সাজ্জাদ জহির	২৮৮
সিনক্লেয়ার আপটন	১৫৮
স্যান্ড জর্জ	৪৮
স্মিথ, এডাম	২৫৮
সিডনী ফিনকেলস্টাইন	২৮৩
স্টোলাইপিন পিতর আরকাদিভিচ	৫৮
হারকনেস মার্গারেট	২১৫
হু শিহ	৯৬
হের্ডার, যোহান গটফ্রিয়েড	২০৭
হেসিওড	১৯৬
হেগেল	২০৬
হৌসম্যান	৫১, ৫২
হোমার	১০১

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষক ড. সাঈদ-উর রহমানের জন্ম কুমিল্লা জেলার শিমপুর গ্রামে, ১৯৪৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারিতে। কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক (১৯৬৪), সিলেটের এম.সি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, বিএ (অনার্স) ও এমএ যথাক্রমে ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৭১ সাল কেটেছে যুদ্ধক্ষেত্রে, মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষক হিসেবে। ১৯৭২ সালে গবেষক হিসেবে বিভাগে যোগদান, ১৯৭৫ সালে প্রভাষক পদে নিযুক্তি, প্রফেসর হন ১৯৯১ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ১৯৯২ সালে। ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ও ফরাসি ভাষায় ডিপ্লোমা পেয়েছেন যথাক্রমে ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সালে; গবেষণাকর্মের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন পুরস্কার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবদুর রব চৌধুরী স্বর্ণপদক অর্জন। বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন ২০০৩ সালে। তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে ৭ জন পিএইচডি ও ৮ জন এমফিল ডিগ্রি পেয়েছেন।

www.pathagar.com

ISBN 978 984 9011 03 3

9 789849 011033

www.pathagar.com